শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

আমার দেবোত্তর সম্পত্তি

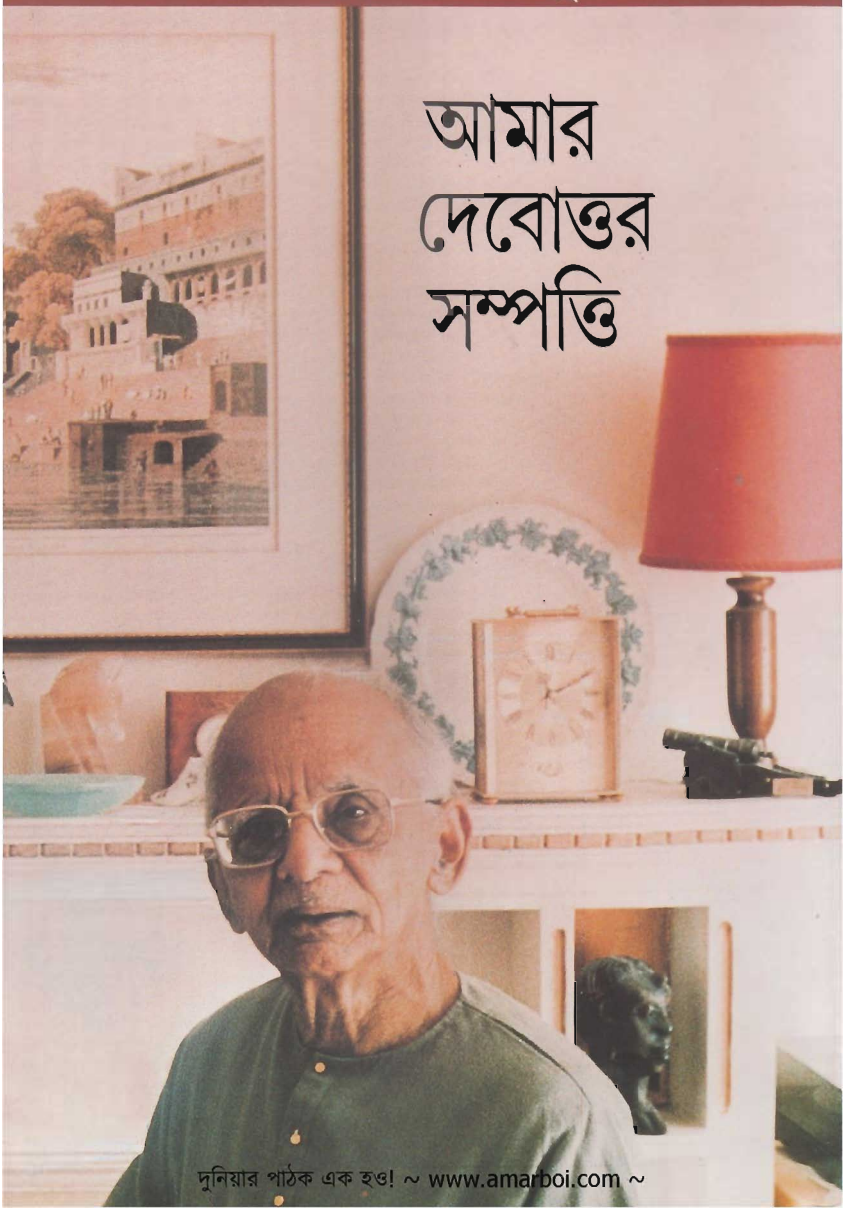

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছিলেন জীবনের প্রথম যে-গ্রন্থ, সেটি তাঁর নিজেরই আত্মজীবনী। ইংরেজি ভাষায় রচিত সেই গ্রন্থনামে নিজেকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন অখ্যাত এক ভারতীয় রূপে।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গ্রন্থটি প্রকাশের পর দেখা গেল, অখ্যাত সেই ভারতীয়ই রাতারাতি পৌঁছে গেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতির চূড়ায় এবং একইসঙ্গে, বিতর্কেরও। বিশেষত, স্বদেশে। এরপর সাতচল্লিশ বছর অতিক্রান্ত। আজ তাঁর বয়স সাতানব্বই। তবু এখনও সমান সজাগ তাঁর মন, লেখনী সক্রিয় এবং পূর্ববৎ ঝড়-তোলা। শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে সেই ঝড়-তোলা লেখনীতেই শ্রীচৌধুরী নতুনভাবে আরেকবার শোনালেন তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের কাহিনী। 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' নামের তাঁর এই নতুন জীবনকথা শুধু যে আকারেই বড় তা নয়, প্রকারেও পুরোপুরি পৃথক স্বাদের। আর তাই, মূল্যেও অনন্য গরিমাপূর্ণ।

এই বই, তাঁর নিজেরই ভাষায়, বাঙালির জন্য বাঙালির লেখা। তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনী যদি আত্মপরিচয়, বাংলা ভাষায় লেখা এই জীবনকথা সেক্ষেত্রে আত্মপরীক্ষা। কোথায় তফাৎ, কেন আত্মপরীক্ষা, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে নতুনভাবে লেখা হল এই বই, তা নিজেই জানিয়েছেন তিনি। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন প্রতিভাত 'দেবোত্তর সম্পত্তি' রূপে, জানিয়েছেন সে-কথাও।

এই গ্রন্থে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বহুব্যাপ্ত ও বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতি পর্বের নানান কৌতূহলকর কাহিনী। বংশপরিচয়, বাল্যজীবন, শিক্ষাদীক্ষা, রোমান্স, দাম্পত্যজীবন, চাকুরিজীবন, লেখালেখির জীবন, বিলেতবাসের জীবন—এমন সমস্ত কিছুর আনুপূর্বিক বিবরণের পাশাপাশি তাঁর জীবনচর্যার, জীবনবোধের ও জীবনদর্শনেরও অকপট পরিচয়। সেই বিবরণ ও সেই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এই বিংশ শতাব্দীর চলমান এক সমাজচিত্রই শুধু চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না, এতকাল-অপরিচিত, কিংবদন্তী-পরিকীর্ণ এক ব্যক্তিমানুষের অন্তরঙ্গ চেহারাটাও ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে। সন্দেহ নেই, এই জীবনকথা নতুন করে চেনাবে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীকে, তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণার ঘটাবে অবসান। অন্যদিকে, উদ্দীপিত করবে বহু পাঠক-পাঠিকাকে।

নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com
ISBN 81-7215-298-1

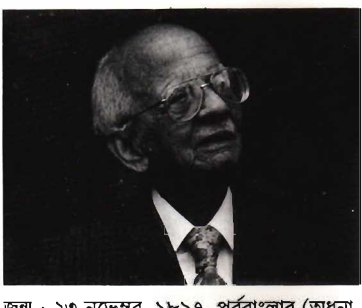

জন্ম : ২৩ নভেম্বর, ১৮৯৭, পূর্ববাংলার (অধুনা : বাংলাদেশ) ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে। বাবা উপেন্দ্রনারায়ণ, মা সুশীলাসুন্দরী।
তেরো বছর বয়স পর্যন্ত জন্মভূমিতে কাটিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। বি-এ পরীক্ষায় ইতিহাস অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। এম-এ পরীক্ষায় দুইটি পেপার দিয়ে আর বসেননি। আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার এখানেই অবসান।
পরীক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর, কিন্তু জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল আশৈশব এবং অতি প্রবল। একটানা বেশি দিন চাকরি করেননি কোথাও। ১৯২৮-এ মডার্ন রিভিয়ুতে সহকারী সম্পাদকের চাকরি। ১৯৩২-এ বিবাহ। স্ত্রী—অমিয়া। বিবাহের পরে মডার্ন রিভিয়ুর চাকরি ছাড়েন। তিরিশের দশকের শেষে শরৎচন্দ্র বসুর সচিব নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছিলেন কলকাতা রেডিওতে—যুদ্ধের ঘটনাবলির ভাষ্যকার। পরে, ১৯৪২ সালের মার্চে, অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি পেয়ে দিল্লি চলে যান। সেখান থেকেই অবসর। ১৯৭০ সাল থেকে বিলেতে আছেন। এখন ব্রিটিশ নাগরিক।
১৯৫১-তে প্রথম বই, 'দি অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান'। বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ ১৯৬৮ সালে, 'বাঙালী জীবনে রমণী'।
১৯৮৯ সালে পেয়েছেন অক্সফোর্ডের সাম্মানিক ডি. লিট.। সে-বছরেই পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, 'দাই হ্যান্ড, গ্রেট অ্যানার্ক' বইটির জন্য।
১৯৬৬ সালে পেয়েছিলেন ডাফ কুপার স্মৃতি পুরস্কার, তাঁর ইংরেজি বই 'দি কন্টিনেন্ট অফ সার্সি'-র জন্য। ১৯৯৩ সালে ইংলন্ডের রানি তাঁকে C.B.E. উপাধি দেন। ১৯৯৭-তে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বিদ্যাসাগর পুরস্কার।

নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আমার দেবোত্তর সম্পত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

আমার দেবোত্তর সম্পত্তি

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৪
ষষ্ঠ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩

© ভুবনারায়ণ চৌধুরী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-298-1

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

AMAR DEBOTTOR SAMPATTI
[Autobiography]
by
Nirod C Chaudhuri

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

iK625

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

“

পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে—
তুমি,
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে।

”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বি জ্ঞ প্তি

এই বই-এ যাহা আছে তাহার প্রায় সমস্তই 'দেশ' পত্রিকায় কয়েক বৎসর ধরিয়া পর পর প্রকাশিত হইয়াছে। এখন সেই রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছি। এইভাবে পুনঃপ্রকাশিত করিবার অনুমতি দিয়া 'দেশ' পত্রিকার স্বত্বাধিকারীরা আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

তবে সাময়িক পত্রে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা শুধু পুনর্মুদ্রণ করিলেই কোনো গ্রন্থ গ্রন্থহিসাবে উৎকৃষ্ট হয় না। এই কথা জানিয়া পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছি, কখনও বেশি, কখনও কম। ভূমিকা আংশিকভাবে নূতন, আংশিকভাবে পুনর্মুদ্রণ। তবে সর্বত্রই ভাষাগত ইতরবিশেষ আছে।

প্রবন্ধগুলি যে-পর্যায়ে 'দেশে' প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই পর্যায় এই বই-এ রাখি নাই। বই-এ যাহা আগে বা পরে থাকে তাহার মধ্যে যুক্তি ও ভাবের পারম্পর্য থাকা উচিত। সেই জন্য প্রবন্ধগুলিকে বই-এ সন্নিবিষ্ট করার সময়ে যুক্তি ও ভাবের ক্রম ও সামঞ্জস্য রাখিতে চাহিয়াছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চী প ত্র

ভূমিকা ১৩

•

প্র থ ম ভা গ
জিজ্ঞাসার উত্তর ২১

প্রথম অধ্যায় :
আমি কেন লিখি ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় :
আমি সাম্রাজ্যবাদী কেন ৫৩

তৃতীয় অধ্যায় :
আমি কেন বিলাঁতে আছি ৭৭

•

দ্বি তী য় ভা গ
জীবনের কাহিনী ১১১

প্রথম অধ্যায় :
আমি একাধারে বাঙালী ও ইংরেজ ১১৫

দ্বিতীয় অধ্যায় :
অক্ষমের ক্ষমতা ১৬৭

তৃতীয় অধ্যায় :
বাঙালী থাকিব, না মানুষ হইব ? ২৪৭

•

উপসংহার ২৭১

পরিশিষ্ট :
What I believe ২৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

Autobiography of an Unknown Indian (1951)
A Passage to England (1959)
The Continent of Circe (1965)
The Intellectual in India (1967)
বাঙালী জীবনে রমণী (১৯৬৮)
To Live or Not to Live (1970)
Scholar Extraordinary—Life of F. Max Muller (1974)
Clive of India (1975)
Culture in the Vanity Bag (1976)
Hinduism (1979)
Thy Hand, Great Anarch (1987)
আত্মঘাতী বাঙালী— ১ম খণ্ড (১৯৮৮)
আত্মঘাতী বাঙালী— ২য় খণ্ড রবীন্দ্রনাথ (১৯৯২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দেবোত্তর সম্পত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

আমি এই বইটাতে আমার জীবনের কিছু কিছু কাহিনী বলিব— কিন্তু তাহা আমার জীবনবৃত্তান্ত দিবার জন্যই নয়, অন্য একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। এই ভূমিকাতেই সেই উদ্দেশ্যটা কি তাহা বলিব। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যেই লিখিয়া থাকি, নিজের জীবনের পরিচয় দিতে গিয়া সেই জীবনকে 'দেবোত্তর সম্পত্তি' বলিলাম কেন? 'দেবোত্তর সম্পত্তি' কাহাকে বলে তাহা জানা থাকিলেও অন্যেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারে এক ব্যক্তি নিজের জীবনকে একান্ত নিজস্ব জিনিস মনে না করিয়া 'দেবোত্তর সম্পত্তি'র মত দেখিল কেন? আমি উপসংহারে উহার ব্যাখ্যা দিব, তাহা ছাড়া 'দেবোত্তর সম্পত্তি' কি তাহাও বলিব, কারণ আজিকার দিনে সকল বাঙালী ভদ্রলোকই হয় চাকুরিজীবী, নয় ব্যবসায়ী হইয়া গিয়াছে; ভূসম্পত্তিগত বহু শব্দের অর্থ তাহাদের জানা নাই এবং ভূসম্পত্তির বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধেও কিছুই সাক্ষাৎ ভাবে জানা নাই। বই পড়িয়া তাহারা যে-ধারণা করে তাহাও বর্তমান যুগের ধ্যানধারণার বশে ভ্রান্ত হয়। ভূসম্পত্তির উল্লেখ করিলেই তাহারা টিয়া পাখির মত একটা শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকে, সেই শব্দটা 'ফিউডালিজম্'। উহা ইউরোপীয় শব্দ, উহার বিশিষ্ট অর্থ আছে, তাহা যে-বাঙালীরা এই শব্দটা আবৃত্তি করে তাহাদের কাহারও জানা নাই। এ-বিষয়ে নানা ইউরোপীয় ভাষায় প্রতি শত বৎসর ধরিয়া অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। সেগুলির কোনো একটাও বাঙালীরা পড়িয়াছে বলিয়া দেখি নাই। তাহাদের কাছে 'ফিউড্যালিজম্' শব্দটা 'বুর্জোয়া' শব্দের মতই সখের গালিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের অল্পবয়সে কিন্তু এই অজ্ঞতা ছিল না।

ভূসম্পত্তি ও ভদ্রলোক

তখন ভূসম্পত্তিই ছিল বাঙালীর 'ভদ্র' বলিয়া গণ্য হইবার একমাত্র উপায়। ওকালতি, ডাক্তারি ইত্যাদি পেশা অবলম্বন করিয়া বা ব্যবসা করিয়া অতি ধনবান হইলেও 'ভদ্রলোক' বলিয়া মান্য হইবার জন্য বাঙালীকে 'জমিদার' অথবা অন্যধরনের ভূস্বামী হইতে হইত। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। জোড়াসাঁকোর রামমণি ঠাকুর ব্যবসা করিয়া ধনী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসা বজায় রাখিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাবনা ও নদীয়া অঞ্চলে বহু সম্পত্তিও কিনিলেন। তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ব্যবসা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের কথাও বলি। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ওকালতি করিয়া বিত্তবান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র যতীন্দ্রমোহন হইলেন 'রাজা'— বাস করিবার জন্য ইংরেজ ভূস্বামীদের অনুকরণে 'ট্যাগোর কাস্‌ল্' পর্যন্ত নির্মাণ করাইলেন।

তাহার পর বিখ্যাত লাহা পরিবারের উল্লেখ করি। প্রাণকৃষ্ণ লাহা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই আদি ব্যবসা নামে রাখিলেও সম্পত্তি কিনিয়া জমিদার হইলেন— যেমন, রাজা দুর্গাচরণ লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা। এই প্রসঙ্গে রূপচাঁদ মল্লিকের বংশধরদের কথাও বলিতে পারিতাম।

আর একটা কথাও বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বাঙালীদের মধ্যে ও বাংলা ভাষায় 'জমিদার' শব্দের একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে। সকল ভূসম্পত্তিসম্পন্ন পরিবারেরই 'জমিদার' আখ্যা হইত না। 'জমিদার' বলিতে বাংলা ভাষায় বোঝা যাইত সেই সব ভূসম্পত্তির অধিকারী যাহারা 'চিরস্থায়ী ব্যবস্থা' অনুযায়ী সাক্ষাৎভাবে গভর্নমেন্টের পত্তনীদার ছিল এবং এজন্য সদরজমা কলেক্টরীতে দিত। ইহারা সাধারণত রায়চৌধুরী পদবী গ্রহণ করিত। অন্য ভূস্বামীরা এই জমিদারদের পত্তনীদার হইত, তাহারা খাজনা দিত জমিদারের কাছে। তাহারা সাধারণত রায় বা চৌধুরী পদবী গ্রহণ করিত। প্রচলিত বাংলায় উহাদের 'তালুকদার' বলা হইত। হিন্দুস্থানে 'তালুকদার' শব্দের অর্থ একেবারে বিভিন্ন ছিল।

রায়চৌধুরী, রায়, বা চৌধুরী উপাধিকারীরা হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্মের যে-কোনো জাতির হইতে পারিত, এমন কি অস্পৃশ্য জাতির ; মুসলমানও হইত। একদিন ইহার জন্য আমি একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের দ্বারা ভর্ৎসিত হইয়াছিলাম। সে ১৯১৭ সনের কথা। আমি ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে গিয়া পড়াশোনা করিতাম। সেখানে সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ও যাইতেন— ইনিই 'জালিয়াৎ ক্লাইভ' পুস্তকের লেখক। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি ?' আমি উত্তর দিলাম, 'নীরদচন্দ্র চৌধুরী।' তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'চৌধুরী ! বামুন না চাঁড়াল বুঝবো কি করে ?' আমি জাতিভেদে বিশ্বাসী ছিলাম না, মনে মনে বলিলাম, 'চাঁড়ালই ধরে নিন।' কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মত দুর্দান্ত ব্যক্তিকে তাহা ধ্বনিত করিয়া বলিবার ভরসা পাইলাম না। আমি অবশ্য জাতিতে কায়স্থ।

আমরা কত পুরুষ ধরিয়া ভূস্বামী বলিতে পারি না। তবে আমাকে লইয়া আমরা ছয়-পুরুষে চৌধুরী। চৌধুরী পদবীর অর্থও বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আছে। হিন্দুস্থানীরা 'চৌধুরী'কে 'চৌধারী' বলে, কারণ তাহারা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ, ধ-কে কোনো স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত দেখিলেই তাহারা মনে করে শব্দটা 'ধারী', যেমন 'ধনুকধারী'। উহারা রাবণের পুত্র 'মেঘনাদ'-কে 'মেঘনাথ' বলে, 'নাথ' তো জানি, 'নাদ' আবার কি ? এমন কি একজন অতি-উচ্চ-শিক্ষিত বাঙালী পর্যন্ত আমাকে বলিলেন, 'চৌধুরী' উপাধিটা প্রাচীন ভারতের 'চৌরোদ্ধরণিক' হইতে আসিয়াছে, অর্থাৎ 'চৌধুরীরা' প্রাচীন ভারতবর্ষের চোর ধরিবার রাজপুরুষ। কিন্তু কোন্ 'ফোনেটিক' নিয়মে 'চৌরোদ্ধরণিক' 'চৌধুরী' হইতে পারে তাহা এই বিদ্বান ভদ্রলোক বিবেচনা করিলেন না। অথচ তিনি যদি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ 'চতুর্ধুরী' জানিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন 'চৌধুরী' 'চতুর্ধুরী'র তদ্ভব রূপ। সংস্কৃত 'চতুর্ধুরী' শব্দের অর্থ বিশিষ্ট ভারপ্রাপ্ত, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

তাই বাঙালী ভূস্বামীরা 'চৌধুরী' উপাধি গ্রহণ করিত। আমার পিতা এইরূপ ভূস্বামী বংশেই জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতি পিতৃব্য ও ভাইরা এমনই অপব্যয়ী হইয়াছিলেন, ও আমার পিতামহকেও এমন ভাবে পরিবারের ঋণের সহিত জড়িত করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলেন যে, পিতা উপায়ান্তর না দেখিয়া, এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করিবার পর কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরে আসিয়া মোক্তারি আরম্ভ করেন। তবে উহাতে যথেষ্ট উপার্জন করিয়া পরে সম্পত্তিও কেনেন।

ভূস্বামী বংশের কেহ এইভাবে কোনো পেশা অবলম্বন করিলে শহরের বাড়িকে তাঁহারা 'বাসা' বলিতেন, একমাত্র পৈতৃক গ্রামের বাড়িকেই 'বাড়ি' বলিতেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার উপন্যাসে এই প্রথা মানিয়া লইয়াছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে বিনয় ভূস্বামী, পাবনা অঞ্চলে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি। সেজন্য কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে তাহার বাসস্থানকে রবীন্দ্রনাথ বিনয়ের 'বাসা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গোরাদের ভূসম্পত্তি নাই। সেজন্য গোরার বাসস্থানকে উল্লেখ করিয়াছেন গোরাদের 'বাড়ি' বলিয়া। আমরাও কিশোরগঞ্জের বাড়িকে 'বাসা' বলিতাম, শুধু পৈতৃক ভিটা বনগ্রামের বাড়িকে 'বাড়ি' বলিতাম। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমার পরিচিত ও আত্মীয়দের বাসস্থান হইতেই দিতে পারি। সুতরাং জীবিকা বা অর্থোপার্জনের জন্য যেখানেই থাকিতে হউক না কেন, বাঙালী ভদ্রলোক পৈতৃক ভিটাকেই সত্যকার বাড়ি বলিয়া মনে করিত। নিজেকে কখনই চিরস্থায়ী শহরবাসী বলিয়া বিবেচনা করিত না।

আমি আমার বংশপরিচয় এত বিস্তারিত ভাবে দিলাম এইজন্য যে, সারাজীবন শহরবাসী হইলেও আমি মানসিক ধর্মে গ্রাম্য ভূস্বামী রহিয়াছি। কখনই শহরবাসীর মনোবৃত্তি আয়ত্ত করিতে পারি নাই। ইংরেজী শিক্ষার ফলে এই মনোবৃত্তি আরও দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। আমি নিজেকে সর্বদাই ইংরেজ ভূস্বামী শ্রেণীর সন্তানের মত বলিয়াও মনে করিয়াছি, কখনও ইংরেজ শহরবাসীর সঙ্গে জড়িত করি নাই। সুতরাং এই জীবনকাহিনীতে আমার আচার-ব্যবহারের যে-বিবরণ দিব, তাহা আমার মানসিক ধর্ম যে কি তাহার পরিচয় না দিলে বোধগম্য হইবে না। আমার একটি বাংলা বই-এ লিখিয়াছি যে, আমি সারাজীবন পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য বালকই আছি, আর কিছু হইতে পারিলাম না। আসলে বলা উচিত ছিল, গ্রাম্য বাঙালী ভূস্বামী বংশের বালক।

ইহার পর এই বই-এ আমার জীবনকাহিনী কি উদ্দেশ্যে দিতেছি, তাহার কথা বলি। আমি এই বই-এ যে-সব কাহিনী বলিতে যাইতেছি, তাহার সবগুলিই আমার ইংরেজী আত্মজীবনীতে আছে। তবে আবার এই বাংলা বই-এ কেন? উহার কারণই প্রথম দেখাইব। সর্বাগ্রে বলিতে হইবে,

বাংলা ভাষায় কেন?

প্রথম কারণ, বাঙালীকে উদ্দেশ্য করিয়া বাংলাতে লেখা ও ইংরেজীতে লেখার মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে। ইংরেজীতে লিখিবার সময়ে আমি যে বাংলা জানি তাহা একেবারে ভুলিয়া যাই; তেমনই বাংলাতে লিখিবার সময়ে ইংরেজী যে জানি তাহাও ভুলিয়া যাই। এরূপ না হইলে আমার দুই ভাষা প্রয়োগেই কৃত্রিমতা আসিয়া যাইত। পাঠকের দিক হইতে দেখিলে, এই কৃত্রিমতা আরও অনেক বেশি বোধ হইত। দর্শকেরা সার্কাসে বন্য জন্তুর খেলা দেখিলে যেমন উহা নিষ্ঠুর শিক্ষার দ্বারা অভ্যস্ত করানো খেলা বলিয়াই মনে করে, জন্তুটির স্বাভাবিক আচরণ বলিয়া গ্রহণ করে না, বাঙালীরা দেশবাসীর ইংরেজী লেখাকে সেইভাবেই নেয়। সেজন্য যত বেশি কায়দা দেখে ততই বাহবা দেয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে সেই লেখা মাথায় ঢুকিলেও হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

নহিলে আমার ইংরেজী পড়িয়া বাঙালী আমাকে বাঙালী-বিদ্বেষী অথবা ভারতবিদ্বেষী বলিত না। একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। একটি অতি সুন্দরী ইতালিয়ান তরুণী দিল্লীতে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে কয়েকটি কথার পরেই ইংরেজীতে বলিয়া উঠিল, 'You are a Baul.' আমি তো হতভম্ব। যাইবার সময়ে সে আমাকে চুম্বন করিয়া গেল। আমার ইংরেজী রচনা পড়িবার পর আমাকে চুম্বন করিবার ইচ্ছা কি কোনও বাঙালী তরুণী বা যুবতীর হইবে ? বরঞ্চ অতীতে ইহার বিপরীতই ঘটিয়াছে। আমার ইংরেজী লেখা পড়িয়া বাঙালী রমণীরা যে- উক্তি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা কটূক্তিই হইয়াছে, অধ্যাপিকা হইলে আরও কটু। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বক্তব্য এক হইলেও শুধু ভাষার প্রভেদের জন্যই আমার উপর রমণীদের ওষ্ঠাধরের প্রয়োগে বিষম উলট-পালট হইয়াছে।

ইহার কারণ শুধু ভাষাগত নয়। ভাষা শুধু ভাষা নয়, মানুষের মনের প্রকাশ। দুই ভাষাভাষীর মনের অনৈক্য হয়। উহার ফলে অর্থও ঠিক বোঝা যায় না, ব্যঞ্জনার উপলব্ধি তো হয়ই না। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। বাংলা 'প্রিয়তম' ও ইংরেজী 'dearest' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এক। অথচ ভাবের গভীর তারতম্য আছে। বাঙালী যুবতী যদি কাহাকেও 'প্রিয়তম' বলেন, তাহা হইলে তাঁহার মনের ভাব 'dearest' শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না, আরও উচ্ছল হইবে।

সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে, প্রতিটি ভাষাভাষীর মনের সহিত পরিচয় ও একাত্মতা না থাকিলে শুধু ভাষার জ্ঞান থাকিলেই অন্য ভাষাতে লেখকের বক্তব্য, তা তথ্যই হউক বা ভাবই হউক— সঠিকভাবে বোঝা যায় না।

আমি ইংরেজীতে লিখি পাশ্চাত্য মনের জন্য ; বাঙালীর, এমন কি সমগ্র ভারতীয়ের মনের জন্যও নয়। বাঙালী মন ও পাশ্চাত্য মন এত বিভিন্ন যে, আমি ইংরেজীতে লিখিয়া দেশে আমাকে ভুল বুঝিবার অবকাশ দিয়াছি। সেই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্যই ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ জীবনকাহিনীর কিছু কিছু বাংলায় দিতেছি। উহা অনুবাদ নয়, অনুবাদ হইতেও পারে না। উহা বাঙালীর জন্য বাঙালীর লেখা।

আত্মপরীক্ষা

নিজের জীবনের কাহিনী এইভাবে পুনরাবৃত্তি করিবার অন্য কারণও রহিয়াছে। উহা আরও মূলগত। আমার ইংরেজী আত্মজীবনী আত্মপরিচয় ; বাংলা ভাষায় নিজের জীবনের কথা বলা আত্মপরীক্ষা। প্লেটো বলিয়াছিলেন— অপরীক্ষিত জীবন, মানুষের দিক হইতে যাপনের যোগ্য জীবন নয়। ইহার অর্থ এই নয় যে, কাহাকেও জন্মগত জীবনের ধারাকে ত্যাগ করিতে হইবে ; প্লেটো শুধু বলিতে চাহিয়াছেন, জন্মের সূত্রে পাওয়া জীবনের ধারাকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার কথার ইঙ্গিত এই যে, পরীক্ষার ফলে যদি সেই ধারা গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তাহা হইলে পুরাতন ধারাতে থাকা অন্যায় হইবে না ; কিন্তু এইভাবে যাচাই করিবার পর যদি নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে উহাকে বর্জন করিয়া গ্রহণযোগ্য অন্য ধারা অবলম্বন করিতে হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোদ্দা কথা, কাহারও নির্বিচারে জীবন যাপন করা উচিত নয়।

আমি যতদূর দেখিয়াছি, তা দেশেই হউক বা বিদেশেই হউক— শতকরা পঁচানব্বুইজন লোকই যে-জীবনের ধারায় তাহারা জন্মিয়াছে, সেটাকে পরীক্ষা করিয়া দেখে না। আমি কিন্তু অতি অল্প বয়স হইতেই বিচার আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার জীবনে আমি যত দুঃখকষ্ট পাইয়াছি তাহা সেই বিচারের ফল ; আবার যত সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহাও সেই বিচারের ফল।

এই কারণেই আমি এই বই-এ যে-কাহিনী বলিতে যাইতেছি, উহা আমার আত্মপরীক্ষার পরিচয় হইবে— তাহাও আবার যতটা নিজের জন্য, তার চেয়ে বেশি বাঙালী সাধারণের জন্য। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন— এই পরীক্ষার কথা অন্যকে বলিবার আবশ্যক আছে কি ? আমি উত্তর দিব— আছে। প্রথমে বলিব— আমার আত্মপরীক্ষার কথা শুনিয়া অন্য বাঙালী, বিশেষ করিয়া যাঁহারা অল্পবয়স্ক, তাঁহারা হয়ত আত্মপরীক্ষা নিজেরাও করিবেন। আমার জীবনের এই কয়টি বিবরণ পড়িয়া অন্য বাঙালী সম্ভবত উৎসাহও পাইবেন, উদ্যমী হইবেন। আমি মনে করি বাঙালীর পক্ষে আমার জীবন দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে পারে।

আমার জীবন কি-ভাবে দৃষ্টান্ত

আমি এইমাত্র যাহা বলিলাম, তাহাতে পাঠকের মনে হইতে পারে— এই ব্যক্তির এত স্পর্ধা কেন ? উত্তর দিব— আসলে স্পর্ধা নয়, অহঙ্কার নয়, সত্যই আমার জীবনের কথা শুনিয়া অন্য বাঙালীর মনে আত্মপ্রত্যয় জাগিতে পারে। আমি আমার দুটি ইংরেজী আত্মজীবনীতে নিজের জীবনকাহিনী— তাহাও মাত্র ৫৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত— মোট পনরো শত পৃষ্ঠায় ছাপাইয়া যে অহঙ্কার আপাতদৃষ্টিতে দেখাইয়াছি, তাহার সাফাই হিসাবে বলিয়াছি, উহা অন্যের কাজে লাগিতে পারে এই জন্য যে, উহা survival of the unfittest-এর কাহিনী।

আমার জীবনের কাহিনী পড়িয়া কাহারও মনে হইবে না যে আমি বীরপুরুষ বা অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, যাহা মনে হইবে তাহা এই— লোকটা দুর্বলচরিত্র, বিষয়বুদ্ধিহীন, খামখেয়ালি, এবং এই সব দোষের শৃঙ্খলেই আবদ্ধ।

অথচ জীবনে সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করিবার মত যেটুকু শক্তি আমার ছিল, সেই অনুপাতে আমি সাফল্য এবং সার্থকতা লাভও করিয়াছি। যে-সব দাবি আমি ন্যায্যভাবে করিতে পারিতাম, তাহার প্রাপ্তি হইতে আমি বঞ্চিত হই নাই। আমি নিজের দুর্বলতাকে অতিক্রম করিয়াছি, যাহাকে আমি বাঙালী জীবনের 'ক্ষুধিত পঙ্ক' বলি, তাহাও আমাকে গ্রাস করিতে পারে নাই।

আমার মত চরিত্রের ব্যক্তিও যদি এইটুকু সাফল্য লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্য বাঙালীর নিরুদ্যম ও আশাহীন হইবার কোনও কারণই হইতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম ভাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসার উত্তর

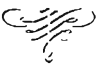

বইটার প্রথম ভাগে আমি আমার জীবনের তিনটা ব্যাপার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিব। শুনিয়াছি আমার সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে কৌতূহল আছে। তবে তাঁহারা অনেক সময়েই নিজেদের অনুমান অথবা শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়াই এই কৌতূহল তৃপ্ত করেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনি, সে-সব কি সত্যি ?' আমি উত্তর দিয়া থাকি, 'যদি আমার পক্ষে হয়, ধরে নেবেন, পনরো আনা মিথ্যা, আর যদি বিপক্ষে হয় তবে নিশ্চিত থাকবেন ষোল আনাই তদ্রূপ।' যদিও আমার আত্মজীবনীর দুইটি খণ্ডে ১৯৫২ সন পর্যন্ত আমার জীবনের কথা ইংরেজী ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিয়াছি, তবুও এই দুইটি বই-এ যে কি আছে তাহা বেশির ভাগ বাঙালীরই জানা নাই।

একদিন দিল্লীতে এক বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন, 'আপনি আপনার "অটোবায়োগ্রাফী অফ আননোন ইন্ডিয়ান" বই-এ এই কথা লিখেছেন।' কি লিখিয়াছি তাহা অবশ্য এই ভদ্রলোকটি উল্লেখ করিলেন। এইখানে তাহা দিলাম না। আমি আমার বইটি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, 'আপনি এই কথা বার করুন, যদি পারেন তবে আপনার নামে এখনি আমি পাঁচশো টাকার একটা চেক লিখে এই ভদ্রলোককে দেব। তিনি আপনাকে দেবেন।' আমার এক আত্মীয় তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, 'ওহে, বার করে পাঁচশো টাকা জিতে নাও !' ভদ্রলোক বইটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিলেন, 'তাড়াতাড়িতে বার করতে পারছি নে।' আমি বলিলাম, 'কখনই পারবেন না, কারণ বইটা আমি লিখেছি, আপনি লেখেন নি।'

আমার ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বিবরণ সম্বন্ধেই যদি এইরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে গুজব কিরূপ হইতে পারে তাহা অনুমান করা সহজ।

যে-তিনটি বিষয়ে আমার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বিশেষভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহারই কথা এইভাগে বলিব। তবে এটাও আমি জানি যে, আমি যাহাই বলি না কেন, যাঁহারা আমার প্রতি বিরূপ তাঁহারা উহা বিশ্বাস করিবেন না, শত প্রমাণ থাকিলেও। আর যাঁহারা আমার পক্ষপাতী তাঁহাদের কাছে আমার কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা সব বিরোধী কথা উড়াইয়া দিবেন। এতদিন পর্যন্ত আমার বিরোধীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রবল ছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আমার লেখার অনুরাগীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহা ষাট বৎসর ধরিয়া নিন্দার উত্তর না-দেওয়ার ফলে। যদি একবারও এই খেউড়ে নিজে নামিতাম, তাহা হইলে সেই খেউড়েই ডুবিয়া মরিতাম।

তবু মনে করি, নিজের কথাটা পুস্তকগত করিয়া রাখি। বিশেষ করিয়া যে-তিনটি ব্যাপারে আমার বিশেষ নিন্দা হইয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধে সত্য কথা বলিয়া অথবা প্রকৃত সংবাদ দিয়া আমি এই কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জোর করিয়া বলিব যে, তথ্যপ্রমাণ দিয়া আমার বক্তব্য খণ্ডন করিবার শক্তি কাহারও হইবে না। তবে মতামত, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা স্বতন্ত্র। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

কৈফিয়তগুলি প্রবন্ধ আকারে সাময়িকপত্রে নানা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এগুলিতে পুনরুক্তি থাকিবে, প্রাসঙ্গিক বলিয়া রাখিলাম। পড়িবার সময়ে পাঠক-পাঠিকারা যেন সাময়িক উপলক্ষ্যটা ভুলিয়া না যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কেন লিখি

(অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর— কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করেন, 'লেখক হবার ধারণা কি করে আপনার মনে এল ?' আমি উত্তর দিই, 'বাঘকে জিজ্ঞেস করবেন, কি করে শিকারের ধারণা তার মাথায় এল ?' নিজের লেখকবৃত্তি সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা সন্তোষজনক কোনো উত্তর আমি দিতে পারি না। তবে কি ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।)

আজ আমি নিজের লেখকবৃত্তির কৈফিয়ৎ দিতে যাইতেছি— একটা গুরুতর কারণে। যদিও আমি ১৯২৫ সনে সাতাশ বৎসর বয়স্ক হইবার পর হইতে ১৯৯২ সনে পঁচানব্বুই বৎসর পার হইবার পর পর্যন্ত— অথবা প্রায় সাতষট্টি বৎসর ধরিয়া, ক্রমাগত ইংরেজী ও বাংলাতে লিখিতেছি ও ছাপার অক্ষরে লেখা প্রকাশিত করিয়া আসিতেছি, তবুও আজ পর্যন্ত কোনও পণ্ডিত বাঙালী আমার লিখিবার যোগ্যতা ও অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইহা আমার অভিমানক্ষুণ্ণ কল্পিত ধারণা নয়, সত্যই এই অভিমত ছাপার অক্ষরে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। হয়ত এই কৈফিয়তের পর কেহ কেহ আমাকে লেখক বলিয়া স্বীকার করিবেন। ইহাদের জন্যই এই প্রযত্ন।

॥ ১ ॥

লেখকবৃত্তি কি ?

তবে প্রথমেই নিজের কথা না বলিয়া লেখকবৃত্তি সম্বন্ধে সর্বকালের ও সর্বদেশের একটা সাধারণ ব্যাপারের কথা বলিয়া আরম্ভ করিব। লেখক হিসাবেই হউক কিংবা অন্য কোনও বৃত্তিতেই হউক, একটি ব্যক্তিবিশেষ কখনও একক বা সম্পূর্ণ নূতন নয়। সে যেমন ব্যষ্টির প্রকাশ, তেমনই সমষ্টিরও অন্তর্ভুক্ত। এই সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা অনুযায়ী আমিও একদিকে নীরদ চৌধুরী, অন্যদিকে একটা বিশেষ শ্রেণীর লেখক। আমার নূতনত্ব হয়ত চার আনা ; সমষ্টিগত ধর্ম নিশ্চয়ই বারো আনা।

তবু এই চার আনার নূতনত্বের কথা বিবেচনা করিলেও লেখক নানারকমের হইতে পারে ; শ্রেণীগত হইলেও শ্রেণীর মধ্যে এক উপশ্রেণীর লেখক হইতে পারে। সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকে এই কথাটাই বোঝে না। তাহারা মনে করে লেখক তো যে লেখে ; সুতরাং যাহারা লেখে তাহারা সকলেই লেখার ধর্মে এক। আসলে এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত।

লেখকবৃত্তি অন্য বৃত্তির মত নয়। সব উকিল মূলত এক, যেমন সব ঘোড়া মূলত এক— তা সে আরব ঘোড়াই হউক কিংবা ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াই হউক। সব ডাক্তারও তাই, সব শিক্ষকও তাই। অর্থাৎ যাহারা মনুষ্যসমাজে প্রচলিত কোনও একটা বিশেষ বৃত্তিতে আছে, তাহারা প্রাণিজগতের একটা বিশিষ্ট 'স্পীশিস্' বা জাতির মত। লেখকেরা কিন্তু সেই ধরনের এক জাতীয় জন্তু নয়। যদি জন্তুর সহিতই তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে একজন লেখক স্বধর্মে সিংহ হইতে পারে, আর একজন ইঁদুর হইতে পারে, গরু তো হইতে পারেই, এমন কি খট্টাশও (পাশ্চাত্য 'স্কাঙ্ক'-এর দেশী রূপ) হইতে পারে। লেখকবৃত্তির ও লেখক-চরিত্রের এই পার্থক্য ও বৈচিত্র্য মানিয়া না লইলে কোনও বিশেষ এক লেখক সম্বন্ধে ভুল ধারণা হইবেই। আমার সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে।

॥ ২ ॥

লেখকেরা দুই চরিত্রের

তবে এই প্রসঙ্গে আমি নিজেকে কোনও বিশেষ লেখক-জন্তু বলিয়া ঘোষণা করিব না। আমি অন্য যে একটা শ্রেণীর মধ্যে পড়ি সেই শ্রেণীবিভাগের কথাই বলিব, তাহাও বলিব একটি উপমার সাহায্যে। এই উপমাটি আপাতদৃষ্টিতে ঠাট্টার মত মনে হইতে পারে, কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই মানিয়া লইতে হইবে যে, উহা লেখকধর্ম ও লেখকবৃত্তি সম্বন্ধে যথার্থ শ্রেণীবিভাগ। এখন উপমাটা দিই।

আমার এক আত্মীয় জ্বর হইলেই প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিতেন। একবার জ্বর হইবার পর যখন মেয়ে পথ্য দিতে আসিল তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'সাবিত্রী ! সাবিত্রী ! মানুষ কয় প্রকার— ?' বাবা ভুল বকিতেছেন ইহা মনে করিয়া মেয়ে ভয়ে নিরুত্তর হইয়া রহিল। তখন পিতা নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, 'মানুষ দুই প্রকার— পাগল, আর ছাগল।' 'পাগলে কি না কয়, ছাগলে কি না খায়'— নিশ্চয়ই এই প্রবাদটি মনে পড়াতে ভদ্রলোক মানুষের এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। সেটা গ্রহণ করিয়া এ-কথাটাও বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যসাধারণের মত লেখকেরাও পাগল কিংবা ছাগল হইতে পারে। সেটা কি-ভাবে হয় তাহা বলিতেছি।

পাগল যেমন যাহা খুশি তাহাই বলে, পাগলশ্রেণীর লেখকও তেমনই যাহা খুশি লেখে, উহা লোকের প্রয়োজনে আসিবে কিনা, লোকে উহা কিনিবে কিনা, অর্থাৎ লেখা হইতে বৈষয়িক লাভ বা জীবনধারণের উপায় হইবে কিনা তাহা চিন্তা করে না, লেখার পাগলামি তাহাকে পাইয়া বসে তাই লেখে।

পক্ষান্তরে, ছাগলজাতীয় লেখক ছাগলের মতই আচরণ দেখায়। ছাগল সকল উদ্ভিদই খায় ও ক্রমাগত খাইতে থাকে। সে কি খাইল তাহার বিচার করে না, যাহার দ্বারা উদরপূরণ হইবে তাহাই খায়। তাহা ছাড়া সে দেখে খাওয়ার ক্ষান্তি করিলে তাহার জীবনেরও অবসান হইবে। তেমনই ছাগলজাতীয় লেখক নিজের রুচির অপেক্ষা না রাখিয়া পাঠকেরা যাহা পড়িতে চায় তাহাই লেখে ও ক্রমাগত সেই ধরনের লেখাই লিখিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। নিষ্কাম লেখা ছাগলজাতীয় লেখকের ধর্ম নয়। এইজন্য লেখাকে ছাগলজাতীয় লেখকের 'প্রফেশন' বা পেশা বলিতে হইবে। তাহাদিগকে পেশাদার লেখকও বলা হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য 'পেশা' জিনিসটা কি ? বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়া এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়াছিলেন। কমলাকান্ত যখন সাক্ষী দিবার জন্য হাকিমের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন উকিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার পেশা কি ?' কমলাকান্ত রাগিয়া উত্তর দিল, 'আমি কি উকিল, না বেশ্যা যে আমার পেশা থাকিবে ?'

প্রচলিত বাংলায় বেশ্যাকে বলা হইত 'পেশাকর'। সেই কথা স্মরণ করিয়াই কমলাকান্ত এই জবাব দিয়াছিল। আসলে কিন্তু, না উকিল না বেশ্যা, কাহাকেও অপমান করিবার উদ্দেশ্য তাহার ছিল না। উকিল হওয়া বা বেশ্যা হওয়া বৃত্তিধর্ম মাত্র, সে উহাই বলিতে চাহিয়াছিল। নিন্দার উদ্দেশ্যমাত্র তাহার ছিল না। হিন্দুর কাছে বেশ্যা নিন্দনীয়া নয়, যদি হইত তবে যাত্রার সময়ে 'দ্বিজ-নৃপ-গণিকা' দেখা শুভ লক্ষণ বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে উক্ত হইত না। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্মো ভয়াবহঃ' এই উপদেশ মানিয়াই বেশ্যা জীবিকা অর্জন করে।

'পেশা'র প্রকৃত অর্থ তাহা হইলে ইংরেজীতে যাহাকে 'প্রফেশন' বলে তাহাই। 'পেশাদার' হওয়ার অর্থও তেমনই 'প্রফেশনাল' হওয়া। এই প্রসঙ্গে কিপলিং একটি উক্তি করিয়াছিলেন— 'Lalun is a member of the most ancient profession in the world.' এটা যে বেশ্যাবৃত্তি তাহা বলা অনাবশ্যক। যখন কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক কোনও পেশা অবলম্বন করে, সে তাহার প্রকৃতিদত্ত বা স্বোপার্জিত পুঁজি (ক্যাপিটাল) কিংবা শিক্ষালব্ধ বিদ্যা বা দক্ষতা অন্য লোকের কাছে বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ বা জীবিকার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহারও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে। ইহাদের জীবনযাত্রা নিজের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। উহা করে অন্য লোকের বা সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদার উপর। এইভাবে নারী দেহ বিক্রয় করে, উকিল আইনজ্ঞান বিক্রয় করে, মুদি তাহার পুঁজির দ্বারা সস্তায় ক্রীত খাদ্যদ্রব্য বেশি দামে বিক্রয় করে, মিস্ত্রি তাহার বিশিষ্ট দক্ষতার দ্বারা অর্থ উপার্জন করে।

তেমনই পেশাদার বা ছাগলজাতীয় লেখক অন্যের মানসিক প্রয়োজন বা চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহার লেখার ক্ষমতা নিজের জীবিকা বা অর্থের জন্য প্রয়োগ করে। তাহার নিজের ইচ্ছার কোনও মূল্যই নাই। তাহাকে প্রতি মুহূর্তেই বলিতে হয়— অবশ্য যদি নিজস্ব কোনও কামনা বা অনুভূতি থাকে— 'লেখা ? এ কি পরিহাস ! দিনের পর দিন "পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা" !'

এইজন্য লেখকবৃত্তিকে একটা মৌলিকবৃত্তি না মনে করিয়া মানুষের কর্মক্ষেত্রের বৃত্তির একটা মানসিক রূপ বলা উচিত। যেমন, যে-লেখক 'পর্নোগ্রাফী' লিখিয়া অর্থোপার্জন করে সে লেখক-বেশ্যা, যে রাজনীতি সম্বন্ধে লেখে সে লেখক-উকিল, যে গল্প লেখে সে লেখক-অভিনেতা বা লেখক-নর্তকী, ইত্যাদি।

পাগলজাতীয় লেখকের কৃত্যকেও এইভাবে কোনও না কোনও লৌকিক পেশার মানসিক রূপ বলা যে যায় না তাহা নয়। কিন্তু সেটা বাহ্যিক সাদৃশ্যমাত্র। পাগল-লেখক ও ছাগল-লেখকের রচনা এক ধরনের হইলেও দুই-এর উদ্দেশ্য এক হয় না, উদ্ভবও এক প্রবৃত্তি হইতে হয় না। যেমন, পাগল-লেখক 'পর্নোগ্রাফী' লিখিতে পারে, লেখেও বটে ;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তাহার 'পর্নোগ্রাফী' নিজের কামজ উত্তেজনার ফল, যেমন কামের বশে ঘরের মেয়ের অসতীত্ব। ইহাতে পয়সা উপার্জনের উদ্দেশ্য থাকে না। আবার পাগল-লেখকের লেখা ওকালতির মত হইতে পারে, কিন্তু উহা আসলে প্রচারকের ওকালতি, উকিলের ওকালতি নয়, কারণ সে যাহা সত্য না মনে করে তাহার সপক্ষে ওকালতি করিতে পারে না। সুতরাং দুই ধরনের লেখকবৃত্তিকে কখনই একই বৃত্তি বলা যায় না।

॥ ৩ ॥

লেখকের সাফল্য ও বিফলতা

এখন এই দুই ধরনের লেখকদের সাফল্য ও বিফলতার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। বৈষয়িক দিক দেখিলে ছাগলজাতীয় লেখকের লাভের সহিত পাগলজাতীয় লেখকের লাভের কোনও তুলনা হইতে পারে না।

প্রথমে লেখা প্রকাশের কথা বলিব। ছাগলজাতীয় লেখক লেখা সহজেই প্রকাশ করিতে পারে, পাগলজাতীয়ের সেটা একটা গুরুতর সমস্যা, যাহার সমাধান অনেক সময়েই দুরূহ, কখনও কখনও একেবারে অসম্ভব।

বর্তমান অবস্থার কথা বলিবার আগে একশো বছর আগেও সমস্যাটা কিরূপ ছিল তাহা বলিতেছি। চার্লস মন্টেগু ডোটির Arabia Deserta ১৮৮৮ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। উহা এখন আরবদের সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। কিন্তু তিনি বইটি শেষ করিয়া চার বৎসর উহা প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। অনেক প্রকাশকই ফেরৎ দিয়াছিল ও একজন লিখিয়াছিল যে, 'It ought to be practically rewritten by a practised literary man.'

উহার কারণ ডোটির ইংরেজী। তিনি বিবেচনা করিলেন, আরবদের জীবন এমন আদিম প্রকৃতির যে, উহার বর্ণনা সমসাময়িক ইংরেজীতে দিলে তাহার যথার্থ রূপ প্রকাশ করা যাইবে না, এবং স্থির করিলেন যে, উহা রাণী প্রথম এলিজাবেথের যুগের ভাষায় লিখিবেন— তাহাই করিলেন। গোল বাধিল ইহার জন্যই। পরে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস উহা প্রকাশিত করিল বটে, কিন্তু উহার দাম এত হইল উহার কথা লোকে প্রায় জানিতেই পারিল না। ১৯০৮ সনে একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ হইবার পর আরও কিছু বেশি লোক জানিল। কিন্তু প্রকৃত খ্যাতি হইল ১৯২১ সনে-টি-ই লরেন্সের ভূমিকা সমেত পুনঃপ্রকাশিত হইবার পর। আমিও ১৯২২ সনের আগে উহার নাম শুনি নাই, তখন ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে গিয়া দেখিলাম।

আর একটি বই এ-ই হাউসম্যানের A Shropshire Lad. বিখ্যাত কবিতার বই। ইহা ১৮৯৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমে ম্যাকমিলান উহা ফেরৎ দেয়। এই প্রত্যাখ্যান লর্ড মরলীর জন্য হয়। তিনি তখন বই-এর প্রকাশযোগ্যতা সম্বন্ধে ম্যাকমিলানের পরামর্শদাতা ছিলেন। পরে কেগান-পল উহা প্রকাশ করে, তবে হাউসম্যানের নিজের খরচে, আড়াই-শিলিং মূল্যে, মাত্র পাঁচশোখানা। এই পাঁচশো বিক্রয় হইতে দুই বৎসর লাগে। কিন্তু পঁচিশ বৎসরের পর উহার এত সমাদর হয় যে, হাউসম্যানের দ্বিতীয় কবিতার বই Last Poems ১৯২২ সনের শেষের দিকে প্রকাশিত হইবার পর তিন মাসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে একুশ হাজার কপি বিক্রয় হয়। তখন Shropshire Lad বৎসরে গড়ে তিন হাজার কপি করিয়া বিক্রয় হইতেছিল।

সুতরাং হাউসম্যানেরও ম্যাকমিলানের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণতা দেখাইবার ইচ্ছা হইল, সুযোগও মিলিল। ১৯২৪ সনে ম্যাকমিলান ল্যাটিন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কাছে একখানা বই চায়। হাউসম্যান বই দিলেন বটে, কিন্তু ঝাল ঝাড়িয়া। তিনি লিখিলেন,—

> 'As in 1895 you refused to publish another book of mine, *A Shropshire Lad*, under similar conditions, I did not think this likely; but he (Charles Whibley) assures me you are now less haughty.'

সুতরাং বুঝিতে হইবে লিখিবার বেলাতে পাগলেরা লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে উদাসীন হইলেও প্রতিশোধ লইবার বেলায় স্বাভাবিক চরিত্রের হইয়া থাকে।

এখন বর্তমানকালের কথায় আসি। বর্তমানে ইংলণ্ডে পাগলজাতীয় লেখকের পক্ষে বই প্রকাশ আগের তুলনায়ও অনেক বেশি দুরূহ হইয়াছে। আমার মুখ্য বইগুলির বেলাতে, বিশেষ করিয়া Thy Hand-এর বেলাতে কত অসুবিধা হইয়াছে তাহার কথা পরে বলিব। আমেরিকায় এই জাতীয় লেখকের রচনা অশ্লীল না হইলে বাহির করা প্রায় অসম্ভব। আমার Thy Hand সেখানে কি করিয়া গৃহীত হইল তাহার কথাও পরেই বলিব। বাংলাদেশে অর্থাৎ বাঙালীর মধ্যে পাগল-লেখকের বই প্রকাশিত হওয়া একেবারেই— একেবারেই অসম্ভব। বাঙালী প্রকাশকেরা ছাগলজাতীয় লেখক ভিন্ন পাগলের বই প্রকাশ করিতে কখনই চাহেন না। কোনও পাগল-লেখক যদি সসঙ্কোচে তাঁহার বই লইয়া প্রকাশকের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহা হইলে নধরকান্তি প্রকাশক মহাশয়, যিনি চেয়ারটি ভাল করিয়া চটকাইয়া বসিয়া আছেন তিনি, পাগল-লেখক-কে, যিনি চেয়ারের ধারটি ভিন্ন বাকী অংশের সহিত পশ্চাদ্দেশের সংস্পর্শ ঘটাইতে ভরসা পান না তাঁহাকে, একটিমাত্র পাতা উল্টাইয়াই বলেন, 'ম্ম, ম্ম'শায়, এ চল্‌বে না।' এই প্রকাশকেরা বিশ্বাসই করিতে পারেন না যে, আজিকার বাঙালী পাঠকও কোনও কোনও ক্ষেত্রে নূতনত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারে। গরুকে মাংস খাওয়ানো যেমন অসম্ভব, তাঁহারা মনে করেন বাঙালী পাঠককে গতানুগতিক বই পড়ানো ভিন্ন অন্য বই পড়ানো সম্ভবই নয়। ইহা কিন্তু তাঁহাদের ভুল। আজও বাঙালী পাঠকও এত বিশুদ্ধ গরু হয় নাই। কিন্তু প্রকাশকগণ অবিচল। তাঁহারা পাগলজাতীয় লেখক সম্বন্ধে সর্বদাই ফাঁসির হুকুম দিবার সময়ে জজের মত কালো টুপি পরিয়া বসিয়া আছেন। আমি পাগলজাতীয় লেখক হইয়াও বাংলাতে কেন প্রকাশ করিতে পারিতেছি তাহার গুপ্ত রহস্য আছে, উহা সর্বাংশে নিয়মের ব্যতিক্রম।

॥ ৪ ॥

সফলতা-বিফলতা— অর্থে, সমাদরে ও অভিঘাতে

লেখকবৃত্তির সার্থকতা যদি অর্থোপার্জন দিয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে যে-কোনও ছাগলজাতীয় লেখকের লাভের সহিত অতি উচ্চশ্রেণীর পাগলজাতীয় লেখকেরও উপার্জনের তুলনা করা যায় না। বিলাতে এই জাতীয় লেখকেরা টাকার জাঁক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখান না। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকায় ইহা বড়াই করিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি আমেরিকান অতি-জনপ্রিয়া বক্‌রী-লেখিকা বড়াই করিয়া বলিয়াছেন,— 'So long as my bank manager respects me, I do not care what the east-coast intellectuals think or say about me.' এইরূপ কথা বলা সম্ভব হইয়াছে, বই প্রকাশ করা একটা ব্যবসামাত্র— এই ধারণা স্বীকৃত হওয়াতে। এখন বেশির ভাগ আমেরিকান প্রকাশক বলেন যে, তাঁহারা সেই সব লোককেই তাঁহাদের প্রকাশিত বই পড়াইতে চান যাহারা নাকি কোনদিন বই পড়ে নাই ; অর্থাৎ হেনরী ফোর্ড যেমন যাহারা কোনদিন মোটরকার চড়িবে কল্পনাও করিতে পারে নাই তাহাদের কাছে তাঁহার নির্মিত গাড়ি বিক্রয় করিয়াছিলেন। তবে আমি শুনিয়াছিলাম, তখন নাকি আমেরিকানরা বলিত, 'আমার দুইটি মোটরগাড়ি ও অতিরিক্ত একটি ফোর্ড আছে।' এখন অবশ্য ফোর্ড গাড়ি ও অন্য গাড়ির মধ্যে এই জাতিভেদ আর নাই। আমেরিকান প্রকাশকেরা বই সম্বন্ধে এইরূপ জাতিভেদ হইতে দিতেছেন না প্রথম হইতেই।

বিলাতে জাতিভেদ বই-এর মধ্যে থাকিলেও সেটা গুণগত, অর্থের উপর নির্ভর করে না, কোনোদিন করেও নাই পক্ষান্তরে বই লিখিয়া টাকা করা গুণ-নিরপেক্ষ। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন জর্জ মেরেডিথ ও টমাস হার্ডি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলিয়া স্বীকৃত, তখনও তাঁহারা মারী করেলীর মত অর্থ উপার্জন করেন নাই। পরের যুগেও যখন গল্‌স্‌ওয়ার্দি, ওয়েলস্‌, বেনেট প্রধান লেখক বলিয়া সম্মানিত, তখন তাঁহাদের কেহই চার্লস গারভিস বা এডগার ওয়ালেসের মত টাকা করেন নাই। বর্তমানেও বৈষয়িক সাফল্যের দিক হইতে বার্বারা কার্টল্যাণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থলেখক বা লেখিকা। (এ বিষয়ে 'গিনেস্‌ বুক অফ্‌ রেকর্ডস্‌' দেখুন।) কিন্তু ইহার জন্য যদি পাগলজাতীয় লেখকেরা ক্ষোভ অনুভব করেন তাহা হইলে তাঁহারা সত্যই পাগল। লিখিয়া কম বেশি অর্থ উপার্জনের পার্থক্য মানুষের স্বভাব হইতে হইয়াছে। উহা মানিয়া লইতে হইবে।

আমাদের দেশেও যখন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্মানে সকলের উপরে ছিলেন, তখন তাঁহারাও বাঙালী ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখকের মত ধনী হইতে পারেন নাই। আমাদের অল্পবয়সে 'দার্শনিক ঔপন্যাসিক' বলিয়া খ্যাত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মত প্রতিপত্তি শরৎচন্দ্রেরও হয় নাই। তাঁহারা 'মিলনমন্দির' উপন্যাস লইয়া হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল।

ইহার পর সমাদরের কথা বলিব। যাঁহারা বই লিখিয়া ধনী হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের সমাদরও বেশি হয়, ইহা ধরিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটা কথাও আছে। লেখকের ক্ষেত্রে সমাদরে সমাদরে প্রভেদ আছে। কোনও লেখক অত্যন্ত সমাদৃত হইলেও সম্মানিত না হইতে পারেন। খেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধা, সিনেমার অভিনেতা, 'পপ্‌'-গায়ক যখন সমাদৃত হয়, তখন তাহারা যে শুধু সম্মানের পাত্র হয় তাহাই নয়, ভক্তি ও পূজার পাত্রও হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু লেখকের বেলাতে এই নিয়ম খাটে না। সমাদৃত লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা না-ও থাকিতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে থাকে না— তাহারা ঠাকুরমা, দিদিমা, মা, মাসীর আদরের দুলালের মত, তাহাদের আদর গুণ-নিরপেক্ষ।

কিন্তু পাগলজাতীয় লেখক যখন সমাদৃত হয় তখন সম্মানিতও হয়। তাহা ছাড়া, এই শ্রেণীর লেখকেরা লেখার সময়ে সমাদর বা সম্মানের কথা না ভাবিলেও, নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত লেখার জন্য পরে সমাদর ও সম্মান প্রত্যাশা করে। ইহার কথা কালিদাস তাঁহার একটি সুপরিচিত শ্লোকে লিখিয়াছিলেন। সেটি এই—

'আ পরিতোষাদ্-বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদ্-অপি শিক্ষিতানাম্-আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥'

—অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিদ্বান ব্যক্তিরা সন্তুষ্ট হইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি যাহা করিলাম তাহার উৎকর্ষ আছে তাহা মনে করিতে পারিব না, কেননা ক্ষমতাবান হইলেও শিক্ষিতগণের মনে নিজের প্রতি অবিশ্বাস থাকে।

ইহার জন্য কিন্তু এই জাতীয় লেখকদের কষ্ট পাইতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই কষ্ট এত অসহনীয় হয় যে, সমাদর না পাইলে লেখক চ্যাটারটনের মত আত্মহত্যা করে, রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষোভ অনুভব করে। ভবভূতি কিন্তু প্রত্যাশিত সমাদর না পাইয়া নিজে ক্ষুব্ধ না হইয়া উল্টা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সগর্বে বলিয়াছিলেন, 'যাহারা নাকি আমার এই রচনা সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করে তাহারা কি জানে ? আমার এই যত্ন তাহাদের উদ্দেশ্যে নয়— কেউ না কেউ আমার সমধর্মী হইবে ও আছে, কারণ কাল নিরবধি ও পৃথিবী বিপুলা।' তাঁহার এই গর্ব করিবার অধিকার ছিল, লেখকবৃত্তি সম্বন্ধে ধারণাও সত্য ছিল।

পাগলজাতীয় লেখকের রচনা সম্বন্ধে এইরূপ পরস্পরবিরোধী মনোভাব ও দলাদলি হয় একটা বিশেষ কারণে— বিদ্বান ও বিদগ্ধ ব্যক্তিরা উহা পড়েন বলিয়া। পণ্ডিতেরা ছাগলজাতীয় লেখকের রচনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন, সুতরাং তাহাদের বেলাতে আড়াআড়ি বা পক্ষপাত বিপক্ষতার প্রশ্ন উঠে না। পাগলজাতীয় লেখকেরা পাঠককে দুই দলে ভাগ করিয়া দেয়— এক দল অনুরাগী ও আর এক দল বিদ্বেষী। জন স্টুয়ার্ট মিল লিখিয়াছিলেন, যে-লেখকেরা প্রতিভাবান ও নূতনত্বের প্রচারক তাহাদের শত্রু দেখা দিবেই। যে-রুচি বা যে-বিচারবুদ্ধি দিয়া উহাদের মতামত গৃহীত হয়, সেই সব ইহাদের নিজেদেরই সৃষ্টি করিতে হয়। ইহার জন্য সময় লাগে। আমি এই কথার সমর্থন ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটা প্রাচীন হিন্দু উপমা দিব। বলিব, নূতনত্ব গ্রহণ করাইতে হইলে নূতনত্বের প্রচারককে অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে হইবে ; যাহারা অশ্বের ভ্রমণে বাধা দিবে তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাইতে হইবে ; নহিলে অশ্বমেধের অধিকার জন্মিবে না। কিন্তু উহা মোটেই সহজ নয়। নূতনত্বের প্রতিষ্ঠাও তাহারই মত। আবার এটাও বলিতে হইবে যে, যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক তাঁহারা নূতনত্ব প্রচারকের শত্রু হইবেনই। এই বিদ্বেষ সকল দেশে সকল যুগে সাহিত্যের ইতিহাসের সুপরিচিত ব্যাপার।

কিন্তু অনুরাগের পরিমাণ ছাগলজাতীয় লেখকের বেলাতে বেশি হইলেও, এবং তাহার জীবন বিদ্বেষের দ্বারা বিষদিগ্ধ না হইলেও, লেখকবৃত্তির চরম সার্থকতার কথা বিবেচনা করিলে পাগলজাতীয় লেখকই শ্রেষ্ঠ, ও তাহারাই শেষ যুদ্ধে জয়ী হয়। সেটা হইয়া থাকে তাহার রচনার 'অভিঘাতের' জন্য। শব্দটা আজিকার বাংলায় তেমন প্রচলিত নয় বলিয়া অর্থটা বলিয়া দিতেছি— অর্থ ইংরেজীতে যাহাকে বলে impact. কিন্তু এই শব্দটা বর্তমান যুগের বাঙালী লেখকের সৃষ্ট অর্বাচীন সংস্কৃত শব্দ নয়, উহা প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকাতে আছে— 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা···' ইত্যাদি। অর্থাৎ তিন রকমের দুঃখের 'অভিঘাত' (impact) হইতে দার্শনিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়। আমিও পাঠকের মনে লেখক কি-ভাবে ও কত প্রবলভাবে আঘাত করে এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করিতেছি।

অভিঘাত বিবেচনা করিলে যাঁহারা লেখাকে জীবনের ব্রত মনে করেন তাঁহাদের সহিত যাঁহারা লেখাকে ব্যবসামাত্র বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের তুলনা হয় না। তখন দেখা যায়, লিখিয়া অর্থ উপার্জনের সহিত লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিবার কোনও যোগ মূলত নাই; যদিও বা কখনও কখনও মনে হয় আছে, উহা কাকতালীয় ন্যায়।

ব্যবসায়ী লেখকেরা পাঠকের দাস, কখনও গুরু হইতে পারে না। তাহাদের লেখকবৃত্তি সভাসদ্, চাটুকার, বিদূষক ইত্যাদি হইবার মত। বন্যার জল যেমন ভাসিয়া গিয়া কোথায় বিলীন হয় কেউ বলিতে পারে না, তেমনই এইজাতীয় লেখাও একদিনের জন্য কূলপ্লাবন ঘটাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। দুই-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কিপলিং-এর গল্পের বই The Day's Work ১৮৯৮ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের পিছন দিকে তাঁহার অন্য বই ও অন্যান্য অনেকগুলি বই-এর বিজ্ঞাপন আছে। এগুলিতে দেখিলাম, সেই বৎসর পর্যন্ত কিপলিং-এর প্রথম Jungle Book ছত্রিশ হাজার কপি বিক্রয় হইয়াছে, আর জেম্‌স্ লেইন অ্যালেন নামে একজন লেখকের The Choir Invisible নামে একখানা বই চুরাশি হাজার কপি বিক্রয় হইয়াছে। কিপলিং তখনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, তবু তিনি অ্যালেনের মত জনপ্রিয় হন নাই। অথচ অ্যালেনের উল্লেখ ইংরেজী সাহিত্যের কোনও ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না।

আরও আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় মার্গারেট মিচেল-এর অতিবিখ্যাত উপন্যাস Gone with the Wind-এর বেলাতে। ইহার সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লিখিয়াছে—

> 'It was almost certainly the largest selling novel in the history of U.S. publishing. A million copies were sold in the first six months after its publication, 50,000 of them in one day. Two million copies were sold in the U.S. by 1939, and over eight million in forty countries before her death.' (1949)

অথচ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার এই সংস্করণেই আমেরিকান উপন্যাস সম্বন্ধে যে নিবন্ধ আছে তাহাতে এই বইখানার অথবা তাহার লেখিকার উল্লেখমাত্র নাই।

পক্ষান্তরে উপনিষদ, গীতা, কালিদাসের কাব্য, হোমার, এস্কিলাস, সোফোক্লেস, ইউরিপিডিস, প্লেটোর রচনা ছাপাখানার অস্তিত্বের অপেক্ষা না রাখিয়াও বাঁচিয়া আছে। সুতরাং লেখক নশ্বর হইতে পারে, অমরও হইতে পারে। অমর হয় যাহারা পাঠকের চরিত্র ও মনকে গঠিত বা পুনর্গঠিত করিতে পারে; আর নশ্বর হইয়া যায় তাহারাই যাহারা জনসাধারণের আমোদের উপকরণ জোগায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ৫ ॥

আমার লেখার বৈষয়িক গতি

ইহার পর আমার নিজের কথায় আসি। পাঠকেরা নিশ্চয়ই বলিবেন, 'তবু ভাল ! কিন্তু নিজের লেখার জবাবদিহি করিতে গিয়া আমাদের কাছে এত বড় ভূমিকা ফাঁদিবার কি কারণ ছিল ?' পাঠকদের দিক হইতে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক, কারণ বেশির ভাগ পাঠকই লেখার বিষয় দেখিয়াই মনে করে— এই বিষয়ে তাহাদের যে ধারণা, লেখক সেই ধারণার অনুযায়ীই লিখিবে। যেমন, আমার Autobiography of an Unknown Indian যখন প্রকাশিত হইল তখন আমার এক বিদ্বান ও সাহিত্যরসিক আত্মীয় প্রশ্ন করিলেন— আমি জিম্ কর্বেটের My India-র মত বই না লিখিয়া মিস্ মেয়োর বই-এর মত বই লিখিতে গেলাম কেন ? এই কথা বলা যে, আমার চেহারা জিম কর্বেটের মত কেন হইল না, কেন মিস্ মেয়োর চেহারার মত হইল, ইহা বলিবারই মত, উহার আভাসও তাঁহার মনে উদয় হইল না।

আবার প্রবন্ধ বা বই-এর নাম সম্বন্ধে যদি লেখকের মনে আগে হইতেই কোনও ধারণা থাকে, তাহা হইলে সেই ধারণা অনুযায়ী আলোচনা না পাইলে পাঠকেরা মনে করে যে, লেখক তাহাদের ধাপ্পা দিয়াছে। দুইটি দৃষ্টান্ত দিই। আমার আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায় কেন An Essay on the Course of Indian History হইল তাহা আমার এক পণ্ডিত বন্ধু বুঝিতেই পারিলেন না। আর একবার Illustrated Weekly of India-তে After Nehru—Who? এই বিষয়ে লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আমি লিখিয়াছিলাম— 'After Nehru—What?' is a more important question than 'After Nehru—Who?' ইহাতে একজন দেশীয় I.C.S. আমাকে বলিলেন, 'You have cheated.' এই সব দেখার ফলেই পাঠককে আমার পথে আনিবার জন্য লেখকবৃত্তি সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ কথা বলিলাম। কোনও লেখকই বৃত্তিধর্ম অতিক্রম করিতে পারে না, আমিও পারি নাই। তবে আমার লেখকবৃত্তি সেই বৃত্তির একটা বিশিষ্ট রূপ। ইহা যে পাগল রূপ, বলিয়া দিতে হইবে না। সুতরাং পাগল লেখকের সব দিকে লাভ-ক্ষতি যেভাবে হয়, সেই রূপে আমারও লাভ-ক্ষতি কিরূপ হইয়াছে, তাহারই দফা দফা করিয়া পরিচয় দিব। সকলের আগে প্রকাশের সমস্যা ও আর্থিক লাভের কথা বলি।

আমি ১৯২৫ সন হইতে লেখা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করি, তবে ইংরেজীতে। বাংলা প্রবন্ধ প্রথম ছাপা হয় দুই বৎসর পরে ১৯২৭ সনে। তার পর হইতে আজ পর্যন্ত সব্যসাচী হইয়া দুই ভাষাতেই প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছি। এ-কথাও বলা প্রয়োজন যে, প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে, না ইংরেজীতে না বাংলায়, না দেশে না বিলাতে, আমার কোনও অসুবিধা হয় নাই। তবে দেশীয় পত্রে ও বিলাতি বা দেশে ইংরেজচালিত পত্রে প্রকাশের সাফল্যের মধ্যে সর্বদাই একটা পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। দেশীয় কাগজে আমার লেখার গুণ যাহাই হউক না কেন, তাহার জন্য কোনও লেখা প্রকাশিত হয় নাই, হইয়াছে খাতিরে, সুপারিশে ও দলাদলিতে ; পক্ষান্তরে দেশেই হউক কিংবা বিদেশেই হউক ইংরেজ-পরিচালিত কাগজে সব লেখাই গুণবিচারের ফলে বাহির হইয়াছে। কোনও সম্পাদকের সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল না, সুপারিশেরও আবশ্যক হয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহার দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি আমার প্রথম প্রকাশিত দুইটি রচনা হইতেই। দুইটিই ইংরেজীতে লিখিয়াছিলাম। একটি ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ'-এর ১৯২৫ সনের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়টি বর্তমান ভারতের সংস্কৃতিগত সমস্যা সম্বন্ধে— কলিকাতার ইংরেজ-সম্পাদিত 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় জানুয়ারি, ১৯২৬-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে শুধু সখের জন্যই লিখিয়াছিলাম, প্রকাশ করিবার ভরসা ছিল না। তবে আমার পূর্বতন শিক্ষক ও কবি মোহিতলাল উহা শুনিয়া এতই মুগ্ধ হন যে, আমাকে একদিন বলিলেন, 'তোমার লেখাটা নিয়ে চল তো আমার সঙ্গে।' তিনি আমাকে লইয়া গেলেন রামানন্দবাবুর পুত্র অশোকবাবুর কাছে— পরে, শুধু তাহাই নয়, লেখাটি আমাকে দিয়া পড়াইলেন ও অশোকবাবুকে দিয়া শুনাইলেন। অশোকবাবু তখনই কিছু না বলিয়া লেখাটি দেরাজের মধ্যে রাখিয়া দিলেন, ও পরে পিতাকে বলিয়া ছাপাইলেন। মোহিতবাবু এই লেখাটির জন্য পঁচিশ টাকা 'মডার্ন রিভিউ' হইতে আনিয়া দিলেন। তখন ইহা বেশ উচ্চ পারিশ্রমিক ছিল। এইভাবে সুপারিশে আমার লেখকজীবন আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় লেখাটি লইয়া ইহার অল্প দিন পরেই ভয়ে ভয়ে চৌরঙ্গীতে 'স্টেট্‌সম্যান' আপিসে গেলাম। তখন 'স্টেট্‌সম্যান' সে-যুগের ইংরেজ সম্পাদকের দ্বারা পরিচালিত, দেশী লোকের লেখা প্রায় প্রকাশিত করেই না, তাহার উপর আমি সম্পূর্ণ অজানা নগণ্য বাঙালী। সাব-এডিটর (সাহেব) আমার দিকে ফিরে চাহিয়াই ট্রে-র দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন, আমি লেখাটি সেখানে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম। ইহার পর সন্ধান না করিয়াও লেখাটি ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইলাম এবং না-চাহিয়াও একটি চেক পাইলাম— পঞ্চাশ টাকার। ইহা আমার অকল্পনীয় ছিল।

এই নিয়মের আজ পর্যন্ত ব্যতিক্রম হয় নাই। 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' বর্তমানে যাঁহারা কার্যত পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের জোড়হাতে জিজ্ঞাসা করি— 'ভয়ে বলি, কি নির্ভয়ে বলি?' নির্ভয়ে বলিবার ভরসা পাইব এই আশা করিয়াই বলিতেছি— 'শ্রীমান অভীকের পক্ষপাতিত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে এই দুইটি কাগজের মত কাগজে আমার লেখা প্রকাশিত হইবে এই দুরাশা আমি কখনও করিতে পারি নাই।' পক্ষান্তরে বিলাতের 'টাইম্‌স্' ও 'ডেলী টেলিগ্রাফে'র মত কাগজও আমার কাছে লেখা চাহিয়া পাঠায়, আমি উপযাচক হইয়া কখনও লেখা পাঠাই না। সুতরাং বলিতেই হইবে— দেশী কাগজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 'অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজ', আর বিলাতি কাগজের সঙ্গে 'লাভ ম্যারেজ'।

কিন্তু ইংরেজীতে প্রবন্ধ ছাড়া বই প্রকাশ করিতে আমাকে রীতিমত বেগ পাইতে হইয়াছে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত। ১৯৫১ সন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত আমি বাহান্নটি বই প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। ইহার মধ্যে দশটি ইংরেজীতে ও দুইটি বাংলাতে, আবার সাতটি ইংরেজী বই বিলাতে ও আমেরিকায়, পাঁচটি বই দেশে— তিনটি ইংরেজীতে ও দুইটি বাংলাতে। দেশে যে বইগুলি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই আমি বিলাতে ও আমেরিকায় তিনটি বই বাহির করিয়া খ্যাতি লাভ করিবার পর— উহা না হইলে দেশে ইংরেজীতে দূরে থাকুক, বাংলাতেও বই প্রকাশ করিতে পারিতাম না। মিত্র অ্যান্ড ঘোষ আমার বাংলা বইগুলি ছাপাইয়াছেন, তাঁহারা সত্যই আমার বই-এর গুণ দেখিয়াছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তাঁহারা ব্যবসায়ীও বটেন, সুতরাং তাঁহারা জানেন যে, বাঙালীর কাছে আমার বই-এর মত বই চালাইতে হইলে— অন্য বাঙালী লেখকদের কথা স্বতন্ত্র—কেবল গুণে চলিবে না গুঁতোরও প্রয়োজন আছে। সে-গুঁতো আসিয়াছে বিলাত ও আমেরিকা হইতে। বিদেশের চাপ পিছনে না থাকিলে আমার কোনও ইংরেজী বই দেশে প্রকাশিতই হইত না। আশ্চর্যের কথা এই যে, বাংলা বইও প্রকাশিত হইত না। জবাহরলাল নেহরু যেমন হ্যারো-কেম্‌ব্রিজে পড়িবার ও বিলাতের ব্যারিস্টার হওয়ার ফলেই মহাত্মা গান্ধী ও ভারতবাসীর দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের নেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, আমিও তেমনই বিলাত ও আমেরিকায় ইংরেজীতে বই প্রকাশ করিবার জোরেই বাংলাতেও গ্রন্থকার বলিয়া গৃহীত হইয়াছি। তবে ইহার মধ্যে কৃত্রিমতা নাই— জবাহরলাল যেমন খাঁটি জাতীয় নেতা ছিলেন, আমিও তেমনই খাঁটি বাঙালী লেখক।

অথচ, আমার পিছনে আমার ইংরেজীতে লেখা বইগুলির জোর থাকা সত্ত্বেও, বিলাতে বা আমেরিকায় এই বইগুলি প্রকাশ করা আমার পক্ষে মোটেই সহজ হয় নাই। কিছু বিবরণ দিতেছি।

আমার প্রথম বই, The Autobiography of an Unknown Indian, ১৯৪৯ সনের এপ্রিল মাসে শেষ করিয়া একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশকের কাছে পাঠাই। তিনি আগে উহার অর্দ্ধেক মত দেখিয়া সমাপ্ত বইটা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, না করিলে হয়ত আমি যে-রকম পরিশ্রমবিমুখ ছিলাম তাহার জন্য এত দীর্ঘ একটা বই শেষই করিতাম না। কিন্তু শেষ করিয়া যখন পাঠাইলাম, তখন তিনি জানাইলেন যে, সম্পূর্ণ অজানা এক জগত ও জীবনযাত্রার এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে ইংরেজ পাঠকের ঔৎসুক্য দেখা যাইবে না, সুতরাং তিনি বইটি প্রকাশ করিতে পারিবেন না। আমি খুবই আশা করিয়াছিলাম, একেবারে মুষড়াইয়া পড়িলাম ; আরও নিরুৎসাহ হইলাম এই জন্য যে, তখন আমি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া জীবন সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়াছিলাম। তাই ভাবিতে লাগিলাম, এত লেখকের এত বই প্রকাশিত হইতেছে, আমার বইটিই কি হইবে না ? বইটি সম্বন্ধে আমার খুবই আস্থা ছিল, সুতরাং দুঃখ আরও বেশি হইল। ইহার পর আর একজন বিখ্যাত প্রকাশকের কাছে পাঠাইলাম। তিনিও জানাইলেন যে বইখানা গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিলাম। সে-সময়ে আমার সঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ সামরিক লেখক লিডেলহার্টের পত্র ব্যবহার চলিতেছিল। আমার বই-এর কথা শুনিয়া তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, প্রকাশের ব্যাপারে যদি সহায়তার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তিনি যথাসম্ভব করিবেন। আমি তাঁহার পরামর্শ চাহিলাম। তিনি লিখিলেন যে, নিজে চেষ্টা না করিয়া বইটি একজন 'লিটারারী এজেন্টে'র হাতে দেওয়া উচিত, এবং তাঁহার নিজের এজেন্টের নাম জানাইলেন। আমি তাঁহার হাতে বইটি দিলাম। তিনি বইটির প্রশংসা করিলেন, কিন্তু এ-ও বলিলেন যে, ইহার দৈর্ঘ্যের জন্য প্রকাশে বাধা হইতে পারে। ইহার পর ছয় মাস আর খবর নাই। ইহাতে চিন্তিত ও অধৈর্য না হইয়া বরঞ্চ ভরসাই পাইলাম, কারণ মনে হইল কোনও প্রকাশক ভাল করিয়া বিবেচনা করিতেছে। অবশেষে খবর আসিল ম্যাকমিলান বইটি ছাপিবে। ম্যাকমিলানের মত প্রকাশক বইটি গ্রহণ করিল ইহাতে আমি খুবই আনন্দিত হইলাম। উহার ডিরেক্টরগণও চিঠিতে বইটির খুবই প্রশংসা করিলেন। পুরা এক বৎসর দুশ্চিন্তার পর আমি শান্তি পাইলাম। পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যখন বইটি প্রকাশিত হইল, তখন সমালোচকদের কাছে উহা যে প্রশংসা পাইল এরূপ সমাদর কম বই-এর বেলাতেই হইয়া থাকে। বি-বি-সি-ই উহার উপর চারটি ব্রডকাস্ট করিল।

আরও লাভের ব্যাপার এই হইল যে, প্রথম বইটির জন্যই আমার দ্বিতীয় ইংরেজী বই লেখা সম্ভব হইল। বি-বি-সি-র কর্তৃপক্ষেরা ১৯৫৫ সনে মনে করিলেন, আমাকে বিলাত দেখাইয়া আমাকে দিয়া বিলাত সম্বন্ধে বক্তৃতা করাইবেন। এ-রকম কোনও সম্ভাবনার কথাও আমার মনে জাগে নাই, সুতরাং খুবই খুশি হইলাম। ইংলণ্ড দেখি নাই, কখনও দেখিব তাহার আশাও করিতে পারি নাই। সাতান্ন বৎসর বয়সে প্রথম বিলাত দেখিবার সুযোগ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটিল। আমি পরে চারিটি বক্তৃতা দিলাম, এবং বিলাত সম্বন্ধে বই-ও লিখিলাম। উহা প্রকাশ করিতে আমার কোনও অসুবিধা হইল না। ম্যাকমিলানই প্রকাশ করিলেন। উহার অবিমিশ্র প্রশংসা বিলাতে হইল, এবং খুব বিক্রয়ও হইল। এটা ১৯৫৯ সনে।

কিন্তু তৃতীয় বই Continent of Circe লইয়া গোল বাধিল। ম্যাকমিলানের পক্ষ হইতে যিনি বইখানা দেখিয়াছিলেন, তিনি কতকগুলি পরিবর্তন করিতে বলিলেন। ইহাতে আমার মেজাজ চড়িয়া গেল, কারণ কোনও বই-এ কি থাকিবে অথবা বই কি-ভাবে লেখা হইবে এ-বিষয়ে লেখককে নির্দেশ দিবার কোনও অধিকার প্রকাশকের আছে তাহা মানিয়া লইতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি পরিবর্তন করিতে অস্বীকার করিয়া বইখানা ম্যাকমিলানের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইলাম। পরে বইখানা চ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাসের দ্বারা প্রকাশিত হইল এবং একটা সাহিত্যিক পুরস্কারও পাইল।

ইহার পর ম্যাক্সমূলারের জীবনী ও ক্লাইভের কাহিনী লইয়া কোনও অসুবিধা হইল না ; কিন্তু হইল হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বই লইয়া। উহা বিলাতে প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে আমার ষষ্ঠ বই এবং তখন আমি লেখক হিসাবে বেশ খ্যাতিমান। বইটির জন্য প্রকাশক অগ্রিম টাকা দিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বিচার্য ছিল বইটি সুলিখিত না কুলিখিত এইমাত্র, উহা হিন্দুধর্মের সঠিক বিবরণ কি না উহা বিচার করিবার জন্য কোনও 'বিশেষজ্ঞে'র কাছে পাঠাইবার প্রয়োজন ছিল না। তবু ভুলক্রমে একজন নূতন ডিরেক্টর উহা একজন ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে পাঠাইলেন। এই অধ্যাপকের উপদেশ যখন আমাকে জানান হইল, তখন আমি উত্তর দিলাম যে, এই উপদেশমত যদি আমাকে বইটি পরিবর্তন করিতে হয় তাহা হইলে আমাকে মানিয়া লইতে হইবে এ-বিষয়ে বই লিখিবার যোগ্যতা বা অধিকার আমার ছিল না ; আমি তাহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলাম না, সুতরাং বইখানা অবিলম্বে ফেরৎ দিতে বলিলাম। তখন বইখানা আমি যেভাবে লিখিয়াছিলাম সেইভাবেই প্রকাশিত হইল।

ইহার পরে যে বইটি লিখিলাম উহাই আপাতত ইংরেজীতে লেখা আমার শেষ বই। ১৯৭৯ হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১৯৮৫ সনে বইখানা শেষ করিলাম। তখন আর আমি অখ্যাত বা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নই— বিশিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে ইংরেজীতে যতগুলি 'রেফারেন্স' বই আছে তাহার সবগুলিতেই আমার নাম আছে। তবুও সবচেয়ে বিভ্রাট হইল এই বইখানা প্রকাশের বেলাতেই। উহার কারণ. বইটির দোষ গুণ নয়, উহার দৈর্ঘ্য। দেখা গেল, ছাপায় উহা এক হাজার পৃষ্ঠারও বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইবে। এত দীর্ঘ বই ছাপিয়া লাভ করা প্রায় অসম্ভব। আজিকার দিনে ইংলণ্ডে এবং আমেরিকাতেও এত বড় বই প্রকাশিত হয় না। সুতরাং প্রকাশক যদি ব্যবসার দিক দেখিয়া আপত্তি তুলিয়া থাকেন, তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না।

তবুও আপত্তি আমার দিক হইতে ঘোর দুঃখের কারণ হইল। কি-ভাবে সেই দুঃখ দূর হইল তাহার কথা বলি। চ্যাটোর একজন ডিরেক্টর প্রথম হইতেই বইখানা দেখিতেছিলেন, তিনি ১৯৮৫ সনে সেই কোম্পানি ছাড়িয়া যান। তবু তাঁহার হাতেই বইখানা ছিল বলিয়া বর্তমান চালকদের কাছে তিনিই রিপোর্ট দিলেন যে, বইখানার দৈর্ঘ্য কমাইয়া অর্ধেকমত করিতে হইবে। বর্তমান কর্তারা সেই মত গ্রহণ করিয়া, নিজেরা বইখানা না দেখিয়া, আমাকে তাহাই জানাইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বইখানা ফিরাইয়া আনিলাম। ইহা কোনও লেখক করিতে পারে, তাহা আজিকার দিনে অকল্পনীয়। তবে আমিও সকল সম্ভাবনার কথা ভাবিলাম। বুঝিলাম, বইখানা আমার জীবিতাবস্থায় দূরে থাকুক কোনও দিন প্রকাশিত না হইতে পারে। তবু এ-বিষয়ে প্রকাশকের নির্দেশ মানিতে পারিলাম না।

যাহা হইবার হইবে— Que Sera Sera— ধরিয়া লইয়া বইখানা বাড়িতে বসিয়া সংশোধন করিতেছি, তখন ছয় মাস পরে চিঠি আসিল, বর্তমান চ্যাটোর কর্তৃপক্ষ বইখানা নিজেরা দেখিতে চান। আমিও পাঠাইলাম। বইখানা ইঁহাদের এত ভাল লাগিল যে অপরিবর্তিত আকারেই প্রকাশ করিবেন স্থির করিলেন, শুধু একটি শর্তে— যদি কোনও আমেরিকান প্রকাশকের সহযোগিতা পান। তখন চ্যাটো কুড়ি-পঁচিশ জন আমেরিকান প্রকাশকের কাছে গেলেন। কিন্তু কেহই বইখানা ছাপিতে চাহিল না। আশ্চর্যের কথা এই যে, ইহার পর চ্যাটো স্থির করিলেন আমেরিকান সহযোগিতা না-পাইয়াও তাঁহারা বইখানা ছাপিবেন, আরও আশ্চর্যের কথা জানিলাম যে, বইখানার দাম এই দৈর্ঘ্যের বই-এর সাধারণত দাম যাহা হয় তাহার অর্ধেকমত করা হইবে। বই প্রকাশিত হইল, যথেষ্ট প্রশংসা পাইল, প্রকাশকেরও কোনও ক্ষতি হইল না। বইখানা পরের বৎসরের প্রথম দিকে পেপার-ব্যাকে অপেক্ষাকৃত অল্প দামে প্রকাশিত হইল।

বিলাতের সেই সফলতার জোরে আমেরিকাতেও প্রকাশক জুটিয়া গেল। ইঁহারা বইখানা অতি সুন্দরভাবে ছাপাইয়া ও বাঁধাইয়া প্রকাশ করিলেন। ইঁহাদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল না, যদিও তাঁহারা আমেরিকান মূল্য বিলাতের মূল্য হইতে কম করিলেন। এখন এই প্রকাশকেরাই আমার প্রথম আত্মজীবনীও আবার ছাপিয়াছেন।

আমার বই প্রকাশ সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম এই জন্য যে, আমার ব্যাপার হইতে সকল নূতন লেখকেরই শিক্ষার সম্ভাবনা আছে। প্রথম শিক্ষা এই— কোনও লেখকের যতই প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি হউক না কেন, তাঁহার লিখিত যে-কোনও বই প্রকাশিত হইবেই তাহা অবধারিত নয়। বই-এর অদৃষ্ট তিনটি অহঙ্কারের সংঘাত হইতে নির্ণয় হয়— লেখকের অহঙ্কার, প্রকাশকের অহঙ্কার ও পাঠকের অহঙ্কার। শেষ পর্যন্ত প্রবলতম অহঙ্কারেরই জয় হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শিক্ষা এই— লেখককে কোনও বাধাতেই নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিতে নাই। তৃতীয় শিক্ষা— পাগলজাতীয় লেখককে সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, এই সাহস না থাকিলে ব্যবসায়ী-লেখক হওয়াই তাঁহার পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হইবে।

ইহার পর সমাদর ও সম্মানের কথা বলিতে হয়। বিদেশে আমার সমাদর ও সম্মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাঙালীর কাছে খাতির পাইবার জন্য সে-কথা বলিব না, কেননা তখনই সমালোচকেরা সাধারণ বাঙালী পাঠককে বুঝাইয়া দিবেন যে, উহা ইংরেজের চাটুকার হইয়া দেশের নিন্দক হইবার জন্য হইয়াছে। আমি কিন্তু বলিব বাঙালীর কাছেও তাহার নিজস্ব রসবোধের জন্যই আমার সমাদর ও সম্মান হইয়াছে। তবে এ-বিষয়ে কোনও সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই।

বাঙালীর মধ্যে লেখকদের সমাদর ও সম্মানের প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত সত্য কথা বলিতে হয়। সেটা এই— এ-পর্যন্ত কোনও বাঙালী লেখক— বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যে-ই হউক না কেন, কেহই এ-বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রমাণ দিতে পারিতেন না। বাঙালী পাঠকসাধারণের সমাদর ও সম্মান সব সময়েই মৌন রহিয়াছে, সুতরাং 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্' বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। উহা কেবলমাত্র বিক্রয় হইতে অনুমান করিতে হইবে। ছাপার অক্ষরে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সব সময়েই নিন্দা। আমিও বিক্রয় হইতেই অনুমান করিয়া সন্তুষ্ট।

সর্বশেষে অর্থোপার্জনের কথা বলিব। সমালোচকেরা শুনিয়া বিরাগ না ছাড়িলেও আশ্বস্ত হইবেন যে, আমি লিখিয়া ধনী হইতে পারি নাই। সব সময়েই আমি ভদ্রজীবন যাপন করিয়াছি বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই অতি কষ্টে। ইহা বুঝাইবার জন্য আমার লেখকজীবনের আর্থিক ইতিহাস সরলভাবে দিতেছি।

আমার লেখকজীবন আরম্ভ হয় ১৯২৫ সন হইতে, এবং উহা আজ পর্যন্ত চলিয়াছে। সুতরাং আমি আটষট্টি বছর ধরিয়া জীবিকার জন্য লেখার উপর নির্ভর করিতেছি। উহার মধ্যে ছয় বছর কোনও চাকুরি না থাকায় ছিলাম দুর্দশায় কাটিয়াছে— উহারও সাড়ে তিন বছর স্ত্রী-পুত্র লইয়া। তখন রাত্রিতে শুইতে যাইবার সময়ে আতঙ্কিত হইয়া দেখিয়াছি বাড়িতে একটি পয়সা নাই, একমুঠা চাল নাই, এক টুকরা কয়লা নাই। অথচ সকালেই দুইটি শিশুকে খাদ্য দিতে হইবে। লাঞ্ছনা ও অপমানের কথা নাই বলিলাম। তবুও মরি নাই। সেজন্য বলিতেই হইবে যে, সংসারকে যে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী মনে করা হয় তাহা অমূলক। আমার মত ব্যক্তিকেও সংসার বাঁচিতে দিয়াছে। ইহার জন্য আমি সংসারের কাছে কৃতজ্ঞ।

আটাশ বৎসর আমার কাটিয়াছে এইরূপ দুর্দশা ছাড়া। কিন্তু অনটনে ও দুশ্চিন্তায়। এই সময়ে কোনদিনই আমার উপার্জন ও আমার জীবিকার প্রয়োজন সমান হয় নাই। কোনওক্রমে চালাইয়াছি। বাকী উনত্রিশ বৎসর সচ্ছল অবস্থায় গিয়াছে, তবে ঐশ্বর্যে বা বিলাসিতায় নয়। উনিশ বৎসর বিলাতে থাকিয়াও আমি ধনবান হই নাই। আমার পরিচিত প্রত্যেকটি বিলাতপ্রবাসী বাঙালীরই আয় আমার চতুর্গুণ। তাঁহারা সকলেই অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন, স্থাবর সম্পত্তিও করিয়াছেন। এ দুয়ের কিছুই আমার নাই।

এই সব নির্জলা সত্য কথা। অনেক বাঙালীই আমার বাহিরের পাট দেখিয়া মনে মনে বলেন, 'বটে! ভেবেছ তোমার হাঁড়ির খবর আমরা রাখি না। আমরা বেশ জানি, তোমার বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।' সত্যই আমার বাহিরে কোঁচার পত্তন। কিন্তু ভিতরে ঠিক ছুঁচোর কীর্তন হয় নাই। আমার ভিতরের কীর্তনকে বনবিড়ালের কীর্তন বলা যাইতে পারে। এই জন্তুটি জানে যে, তাহাকে শিকার করিয়া খাইতে হইবে, নহিলে উপবাসে মরিবে— কিন্তু ইহার জন্য সে উপহাসাস্পদ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে আমি শত অভাবেও কোঁচার পত্তন কেন রাখিয়াছি বলি। অতি অল্পবয়সেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, অর্থাভাবের জন্য যদি আমি জীবনযাত্রায় বাহ্যিক সৌষ্ঠব বা সৌন্দর্য ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে আত্মপ্রত্যয়ও রাখিতে পারিব না, মনও ভাঙিয়া পড়িবে। অবশ্য ইহার জন্য আমাকে অপমানসূচক কথা শুনিতেও হইয়াছে। বন্ধুরাও বলিয়াছেন, 'খেতে পায় না, তবু জানালায় সিল্কের পর্দা টাঙায়!' তাঁহারা বুঝেন নাই যে, এই সিল্কের পর্দা শুধু আমার জানালাতেই ছিল না, আমার দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা একদিকে, অন্যদিকে আমার মন— এই দুয়ের মধ্যেও ছিল।

॥ ৬ ॥

আমি কি ধরনের লেখক নই, নই, নই!

এই সব কথা শুনিবার পর পাঠকেরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবেন, এতসব সহিয়া আমি লেখকবৃত্তি ধরিয়া আছি কেন? এই প্রশ্নটা আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মত—

'ভালবেসে যদি সুখ নাহি, তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালবাসা?
হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে। বলগো, কেন,
ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা?'

সংসারে কোনও জিনিস ভালবাসিলে— ভালবাসাই যে চরম সার্থকতা, উহার যে আর কোনও উদ্দেশ্য নাই, তাহা যে কেউ ভালবাসিয়াছেন তিনিই জানেন। ভালবাসার কৈফিয়ৎ কেহই দিতে পারে না। ভালবাসা অহৈতুকী।

কিন্তু ভালবাসার প্রকাশ একভাবে হয় না, সব প্রণয়ী একধরনের হয় না, প্রণয়িণীও একধরনের হয় না, সন্তান-সন্ততি তো একধরনের হয়ই না। তেমনি যাহারা লেখকবৃত্তিকে ভালবাসিয়া লেখক হইয়াছে, তাহারাও নানাধরনের হয়, তাহাদের লিখিত বইও নানাধরনের হয়। আমি শুধু আমার কথাই বলিব— ভালবাসিয়া লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিবার পর আমি কি-ধরনের লেখক হইয়াছি, ও কি-ধরনের বই লিখিয়াছি।

তবে প্রথমেই বলিব আমি কি-ধরনের লেখক নই, ও কি-ধরনের বই লিখি নাই। কিন্তু এও বলিতে হইবে যে, আমাকে ও আমার লেখাকে যে-ভাবে অন্য লোকে বিশিষ্ট করিয়াছে, আমি ঠিক সেই ধরনেই বিশিষ্ট নই। অর্থাৎ আমি বা আমার লেখা যে 'কন্ট্রোভার্শ্যাল' অথবা 'বিতর্কিত' ও 'বিতর্কমূলক' এই কথাটাই আমি স্বীকার করি না। রামকৃষ্ণ পরমহংস সর্বদাই উপদেশ দিতেন— 'অহংজ্ঞান ত্যাগ করবি।' আমি এইটাই পারি নাই। আমি অহংজ্ঞানে পরিপূর্ণ, সুতরাং নিজের কথা বলা ভিন্ন অন্যের কথা লইয়া মাথা ঘামাই না, অন্যের মত খণ্ডন করিবার কোনও চেষ্টাও করি নাই। আমার লেখাতে আর যাহাই থাকুক বা না-থাকুক, তর্ক নাই। তর্কে আস্থা আমার নাই।

আমার একটি প্রবন্ধে শুধু অন্য লেখক ও তাঁহার বই-এর উল্লেখ করিয়াছিলাম। তিনি লর্ড রোনালড্‌সে ও বইটি The Heart of Aryavarta. সেটা ১৯২৬ সনের জানুয়ারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসে। কিন্তু ইহাও করিয়াছিলাম আমার বক্তব্যের উপলক্ষ্য পাইবার জন্য। লর্ড রোনালড্‌সে এই বই-এ একটি প্রচলিত ধারণাকে সত্য বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। আমি উহাকে সত্য বলিয়া মানি নাই। সেজন্যই এ প্রচলিত ধারণার উল্লেখমাত্র করিয়া আমার নিজের কথা বলিয়াছিলাম। ইহার পর অন্যের বই বা মতামতের জন্য এতটুকু আগ্রহও দেখাই নাই। নিজের কথাই বলিয়াছি।

অপর পক্ষে আমার মতামত লইয়া কেহ তর্ক করেন নাই, বিচার করেন নাই। যাহা হইয়াছে তাহাকে তারস্বরে একতরফা গালি ও নিন্দা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। এ-সবের বিরুদ্ধে এবং আমার সপক্ষে আমি কখনও একটি কথাও লিখি নাই, অভদ্র গালির উত্তর দিই নাই; মিথ্যা অপবাদেরও প্রতিবাদ করি নাই। তবে আমি 'কন্ট্রোভার্শ্যাল' হইলাম কিসে?

কিসে অবশ্য আমি ভাল করিয়াই জানি। ইংরেজশাসনের যুগে নিজের অতীত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ ইউরোপ হইতে পাইবার পর বাঙালী লেখকরা ভারতবর্ষ ও হিন্দুজীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য ও মতামত পাশ্চাত্য প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের কাছ হইতে লইয়া, কিছু নিজেদের জাতীয়তাবোধ হইতে সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি ধারণা প্রচলিত করিয়া সেগুলিকে জাতীয় আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মানের অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমিও এই ধারণাতে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, ইহাতে বিশ্বাস করিতাম, মুখে মুখে নিজেও উহা অন্যকে বলিতাম। কিন্তু আমার বয়স পঁচিশ হইবার পর হইতে নিজের অনুসন্ধানের ফলে ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে যাহা জানিলাম তাহাতে আগেকার প্রচলিত ধারণা সম্বন্ধে আমার মনে প্রথমে সন্দেহ জাগিল, পরে সেগুলি বর্জন করিতে বাধ্য হইলাম। আমার লেখাতে আমি আমার নিজের ধারণা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতেই বিরোধ বাধিল।

AMARBOI.COM

কিন্তু সে বিরোধটা বিচারও নয়, তর্কও নয়, সেটা ঘোর কলরব। কলরবের রকমটা একটা প্রাচীন কাহিনী বলিয়া বুঝাইব। খ্রীষ্টীয় ৫৭ সনে সেন্ট পল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে করিতে এশিয়া মাইনরের এফেসাস শহরে আসিলেন। এই শহরটি প্রাচীন কাল হইতে দেবী আর্টেমিসের পীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল, ও তখন রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। এই শহরের রৌপ্যকারেরা দেবীর মূর্তি ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী নির্মাণ ও বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করিত। তাহারা সাধারণ নগরবাসীদের বুঝাইল যে, দুর্বৃত্ত পল সমস্ত এশিয়াতে পুরাতন ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া এফেসাসে আসিয়াছে দেবীর পূজা বন্ধ করিবার জন্য ও তাঁহার মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য। তখন সমস্ত নগরবাসী রাস্তায় বাহির হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল— 'এফেসাসবাসীদের দেবী আর্টেমিস মহীয়সী।' তাহারা দলবলে পলের দুইটি শিষ্যকে টানিয়া সার্কাস-এ লইয়া গিয়া ঘোরতর গণ্ডগোল করিতে লাগিল। একজন অখ্রীষ্টান ইহুদী তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য দাঁড়াইতেই তাহাকে কথা বলিতে না দিয়া নগরবাসীরা দুই ঘণ্টা ধরিয়া চীৎকার করিল— 'এফেসাসবাসীদের দেবী আর্টেমিস মহীয়সী।' এফেসাসবাসীদের ভাষা গ্রীক ছিল, তাহাদের মূল চীৎকার উদ্ধৃত করিতেছি— 'মেগালে এ আর্টেমিস এফেসিয়োন' (Great is the Diana of the Ephesians).

তখন নগরপাল আসিয়া নাগরিকদের বলিল, 'তোমরা কি পাগল হইয়াছ? দেবী আর্টেমিসের গৌরবের কথা কে না জানে? তাঁহার অনিষ্ট কেউ করিতে পারে! যাও, ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাও। তাহা না হইলে এই গোলমালের জন্য দাঙ্গার অপরাধে অপরাধী হইয়া বিচারকের কাছে যাইতে হইবে।' তাহার বাক্যে শান্ত হইয়া নগরবাসীরা ঘরে ফিরিয়া গেল।

তেমনই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, নেতাজীভবন প্রভৃতি লাভজনক প্রতিষ্ঠান যাঁহারা চালাইতেছেন, তাঁহারা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন— নীরদ চৌধুরী ভারতমাতার গৌরব অস্বীকার করিয়া তাঁহার পূজা বিনষ্ট করিতে বই লিখিতেছে। ফলে চীৎকার আরম্ভ হইয়াছে— 'ভারতমাতার জয়!

এই হইল আমার কস্ট্রোভার্শ্যাল হইবার প্রকৃত রূপ। ইহার বেশি কিছু নয়।

তবে আমি নিরীহ ভালমানুষও নই, যদিও অল্পবয়সে আমাকে সকলেই গোবেচারা বলিয়া ধরিয়া লইত। শরৎবাবুর সেক্রেটারির কাজ করিবার সময়ে (বয়স চল্লিশ মত), একদিন ট্রামে আসিতেছি তখন কয়েকটি যুবক আমাকে লইয়া তামাসা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু উহাদের একজন কি কারণে করুণাপরবশ হইয়া বলিল— 'বুড়ো ভাল মানুষকে নিয়ে তামাসা করছিস কেন?' এইরূপ আচরণ স্বাভাবিক ছিল, কারণ আমি খর্বকায়, শীর্ণদেহ, ও শীর্ণমুখ ছিলাম, মুখও গম্ভীর করিয়া রাখিতাম। খুব বেশি হইলে আমার দুই ভ্রূর মধ্যে কুঞ্চিত চামড়া দেখিয়া কেউ কেউ মনে করিত যে, লোকটা পিটপিটে, তবে অন্যকে দাঁত খিঁচাইবার সাহস নাই, কেবল নিজেই মনে মনে গুমরাইয়া মরে।

এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত ছিল, কারণ আমি বাল্যকাল হইতেই ক্ষেপাইতে পটু ছিলাম। উহা অনেক সময়ে নষ্টামিতেই পরিণত হইত। সেটা লেখাতেও দেখা গেল। আমার আত্মজীবনী যখন প্রকাশিত হইল, তখন আমার ছোট ভাই ডাঃ ক্ষীরোদ চৌধুরী বলিলেন, 'মেজদার চিরকাল ক্ষেপিয়ে দিতেভাস, বইটাতেও তাই করেছে!'

তবে এই অভ্যাসও পুরাপুরি আমার ব্যক্তিগত নয়, জাতিগতও বটে। এখানে 'জাতি' অর্থ হিন্দুসমাজের 'জাতি'। অর্থাৎ আমার ক্ষেপাইবার ঝোঁক কায়স্থ হওয়ার দরুন হইয়াছে। সংস্কৃতে প্রাচীন ভারতবর্ষের কায়স্থ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে। তাহা এইরূপ,—

'লেখনীকৃতকর্ণস্য কায়স্থস্য ন বিশ্বসেৎ।
বিশ্বসেৎ কৃষ্ণসর্পেষু, বনে ব্যাঘ্রেষু বিশ্বসেৎ॥'

অর্থাৎ 'যে কায়স্থ কানে কলম গুঁজিয়া বসিয়া আছে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, বরঞ্চ গোক্ষুর সাপকে বিশ্বাস করিবে, বনের ব্যাঘ্রকে বিশ্বাস করিবে।' আমাকে যাঁহারা ঘাঁটাইতে আসেন তাঁহারা যেন এই সংস্কৃত শ্লোকটি ভুলিয়া না যান।

॥ ৭ ॥

তবে আমি কি ধরনের লেখক?

এই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইতেছি। উহা নিজের মুখের প্রতিকৃতি নিজে আঁকার মত হইবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া উহাতে, নিজের রূপ না থাকিলেও নিজেকে রূপবান করিয়া দেখাইব না, কারণ আমি লিখিতে আরম্ভ করিলাম নিজের দায়ে, আত্মপ্রীতির বশেও নয়, বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যও নয়। যখন আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে লিখি, তখন লিখিয়া অর্থোপার্জন করিব এরূপ কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। আমি তখন সরকারি চাকুরি করি, উহাতে কায়েমী ছিলাম, ও উন্নতিরও সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং যে-দায়ের কথা বলিলাম উহা পয়সা করিবার দায় হয় নাই।

যখন সরকারি চাকুরি ছাড়িবার পর লিখিয়াই জীবিকা উপার্জন করিব স্থির করিলাম, তখনও লেখার সময়ে পয়সার কথা কখনও ভাবি নাই। এমন কি যখন আমি অত্যন্ত অভাব-অনটনে ছিলাম, তখনও আমি বাজারের কথা ভাবি নাই, লেখাকে পণ্য করি নাই। শুধু একটা বিষয়ে লেখার ইচ্ছা হইয়াছে, প্রয়োজন আছে, এই জন্যই লিখিয়াছি। অবশ্য এটাও আশা করিয়াছি, আমার লেখার যদি কোনও মূল্য থাকে তাহা হইলে সম্পাদকেরা ও প্রকাশকেরা হয়ত মূল্যানুযায়ী দাম দিবেন। তাহা হইতে আমার দিন চলিবে।

তবে আমার দায় কি ছিল ? সেটা আর কিছু নয়, প্রাণের দায়। এই কথাটা কেউ যেন অতিরঞ্জন বলিয়া মনে না করেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমি যে-যুগে ও যে-সমাজে বাস করিতে বাধ্য হইতেছি উহাতে সাফল্য দূরে থাকুক, বাঁচিয়া থাকিতে হইলেও সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন আছে। মনে রাখিতে হইবে, ১৯২০ হইতে বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটার পর একটা সমস্যা দেখা দিতে লাগিল। পরাধীনতা দূর করা আমাদের প্রথম কর্তব্য বলিয়া জানিতাম। কিন্তু ইহার জন্য বাঙালীর সৃষ্ট জাতীয়তাবোধ ও বাঙালীর প্রবর্তিত জাতীয় আন্দোলন ঠিক, না মহাত্মা গান্ধীর পন্থা ঠিক, এই প্রশ্নটা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাঙালীরা পুরাপুরি নিজের ধারাও বজায় রাখিল না, পুরাপুরি গান্ধীজীর পথও ধরিল না, এমন কি চিত্তরঞ্জন দাশ পর্যন্ত। সকলেই দুই নৌকায় পা দিয়া রহিল। আমার মন ইহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল না।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই দোটানা দেখা দিল। সকলেই জাতীয় বা হিন্দুধারার সমর্থন করিত, অথচ নির্বিচারে যে-কোনও পাশ্চাত্য ধারা চিত্তাকর্ষক বা অর্থকরী তাহা গ্রহণ করিতে লাগিল। ব্রাহ্ম ধারা ও নব্যহিন্দু ধারা এ-দুয়ের সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বাঙালীর মানসিক জীবনকে জীবন্ত ও সচল রাখিয়াছিল। আমি দেখিলাম এই দুটিরই অবসান হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়াও আমি অনুভব করিলাম যে, বাঙালীর মানসিক শক্তির ক্ষীণতা দেখা দিয়াছে।

এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবনের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে সব নিশ্চয়তা ঘুচিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, যে-সব ধারণার উপর আমার বাল্যশিক্ষা হইয়াছিল ও যাহার দ্বারা মন গঠিত হইয়াছিল তাহাতে আমার সন্দেহ জাগিল, সেই সব ধারণাকে জীবনের অবলম্বন করিতে পারিলাম না। সুতরাং আমার দশা হইল যেন জলে পড়িয়া নীচেও ঠাঁই পাইতেছি না, তীরও দেখিতে পাইতেছি না। বুঝিতে পারিলাম, পারে উঠিতে হইলে দেশ ও দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে নূতন এবং সত্য ধারণা আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহাতে প্রথমে অনুসন্ধানের, পরে সেই অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা ও উদ্যম হইল।

আমি এ-কথা বলিব না যে, এই সব কথা তখন আমি এত স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু মনে অসোয়াস্তি জাগিয়াছিল, অনিশ্চয়তা ছিল, তাহার জন্য কষ্ট হইতেছিল। তাই পরিষ্কার না বুঝিয়াও নিজেকে সংশয়মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা হইতে এই উপলব্ধিও হইল যে, জীবনকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখীও হইব না, সফলতাও লাভ করিব না। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭ সনে বাঙালীকে 'অসত্যভারাবনত মূঢ়!' বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। আমি এই কথা কত যে সত্য তাহা বুঝিলাম। স্থির করিলাম, এই অসত্যের ভার আর বহন করিব না। তবে নূতন সত্যের সন্ধান করিবার পিছনে হিন্দুর প্রাচীন জ্ঞানযোগের প্রতি আস্থাও অজ্ঞাতসারে আমার মনে নিশ্চয়ই ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জ্ঞানযোগের কথা বঙ্কিমচন্দ্রও লিখিয়াছিলেন। 'আনন্দমঠে'র শেষে মহাপুরুষ যখন সত্যানন্দকে বলিলেন যে, ইংরেজ শাসন মানিয়া লইতে হইবে, কারণ ইংরেজকে কেউ পরাভূত করিতে পারিবে এই সম্ভাবনা নাই, তখন সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, 'না থাকে, এইখানে মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব।' মহাপুরুষ বলিলেন, 'অজ্ঞানে? চল, জ্ঞান লাভ করিবে চল।' এই কথাগুলি আমার মনে ছিল না, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুর আহ্বান যেন আমারও কানে বাজিয়াছিল— 'আত্মানম্ বিদ্ধি!'

সত্যের সন্ধান সহজ কাজ নয়। উহার পথে প্রবলতম বাধা আসে নিজের ভিতর হইতে, বাহির হইতে নয়, অর্থাৎ দৃঢ়মূল প্রচলিত সংস্কার, ভাললাগা মন্দলাগা, ইচ্ছা অনিচ্ছা হইতে। সত্যকে অপলকদৃষ্টিতে দেখিবার সাহস ও শক্তি না থাকিলে কখনই এগুলিকে অতিক্রম করা যায় না। আমি আমার সত্যসন্ধানে এগুলিকে বর্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি এ-কথা বলিব না যে, জীবনে আমাদিগকে ভালবাসা বা না-বাসা, ভাল লাগা বা না-লাগা, ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকে ছাড়িতে হইবে। তাহা সম্ভব নয়। তবে যাহা করিতে হইবে তাহা এই— ভালবাসা-না-বাসা ইত্যাদিকে সত্যের অধীন করিতে হইবে, সত্যকে এই সব প্রবৃত্তির অধীন করিলে চলিবে না।

অবশ্য এ-সবকে পুরাপুরি ছাড়া সম্ভবপর নয়। তবু আমি যাহা করিতে চাহিয়াছি তাহা বলি। আমি স্থির করিলাম যে, আমার মনকে যথাসাধ্য ক্যামেরার মত করিয়া দেশের প্রতিকৃতি তুলিতে হইবে। জ্ঞানের আলোকে উহার সত্য রূপ ক্যামেরার ফিল্মে অদৃশ্য ছাপের মত হইবে, আমার লেখাটা শুধু 'ডেভেলাপ' করিয়া ফোটোগ্রাফ তৈরি করিবার মত হইবে। এই জন্য আমি বিশ্বাস করি যে, আমি দেশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা দেশের আত্মপ্রকাশ মাত্র, আমার অঙ্কিত চিত্র নয়। ব্যাপারটা কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য মিকেল-এঞ্জেলো সম্বন্ধে একটি কাহিনী বলিব। একজন ফরাসী পর্যটক ১৫৭৪ সনে ফ্লোরেন্সে গিয়া মিকেল-এঞ্জেলো সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহার বিবরণ এইভাবে দেন,—

'তাঁহার এক বন্ধু, ভাবে বিভোর রাত্রির মূর্তি ও অন্য মূর্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিয়া মিকেল-এঞ্জেলো এইরূপ কলাশিল্প সৃষ্টি করিলেন।" তখন মিকেল-এঞ্জেলো উত্তর দিলেন, "আমি তো উহা গড়ি নাই। যে-মূর্তিটি তুমি দেখিতেছ তাহা পূর্ব হইতেই সেই মার্বেলের মধ্যে ছিল, আমি শুধু উহার চারিদিকে যে-সব মার্বেলের টুকরা-টাকরী ছিল তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছি। ইহার প্রমাণ হিসাবে আমি এই কথা বলিব যে, বড় হউক আর ছোটই হউক এইরূপ যে-কোনও মার্বেল নিয়া দেখিবে যে, এমন কোনও মার্বেল নাই যাহার মধ্যে আগে হইতেই একটা-না-একটা মূর্তি নাই। যাহা প্রয়োজন তাহা শুধু সেই মূর্তিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখা।"

মনে রাখিতে হইবে মিকেল-এঞ্জেলো যে-মার্বেল খণ্ড হইতে রাত্রির মূর্তি 'কাটিয়া-কুটিয়া' বাহির করিয়াছিলেন, উহা দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট, উচ্চতায় ছয় ফুট, প্রস্থেও চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুট মত ! আমিও দেশের মার্বেল হইতে সামান্য কাটাকুটি করিয়া দেশের মূর্তি বাহির করিয়া দিয়াছি।

এই বিশ্বাসের বশেই আমি নিজেকে আমার বইগুলির সত্যকার গ্রন্থকার বলিয়া মনে করি না। ১৯৬৭ সনে বিলাতে আমাকে একটি সাহিত্যিক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে উঠিয়া আমি বলিলাম, 'সাহিত্যিক পুরস্কার আসলে যাহার প্রাপ্য তাহার কাছে যায় না। পুরস্কার অর্জন করে বইটি, কিন্তু লেখক উহাকে আত্মসাৎ করে।' এই কথা আমি অকপটেই বলিয়াছিলাম। বহু বই অবশ্য আছে যাহার সম্বন্ধে বলা যায়— লেখক ও বই এক। কিন্তু আমি যে-ধরনের বই লিখি তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় না। আমি সত্য সত্যই অনুভব করি আমি জ্ঞাতসারে, নিজের বুদ্ধিবিদ্যা দিয়া এই সব বই লিখিতে পারিতাম না। যখন লিখিবার পর বইগুলি সংশোধন করিয়া ছাপাখানার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি, তখন অনেক সময়েই মনে হইয়াছে আমি এই সব কথা লিখিলাম কি করিয়া ? এই ধরনের ভাব, এমন কি ভাষাও তো আমার মনে ছিল না। সুতরাং আমি বলিব— নীরদ চৌধুরী লেখক ও নীরদ চৌধুরী নিজের লিখিত বই-এর সংশোধক বা পাঠক, এক ব্যক্তি নয়। লেখার সময়ে আমাকে কিসে যেন পাইয়া বসে। সমালোচকেরা নিশ্চয়ই বলিবেন— ভূতে। আমি বলিব আমার দেশের আত্মায়।

আমার বিরুদ্ধে দম্ভ, গোঁয়ার্তুমি ও বিদঘুটেপনার যে-সব অন্তহীন অভিযোগ হইতেছে, তাহার মূলে আমার এই বিশ্বাস। আমি আমার লেখা সম্বন্ধে অযথা বিনয় প্রকাশ করি না, ভয়ে ভয়ে বলি না, মিউ মিউ করি না এই জন্য যে, আমি মনে করি যে-লেখা আমি দান হিসাবে পাইয়াছি, যাহার সম্পর্কে আমি শুধু 'মিডিয়াম', তাহার সম্বন্ধে ভীতি দেখানো সেই দানে অশ্রদ্ধা দেখানো হইবে। আমার লেখা সম্বন্ধে আমার যা বিশ্বাস, লিখিলাম— বিশ্বাস করা-না-করা পাঠকের কাছে।

সকলের শেষে আর একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হইবে— আমার লেখার কোনও অভিঘাত কি বাঙালীর উপর হইয়াছে ? স্বীকার করিতেই হইবে, ১৯২৫ সন হইতে ১৯৮৮ সন পর্যন্ত উহার বিন্দুমাত্র পরিচয় পাই নাই। তবে ১৯৮৯ সনে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। আমি একজন বাঙালী সাংবাদিককে একটা 'ইন্টারভিউ' দিয়াছিলাম, উহাতে যে-সব অসংযত উক্তি রাগের বশে করিয়াছিলাম, তাহাতে বাঙালী সমাজে আমার 'বাণী'র উত্তরে অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব সাড়া জাগিল। ইহা অসংযত হইয়া লিখিবার জন্য আমন্ত্রণ, দারুণ প্রলোভন। তবু ইহার পরও আমার নিন্দা সম্বন্ধেও যাহা লিখিতে যাইতেছি, তাহাতেও ভদ্রতার ত্রুটি করিব না।

॥ ৮ ॥

আমার নিন্দা

আমি যে দেশে, বিশেষ করিয়া বাঙালীর মধ্যে, অতি নিন্দিত লেখক তাহা বলার আবশ্যক রাখে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের লেখকবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

> 'আমি লিখিয়া থাকি, অথচ লোকরঞ্জন আমার কলমের ধর্ম নয়, এই জন্য লোকেও আমাকে সদাসর্বদা যে-রঙে রঞ্জিত করিয়া থাকে তাহাতে কালির ভাগই বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয় ; কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।'

—তেমনই আমিও ঠিক এই কথাগুলিই বলিতে পারি, তাহাও আরও একটু বাড়াইয়া।

বর্তমানে এই নিন্দার কারণ হিসাবে বলা হইয়া থাকে যে, আমি দেশদ্রোহী এবং ইংরেজের দাস। এটা কিন্তু সত্যকার কারণ নয়। আমার দেশদ্রোহী অপবাদ আরম্ভ হইল ১৯৫১ সনে আমার আত্মজীবনী প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে। আমার নিন্দা তাহার অনেক আগে হইতেই উচ্চরবে প্রচারিত হইয়াছিল। আমি বাংলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করি ১৯২৭ সনের অক্টোবর মাস হইতে। ১৯২৮ সনের জুন-জুলাই মাসেই এখন যাঁহারা আমার নিন্দা করিতেছেন তাঁহাদের পিতামহস্থানীয় সমালোচকেরা আমার সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃতরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন,—

> "'শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক মহাশয় তাঁহার কৃশ শরীরকে কৃশতর করিয়া থ্যাকার স্পিঙ্ক-এর দোকান হইতে ক্যাটালগ আনাইয়া বই-এর নাম মুখস্থ করিতে থাকুন। তাঁহার চিন্তার সম্পদ না থাকিতে পারে— কিন্তু "ক্র্যাম" করিবার ক্ষমতা নাই এ-কথা কেহ বলিতে পারিবে না।'

এইরূপ ধারণা যে আমার সম্বন্ধে বদ্ধমূল হইল তাহার প্রমাণ পাইলাম ১৯৩৪ সনে, সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে যে-একটা কথা বলিলেন তাহা হইতে। তখন "মডার্ন রিভিউ"-এ প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধ তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তাই তিনি তাঁহার পরিচিত লেখকদের বলিলেন, 'এ-রকম আর্টিকেল নীরদ চৌধুরী লেখে, আপনারা লেখেন না কেন?' তিনি উত্তর পাইলেন, 'এর মধ্যে এমন কি আছে? নীরদ চৌধুরী ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে যায়, সেখান থেকে এটা-ওটা টুকে এনে প্রবন্ধ লেখে।' ইহার উত্তরে সুরেশবাবু কি জবাব দিয়াছিলেন তাহা আমাকে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন। জবাবটি এই— 'আমি কি আপনাদের মাথার দিব্যি দিয়ে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে গিয়ে টুকতে মানা করেছি?' অবশ্য তাঁহার কথায় আমার কোনও লাভ হয় নাই। আমার 'ক্র্যামার' অপবাদ রহিয়া গেল।

১৯৫১ সন হইতে কিন্তু আমি "ক্র্যামার" পদ হইতে উন্নীত হইলাম। তখন আজিকার সমালোচকদের পিতৃস্থানীয়েরা প্রচার করিলেন যে, আমি দেশদ্রোহী। সেই অপবাদ আজও চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং হালের সমালোচকেরা বলিতে পারেন— 'ভদ্রলোকের এক কথা, আর আমরা তিনপুরুষে ভদ্রলোক!' ইঁহারা পুরুষানুক্রমে বাপের বেটা না থাকিয়া আমার প্রশংসা করিবেন, এই অন্যায় আবদার আমি করিতে পারি না।

তবে ইহাও সত্য যে, এই পুঞ্জীভূত নিন্দাতেও আমার কোনও ক্ষতি হয় নাই— না খ্যাতিতে, না অর্থে, না আত্মপ্রসাদে, না লেখকবৃত্তির সার্থকতার অনুভূতিতে ; না বিদেশে, না ভারতবর্ষের অন্যত্র, এমন কি বাংলাদেশেও নয়। ইহার সমর্থন প্রকাশকেরা, সম্পাদকেরা এবং পুস্তকবিক্রেতারাও করিতে পারিবেন। অবশ্য ইহারও পাল্টা জবাব সমালোচকেরা দিয়া থাকেন। দিল্লীতে থাকার সময়ে শুনিলাম বাঙালী সমালোচকেরা বলিতেছেন, 'কোনো সত্যিকার "হিস্টোরিয়ান", যেমন রমেশ মজুমদার, কি "স্টেট্‌সম্যান" বা "ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লী"র স্তরের কাগজে লেখেন?' বই বিক্রি সম্বন্ধেও যুক্তি শুনিলাম। আমার বই বিক্রি হয় বলিয়া কনট্-প্লেসের মেজেতে বসিয়া যাহারা বই বিক্রি করিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহারাও স্তূপাকৃত আকারে আমার বই রাখিত। সমালোচকেরা বলিতে লাগিলেন, 'নীরদ চৌধুরী এই স্তরেরই বই লেখে যে, ও-গুলো কনট্-প্লেসের মেজের ওপর পড়ে থাকে।'

এই সব কথা শুনিবার আগে আমার ধারণা ছিল যে, মনকে চোখ ঠারিবারও একটা সীমা আছে। বুঝিলাম যে নাই।

॥ ৯ ॥

নিন্দা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য

আমি বলি— নিন্দুকেরাও আমার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা জানেন, আমার লেখার গুণ অস্বীকার করিলেও। কেবল তাঁহারা উহা জানিতে চাহেন না। যে জানিতে চাহে না তাহাকে যে কিছুই জানানো যায় না, তাহার একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দিতেছি। দিল্লীতে থাকাকালীন আমি একদিন বাঙালীদের একটি সাহিত্যসভায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হই। বক্তৃতার পর যখন সামাজিক কথাবার্তা চলিতেছে তখন উদ্যোক্তাদের একজন— তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী লেখক, নাম করিব না— আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি ইংরেজীতে লিখে বিলেতে বই বার করেন কেন?' আমি উত্তরে প্রশ্ন করিলাম, 'কেন? কি হয়েছে?' তিনি বলিলেন, 'জানেন, সেখানে সবাই আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করে?' আমি বলিলাম, 'বিলেতে আমার সম্বন্ধে কে কি বলে তো তো আমারই বেশি জানবার কথা, কারণ আমি 'প্রেস-কাটিং এজেন্সী'তে টাকা দিয়ে রেখেছি, আমার সম্বন্ধে যা-কিছু বেরোয় সবই পাঠাতে। আমি তো হাসি-তামাসার কিছু পাইনি।' তিনি তখন বিচলিত না হইয়া বলিলেন, 'না, আমি সেখানে গিয়েছিলাম, শুনেছি।' আমি আবার প্রশ্ন করিলাম, 'তবে বিলেতে আমার বই ছাপা ও বিক্রি হয় কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হাসি-তামাসার একটা পাত্র পাবার (অর্থাৎ butt of ridicule পাবার) দরকার আছে তো, তাই বার করে।' আমি শেষ কথা বলিলাম, 'তার জন্য যদি ওরা ঘরের কড়ি খরচ করতে পারে, তা হলে আমিও একশোবার লিখবো।'

এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য এই—কেউ যদি ব্যক্তিগত বিরাগের বশে এই ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পারে, এবং তাহারাও যদি বাঙালী সমাজের উচ্চতম স্তরের হয়, তাহা হইলে আমি যে বাঙালীকে আত্মঘাতী বলিতেছি তাহা কি অমূলক কথা? এ তো বাঘকে butt of ridicule বলিয়া তুচ্ছ করিবার মত।

তবে ইহাও বলিব যে সকল বিদ্বান, অধ্যাপকশ্রেণীর বাঙালী— যাঁহারা আমার সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন তাঁহারা সব সময়েই আত্মপ্রবঞ্চক নন, কপটতাও করেন না। ইহারও দৃষ্টান্ত দিতেছি। তখনও আমি দিল্লীবাসী, বাসে যাতায়াত করি। একদিন বাসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে দিল্লীর একজন সুপরিচিত ও পসারওয়ালা বাঙালী ডাক্তার আসিয়া সেই বাসে উঠিলেন। পরস্পর সাদর সম্ভাষণের পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ বাসে যে।' তিনি বলিলেন, 'গাড়িটা গ্যারাজে পাঠাতে হলো।' তারপরে তাঁহার সঙ্গী বাঙালী ভদ্রলোকটির পরিচয় দিলেন যে, 'ইনি অমুক, অমুক কলেজের অধ্যাপক।' তারও পর আমার পরিচয় দিলেন, 'ইনি মিঃ নীরদ সি চৌধুরী।' কিন্তু ভদ্রলোক শুধু ফ্যাল-ফ্যাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এঁর নাম শোনেননি ?' অধ্যাপকটি যখন ডান কাঁধ হইতে বাঁ কাঁধ পর্যন্ত মাথা নাড়িয়া জানাইলেন যে 'না', তখন ডাক্তারবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি ! ইনি "স্টেট্‌সম্যানে" লেখেন— আদ্ধেক বুঝতে পারবেন না ম-ম-শায় !'

আমার ইংরেজীর ইহার অপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা আমি কোনও বাঙালীর মুখে শুনি নাই। তবে ইহাও বুঝিলাম কেন ইংরেজীতে লিখিয়া আমার দেশদ্রোহী অপবাদ হইয়াছে। কিন্তু সত্য কথা গোপন করিব না। সারা লেখকজীবন জুড়িয়া নিন্দা শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া খেদোক্তি করিতে ইচ্ছা হয়—উহা কি ভাষাতে, তাহা একটি গল্প বলিয়া বুঝাইব।

১৯৩৮ সনে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় একটি বক্তৃতায় তুষারকান্তি ঘোষকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন। আমি তখন শরৎবাবুর সেক্রেটারি, বক্তৃতাটি খুব মুন্‌শিয়ানা করিয়া আমিই লিখিয়াছিলাম। আমি সাধারণত শরৎবাবুর সঙ্গে সভা-সমিতিতে যাইতাম না। কিন্তু সেদিন আমার মুন্‌শিয়ানার কি ফল হয় সে-বিষয়ে কৌতূহলী হইয়া ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে গেলাম ও শরৎবাবুর পিছনে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পাশে বসিলাম। চিনিতে পারিলাম যে, ইনি বিখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন 'অমৃতবাজারে' কাজ করেন। শরৎবাবু ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া চলিয়াছেন, আর দেখিলাম উপেনবাবু নিম্নস্বরে বিড়বিড় করিয়া কি বলিতেছেন। একটু কান পাতিয়া শুনিলাম, তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' হইতে মালিনীর উক্তি আবৃত্তি করিতেছেন,—

'অরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের ধূমহেতু
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্মের বাঁধহ সেতু।'

আমারও বলিতে ইচ্ছা হয়, কাটিতে চাও কাটিয়া ফেল, ছাড়িয়া দিতে চাও ছাড়িয়া দাও, কেবল এই পালা সাঙ্গ কর।

কিন্তু এই গল্প বলিতে গিয়া হঠাৎ একটা দুষ্টবুদ্ধিও আমার মাথায় জাগিল। বাঙালী সমালোচক ও আমার মধ্যে বিবাদকে, যাহা নিতান্তই একতরফা তাহাকে, মালিনী ও কোটালের বাদানুবাদের মত করিয়া দুই-তরফা তো করিতে পারি— এইরূপে :

নীরদমালিনী।

'নষ্টের এ বড় গুণ পিঠেতে মাখয়ে চূণ।
কি দোষ পাইয়া অরে কোটালিয়া
মারিয়া করিলি খুন ॥
এ তিন প্রহর রাতি ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার লুঠিলি আগার
ধরিয়া খাইলি জাতি ॥'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলোসাহিত্যের কোটাল ।

'কোটাল হাসিয়া কয় কহিতে না লাজ হয় ।
হেদে বুড়ী শালী বলে জাতি খা(ই)লি,
শুনিয়া লাগয়ে ভয় ॥ '

নীরদমালিনী ।

'হীরা বলে অরে বেটা তোরে ভয় করে কেটা ।
তোর গুণপনা জানে সর্বজনা
পাসরিলি বটে সেটা ॥ '

বাংলোসাহিত্যের কোটাল ।

'কোটাল কহিছে রাগি কি বলে রে বুড়ামাগী
ঘরে পোষে চোর আরো কহে জোর
এ বড় কুটিনী ঘাগী ॥'

নীরদমালিনী ।

'হীরা কহে পুন জোরে কুটিনী বলিলি মোরে
রাজার মালিনী বলিলি কুটিনী—
কালি শিখাইব তোরে ।
লোকের ঝি বহুলয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে ।
তোর ঘরে যত সকলি অসত
আমি দিবে জারি কয়ে ॥ '

বাংলোসাহিত্যের কোটাল ।

'ধূমকেতু ক্রোধে ফুলে ভূমে পাড়ে ধরি চুলে
কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী
উভে উভে দিব শূলে ॥ '

নীরদমালিনী ।

'মালিনী তখন কয় শূল ত বাঁশের হয়,
প্যাকাটির তোর ঢুকিবে না*···মোর,
তারে নাহি করি ভয় ॥ '

(*এখানে শালীনতার খাতিরে একটি প্রয়োজনীয় শব্দ বসাইতে পারিলাম না, রসিক পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন ।)

॥ ১০ ॥

শেষ কথা

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার কথাই শেষ কথা নয় । সব নিন্দাকে আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারি, কারণ ইহার জন্য আমার কোনও ক্ষতি হয় নাই, নিজের মনেও ক্ষয় মানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই। লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমি যাহা পাইয়াছি, তাহা আমার দুরাশারও অতীত ছিল। পাওয়া অবশ্য সহজে হয় নাই, অল্প সময়েও হয় নাই। আমি যখন ১৯২৬ সনে সরকারি চাকুরি ছাড়িলাম, তখন এই আশা করিয়াই ছাড়িয়াছিলাম যে, লেখকবৃত্তিতে জীবিকানির্বাহও করিতে পারিব, জীবনে সার্থকতাও আনিতে পারিব। প্রথমে জীবিকার্জনও হয় নাই, পরে 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক হিসাবে তাহা হইল। কিন্তু লেখক বলিয়া কিছু খ্যাতি লাভ করিলেও উহাকে চরম সার্থকতা দূরে থাকুক, উৎসাহ পাইবার মত সার্থকতাও মনে হইত না। তাই ১৯২৯-৩০ সনে যখন আপিসের কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিতাম তখন একটা গভীর বিষাদ আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। পথ চলিতে চলিতে একটা গানের কথা ও সুর কানে বাজিত ও নিজেও অনুচ্চস্বরে গাহিতাম। সেটা এই,—

'এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণব্রত জীবনে হল না সাধা ॥
কবে যে এ দুঃখজ্বালা হবে রে বিজয়মালা,
ঝলিবে অরুণরাগে নিশীথরাতের কাঁদা ॥'

—চোখে জল আসিয়া পড়িত। এই দীর্ঘ নিশীথরাত্রির কাঁদা ঘুচিয়া আমার জীবনে একটু অরুণরাগ দেখা দিতেও বিশ বছর লাগিয়াছিল।

'তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ, কখনো রবি,
কখনও ক্ষুব্ধ সাগর কখনো শান্ত ছবি।'

তবু বুঝি নাই জীবন কোন দিকে চলিয়াছে, কেবল দেখিয়াছি—

'সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন...'

শুধু আজ—এতদিন পরে, প্রভাতের অরুণরাগ অস্তের আকাশব্যাপী রক্তরাগে বিস্তৃত হইয়াছে। এই অবস্থাতেও যদি আমি নিন্দাকে তুচ্ছ না করিতে পারি তাহা হইলে জীবনদেবতার কাছে অকৃতজ্ঞতার ঘোর অপরাধে অপরাধী হইব।

কিন্তু বাঙালী জাতির ইতিহাসে যে-সব মহান বাঙালী দেখা দিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা সম্ভব নয়। একদল বাঙালীর নিন্দায় চৈতন্যদেব হইতে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত সকলের অনিষ্ট হইয়াছে, বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথের জীবন বিষময় হইয়াছে, বাঙালী জাতির কলঙ্ক হইয়াছে। সুতরাং বাঙালী জাতির দিক হইতে এই হিংস্র নিন্দাপরায়ণতাকে উপেক্ষা করা যায় না। অথচ বলিতে বাধ্য হইতেছি বাকি বাঙালী ইহার অবসান করিতে পারিবে না, তাহাদের সে শক্তি নাই। ইহাই বাঙালী জাতির চরম অক্ষমতা।

তাই মনে হয়, সব মহান বাঙালী প্রমেথিউস্। সে মানুষের উপকার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে আগুন চুরি করিয়া আনিয়া মানুষকে দিয়াছিল। অযোগ্য পাত্রে এই দান জিউস্ ক্ষমা করিতে পারিলেন না, প্রমেথিউসকে কঠিন শাস্তি দিলেন। তাহাকে একটি পাহাড়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল, ও একটি ঈগল পক্ষী তাহার বুক ছিঁড়িয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া খাইতে লাগিল। পাছে একদিনে প্রমেথিউসের যন্ত্রণার অবসান হয় সেইজন্য জিউস্ ইহাও করিলেন যে, প্রতিদিন তাহার একটি নূতন হৃৎপিণ্ড হইবে। তাহার এই অবস্থা সম্বন্ধে শেলী তাঁহার নাটকে ডেমোগর্গনের মুখে এই উক্তি দিলেন,—

'To suffer woes which Hope thinks infinite;
To forgive wrongs darker than death or night;
To defy Power, which seems omnipotent;
To love, and bear; to have till Hope creates
From its own wreck the thing it contemplates;
Neither to change, nor falter, nor repent;
This, like thy glory, Titan, is to be
Good, great and joyous, beautiful and free;
This is alone Life, Joy, Empire, and Victory.'

বাংলার প্রমেথিউসদেরও তাহাই বিজয়মালা। কিন্তু ইহাতে বাঙালী জাতির অপরাধের স্খালন হইবে না, হইবে একমাত্র যদি এই সব 'প্রমেথিউস্ বাউন্ড'-কে তাহারা 'প্রমেথিউস্ আন্‌বাউন্ড' করিতে পারে। তাহা সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সাম্রাজ্যবাদী কেন

জ্যামিতির এই রীতিটা সকলেরই জানা আছে— কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমেই সিদ্ধান্তটা যে কী, তাহা বলিয়া দেওয়া হয়। আমিও এই রীতি অনুসরণ করিয়া সর্বাগ্রে আমার বক্তব্যটা যে কী, তাহা উপস্থাপিত করিব। —

১। আমি সাম্রাজ্যবাদী, প্রথমত, মানুষ বলিয়া ; কেঁচো নই বলিয়া। দেহে মানুষের মত হইলেও অনেক মানবসন্তানই যে চরিত্রধর্মে কেঁচো হয়, তাহা সর্ববিদিত।

২। আমি সাম্রাজ্যবাদী, দ্বিতীয়ত, সভ্য মানুষ বলিয়া ; অসভ্য, পদদলিত, দাসজাতীয় মানুষ নই বলিয়া। বিবেকানন্দ এক শ্রেণীর ভারতীয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, তাহারা 'বহু শতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিপীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ পরিশ্রম-অসহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন,··· দাসোচিত ঈর্ষ্যাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরি-প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের প্রতি-স্বরূপ, বলহীন, আশাহীন···' আমি এই জাতীয় ভারতীয় বা বাঙালী নই, সেজন্যই সাম্রাজ্যবাদী।

৩। আমি সাম্রাজ্যবাদী, তৃতীয়তঃ, সত্যকার হিন্দু বলিয়া, মলিন প্যান্ট-পরিহিত, আধা-ট্যাঁসফিরিঙ্গি, অথচ গনৎকারের উপাসক হিন্দু নই বলিয়া।

আশা করি, স্পষ্টতার ত্রুটি করিলাম না।

ইহা হইতেই বোঝা যাইবে, যাহারা সাম্রাজ্যবাদী নয় তাহাদের আমি কী চক্ষে দেখি। স্পর্ধা ? হাঁ, স্পর্ধাই বটে। তবে স্পর্ধাটা আমি নীরদ চৌধুরী বলিয়া নয়, নীরদ চৌধুরী বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় যাহা হইয়া জন্মিয়াছে, উহার গৌরবের অনুভূতি আছে বলিয়া। আমি যে এই জন্ম লাভ করিয়াছি তাহার মধ্যে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই, সুতরাং আমার ব্যক্তিগত অহমিকা পোষণ করিবার অধিকারও নাই।

আমার বক্তব্য প্রমাণ করিবার আগে আরও একটা ভূমিকা করিবার প্রয়োজন আছে। ইহার উপলক্ষ্য আমি C.B.E. উপাধি পাইয়া যে-কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিয়াছিলাম তাহা। আমি বলিয়াছিলাম, এই 'অর্ডার'টি আমাকে দেওয়ার জন্য আমি বিশেষ আনন্দিত, কারণ আমি একজন dedicated imperialist। শুনিয়াছি, ইহার জন্য দেশে প্রবল প্রতিবাদ ও নিন্দা হইয়াছে। আমি তাহারই পাল্টা জবাব দিতেছি। তবে এই কৈফিয়ৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়া বাঙালী কমিউনিস্ট ও বাঙালী ফরোয়ার্ড-ব্লক-ওয়ালাকে প্রসন্ন করিতে পারিব, এই আশা পোষণ করিবার মত নির্বোধ আমি এখনও হই নাই। আমি এই দুই শ্রেণীর বাঙালীকেই ভাল করিয়া জানি। ইহাদের নাড়ী কাটিয়া নাম না রাখিলেও এইভাবে নামকরণের সময়ে উপস্থিত ছিলাম। সেই দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে ইহাদের সম্বন্ধে আমার কী ধারণা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া ভদ্রতার ত্রুটি করিব না।

আমার প্রতিবাদকারীদের সম্বন্ধে বলিব, 'তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।' আমি শিক্ষিত নিরপেক্ষ বাঙালীর কাছে সাম্রাজ্যবাদ কী তাহা বলিতে চাই। এই ব্যাপারে অনেক বাঙালীরই ভুল ধারণা আছে— উহা অংশত ইংরেজের অধীনতাপ্রসূত, বেশি অজ্ঞতার ফল, কিন্তু পেশাদার সাম্রাজ্যবিদ্বেষীদের মত তামসিক বিদ্বেষে মগ্ন থাকিবার জন্য নয়।

॥ ১ ॥

আদিম সাম্রাজ্য— পশু-পক্ষী ও উদ্ভিদের উপর

এখন, একে একে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যাহা অবিসম্বাদিত সত্য তাহার পরিচয় দিই। হাঁ, অবিসম্বাদিত।

সবচেয়ে পুরাতন সত্য এই যে, যেদিন হইতে মানুষ পৃথিবীতে জীবজগতের একটি জীব হওয়া সত্ত্বেও, অন্য জন্তুর মত সাধারণ জন্তু না হইয়া মানুষ বলিয়া একটা বিশিষ্ট জীব হইয়াছে, সেই দিন হইতেই সে সাম্রাজ্যবাদী হইয়াছে। উহা কত সহস্র বৎসর আগেকার কথা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, শুধু বলা চলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ অর্থাৎ পুরাতন প্রস্তর-যুগের আদি পর্ব হইতেই। ইহা ঘটিয়াছে মানুষের মনুষ্যধর্ম হইতে।

এই ধর্মের বশে সে প্রথমে পশু-পক্ষীকে বধ করিয়া খাইয়াছে। তাহার পর পশু-পক্ষীকে অধীনে আনিয়া নিজের খাদ্য বা ভৃত্যে পরিণত করিয়াছে। পক্ষীর কথা ছাড়িয়া দিয়া পশুদের কথাই বলি। গরু, ঘোড়া, গাধা, মেষ, ছাগল, শূকর, কুকুর, এমন কী হাতিকেও মানুষ নিজের দাস ও প্রজা করিয়াছে। আরও কঠিন সত্য এই যে, যে-পশুকে মানুষ দাস করিতে পারে নাই, তাহাকে শত শত বৎসর ধরিয়া বধ করিয়াছে। সে পশুদের স্বাধীন অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারে নাই। মানুষের মৃগয়াপ্রীতির মূলে ইহাই।

তাহার পর নূতন প্রস্তর-যুগে মানুষ উদ্ভিদ জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সে নানা বন্য তৃণের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, উহাদের ধান, গম, যব ইত্যাদি পোষা তৃণে পরিণত করিয়া নিজের প্রজা করিয়াছে। আবার যে-গাছকে সে অধীন করিতে পারে নাই তাহাকে কাটিয়া ঘরবাড়ি, যানবাহন, আসবাব ও হাতিয়ার তৈরি করিয়াছে ; আধুনিক কালে বনের পর বন উৎসন্ন করিয়া সংবাদপত্রের জন্য কাগজ তৈরি করিতেছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' মানুষের এই সাম্রাজ্যবাদ না থাকিলে প্রকাশিত হইত না, সুতরাং এই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় যদি আমার এই লেখাটি প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভণ্ড বলিতাম।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সারাজীবন ব্রিটিশ মিউজিয়মে পড়াশোনা করিয়াও মার্কস এই সহজ তথ্যগুলি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বিদ্বেষ-পরায়ণতার জন্য তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা বুর্জোয়াকে 'সাম্রাজ্যবাদ-পাপে' পাপী করিয়াছিলেন। উহা তাঁহাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতৃবিদ্বেষ।

এই সূত্রে বাঙালী সাম্রাজ্য-বিরোধীদের কাছে একটা কথা বলি। তাঁহারা যদি অকপটভাবে সাম্রাজ্য-বিরোধী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত ভাত ও দুধ না খাইয়া শহিদ হওয়া। যাহাতে তাঁহাদের এইরূপ শহিদ হইবার বাসনা আরও প্রবল হয়, সেজন্য একটা পুরস্কারের কথা বলি। শহিদরা ইসলামীয় স্বর্গে গিয়া হুরিদের ক্রোড়ে লালিত হইবেন। ইহাও বলা প্রয়োজন যে, হুরিরা শ্বেতাঙ্গিনী, তাহাদের চোখ তীব্র কৃষ্ণতারকাযুক্ত, তাহাদের দেহ মৃগনাভি ও গন্ধদ্রব্য হইতে গঠিত ; আরও লোভনীয় কথা এই যে, শহিদদের সুখের জন্য তাহারা শহিদদের কাছে প্রতি রাত্রিতেই কৌমার্য বিসর্জন দিয়া তৎক্ষণাৎ কৌমার্য ফিরাইয়া আনে, যাহাতে শহিদদের কৌমার্যভোগ অব্যাহত থাকে। ইহার পরও কি বাঙালী সাম্রাজ্য-বিরোধীরা উপবাস করিয়া শহিদ না হইয়া দুধভাত খাইবেন ?

॥ ২ ॥

সভ্যমানুষের সাম্রাজ্য

এখন সভ্য মানুষের সাম্রাজ্যস্থাপন ও সাম্রাজ্যবাদের কথা বলি। সাম্রাজ্যের অর্থ, সামরিক দক্ষতার সহায়তায় একটি শক্তিমান জাতির একাধিক অন্য জাতির উপর নিজের আধিপত্য স্থাপন। পাঠক সম্ভবত বলিবেন, তবু ভাল, লোকটা এতক্ষণে ছেঁদো কথা, ন্যায়ের ফক্কিকা ও অবান্তর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া আসল কথায় আসিল, সাম্রাজ্যবাদের আলোচনা করিতে গিয়া গরু, ঘোড়া, ধান ও গম টানিয়া আনিবার কী কারণ ছিল ?

আমি এই অভিযোগ মানিতে পারি না। এ-পর্যন্ত আমি যাহা বলিয়াছি তাহা কোনওদিক হইতেই অবান্তর নয়। মানুষ যাহা করিয়াছে অথবা করিতেছে তাহাকে, প্রথম হইতে বিশ্বের অস্তিত্বের যে-ধারা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই সব কাজ বিশ্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহারই অনুবর্তন মাত্র, পার্থক্য যাহা হইয়াছে তাহাও বিশ্বের ধারার অনুবর্তী, কারণ বিশ্বের সনাতন অস্তিত্ব যেমন সত্য, উহার পরিবর্তনশীলতাও তেমনই সত্য। ফরাসী ভাষায় একটা প্রবাদ আছে— Plus ça change, plus c'est la même chose, বিশ্ব সম্বন্ধেও তাহাই বলা চলে। সুতরাং যাহাকে সভ্য মানুষের ইতিহাসে 'সাম্রাজ্য-স্থাপন' বলে, উহা মানুষের সমগ্র ইতিহাসেরই অংশবিশেষ, প্রসারণ হইলেও। আবার, যাহা পরে ঘটে তাহার উৎপত্তি আগে যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতেই হয়, কোনও কিছুই স্বয়ম্ভূ নয়। সুতরাং তর্ক না বাড়াইয়া সভ্য মানুষের imperialism কী তাহারই পরিচয় দিব।

সভ্য মানুষের ইতিহাস পাঁচ হাজার বৎসর মত, এর বেশি নয়। উহার কথা আমরা জানিতে পারি লিখিত বৃত্তান্ত হইতে। লিখিত কাহিনী হইতেই আমরা মানুষের মনের পরিচয় পাই তেমনই লিখিত বা প্রস্তরে উৎকীর্ণ বিবরণ হইতে আমরা সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসও আদ্যোপান্ত পাই। প্রথমে প্রাচীনতম পরিচয়ের কথাই বলি।

মিশরের প্রথম বংশের রাজা মার্নের-এর (তারিখ খ্রীঃ পূঃ ৩২০০ বছরের কাছাকাছি।) সাম্রাজ্যস্থাপনের উদ্যোগ সম্বন্ধে একটি ফলক কেরো মিউজিয়মে আছে। উহার একদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশটি মুণ্ডকাটা শত্রুদেহ মাটির উপরে সাজানো দেখানো হইয়াছে, অন্যদিকে মার্নের নিজে বিজাতীয় শত্রুকে বধ করিতেছেন দেখানো আছে। যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবে না তাহাদের বধ করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ইহাই সাম্রাজ্যবাদের প্রথম ও মূল সূত্র। এই সূত্রের প্রয়োগ পরবর্তী সকল সাম্রাজ্য স্থাপনেই পাই, কী বাবিলোনীয়, কী আসিরীয়, কী পারসীক, কী ভারতীয়। ইহার ব্যতিক্রম কোথাও নাই।

তবে পারসীকদের সাম্রাজ্যবাদ প্রবর্তন ও সাম্রাজ্য স্থাপনের পর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ নূতন ধারা দেখা গেল। সাম্রাজ্য 'সভ্য' হইল বলা চলে। আধুনিক কালে ইউরোপীয় imperialism-এর যে-রূপ দেখা গিয়াছে, তাহার উদ্ভব ইউরোপে হয় নাই, হইয়াছে পারস্যে। কি-ভাবে হইল বলিতেছি।

পারসীক সম্রাটদের রাজত্বের ধারণা 'রাজা' বলিতে যাহা বোঝায় তাহা হইতে লব্ধ নয়। সংস্কৃত 'রাজন্' শব্দের (একই অর্থে) প্রতিশব্দ ল্যাটিনে 'রেকস্', 'রাজ্ঞী' শব্দের ল্যাটিন প্রতিশব্দ 'রেগিনা' ; আয়াল্যান্ডের কেল্টিক ভাষায় উহা 'রি' এবং ফ্রান্সের কেল্টিক ভাষায় উহা 'রিক্স্' (rix)। এই শব্দগুলির অর্থ অধিপতি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জাতিদের কেবলমাত্র পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে উহা আছে, মাঝখানে পারসীকে নাই। পারসীক সম্রাটেরা নিজেদের প্রাচীন পারসীক ভাষার অন্য একটা শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন— 'দারয়বৌস, বিষ্টপস্য পুত্র, ক্ষয়থীয়, ক্ষয়থীয় ক্ষয়থীয়ানাম্, ক্ষয়থীয় বজ্রক। (ব-এর উচ্চারণ সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব-এর মত হইবে।) অনুবাদ, 'দারয়বৌস, বিষ্টপ্সের পুত্র, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়দের উপরে ক্ষত্রিয়, মহা-ক্ষত্রিয়।'

পারসীকেরা শাসক বা অধিপতি বুঝাইতে 'ক্ষত্র', 'ক্ষত্রিয়' এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পুরাতন পারসীক ভাষায় এই দুই শব্দের অর্থ সংস্কৃত ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ হইতে বিভিন্ন। উহা পুরাতন পারসীক ধাতু 'ক্ষয়' হইতে আসিয়াছে— যাহার অর্থ প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা, প্রভুত্বলাভ। দারয়বৌস একটি শিলালিপিতে বলিয়াছিলেন, 'আহুর-মজদা আমাকে ক্ষস্স দান করিয়াছেন।' তাঁহার পুত্র, ক্ষয়র্ষণ নিজেকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,— 'আমি, ক্ষয়র্ষণ—ক্ষয়থীয়, ক্ষয়থীয় ক্ষয়থীয়ানাম্, ক্ষয়থীয় বজ্রক, বহু দেশের, এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর শাসক, ক্ষয়থীয় দারয়বৌসের পুত্র, পারসীক, পারসীক পুত্র, আর্য, আর্যজাতীয়।'

পারসীক সম্রাটেরা প্রথমে দিগ্বিজয়কে ক্ষত্রিয়ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। হেরোডোটাস লিখিয়াছেন যে, হখামনিষীয় দারয়বৌসের পত্নী আতোসা,— তিনি হখামনিষীয় কুরুষের কন্যা—একদিন স্বামীকে বলিলেন,—

'ক্ষত্রিয়, তুমি প্রবল শক্তির অধিকারী, তবু তুমি অলসভাবে বসিয়া আছ, অন্য জাতিদের পারসীকের অধীন কর না। তুমি যুবা-বয়স্ক, তোমার অপরিমিত ধনও আছে, তোমার উচিত তোমার কার্যের দ্বারা তুমি মান্য হও, যাহাতে পারসীকেরা বুঝিতে পারে তাহারা একজন পুরুষের দ্বারা শাসিত।' এখানে পারসীক সম্রাটদের যে-নামগুলি পুরাতন পারসীক ভাষায় দিয়াছি, তাহার পরিচিত ইংরাজী রূপ দিতেছি—Darius, Xerxes, Cyrus. হখামনীষীয় বংশের পরিচিত রূপ Achaemenid—উহার পারসীক অর্থ মনিরসখা বংশীয়।

কিন্তু পারসীকেরা কেবল অপর জাতিকে বশীভূত করাকেই সাম্রাজ্যস্থাপনের একমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে নাই, কুরূষ প্রথমে প্রচার করিলেন, বিজিত জাতিকে নিজেদের ধর্ম ও জীবনের রীতি অব্যাহত রাখিয়া বাস করিতে দিতে হইবে, এমন কী অন্য জাতির দ্বারা অত্যাচারিত জাতিকে পরাধীনতা হইতে মুক্তি দিতে হইবে। এজন্যই পারসীক সম্রাট নির্বাসিত ইহুদিদের বাবিলোনীয় দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

॥ ৩ ॥

গ্রীক, রোমান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যশাসনের এই ধারণা আলেকজান্ডার পারসীকদের কাছ হইতে গ্রহণ করেন। তাঁহার পরবর্তী গ্রীক রাজারা এই ধারা অনুযায়ী সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহাদের পরে রোমানরাও সাম্রাজ্যবাদের এই মূলমন্ত্র প্রচার করেন। ভার্জিল তাঁহার পরিচয় এই কবিতাতে দিয়াছিলেন—

> 'Tu regere imperio populos, Romane, memento/
> (Hae tibi erunt artes), pacisque imponere morem/ Parcere subiectis, et debellare superbos.
> (হে রোমান, ইহা মনে রাখিও— তোমার দক্ষতা ইহাতেই— তোমার কৃত্য অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করা, শান্তিসঙ্গত আচরণ প্রতিষ্ঠা করা, আর্তের উদ্ধার, এবং অহঙ্কৃতের দমন।)
> [আমাকে উপাধি দিবার সময়ে আমি এই কথাগুলিই ল্যাটিনে আবৃত্তি করিয়াছিলাম।]

AMARBOI.COM

ইংরেজ যখন সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল তখন এই বাণীই নিজেদের শাসনের মন্ত্র বলিয়া মানিয়া লইল। একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইংরেজ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল বাণিজ্য করিয়া ধনোপার্জনের জন্য, ভারতবাসীদের শোষণ করিবার জন্য। ফল বিবেচনা করিলে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সত্যই ভারতবর্ষে আসিয়াছিল বাণিজ্যের জন্য, কিন্তু তাহাতে শুধু বাণিজ্যের ন্যায্য লাভই এই কোম্পানি চাহিয়াছিল, শোষণ করিতে চাহে নাই। প্রথম যুগে, কোম্পানিকে বঙ্গদেশের তাঁতিদের দাদন দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইত, তাহারা পরে নিজেদের বোনা কাপড় দিয়া সেই দেনা শোধ করিত। ইহাতে দুই পক্ষেরই লাভ হইত, শুধু এক পক্ষের নয়। *

ইহার পর মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের গদিতে বসাইয়া ক্লাইভ ১৭৫৭ সনের ২৯ জুন (পলাশীর যুদ্ধের ছয়দিন পরে) কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিলেন,—

* এ-বিষয়ে যাঁহারা ইংরেজ-বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে চাহেন, তাঁহারা যেন এই দুইটি গ্রন্থ দেখেন—
1. K.N. Chaudhuri: The Trading World of Asia and the East India Company (1660-1760) 1978.
2. K.N. Chaudhuri: Asia Before Europe 1990.
আমার জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ-এর নাম হইয়াছিল স্থানীয় বিখ্যাত তাঁতিবংশের কিশোরীলাল পরামাণিকের নাম হইতে। এই গঞ্জটি তাঁতিয়ানী বস্ত্রের একটা বড় আড়ৎ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'As the present Nawab is a brave and good man, the country might expect to be quiet and happy under him; and for our parts we should not anyways interfere in the affairs of the Government...we should return to Calcutta and attend solely to commerce, which is our proper sphere and our whole aim in these parts.'

কিন্তু পরে দেখা গেল, মীরজাফর ও তাঁহার পরবর্তী নবাবেরা অকর্মণ্য, সুতরাং বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইতে গেলেও বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু তখন ইহাও দেখা গেল যে, শাসন করা ও ব্যবসা করা এক সঙ্গে চলিবে না। কোম্পানির কর্মচারীরা তখন নিজেরা ব্যবসা করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারিত, বিশেষ করিয়া লবণের ব্যবসায়ে। লন্ডনের ডিরেক্টরগণ এইরূপ ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা ১৭৬৬ সনের ১৭ মে তারিখে কলিকাতার কর্তৃপক্ষকে লেখেন,—

'It is neither consistent with their (কোম্পানির কর্তৃপক্ষের) honour nor their dignity to promote such trade, as it is now more immediately our interest and duty to protect and cherish the inhabitants, and to give no occasion to look on every Englishman as their national enemy, a sentiment we think such a monopoly would suggest.'

পরে কোম্পানির বাণিজ্য করা একেবারে বন্ধ করা হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাম্রাজ্যস্থাপন বাণিজ্যের জন্য হওয়া দূরে থাকুক, বাণিজ্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। অবশ্য ইংরেজশাসনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজরা ধন উপার্জন করিয়াছে, তেমনই ভারতীয়েরাও করিয়াছে। উহা আনুষঙ্গিক ফল। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অর্থকে সাক্ষাৎভাবে জড়িত না করিবার কারণ আমি পাইলাম।

পক্ষান্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষেরা ও তাঁহাদের স্থানীয় প্রতিনিধিরা রোমান সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা যে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দুইটি মাত্র দিতেছি। হ্যালহেডের 'A Code of Gentoo Laws' হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে ইংরেজীতে প্রথম গ্রন্থ। উহা প্রথমে স্মৃতি হইতে হিন্দু পণ্ডিতেরা সঙ্কলন করেন, পরে উহা ফারসীতে অনূদিত হয়; এবং ফারসী হইতে হ্যালহেড ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। উহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৭১ খ্রীঃ সনে। উহার ভূমিকায় হ্যালহেড এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন : ইংরেজ শাসকদের হিন্দুদের শাস্ত্রীয় বিধান জানিবার ও মানিয়া লইবার কি প্রয়োজন? উত্তরে তিনি বলেন,—

'Nothing can so favourably conduce to these two points [i — to conciliate the affections of the nations, or ii — to ensure stability to the acquisition (of the British)] as a well-timed toleration in matters of religion, and an adoption of such original institutes of the country, as do not immediately clash with the laws or interests of the conquerors.

'To a steady pursuance of this great maxim, much of the success of the Romans may be attributed, who not only allowed to their foreign subjects the free expression of their own religion, and the administration of their

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

own civil jurisdiction, but sometimes even naturalized such parts of the mythology of the conquered, as were in any respect compatible with their own system.'

বহু পরবর্তী যুগের একজন ল্যাটিন ভাষার কবি (জন্ম ও বাস 'গল-প্রদেশে' অর্থাৎ আধুনিক ফ্রান্সে) রুটিলিউস্ নামাতিয়ানুস্ লিখিয়াছিলেন,—

'Patriam fecisti diversis e gentibus unam.' (হে রোমান, তুমি বহু বিভিন্ন জাতির জন্য একটি মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ।)

আমরাও যে ইংরেজশাসনের ফলে ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়া একটা বৃহত্তর মাতৃভূমি পাইয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই।

ওয়ারেন হেস্টিংস-ও বিশ্বাস করিতেন যে, কোম্পানির কর্মচারীদের হিন্দুদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা উচিত। তিনি লেখেন,—

'It is the gain of humanity: in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection; it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence.'

সর্বশেষে হেস্টিংস দুইটি কথা বলিলেন। প্রথম কথাটা এই— ইংরেজদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, ভারতবাসীরা অসভ্য জাতি, ইহাদের শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিলে এই ধারণা দূরীভূত হইবে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে বলিলেন, 'These will survive when the British dominion in India shall long ceased to exist and when [it will be] lost to remembrance.'

ভারতবর্ষে ব্রিটিশশাসনের রীতির সঙ্গে যে, রোমানসাম্রাজ্য শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে, তাহা আমি প্রথম জানিলাম, ছাত্রাবস্থায়— লর্ড ব্রাইসের 'Studies in History and Jurisprudence' গ্রন্থটি পড়িয়া।

॥ ৪ ॥

হিন্দুর সাম্রাজ্যবাদ

সকলের শেষে প্রাচীন হিন্দুর, অথবা ভারতীয় আর্যের সাম্রাজ্য-বিস্তার ও সাম্রাজ্যবাদের কথা বলি। আর্যদের ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগে রামায়ণ ও মহাভারতে রাজ্য স্থাপন ও রাজ্য ভোগ সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহা হইতে মনে হয় না যে, তখন অন্য রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত বা অন্য উপায়ে বশীভূত করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা প্রচলিত ছিল। মহাভারতে দেখা যায় দুই পক্ষের রাজারাই স্বাধীনভাবে এক পক্ষ বা অন্য পক্ষের মিত্র হিসাবেই যুদ্ধ করিয়াছিল।

তবে সে-যুগেও নিজের রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য অথবা অপহৃত রাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ ধর্মসঙ্গত ছিল, বরঞ্চ ইহার জন্য যুদ্ধ না করা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ না করাই ধর্মবিরোধী বলিয়া মনে করা হইত। 'গীতা'তে উহার প্রমাণ পাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন যখন গুরু-জ্ঞাতি-বন্ধুকে বধ করিতে হইবে দেখিয়া কৃপাবিষ্ট হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্র ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে কঠিন ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন,—

'অর্জুন, বিপদের সময়ে তোমার এই আর্যের অনুচিত, স্বর্গের পথে বাধা, অকীর্তিকর দুর্বলতা কোথা হইতে আসিল ? পার্থ ! ক্লৈব্যগ্রস্ত হইও না, ইহা তোমার অনুচিত। হে পরন্তপ ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও।'

কেননা, যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়দের ধর্ম, এই ধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়া যদি তুমি যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে তুমি নিজের ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপভাগী হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কী ? ভারতীয় আর্যেরা 'আর্য', 'ক্ষত্র', 'ক্ষত্রিয়', এই শব্দগুলি পারস্য হইতে লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিবার পর তাহারা 'ক্ষত্র' ও 'ক্ষত্রিয়ে'র অন্য অর্থ দিয়াছিল। ক্ষাত্র-ধর্ম তখন হইল যুদ্ধ করা, এবং ক্ষত্রিয় বলিলে চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ বুঝাইত। ইহা ছাড়া (একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) এই দুইটি শব্দের অন্য অর্থ আমি কোনো সংস্কৃত বই-এ পাই নাই।

কিন্তু আধুনিক সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে 'ক্ষত্র' শব্দের একটা অর্থ দেওয়া হইয়াছে— dominion, power; ইহাতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। আধুনিক অভিধানকারেরা এই অর্থ কোথা হইতে পাইলেন ? উহা 'ক্ষত্র' শব্দের পারসীক অর্থ, সংস্কৃত ভাষার অর্থ নয়। 'গীতা'য় কী আছে তাহাই দেখা যাক।

উহার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে আছে—

'শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যম যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানং ঈশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥'

(ইহার বাংলা অনুবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলাম না।)

ইহার মধ্যে একমাত্র 'ঈশ্বরভাব' শব্দটার অর্থ 'প্রভুত্ব ধর্ম' অথবা ইংরেজীতে 'lordly nature' বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহাকে ব্যক্তিগত চরিত্রধর্ম বলিয়াই দেখানো হইয়াছে। এক জাতির অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিবার অর্থে নয়। 'গীতা'র শব্দটা পারসীক 'ক্ষয়' শব্দের বাচক নয়।

কালিদাস কিন্তু এক জায়গায় 'ক্ষত্র' শব্দের অন্য অর্থ দিয়াছেন, যাহাতেও আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াছি। তিনি বলিলেন,

'ক্ষতাৎ কিল ত্রায়তে ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।'

('ক্ষত' অর্থাৎ বিপদ বা অনিষ্ট হইতে ত্রাণ করে বলিয়া মহান্ বা ভয়ঙ্কর 'ক্ষত্র' শব্দ পৃথিবীতে খ্যাত।) কালিদাস এই অর্থ কোথায় পাইলেন ? এই অর্থ সংস্কৃতে নাই, পুরাতন পারসীকেও নাই, উহা ভার্জিলের ল্যাটিনে যাহা আছে— অর্থাৎ 'parcere subiectis'-এর অর্থের সহিত একেবারে মিলিয়া যায়। এ-বিষয়ে অন্য কথা না বলিয়া শুধু আমার একটা ধারণার কথা বলিব। আমার মনে হইয়াছে, কালিদাসের যুগে ল্যাটিন কাব্যে কী আছে এবং রোমান সাম্রাজ্যবাদ কী তাহা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত লোকের জানা ছিল। ভার্জিলের 'Aeneid'-এর সঙ্গে কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এর বেশ সাদৃশ্য আছে— অবশ্য ভার্জিল কালিদাসের পূর্ববর্তী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ৫ ॥

প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্য

এই সব প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এখন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথায় আসি। ভারতীয় রাজারা সাম্রাজ্যের ধারণা প্রথমে যে পারসীদের কাছ হইতে পাইলেন, তাহাতে সন্দেহ করা চলে না, সম্ভবত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাল হইতে। এই ব্যাপারে আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী গ্রীক রাজারা মধ্যবর্তী হইয়া থাকিতে পারেন। ভারতবর্ষে 'রাজাধিরাজ' ও 'মহারাজ' শব্দগুলি কখন হইতে ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইল তাহা আমি আবিষ্কার করিতে পারি নাই, তবে দুইটিই যে, পারসীক 'ক্ষয়থীয়ানাং ক্ষয়থীয়' ও 'ক্ষয়থীয় বজ্রক' এবং গ্রীক 'basileus basileon' এবং 'basileus megalos'-এর অনুবাদ সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে, প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ পারসীক ও হেলেনিস্টিক সাম্রাজ্যবাদ হইতে উদ্ভূত ও পরে রোমান সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে বিকশিত।

ইহার পর, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের কথা ছাড়িয়া দিয়া, উহার লক্ষণ এবং রূপ কী তাহা বিবেচনা করা যাউক। উহার প্রথম কৃত্য শত্রুনিপাত। রাজ্যলাভের জন্য শত্রু বধ করিতে হইবে যেমন সর্বস্বীকৃত ছিল, তেমনই সাম্রাজ্যস্থাপনের জন্যও করিতে হইবে তাহা স্বীকৃত হইল ; ইহা অবশ্য পারসীক সাম্রাজ্যবাদেও ছিল। দারয়বৌস তাঁহার বহু ঘোষণায় ইহা বার বার বলিয়াছিলেন।

সেজন্য ভারতীয় রাজারা এবং সম্রাটেরা 'অরিন্দম' 'পরন্তপ' উপাধি গ্রহণ করিতেন। 'কাদম্বরী' উপন্যাসে শূদ্রক সম্বন্ধে বলা হইল, 'চাপকোটি-সমুৎসারিতসকলারাতিকুলাচলো রাজা শূদ্রকো নাম।' (কোটি কোটি ধনুর দ্বারা অর্থাৎ অগণিত ধনুর্ধর সৈনিকের দ্বারা, সকল অরাতিকুলের উৎসারণ-কর্তা শূদ্রক নামে রাজা।) ইহাতে শত্রুকুলের প্রতি যে-নিষ্ঠুরতা দেখানো হইল উহারও প্রশংসা আছে। শূদ্রককে স্তুতি করিয়া শুকরূপী পুণ্ডরীক বলিল,—

'স্তনযুগমশ্রুস্নাত সমীপতরবর্তি হৃদয়শোকাগ্নেঃ।
চরতি বিমুক্তাহারং ব্রতমিব ভবতো রিপুস্ত্রীণাম্ ॥'

(হৃদয়ে যে শোকাগ্নি জ্বলিতেছে তাহার অত্যন্ত নিকটবর্তী ও হারবিমুক্ত, এবং অশ্রুস্নাত স্তনযুগল যেন আপনার শত্রু-স্ত্রীদের বৈধব্যব্রত পালন করিতেছে।)

এই সুর ক্রমাগত বাজিয়াছে। অল্পবয়স্ক শত্রুপুত্রদের প্রতিদিন প্রভাতে বিজেতা রাজার বন্দনা গান গাহিয়া করিতে হইত। ইহা হইতেই 'বন্দী' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, কারারুদ্ধ অর্থে নয়।

ভারতীয় সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রূপ এই, বশ্যতা মানিবার পর বশীভূত নৃপতিদের সহিত সম্রাটের আর কোনও বিরোধ নাই, কারণ তাহারা নিজেদের শিরে সম্রাটের শাসন সমভ্যর্চিত করিয়া লইয়াছে, তাঁহার প্রতাপ ও অনুরাগ দুই-এর দ্বারাই অবনত হইয়া তাঁহার সামন্ত হইয়াছে। কিন্তু সম্রাট চক্রবর্তিত্ব লাভ করিয়াও তাহাদের বন্ধু ভাবেই দেখিতেছেন, এবং কোনও রাষ্ট্রীয় প্রশ্ন উঠিলে সমীপবর্তী রাজাদের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কো দোষঃ ?' কোনও দোষ আছে কি ? এই আচরণ রোমান সম্রাটদের সহিত সামন্ত রাজাদের সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়— যেমন হেরড দি গ্রেট, প্রথম হেরড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ্রিপ্পা ও দ্বিতীয় হেরড আগ্রিপ্পা ; এমন কী জার্মান বিদ্রোহী আর্মিনিয়াস প্রথমে রোমান সেনাপতি ছিলেন ; এবং বিদ্রোহী ব্রিটিশ রাণী Boadicea-র স্বামীও রোমানদের মিত্রসামন্ত ছিলেন। বিদ্রোহী না হইলে কোনও সামন্ত রাজার প্রতি কোনও দুর্ব্যবহার করা হইত না। ভারতবর্ষে ইংরেজরাও এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। সেজন্যই নিজাম ও রাজপুত রাজাদের সহিত মিত্র-সামন্তের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। সাম্রাজ্যশাসনের ধর্ম সব দেশে সব কালে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একই ছিল।

এখন সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় নির্দেশে আসি— সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রথম উদ্যোগ দিগ্বিজয়। ইহা পারসীকেরা যেমন ঘোষণা করিয়াছিল প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদীরাও তেমনই ঘোষণা করিল। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন কালিদাস। তিনি প্রথমেই ইহার ফল কী হইল তাহা এই ভাষায় বলিলেন, 'বসুন্ধরা যদিও বা ইতিপূর্বে মনু প্রভৃতি মান্য রাজাদের দ্বারা ভুক্তা (ভুক্তিতা) হইয়াছিলেন, তবুও রঘুকে এমন ভাবে গ্রহণ করিলেন যেন ইতিপূর্বে তাঁহার অন্য কোনও পতি ছিল না।' ইহার পর রঘুর দিগ্বিজয়ের বিবরণ দেওয়া হইল। তিনি বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া পারস্য পর্যন্ত গিয়া আবার ভারতবর্ষে আসিয়া কামরূপ পর্যন্ত জয় করিলেন। রঘুর কালে এই সব দেশের অস্তিত্ব অবশ্য ছিল না, তবে কালিদাসের কালে ছিল।

ইহার পর ভবভূতি রামচন্দ্রের সময়ে সাম্রাজ্যটি কীরূপ ছিল তাহার বর্ণনা দিলেন। আশ্রম বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, 'কী প্রয়োজনে এই অশ্ব সৈন্য-পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে?' লব সাম্রাজ্যস্পৃহা অনুভব করিয়া নিজে নিজে বলিলেন, 'অহো, যে যজ্ঞের দ্বারা বিশ্ববিজয়ী ক্ষত্রিয়েরা অন্য সকল ক্ষত্রিয়কে পরাভূত করে অশ্বমেধ তাহারই সর্বোচ্চ কৃত্য।' এমন সময়ে নেপথ্যে শোনা গেল—

'এই অশ্ব, এই পতাকা, এই বীর-ঘোষণা সপ্তলোককে একবীর (এক সম্রাটের অধীন) করিবার জন্য দশাননজয়ীর।'

রামচন্দ্রের নাম করিয়া ভবভূতি তাঁহার যুগের সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় দিলেন।

কাব্য-উপন্যাসের কথা ছাড়িয়া প্রাচীন ভারতের প্রত্যেকটি সম্রাট সম্বন্ধেই এই কথা বলা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বিবরণ এলাহাবাদে অশোকের স্তম্ভের উপর হরিষেনের প্রশস্তিতে আছে, চন্দ্রগুপ্তের (চন্দ্রের) দিগ্বিজয়ের কাহিনী দিল্লীর লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে। হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল, দেবপাল, রামপাল সকলেই এই একই ঘোষণা করিয়াছিলেন।

॥ ৬ ॥

বাঙালীর হাস্যাস্পদ আচরণ

এই সব তথ্য বাঙালী পণ্ডিতদের জানা নাই, এ-কথা মনে করা অসম্ভব। তবে তাঁহারা প্রীতিকর না হইলেই যাহা জানেন তাহাও ভুলিয়া থাকিবার ভান করেন। আধুনিক বাঙালীর সাম্রাজ্য-বিরোধিতার মূলে এই আত্মপ্রবঞ্চনাই রহিয়াছে। এই কারণে আমি বলিতে বাধ্য যে, বাঙালী সাম্রাজ্যবিরোধীদের মত হাস্যাস্পদ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিসমষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথাও দেখা যায় না। বাঙালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিত বলিয়া যখন তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, তখন উহার বড়াই করিতে তাঁহাদের কোনও দ্বিধা ছিল না। আমি অল্পবয়সে শুনিতাম (স্বীকার করিব— তখন বিশ্বাসও করিতাম) :

'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয় ;
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময় !'
(Rule Britannia স্মরণ করুন।)
'সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তুই তো না, মাগো, তাদের জননী, তুই তো না মাগো, তাদের দেশ।'
অথবা,
'হিন্দু যখন সিন্ধুপারে দখল করলে যবদ্বীপ...'
অথবা,
'শ্যাম-কম্বোজে ওঙ্কারধাম মোদেরই প্রাচীন কীর্তি।'

এমন কী বড় হইয়াও আমার শিক্ষক কালিদাস নাগ মহাশয়ের স্থাপিত 'Greater India Society'-র প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করি নাই।

সুর বদলাইয়াছে যখনই ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যের প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের প্রসঙ্গে যাঁহারা সাম্রাজ্যবিরোধী হইয়াছেন, তাঁহাদের জামা খুলিলে দেখা যাইবে, পিঠে লোহা পুড়াইয়া অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ হার্ভার্ড ও অন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাগা দেওয়া আছে। আমি এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নই, সুতরাং সাম্রাজ্যবিরোধী হইতে পারিলাম না। ইহা অদৃষ্টচক্রে ঘটিয়াছে, উহার উপরে আমার হাত নাই।

AMARBOI.COM

॥ ৭ ॥

সাম্রাজ্য সম্বন্ধে মূলগত তথ্য

এ-পর্যন্ত আমি নিজে সাম্রাজ্যস্থাপন ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায় এ-সম্বন্ধে কোনো কথাই বলি নাই, কারণ এই প্রশ্নের বিচার স্থির বুদ্ধির দ্বারা কখনই করা হয় না, হয় সাধারণত জনপ্রচলিত সাময়িক ধারণার বশে, অথবা ব্যক্তিগত ভালমন্দের ধারণা হইতে। এই সব ধারণা সবসময়েই সাময়িক স্বার্থবোধ হইতে হয়। তাহা ছাড়া কোনো বিষয়ে মতের ঐক্য কোনো যুগেই দেখা যায় নাই। সেজন্যই মহাভারতে আছে,—

'বেদাঃ বিভিন্নাঃ, শ্রুতয়ঃ বিভিন্নাঃ,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ;
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতম্ গুহায়াম্,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

সুতরাং কেবলমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির, বিশিষ্ট ব্যক্তিসমষ্টির, অথবা বিশিষ্ট কোনো যুগের মতকে অভ্রান্ত মনে করিলে ভুল হইবে, উহার উপর নির্ভর করিয়া কোনোও ঐতিহাসিক ব্যাপার অথবা ঘটনাকে ভাল বা মন্দ, উচিত বা অনুচিত, ন্যায্য বা অন্যায়, কল্যাণকর বা অকল্যাণকর বলা সঙ্গত হইবে না। আমিও যদি সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিতে চাই, তাহা হইলে নিজের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া উহা বলিব না। ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে একমাত্র তাহার ধর্ম বিবেচনা করিয়া এই সবের প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োজনীয়তার সন্ধান আমাকে করিতে হইবে।

কিন্তু এখানেও একটা জটিল প্রশ্ন উঠে। ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে মানবজাতির কার্যকলাপ ও আচরণের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, জনসমষ্টি অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অন্যায় এবং নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছে। নৈতিক বিচারে এসবকে কিছুতেই ভাল বলা চলে না। পক্ষান্তরে সকলেই অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিবে।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিই। উত্তর আমেরিকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা, বিশেষ করিয়া ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা সেই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের, অর্থাৎ মোঙ্গলীয় 'রেড-ইন্ডিয়ান'দের উৎসাদন করিয়াছে। তাহারা বলিত, The only good Indian is the dead Indian. মানুষের হিংস্রপ্রবৃত্তির পরিচয় এইভাবে পৃথিবীর সারা ইতিহাসে আর কোনো জাতি দেয় নাই, এমন কি আসীরীয় অসুর-নসিরপাল কিংবা তাতার জেঙ্গিসও না। ইহাকে পাপকার্য ভিন্ন আর কি বলা যায়?

অথচ এই আমেরিকানরাই নিজেদের সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, সুতরাং মানবজাতির হিতৈষী বলিয়া নিজেদের ঘোষণা করিয়াছে ও করিতেছে। ইহার চেয়ে নির্লজ্জ কপটাচরণ কল্পনা করা যায় না। অথচ ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, কেহ বলিবে না যে, মুসলমানদের দ্বারা সমস্ত উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও ভারতবর্ষ জয় ও সেই সব দেশের পুরাতন সভ্যতা বিনাশ ন্যায়সঙ্গত। অথচ মুসলমানেরা ইহা করিয়াছে।

তৃতীয়ত, কেহ বলিবে না যে, আমেরিকান যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের ইংরেজ ও ইউরোপীয় অধিবাসীরা দাসপ্রথা স্থায়ী রাখিবার জন্য গৃহযুদ্ধ করিয়া ন্যায়সঙ্গত আচরণ করিয়াছিল। এই গৃহযুদ্ধে তিনলক্ষের উপর আমেরিকান প্রাণ হারাইয়াছিল, ভাই ভাইকে, পুত্র পিতাকে বধ করিয়াছিল। অথচ আমি টেক্সাসে থাকিবার সময়ে এই যুদ্ধের গৌরব-ঘোষণা শিলালিপিতে উৎকীর্ণ দেখিয়াছি। দক্ষিণের আমেরিকানরা এখনও বলে, উহা তাহাদের 'war of independence.'

চতুর্থত, কেহ বলিবে না যে, ১৯৪৬-৪৭ সনে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল ও যাহাতে সম্ভবত দশলক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল এবং আরও বহু লক্ষ সর্বস্বান্ত হইয়াছিল, উহা ভাল হইয়াছিল। তবু উহা ঘটিয়াছিল। বহু সদুপদেশ দিয়া কেহই উহা নিবারণ করিতে পারে নাই।

আরও বলিব, এখনও আইরিশ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টের মধ্যে যে হত্যাকাণ্ড চলিতেছে তাহার কোনো সঙ্গত কারণ আছে এই যুক্তি কেউ দেয় বা দিতে পারে। তবু উহা বন্ধ হইতেছে না।

এইরূপ কত দৃষ্টান্ত দিব? উদাহরণ দিয়া একটা বই লিখিতে পারি। তবে কি মানিয়া লইতে হইবে যে, ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সবই অন্যায় ও অত্যাচারের ব্যাপার; এ সবের বিরুদ্ধে আপত্তি অবান্তর, শিশুর রাগিয়া হাত-পা ছোঁড়ার মত? মানবজাতির ইতিহাসে এই দ্বিত্ব, নিষ্ঠুর দ্বিত্ব আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমার বিশ্বাস কোথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা নিগূঢ়, অন্তর্নিহিত সত্য আছে, যাহার আলোতে দেখিলে এই অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে। আমি সেই সত্যেরই সন্ধান সারাজীবন ধরিয়া করিয়াছি। সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা উহা সেই সত্যসন্ধানেরই অংশ।

সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদ সহজবোধ্য ব্যাপার নয়। উহার বিচার করিতে হইলে প্রথমেই আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে— মানুষের দ্বারা মানুষের শাসন, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট মাত্রই কি ন্যায়সঙ্গত ব্যাপার ?

॥ ৮ ॥

জাতীয় শাসন কি ন্যায্য ?

অন্ততপক্ষে এনার্কিস্টরা শাসন বা গভর্নমেন্ট মাত্রকেই অন্যায় বলিয়া মনে করে। তাহাদের দ্বারা রুশিয়ার সম্রাট ও আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের হত্যা বিদ্বেষপ্রসূত হইতে পারে, কিন্তু প্রিন্স ক্রপটকিনের মত ব্যক্তি শুধু বিদ্বেষের বশেই এনার্কিস্ট হইয়াছিলেন এ-কথা বলা চলে না। এনার্কিস্টদের 'থিওরী' খণ্ডন করা সহজ নয়।

প্রথমেই দেখিতে হইবে, জাতীয় রাষ্ট্রের রূপ ও ধর্ম ; কোন রূপের পরিচয় আমরা ইতিহাস হইতে পাই। সভ্য মানবের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের মত লিখিত আছে। উহা সকল জাতি বা দেশের বেলাতে না হইলেও অধিকাংশ জাতি ও দেশের ক্ষেত্রেই আছে। এই ঐতিহাসিক কালের মধ্যে অধিক সময়ে এবং অধিক দেশেই রাষ্ট্রীয় শাসন রাজাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে, প্রজাসাধারণের বা তাহাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা হয় নাই। প্রজাতন্ত্র প্রাচীন ইতিহাসে দেখা গেলেও— যেমন রোমান 'রিপাব্লিক' বা প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে— অধিকাংশ দেশেই উহা আধুনিক ব্যাপার।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, রাজাদের দ্বারা শাসন বংশগত ব্যাপার হইত। রাজারা তাহাদের পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইত, প্রজাদের ইচ্ছায় নয়। সুতরাং পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজাদের কন্যারাও সিংহাসন পাইত। কিন্তু সিংহাসনে যে-ই অধিরূঢ় হউক না কেন, সে নিজের ইচ্ছামত শাসন করিতে পারিত। সেইজন্য এইরূপ শাসনকে একাধিপত্য— monarchy— বলা হইত ও হয়। এই শব্দটা গ্রীকভাষা হইতে আসিয়াছে। উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'একজনের শাসন'। এইরূপ রাজা বা রাণীরা তাহাদের পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইত বলিয়া রাজ্যশাসন রাজা বা রাণীর চরিত্র অনুযায়ী হইয়াছে। এই কারণে দেখা গিয়াছে যে, একজন কর্মদক্ষ, বিবেচক, এবং প্রজার উপকারকারী রাজার পর পরবর্তী রাজা দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী ও শোষক হইয়াছে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় নাই।

ইহা ছাড়া যে-রাজার রাজত্বকাল কোনো বিশেষ জাতি বা দেশের বিশেষ গৌরবের যুগ বলিয়া স্বীকৃত, তাহাও এই রাজার সমস্ত রাজত্বকাল জুড়িয়া জনপ্রিয় বা কল্যাণকর থাকে নাই। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই। তাঁহার শাসনকালকে ফ্রান্সের গৌরবময় যুগ বলা হয়— Le grand siècle (the great century) বলা হয়। কিন্তু তাঁহার শেষের দিকে প্রজাদের এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল যে, বাহাত্তর বৎসর রাজ্যশাসন করিবার পর যখন ১৭১৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন প্রজারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দে নৃত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিল। একভাবে বা অন্যভাবে বংশানুক্রমিক রাজাদের শাসনের এই বিচিত্র রূপই ইতিহাসে দেখা গিয়াছে।

ইহার পর রাজা বা রাণীর দ্বারা শাসিত জাতীয় রাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্যধরনের জাতীয় শাসনের কথা বিবেচনা করা যাক। এই সব শাসন নানা রকমের হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত— ডিক্টেটরদের, কোনো বিশিষ্ট দলের, বিভিন্ন দলের দ্বারা পরিচালিত পার্লামেন্টের। ইহাদের কোনটাই জাতি বা জনসমষ্টির ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই, কিংবা হয় না। একবার কেহ বা কোনো দল রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইলে তাহারা যে-কালের জন্য অধিকার পাইয়াছে, সেইকালের মধ্যে যাহা কিছু করিতে চায় করিতে পারে ; যাহারা তাহাদের এই অধিকার দিয়াছে তাহারা শাসকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি করিতে পারে না। ইহাতে জনসমষ্টির অনিষ্ট পর্যন্ত হইয়াছে, সবসময়েই জনপ্রিয় আচরণ দেখা যায় নাই। এই নির্দিষ্ট কালের মধ্যে শাসকেরা যে-কোনো আইন প্রবর্তন করিতে পারে, উহা সকলকেই মানিতে হয়।

সর্বোপরি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকদের স্বেচ্ছাতন্ত্র হইবার অধিকার দুইটি ব্যাপারে দেখা যায়, দুইটিতেই জনসাধারণের অর্থশোষণ বা প্রাণনাশ হইতে পারে, অথচ উহাতে বাধা দিবার অধিকার জনসাধারণের থাকে না। এই দুইটি ব্যাপার এই— প্রথমত, রাজস্ব প্রবর্তন, দ্বিতীয়ত, যুদ্ধঘোষণা ; বিশেষত যুদ্ধঘোষণা যাহাতে সহস্র সহস্র, এমন কি লক্ষ লক্ষ লোকেরও প্রাণনাশ হইতে পারে। তাহার উপর জনগণের কোনো অধিকার নাই, ইহার অধিকার সম্পূর্ণ সাময়িক গভর্নমেন্টের হাতে থাকে।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও নিজেদের অর্থ বা প্রাণের উপর সম্পূর্ণ অধিকার জনসাধারণের নাই। উহার জন্য জাতীয় রাষ্ট্রেও যে অর্থশোষণ ও প্রাণনাশ হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা অধিক অর্থশোষণ বা প্রাণনাশ কোনোও সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রে হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। পক্ষান্তরে অনেক সময়ে সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রেই কম হইয়াছে।

দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে (১৯১৪-১৯১৮) প্রায় সাতলক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হয় ; কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই যুদ্ধে লিপ্ত থাকিলেও পঁচিশ-ত্রিশ হাজারের বেশি ভারতীয় সৈন্য প্রাণ হারায় নাই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। ব্রিটিশশাসনের কালে আমি উচ্চ বেতনের রাজকর্মচারী হইলেও ৬/৭ পারসেন্টের বেশি ইনকাম-ট্যাক্স দিই নাই। কিন্তু ১৯৫১ সনে যখন আমার প্রথম ইংরেজী পুস্তক বিলাতে প্রকাশিত হইল, তখন উহার ইনকাম-ট্যাক্স হইল ৪৯ পারসেন্ট। সুতরাং ব্রিটিশ জাতীয় রাষ্ট্রের অধীন হওয়াতে আমি আমার অর্জনের অর্দ্ধেকের বেশি পাই নাই। ইহাতে যে আমার ব্রিটিশসাম্রাজ্যের প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল বলিতে পারি না।

॥ ৯ ॥

সাম্রাজ্যের অবসান হইলে কি ঘটে

জাতীয় রাষ্ট্র যখন সুপরিচালিত হইয়াছে এবং সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রও যখন সুপরিচালিত হইয়াছে, তখন দুই ধরনের রাষ্ট্রে জনসাধারণের অবস্থা ও কল্যাণের ইতর-বিশেষ দেখা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই। কিন্তু যখনই কোনো সাম্রাজ্যিক শাসনের অবসান হইয়াছে, তখন জনসাধারণের চরম দুর্গতি হইয়াছে। এক সাম্রাজ্যের পতন ও নূতন সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের মাঝেকার যুগকে আমি imperial interregnum বলিয়া থাকি। এই সময়ে জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ হয় তাহার সন্ধান লওয়া প্রয়োজন।

ব্রিটেনে রোমান সাম্রাজ্য ৪০০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, উহার পর অবসানপ্রায় হয়। ইহাতে নানাদিকে, বিশেষ করিয়া বর্বর জার্মানজাতীয়দের আক্রমণে সভ্য ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী কেল্টিক জাতীয় ব্রিটনদের কি দুর্দশা হয় তাহার সম্বন্ধে একজন ব্রিটিশ খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীর লেখা একখানি বই আছে— উহার নাম 'ব্রিটেনের সর্বনাশ'। এমন কি ব্রিটিশ খ্রীষ্টানরা রোমান সেনাপতির কাছে পরিত্রাণের জন্য একটি আবেদন পাঠায়।

পাশ্চাত্য জগতে সভ্য জীবন ও সুশাসন রোমান সাম্রাজ্যের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল যে, লোকে বলিত রোম গেলে এসবও যাইবে। এই কারণে রোমান সাম্রাজ্যের অবসান হইবার পরবর্তী তিন-চার শত বৎসরকে ইউরোপের অন্ধকারময় যুগ বলা হয়।

আবার যখন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতার পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হইল— যাহাকে Carolingian Renaissance বলা হয়— তখন আর একটা কাল্পনিক রোমান সাম্রাজ্য সৃষ্টি করা হইল। ৮০০ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পোপ জার্মান সম্রাট শার্লিমেনকে রোমের সেন্টপিটার্স-এ সম্রাটপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার উপাধি দিলেন, Augustus এবং Imperator. পরে Sacrum Romanum Imperium—Holy Roman Empire বলিয়া একটা কাল্পনিক সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হইল। অস্ট্রিয়ার সম্রাটেরা এই সাম্রাজ্যের অধিপতি হইতেন। উহা মাত্র ১৮০৬ সনে লুপ্ত হয়। ইউরোপীয়দের রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যকলাপের উপর রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব শত শত বৎসর ধরিয়া বর্তমান ছিল।

এখন দেখা যাক ভারতবর্ষে মোগলসাম্রাজ্যের পতনের পর কি ঘটিল। এই সাম্রাজ্যের অবনতির সূত্রপাত হয় ১৭০৭ সনে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর। তবে কোনক্রমে জোড়াতাড়া দিয়া মোগল সম্রাটের কিছু ক্ষমতা ১৭৪৮ সনে মহম্মদ শাহ-র মৃত্যু পর্যন্ত ছিল। তার পর নামে সম্রাট থাকিলেও স্থানীয় শাসকেরা নিজেদের ইচ্ছামত আচরণ করিত ও প্রজার সর্বস্ব লুটিত। এইরূপ অত্যাচার ইংরেজশাসন ১৭৭০ সনে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাড়িয়া চলিল। তখন বাঙালীর কি অবস্থা হইয়াছিল তাহার বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নানা উপন্যাসে দিয়াছেন। আমি শুধু 'দেবীচৌধুরাণী'-তে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিব।

প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের কাছে সবদিকে উপকৃত হইয়াও তাহাকে ডাকাতি ছাড়িতে বলিল। ভবানী উত্তর দিল, 'আমি ডাকাতি করি না, রাজত্ব করি।' প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাকাতি কি রকম রাজত্ব?' ভবানী বলিল, 'এদেশে রাজা নাই···আমি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি।' প্রফুল্ল এ-উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না, তখন ভবানী তাহাকে বুঝাইবার জন্য দেশের লোকের দুরবস্থার বর্ণনা দিল, বলিল,—

> 'কাছারীর কর্ম্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকানো ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝে খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে একগুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়, না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারীতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্ব্বসমক্ষে প্রাপ্ত করায়।'

বঙ্কিমচন্দ্র কি এই বিবরণ দিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন ? ইহা বলিবার উপায় নাই। আমি পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে, ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে বাঙালী ভদ্রলোক সমৃদ্ধ হইলেও পাকাবাড়ি করিতে ভরসা পাইত না, ধুমধাম করিয়া দুর্গাপূজা করিত না, পাছে কোনো শত্রু নবাবদপ্তরে খবর পাঠায় যে, এই ব্যক্তি ধনী এবং উহার ফলে নবাবের লোক আসিয়া টাকার দাবি করে। বাঙালী ভদ্রলোকের বাহ্যিক জীবনে সমৃদ্ধি একমাত্র ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সম্ভব হইয়াছিল। এই কিম্বদন্তী যে সত্য তাহার পরিচয় আমিও অল্পবয়সে পাইয়াছিলাম। ১৯২০ সনে আমি আমার ভগিনীর শ্বশুরবাড়িতে যাই। শ্বশুরমহাশয় সম্পন্ন জমিদার ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, নবাবী আমলে তাঁহার এক পূর্বপুরুষ পাকাবাড়ি করিয়াছিলেন। তখন কোনো জ্ঞাতিশত্রু উহার কথা মুর্শিদাবাদে জানায়। সেই পূর্বপুরুষ সংবাদ পাইয়া তিনদিনের মধ্যে পাকা দালান ধ্বংস করিয়া ভিটাতে মাটিয়া বুনিয়া দেন, অর্থাৎ ঘুঘু চরিবার ব্যবস্থা করেন।

আমি সমস্ত ঐতিহাসিক বিবরণ পড়িয়া এবং সমস্ত জনপ্রচলিত কাহিনী শুনিয়া মোগলসাম্রাজ্যের পতনের কালে শাসনব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৯৪৬ সনে লন্ডনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলাম। সম্পাদক উহা সেই বৎসরের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যাতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উহাতে সাতটি দফাতে তখনকার শাসনব্যবস্থার পরিচয় দিয়াছিলাম। তিনটি মাত্র উদ্ধৃত করিব।

'1. Complete ineffectiveness of the State. It could not resist foreign invasion, put down internal rebellions, suppress Hindu-Muslim riots (there were Hindu-Muslim riots even in those days), could not ensure efficient administration, and was not successful in any project it initiated.'

'4. Political life and State Service came to be regarded as the means of promoting private interests alone, and all posts were filled by careerists, The public revenues were looked upon as legitimate loot, and through jobbery and wirepulling the careerists could get almost any assignments they wanted on the public revenues.'

'7. Lastly, there grew up a habit of tolerance of anarchy and corruption, or at all events resignation to them.' (*The New English Review,* Dec. 1946)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ইঙ্গিত করিয়াছিলাম যে, ইংরেজশাসন গেলে এইরূপ অবস্থা আবার আসিতে পারে। আমার আশঙ্কা যে অমূলক ছিল, তাহা আজিকার দিনে কেহ বলিবে না। অথবা বলিবে শুধু সেই শ্রেণীর লোকেরা যাহারা ইংরেজশাসন লুপ্ত হইবার পর সৎ এবং অসৎ দুই উপায়েই ধনী হইবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাইয়াছে।

ইহাও মোগলসাম্রাজ্যের পতনের যুগে ঘটিয়াছিল। একদিকে জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা ও অন্যদিকে মুষ্টিমেয় লোকের অপরিমিত ধন সেই সময়ে দেখা গিয়াছিল। আমি যে-সময়ের কথা বলিতেছি উহা বর্গীর হাঙ্গামার পরেকার কাল। বর্গীর হাঙ্গামাতে পশ্চিমবঙ্গের লোকের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহার পরিচয় ভারতচন্দ্র এইভাবে দিয়াছিলেন,—

'লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হইল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥'

অথচ ইহার দশ-বারো বৎসরের মধ্যে মুর্শিদাবাদে কিরূপ অর্থবান ব্যক্তি ছিল তাহার কথা ক্লাইভ এইভাবে বলিয়াছিলেন,—

'Murshidabad was as extensive, populous and rich a city as the City of London with this difference— that there were individuals in it who possessed infinitely greater amounts of property than any in London.'

কিন্তু এই ধন নবাবের ছিল না। ছিল শেঠদের ও ঘুষখোর রাজকর্মচারীদের। শেঠদের কাছে ঋণ লইয়াই নবাবের শাসন চলিত, নহিলে অচল হইত। শেঠদের মধ্যে অবশ্য জগৎ শেঠ বলিয়া যে-পরিবার খ্যাত ছিল সেই পরিবারই সবচেয়ে বিত্তশালী ছিল, আর রাজকর্মচারীদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা ধনবান ছিল দেওয়ান দুর্লভরাম রায় (মিত্র কায়স্থ)। মীরজাফর নবাব হইবার পর যখন নবাবের তহবিল হইতে কোম্পানিকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার দাবি উঠিল, তখন দেওয়ান দুর্লভরাম রায় হিসাবে বলিল যে, সে সমস্ত সন্ধান করিয়া দেখিয়াছে যে, সিরাজের তহবিলে সর্বসুদ্ধ দেড় কোটি টাকার বেশি নাই। সকলেই ধরিয়া লইল যে, দেওয়ান টাকা সরাইয়াছে। পরে যখন প্রাপ্য টাকার একটা রফা হইল, তখন দুর্লভরাম উহার উপরে শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন দাবি করিল। ক্লাইভকে উহা মানিতে হইল। ক্লাইভ ১৭৫৭ সনের ৩০শে জুন তারিখে কলিকাতার কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন, 'It was absolutely necessary to satisfy Rai Durlabh, who is the principal minister, and through whose hands our affairs must pass.'

ইহা হইতে সহজেই বোঝা যাইবে যে, বর্তমান ভারতীয় শাসকদের আচরণ সম্বন্ধে যাহা শোনা যায় তাহা পূর্ববর্তী imperial interregnum হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলের শেষে শাসনব্যবস্থার একটি মাত্র দিককে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অবসানের পর স্বাধীন ভারতে কি হইয়াছে তাহার পরিচয় দিব। উহা ডাকবিভাগের অবস্থা। ইংরেজশাসনের সময়ে ইংরেজরাও বলিত যে, ভারতীয় ডাকবিভাগের ব্যবস্থা ইংলন্ডের ডাকবিভাগের চেয়েও ভাল। অথচ উহাতে মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্মচারী ছাড়া সকলেই ছিল ভারতীয়। বিশেষ করিয়া বিলাতি ডাক সম্বন্ধে কোনো শৈথিল্য হইত না। আমি নিজে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত দেখিয়াছি প্রতি রবিবার সকাল আটটার সময়ে বোম্বে মেল হাওড়া পৌঁছিবার পর বেলা বারোটার সময়ে কলিকাতা জি-পি-ও হইতে সর্বত্র বিলির জন্য ডাক পাঠানো হইত। আমার পরিচিত একজন বাঙালী ভদ্রলোক এই বিলির ব্যবস্থা করিতেন। কোনো দিন ট্রেন পৌঁছিতে বিলম্ব হইলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন থাকিত বিলি করিতে কত দেরি হইবে। তাহাও কখনও দুই ঘন্টার বেশি হয় নাই। আমি প্রতি রবিবার চারটার সময়ে কলেজ স্কোয়ারে 'বুক-কোম্পানী'তে গিয়া স্তূপাকৃতি নূতন বই দেখিতাম।

আর এখন ৮/১০ ঘন্টায় দিল্লী ও কলিকাতায় এরোপ্লেনে ডাক পৌঁছায়। কিন্তু বিলি হইতে ৭ হইতে ১৫ দিন পর্যন্ত দেরি হয়। তাহা সত্ত্বেও বহু চিঠি মারা যায়, কখনও পৌঁছায় না। আমিই একজন নই, বিলাতপ্রবাসী প্রতিটি পরিচিত বাঙালীর মুখে উহা শুনিয়াছি। আমারও বহু চিঠি মারা গিয়াছে। সর্বশেষে একটা বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়াছে।

আমি এই বইটি প্রকাশ করা সম্বন্ধে আলেন পাবলিশার্স লিমিটেডকে একটা বিস্তারিত চিঠি ১৯শে আগস্ট তারিখে লিখি ও উহা সেই দিনই রেজেস্ট্রি ডাকে পাঁচশত পাউন্ড ইনশিওর করিয়া পাঠাই। এই চিঠি আজও বাজার আপিসে পৌঁছায় নাই।

এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাতে এখানকার পোস্টমাস্টার বলিলেন, ইহা অহরহ ঘটিতেছে, রেজেস্ট্রি চিঠিও মারা যাইতেছে। তিনি খবর করিয়া জানাইলেন যে, চিঠিটা যথা সময়ে ভারতবর্ষগামী এরোপ্লেনে তোলা হইয়াছে। ইহার পর কি ঘটিয়াছে, উহা ভারতবর্ষের ডাকবিভাগে লিখিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু পোস্টমাস্টার ইহাও বলিলেন, ইনশিওরের টাকা পাওয়া দূরে থাকুক, উত্তরও পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু দেশে যতটুকু খবর লইয়াছি তাহা হইতে জানিয়াছি যে, চিঠিপত্র হারাইবার পিছনে ডাকবিভাগের গাফিলতি ছাড়া অন্য ব্যাপারও আছে। উহা অনুমানের জন্য রাখিয়া দিব।

শেষ কথা বলি, ইংরেজশাসনের শেষের দিকে উহাতে যে-সব দোষ দেখা দিয়াছিল— যাহার ফলে ইংরেজশাসনের প্রতি বিদ্বেষ বাড়িতে থাকে— উহা চতুর্গুণ হইয়া স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনে দেখা দিয়াছে।

উহার সবচেয়ে ঘৃণ্য অথচ ভয়াবহ দিক এই আদর্শপরায়ণ, স্বার্থচিন্তাহীন, দেশপ্রেমিক, লোকহিতব্রত, সাহসী ব্যক্তি মাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখা ও তাহার পিছনে গোয়েন্দা লাগানো। এ-পর্যন্ত যতজন নিঃস্বার্থ ভারতীয়ের সঙ্গে আমি এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি তাঁহারা সকলেই বলেন এই আচরণ সমস্ত সরকারি কার্যে দেখা দিয়াছে। ইংরেজশাসনের শেষের দিকে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ অল্-ইন্ডিয়া-রেডিও-তে আমার চাকুরি লইতে চাহিয়াছিল। মনে হয় এখনও তাহাদের অনুগ্রহ হইতে পরিত্রাণ পাই নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ১০ ॥

বাঙালীর সাম্রাজ্যবিদ্বেষের মূলে কি

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কোনো শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল বা কুশৃঙ্খল, উহা কল্যাণকর কি অকল্যাণকর, এই সব প্রশ্নের সহিত বর্তমান কালের ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবিদ্বেষের কোনো সম্বন্ধ নাই। আসলে উহা ইংরেজশাসনের প্রতি বিদ্বেষ, ইংরেজের প্রতি ব্যক্তিগত বা জাতিগত বিদ্বেষ পর্যন্ত নয়। এখন ভারতীয়দের, বিশেষ করিয়া বাঙালীদের সাদা চামড়া সম্বন্ধে এরূপ মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে, যে উহাকে পা-চাটা ভিন্ন অন্য কিছু বলা চলে না। আমার পরিবারে উহাকে 'সাহেব-লেউলেউ' বলা হয়। অথচ ইংরেজের শাসন সম্বন্ধে ক্ষ্যাপা কুকুরের অবস্থা সকল শিক্ষিত বাঙালীর হইয়াছে। ইহার ফলে অকর্মণ্য দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্, অত্যাচারী ও উন্মাদ সিরাজউদ্দৌলা এবং অকর্মণ্য ও লম্পট ওয়াজিদ আলি শা পর্যন্ত বাঙালীর কাছে দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙালী কম্যুনিস্টদের মধ্যে এইরূপ মুসলমানপ্রীতি দেখা দিয়াছে যে, উহাদের ইসলামীয় দৈহিক পরিবর্তন করিয়া মুসলমানের সহিত সর্ববিষয়ে সমান করিয়া দেওয়া উচিত।

এই মূঢ় মুসলমানপ্রীতি ও ততোধিক মূঢ় ইংরেজশাসনবিদ্বেষ সেই বাঙালীসমাজের মধ্যেই বেশি দেখা যাইতেছে যাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত ইংরেজশাসন না হইলে দেখা যাইত না। শুনিয়াছি খচ্চর পিতার নাম শুনিতে চাহে না, উহার কারণ তাহার অশ্বীমাতা গর্দভের ঔরসে তাহার জন্মদান করে। বর্তমান যুগের শিক্ষিত বাঙালীর পিতা হিসাবে ইংরেজ যে গর্দভজাতীয় ছিল তাহা বলা চলে না, তবু এই অনিচ্ছা কেন ? ইহার প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে।

ইংরেজশাসনের সময়ে পরাধীনতার গ্লানি তীব্রভাবে অনুভব করিলেও কোনো মহান বাঙালী এই তামসিক মনোবৃত্তি দেখান নাই। ইঁহাদের সকলেরই স্থানীয় ইংরেজের প্রতি বিরাগ ছিল, তবু ইংরেজজাতি বা ইংরেজের শাসন সম্বন্ধে সত্যের অপলাপ করেন নাই। তিনজনের কথা বলিব।

প্রথম রামমোহন। তিনি ১৮২৯ সনের ২১শে জুন তারিখে তাঁহার বাগানবাড়িতে (উহা বর্তমান আপার সার্কুলার রোডে ছিল, আমহার্স্ট স্ট্রীটে রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ি নয়) ফরাসী বৈজ্ঞানিক—যুবক ভিক্টর জাকমঁর সহিত আলাপ করেন। অন্যান্য প্রসঙ্গের সহিত ইংরেজশাসনের কথাও বলেন। কথাগুলি এইরূপ—

> 'National independance is not an absolute good; the object, the goal, so to say, of society is to secure the happiness of the greatest possible number, and when, left to itself, a nation cannot attain this object, who it does not contain within itself the principle of future progress, it is better for it that it should be guided by the example and even by the authority of a conquering people who are more civilized.'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়ে রামমোহন রাজনৈতিক মতামতে বেন্থামপন্থী হইয়াছিলেন। তিনি সবশেষে বলিলেন,—

> 'Conquest is very rarely an evil when the conquering people are more civilized than the conquered, because the former bring to the latter the benefits of civilization.'

আমি ১৯২৫ সনে জাকর্ম-র জার্নালে কথাগুলি ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে পাই ও ফরাসী হইতে অনুবাদ করিয়া 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত করি। (The M.R., June 1926, pp. 689-92. যাঁহারা সমস্ত কথাবার্তা জানিতে চাহেন, তাঁহাদের এই প্রবন্ধটি পড়িতে অনুরোধ করি।) ইহার পূর্বে এই কথাগুলি কেহ ভারতবর্ষে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। রামানন্দবাবু চরম জাতীয়তাপন্থী হইলেও উহা ছাপিতে আপত্তি করেন নাই।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলি। তিনি 'আনন্দমঠে'র ভূমিকাতে লেখেন,—

> 'সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝানো গেল।'

'আনন্দমঠে'র শেষেও তিনি চিকিৎসকের মুখে সন্ন্যানন্দের প্রতি এই উক্তি দিলেন,—

> 'ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব, হে বুদ্ধিমান, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া রাজার অনুসরণ কর।'

ইহার যে-একটা শোকাবহ ও করুণ দিকও আছে তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র ভুলেন নাই। তাই তিনি লিখিলেন— 'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিল।' এই 'বিসর্জন' জাতীয়তার আবিষ্কার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই। ইহা ছাড়া উপায় ছিল না।

সকলের শেষে বিবেকানন্দ কি মনে করিতেন তাহার কথা বলি। তিনি একটি বক্তৃতায় ইহা বলিয়াছিলেন,—

> 'No one ever landed on the English soil with more hatred in his heart for a race than I did for the English. On this platform are present English friends who can bear witness to this fact; but the more I lived among them and saw how the machine was working—the English national life—and mixed with them, I found what the heart-beat of the nation was and the more I loved them.'

এই বক্তৃতাতেই তিনি ইংরেজ সম্বন্ধে বলিলেন যে, 'They are a nation of heroes, they are the true Kshattriyas.'

ইঁহারা কি আজিকার বাঙালীর চেয়ে কম দেশপ্রেমিক ছিলেন? তাঁহারা কি পরাধীনতার গ্লানি কম অনুভব করিতেন?

আজিকার বাঙালীর ইংরেজশাসনের প্রতি বিদ্বেষ সম্পূর্ণ অন্য মনোভাব হইতে উদ্ভূত। উহার মূলে আছে জাতিমাত্রেরই বিজাতীয়ের অধীনতা স্বীকারে আপত্তি। ইহা সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে সকল কালে সকল জাতির মধ্যেই দেখা গিয়াছে। কোনো জাতিই বিজাতীয়ের শাসন সহ্য করিতে পারে নাই। বলিলে অন্যায় হইবে না যে, জাতিবৈর মানুষের ধর্ম।

এই জাতিবৈর ইংরেজশাসনের প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকল ভারতবাসীর মধ্যে দেখা দিয়াছিল। ফরাসী পাদ্রী আবে দুবোয়া এই বিরাগ সম্বন্ধে বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকেই লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের লোক স্বজাতীয় রাজাদের ভালবাসে, কিন্তু তাহাদের শাসনকে অবজ্ঞার চক্ষে, এমন কি বিদ্বেষের চক্ষেও দেখে ; তাহারা ইংরেজের শাসনকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ইংরেজকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে। এই মনোভাব যে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার বশেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন,

'দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ছাড়িয়া।'

অবশ্য পরের প্রতি এই বিরাগ আমাদের সামাজিক জীবনেও ছিল। উহার পরিচয় এই প্রচলিত বাক্যে পাওয়া যায়— 'আমাদের ছেলেটি নাচে যেন ঠাকুরটি, ও-বাড়ির ছেলেটা নাচে যেন বাঁদরটা।' এই গতানুগতিক মনোবৃত্তি আমি রাখিতে পারি নাই। আমার মনোভাবের পরিচয় কিপলিং-এর কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া দিব,—

'All good people agree,
And all good people say,
All nice people, like Us, are We
And every one else is They:
But if you cross over the sea,
Instead of over the way,
You may end (think of it!) looking on We
As only a sort of They!'

তাই আমি বাঙালী ও ইংরেজ দুই-এর সম্বন্ধেই নিরপেক্ষ হইতে পরিয়াছি, তাই আমি রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মত একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কেন বিলাতে আছি

বৎসর দুয়েক আগে একটি বাঙালী ভদ্রমহিলা আমাকে একখানি চিঠি লেখেন। (তাঁহার পত্রের উত্তর আমি দিতে পারি নাই, এই অপরাধের কৈফিয়ৎ তিনি এই অধ্যায়ের শেষে পাইবেন।) তিনি জানান যে, আমার লেখার প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে, তবে আমার জীবনের একটি ব্যাপার তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। তিনি বলিলেন, সত্যজিৎ রায় কলিকাতাবাসী হইয়াও যদি 'অস্কার' পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার দেশত্যাগী হইয়া বিলাতপ্রবাসী হইবার কি প্রয়োজন ?

তাঁহার এই প্রশ্নে আমি সত্যই আশ্চর্য হইয়াছিলাম। একটু প্রণিধান করিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন আমি কোনোদিকেই সত্যজিৎ রায়ের সহিত তুলনীয় নই, যেমন নই দৈহিক আকৃতিতে তেমনই নই বৃত্তিতে। আমি ক্ষুদ্রকায় লেখক, তিনি শালপ্রাংশু ফিল্ম্-কারক। তিনি বাংলা ভাষায় বাঙালী জীবন লইয়াই ফিল্ম্ তৈরি করিয়াছেন। তাঁহাকে অনিচ্ছায় হইলেও কলিকাতায় থাকিতে হইত, নহিলে তিনি 'অস্কার' পাওয়া দূরে থাকুক, ফিল্ম্-ও তৈরি করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে আমি প্রধানত ইংরেজীতে লিখি। এ-পর্যন্ত আমার যতগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দশখানা ইংরেজীতে, তিনখানা বাংলায়। প্রবন্ধও বেশির ভাগ ইংরেজীতে লেখা। আমার প্রথম ছাপা লেখা ইংরেজীতে, সেগুলি ১৯২৫ সনে লিখিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় লেখা আমি আরম্ভ করি ১৯২৭ সনে। আরো বলা আবশ্যক যে, আমার ইংরেজী বই প্রথমে লন্ডন ও নিউইয়র্কে প্রকাশিত হইয়াছে, পরের প্রধান প্রধান বইগুলিও তাহাই। প্রথম ইংরেজী বই প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনে, প্রথম বাংলা বই প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সনে।

॥ ১ ॥

প্রথমেই যে উত্তর দিতে পারিতাম

আমার লেখকবৃত্তির এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতেই ভদ্রমহিলাটি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইতেন। আরও বিস্তারিত করিয়া যাহা বলিতে পারিতাম তাহা বলি। ইংরেজীতে লিখিলে, যে-সব দেশের লোক ইংরেজী ভাষাভাষী সেই সব দেশে থাকাই সুবিধাজনক, বই প্রকাশ করিতে হইলে যে আরও বাঞ্ছনীয় তাহা বলিবার আবশ্যক রাখে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলাতে না থাকার জন্য আমার প্রথম ইংরেজী বই প্রকাশ করিতে অসুবিধা হইয়াছিল। আমি নিজের উদ্যোগে সফল হই নাই। পরে বিখ্যাত ইংরেজ সামরিক ইতিহাস লেখক ক্যাপ্টেন লিডেলহার্ট আমাকে সহায়তা করেন। তিনি আমার একটি সামরিক প্রবন্ধ পড়িয়া অত্যন্ত খুশি হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার সহিত আমার পত্রালাপ চলিতেছিল। তিনি, আমি বিফলপ্রযত্ন হইতেছি শুনিয়া, আমাকে একজন লিটারারী-এজেন্টের সহায়তা লইতে বলিলেন ও তাঁহার এজেন্ট জন্ ফার্কারসন-এর হাতে বইটি দিতে উপদেশ দেন। এই কোম্পানির তদানীন্তন পরিচালক মিঃ ইনস্‌রোজ বইখানা ম্যাকমিলানের দ্বারা প্রকাশিত করান।

এই বইটি অবশ্য 'The Autobiography of an Unknown Indian.' এই বইটির জন্যই আমি ইংরেজীতে লেখক বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হই। উহা প্রকাশের পরই বিলাতে যে-ভাবে প্রশংসিত হইয়াছিল ও যে-ভাবে আলোচিত হইয়াছিল তাহা ইহার পূর্বে কোনও ভারতীয়ের লেখা ইংরেজী বই-এর বেলাতে দেখা যায় নাই, এমন কি জবাহরলাল নেহরুর আত্মজীবনীর জন্যও নয়। ইহা আত্মম্ভরিতার উক্তি নয়, ঐতিহাসিক সত্য।

এ-বিষয়ে একটি মাত্র প্রমাণ দিতেছি। 'ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ', যাহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সনে, তাহা বিলাতের সর্বোচ্চ সচিত্র সাপ্তাহিক বলিয়া স্বীকৃত ছিল। উহার ১৯৫১ সনের ৩রা নভেম্বর তারিখের সংখ্যায় বইটির একটি দীর্ঘ পরিচয় প্রকাশিত হয়—খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যসমালোচক স্যর জন স্কোয়ারের লিখিত। উহার অতিরিক্ত আমার একটি বড় ফোটোগ্রাফও ছাপা হয়। এত বড় প্রতিকৃতি— এই পত্রিকায় এক জবাহরলাল নেহরু ও আমার ভিন্ন কোনও ভারতীয়ের বেলাতে ছাপা হয় নাই। তবে তখন নেহরু ছিলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ও ফোটোগ্রাফটি খ্যাতনামা কার্শের তোলা। আমি ছিলাম অজ্ঞাতনামা ভারতবাসী ও ফোটোটি তুলিয়াছিল আমার অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র। অন্যান্য পত্রিকা ও বি-বি-সি-তে আলোচনার কথা না-ই বলিলাম।

ইহার পর ১৯৫৯ সনে আমার দ্বিতীয় বই 'A Passage to England' প্রকাশিত হয়। উহারও প্রশংসা সকল ইংরেজী পত্রিকায় হয়। আমার সমস্ত ইংরেজী বই-এর মধ্যে উহারই বিক্রয় সবচেয়ে বেশি হইয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যেই উহার সাতটি সংস্করণ হয়। আজ পর্যন্ত উহা মুদ্রিত হইয়াছে ও উহার অংশ বিশেষ বি-বি-সি-তে পঠিত হইয়াছে। অথচ উহার বিষয় ইংল্যান্ড ও ইংরেজের জীবন ও সভ্যতা এবং উহার লেখক, ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা যাহাদের 'বাঙালী বাবু' ও 'বাবু ইংলিশে'র লেখক বলিয়া তুচ্ছ করিত সেই বাঙালী বাবু। আমিই সেই অবজ্ঞার প্রতিশোধ লইয়াছি।

আমার তৃতীয় ইংরেজী বই 'The Continent of Circe' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সনে। প্রশংসা ছাড়া উহার জন্য আমি ডাফ-কুপার পুরস্কার পাইয়াছিলাম। আমি ছাড়া কোনো বিদেশী লেখক এই পুরস্কার পান নাই। আমার পূর্বে যে-সব ইংরেজ লেখক পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শুধু চারজনের নাম করি— লরেন্স ডারেল, জন বেচ্‌ম্যান, মাইকেল হাওয়ার্ড ও প্রুস্তের বিখ্যাত জীবনীপ্রণেতা, জর্জ পেন্টার।

আমি যে এই সব কথা বলিতেছি তাহা অহঙ্কারপ্রসূত আত্মপ্রচার বলিয়া মনে হইবে ; এই কুকর্ম আমি কখনও করি নাই। তবু যে করিতেছি তাহার কারণ এই যে, এইভাবে খ্যাতিলাভকে বিলাতে আসিবার প্রলোভন বলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা সত্ত্বেও আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলাতে আসি নাই, এমন কি বিলাতে আসিবার কল্পনাও করি নাই। দেশে থাকিয়াই ইংরেজীতে বই লিখিয়াছি।

॥ ২ ॥

আরও যাহা বলিতে পারি

এই সব ছাড়াও আমার বিলাতপ্রবাসী হইবার জন্য শুধু ইচ্ছাই নয়, সংকল্পও হইতে পারিত, বরঞ্চ বলিতে পারি এই সংকল্প না-হওয়াই অস্বাভাবিক হইত। ইহার কারণ প্রতিষ্ঠা, যশ ও অর্থলাভ করিবার ইচ্ছা নয়, জীবনধারণেরই দায়। ১৯৫১ সনে আমার আত্মজীবনী প্রকাশিত হইবার পর দেশবাসীর মধ্যে আমার বিরুদ্ধে যে-বিদ্বেষ দেখা দিল ও তাহার জন্য যে-উৎপীড়ন আরম্ভ হইল তাহাতে দেশে আমার স্ত্রী-পুত্র লইয়া উপবাসী মরিবার সম্ভাবনা হইল।

আমি কিন্তু এইরূপ ফল হইতে পারে তাহা ভাবিতেও পারি নাই। আমি নিজের বাল্য ও ছাত্রজীবনের কাহিনী লিখিবার উপলক্ষ্য করিয়া বাঙালীর জীবন, কার্যকলাপ, কৃতিত্ব ও জাতীয়তাবোধের বিবরণ দিয়াছিলাম। সব জাতিরই দোষগুণ থাকে, আমি সত্য ইতিহাস লিখিতে চাহিয়াছিলাম, তাই অল্পবিস্তর দোষেরও উল্লেখ করিয়াছিলাম, তবে গুণের কথাই বেশি ছিল। তাই বইখানা দেশে পৌঁছিবার পর তখন সকলে আমাকে দেশদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিল তখন আমি বোকা বনিয়াই গেলাম।

তবে দুইজন এইরূপ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের একজন স্যর জন স্কোয়ার। ইনিই ম্যাকমিলানের জন্য বইটির পাণ্ডুলিপিটি পড়েন, ও প্রকাশিত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। আমি এই ব্যাপার সেদিন মাত্র জানিয়াছি, আগে জানি নাই। তিনি বই সম্বন্ধে মত ম্যাকমিলানকে জানাইবার পর তাঁহার ভারতীয় বন্ধু স্যর সি আর রেড্ডিকে ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫০ তারিখে একখানা চিঠি লেখেন। তাহাতে বইখানার, আমার ইংরেজী লেখার ও ব্যক্তিগতভাবে আমার উচ্চ প্রশংসা করিয়া সকলের শেষে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি বলিলেন,—

'If this book comes out, as I hope it will, it may put India into an uproar. But it will certainly enlighten all historically-minded men and he might possibly, if necessary, find a refuge in England where in spite of all we have lost, we are still allowed liberty to think.'

তাঁহার কথা যে সত্য হইয়াছে ইংল্যান্ডবাসী হওয়া সম্বন্ধে ও ভারতবর্ষে uproar উঠা সম্বন্ধে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আমি uproar-এর তাড়নায় বিলাতে আসি নাই।

আর একজন যিনি আমার সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইয়াছিলেন তিনি আমার সাহিত্যগুরু ও কবি মোহিতলাল মজুমদার। বইখানা প্রকাশের পর তিনি উহা পড়েন, ও ১৯৫১ সনের শেষে আমাকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি বইটির, বিশেষ করিয়া উহার ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন, যদিও আমার কোনো কোনো অভিমত সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় ছিল। কিন্তু তিনি যেটা ব্যক্তিগতভাবে গুরুতর মনে করিলেন সেটা দেশে আমার বৈষয়িক অনিষ্টের সম্ভাবনা। তিনি জানিতে চাহিলেন, জবাহরলাল নেহরু বইটি সম্বন্ধে কি মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। তিনি বলিলেন, বইটি পড়িয়া লোকে আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা না করে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনিও ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। আমি বুঝি নাই। তবে বুঝিতে বিলম্বও হইল না।

॥ ৩ ॥

দেশবাসীর বিদ্বেষ ও দেশীয় কর্তৃপক্ষের উৎপীড়ন

দেশীয় সংবাদপত্রে ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় বইটির যে-সব সমালোচনা প্রকাশিত হইল তাহাতে নির্ভাজ গালি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। একজন সমালোচকও আমার মতামত বা সিদ্ধান্ত খণ্ডনের চেষ্টা করিলেন না, শুধু বলিলেন বইটাতে শুধু আছে ভারতবর্ষের নিন্দা। একটি সংবাদপত্রে আমাকে মিস্ মেয়োর সহিত তুলনা করা হইল, আর একটি পত্রিকাতে মন্তব্য হইল, আমার বইটি 'Lavatory writing'। মৌখিক মন্তব্য যাহা কানে আসিল উহাও তদনুরূপ। ইহার ফলে সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া, বিশেষ করিয়া বাঙালীর মধ্যে, দেশদ্রোহী বলিয়া আমার অখ্যাতি হইল। ইহার পর কোনো দেশীয় পরিচালিত পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইল।

তবু ইহাতে আমার জীবিকানির্বাহের ক্ষতি হইত না, কারণ তখন আমি ভারত গভর্নমেন্টের চাকুরি করি। তবে দেশব্যাপী বিরূপভাবের সহায়তা পাইয়া কয়েকজন দিল্লীপ্রবাসী বাঙালী (ইঁহাদের মধ্যে আমার বহুকালের পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয় উচ্চপদস্থ বাঙালীও ছিলেন) সরকারি চাকুরিতে আমার অনিষ্ট করিতে প্রচেষ্ট হইলেন। আমি কিছুতেই মানিয়া লইতে পারি না যে, তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা স্বতঃস্ফূর্ত দেশপ্রেম হইতে হইয়াছিল। এই ঘৃণ্য, নীচ ও পঙ্কিলমে নিষ্ফল প্রযত্নের বিস্তারিত কাহিনী আমি আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে দিয়াছি। আবার সেই কথা বলিতে চাই না, শুধু প্রধান ঘটনার ও তাহার সদ্য সদ্য ফলের বিবরণ দিব।

এই প্রধান ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ১৯৫২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। ইহার পূর্বেও আমার আর্থিক অনিষ্ট করিবার চেষ্টা অল-ইন্ডিয়া-রেডিও-র ভিতরেই একজন বাঙালী কর্মচারীর দ্বারা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই। তবে বই প্রকাশের এক বৎসর পরে আমি যে সরকারি বিভাগে কাজ করিতাম, অর্থাৎ 'ইনফর্মেশ্যন ও ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রি' তাহার তরফ হইতে কৈফিয়ৎ তলব হইল আমি গভর্নমেন্টের অনুমতি না লইয়া কেন বইখানা প্রকাশিত করিয়াছি। ইহা যদি আসলেই অপরাধ হইত তাহা হইলে আমার চাকুরি যাইত। কিন্তু আমি জবাবে দেখাইলাম যে, অনুমতি লইতেই হইবে এইরূপ কোনো বাধ্য-বাধকতা Government Servant's Conduct Rules-এ নাই। আমি আরও বলিলাম, নূতন কনস্টিটিউশ্যনে যে Fundamental Rights আছে, Freedom of Expression তাহার অন্তর্ভুক্ত, এক সামরিক ব্যক্তি ভিন্ন সকলেরই জন্য। আমার এই সব যুক্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া দেখা গেল, সুতরাং আমাকে শাস্তি দিবার এই অক্ষম উদ্যম ব্যর্থ হইল। তবে ইহার পরই একটি Constitutional amendment করিয়া এই অধিকার লোপ করা হইল। ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যেরা হাড়ে-গোলাম, সুতরাং এই amendment-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিল না। আমি বড়াই করিতে পারি যে, ভারতবর্ষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূতন কনস্টিটিউশ্যনের একটি amendment আমার স্বাধীন মনোবৃত্তি হইতে হইয়াছে।

আমি ভাবিলাম, বুঝি ফাঁড়া কাটিল। ওরে বাবা! তাহা হইল না। আমাদের ভাষায় একটা প্রবাদ আছে— 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'— সরকারি paper-tiger-এ ছুঁইলেও 18[2] ঘা হয় তাহা আমি জানিতাম না। সেই ব্যাঘ্র যে ক্ষমা করে না তাহা জানিতে বিলম্ব হইল না।

তখন নিয়ম ছিল উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীকে (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারকে) ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইলে অবসরগ্রহণ করিতে হইবে। ১৯৫২ সনের ২৩শে নভেম্বর আমার সেই বয়স হইবার কথা এবং আমিও সেই শ্রেণীর কর্মচারী। কিন্তু নিয়মানুযায়ী তখনই আমার অবসরগ্রহণ করিবার কথা হইলেও, আমি তদানীন্তন ডিরেক্টর-জেনারেলের নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, আমাকে স্থায়ী করিয়া আরও দুই বৎসর আরো উচ্চ বেতনে রাখিবার প্রস্তাব তিনি উপরওয়ালাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। সুতরাং আমি আশা করিয়াছিলাম যে, সেরূপ ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু যখন পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ণ হইবার মাস দুয়েক আগে সংবাদ লইবার জন্য গেলাম, ডেপুটি ডিরেক্টর-জেনারেল বলিলেন, এই সব কিছুই হইবে না, গভর্নমেন্ট মঞ্জুর করে নাই। বুঝিলাম, একটা বিপদ ঘটিবে। বিষণ্ণমনে পত্নীকে গিয়া বলিলাম। তিনি ভগবানের উপর আস্থা রাখিতে বলিলেন।

নির্দিষ্ট তারিখে অবসর লইতে হইল। তখন জানিলাম আমাকে কোনও retirement benefit (অর্থাৎ পেনশন বা থোক টাকা) দেওয়া হইবে না, কারণ আমি অস্থায়ী পদে ছিলাম। পরে ইহাও শুনিলাম যে, নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, আমাকে যেন অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও-তে কোনো বক্তৃতা করিতেও দেওয়া না হয়। আমি অর্থসঞ্চয় করি নাই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা হইতে মাসতিনেক খরচ চলিল। কিন্তু ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাস হইতে স্ত্রী ও আমার তিনটি নাবালক পুত্র লইয়া জীবনধারণের উপায় রহিল না। ছেলেরা অত্যন্ত অল্পবয়স্ক, তাহাদের স্কুলের শিক্ষাও সমাপ্ত হয় নাই।

কিন্তু কেহই আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। এমন কি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরাও, যদিও আমি ভারতবর্ষে ব্রিটিশশাসনের প্রশংসা করিবার জন্যই আমাদের গভর্নমেন্টের বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। ইঁহারা তখন পূর্বতন শত্রু ও নবলব্ধ বন্ধু নেহরুর প্রীতি লাভ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। আমিও কাহাকেও ধরাধরি করিতে প্রস্তুত নই। সুতরাং আমার অবস্থা শোচনীয় বলা যাইতে পারে। এমন সময়ে একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে একটি কাজ দিলেন। তিনি ফ্রান্সের দূত কাউন্ট অস্ট্রোরগ।

তিনি ১৯৫১ সনের শেষের দিকে ফ্রান্সের দূত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন, ও আমার আত্মজীবনী পড়িয়া মুগ্ধ হন। ১৯৫২ সনের প্রথম দিকে তিনি আমাকে তাঁহার বাড়িতে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। এইভাবে পরিচয় হওয়ার পর তিনি আমাকে বন্ধুভাবে দেখিতেন ও প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন। তিনি ১৯৫৩ সনে কি করিয়া আমার অবস্থার কথা জানিলেন বলিতে পারি না, আমি তাঁহাকে বলি নাই। একদিন ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়া পরে আমাকে বলিলেন যে, একটা কাজ আমাকে দিতে পারেন, ইহার জন্য আমাকে প্রতিদিন বা নিয়মিতভাবে আপিস করিতে হইবে না। শুধু মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহাদের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করিতে হইবে। উপযুক্ত বেতন দিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিলেন। আমি তো বাঁচিয়া গেলাম, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া কাজটি গ্রহণ করিলাম ও পরদিন কাজে যোগ দিলাম। বেতন যাহাই হউক নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের অন্নসংস্থানের উপায় হইল।

কিন্তু অল-ইন্ডিয়া-রেডিও-র ব্যাপারটা কেন ঘটিল তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। আমি যদি বইখানা প্রকাশ করিয়া অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে কৈফিয়ৎ বইটি দেশে আসিবার পরই তলব করা স্বাভাবিক হইত, তাহা না হইয়া পুরা একটি বৎসর পরে কেন হইল ?

কিছুদিন পরে বন্ধুস্থানীয় একজন বাঙালীর কাছে শুনিলাম ইহার কারণ কি। কৈফিয়ৎ চাওয়া মোটেই গভর্নমেন্টের বা ইনফর্মেশ্যন মিনিস্ট্রির উদ্যোগে (অর্থাৎ initiative-এ) হয় নাই, হইয়াছিল একটা ষড়যন্ত্রে। দিল্লীপ্রবাসী কয়েকজন উচ্চপদস্থ বাঙালী আমার বই-এর মধ্যে যে-সব জায়গাতে জবাহরলাল সম্বন্ধে মন্তব্য বা তাঁহার ঐতিহাসিক ধারণার বিরোধী কথা ছিল, সেই সব লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দিয়া তাঁহার কাছে পাঠান। ইহা দেখিয়া জবাহরলাল বইটি ইনফর্মেশ্যন বিভাগের মন্ত্রীর কাছে পাঠাইয়া উপযুক্ত নির্দেশ দিতে বলেন। উহার ফলেই আমার কৈফিয়ৎ তলব হয়।

এই ব্যাপারে কাহারা ছিলেন তাহা অনুমান করিতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইল না। ইঁহাদের বিরূপভাবের কথা আমার অজানা ছিল না।

এই কাহিনীটা আমি শোনা কথা হিসাবে আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে দিয়াছিলাম। সম্প্রতি খুবই বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা একেবারে ঠিক। আমার বইটিতে এই কাহিনী পড়িয়া একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আমার অবসরগ্রহণ সংক্রান্ত ফাইল আনাইয়া পড়েন ও দেখেন যে, জবাহরলাল সত্যই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি যে, ফাইলটি লোপাট হইয়া গিয়াছে। অবশ্য আমার দিক হইতে ইহা শোনা কথা। যেমন শুনিয়াছি তেমনই লিখিলাম।

॥ ৪ ॥

আমার আর্থিক দুরবস্থা

যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে আমার সাময়িক দুরবস্থা ঘটাইলেন তাঁহাদের আমি কোনো দোষ দিই না। মেনকা কন্যা উমা সম্বন্ধে অভিমান করিয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন,—

'আবার ভাবি, গিরি, কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো।'

আমি পরিহাস করিয়া বলি ইঁহারা পিতৃদোষে নীচ হইলেন। এ-কথাটা বলি এইজন্য যে, ইঁহারা বংশানুক্রমে গোলামজাতীয়, অর্থাৎ যাহাকে বলে ঝাড়েবংশে গোলাম তাহাই। স্বাধীনচেতা হইবার সাহস বা ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। অর্থের জন্য দাসত্ব স্বীকারের প্রবৃত্তি ইঁহাদের রক্তে প্রবহমান।

সুতরাং ইঁহারা মনে করিয়াছিলেন আমি তাঁহাদের মত, একটু চাপ দিলেই তাঁহাদের পায়ে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিব। ইহাই তাঁহাদের মূলগত ভুল হইয়াছিল। আমি আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতির উচ্চতম বাণীর মধ্যে ইহাও পড়িয়াছিলাম —

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

তবে হৃদয়ে বল রাখিয়া আচরণে সাহস দেখানো এক কথা, আর অর্থাভাবের মধ্যে পড়া অন্য কথা। অর্থাভাব বাস্তব, অনিবার্য ও সতত সম্মুখীন। শুধু মানসিক ভাব দিয়া উহার ফলকে ঠেকাইয়া রাখিবার উপায় নাই। সুতরাং সরকারি চাকুরি যাইবার পর দশ বৎসর মত কাল কষ্ট ও দুশ্চিন্তায় রহিলাম।

ফ্রেঞ্চ এম্বেসীর বেতনে অল্পসংস্থান হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য খরচের জন্য বিশেষ অসুবিধা হইল। দেশে একমাত্র বিদেশীর পরিচালিত পত্রিকায় লিখিয়া কিছু উপার্জন করিলাম, কিছু লন্ডনের 'টাইমস', আমেরিকার 'অ্যাটলান্টিক মান্থলি', ও আন্তর্জাতিক 'এনকাউন্টার'-এর মত পত্রে লিখিয়া। ইহাতে অতিপ্রয়োজনীয় কর্তব্যের জন্য অর্থ পাইলাম। কিন্তু কোনোদিকে সচ্ছলতা হইল না, দৈনন্দিন ভাবনা হইতেও নিষ্কৃতি পাইলাম না।

তাহার পর ১৯৫৬ সনে মধ্যমপুত্রকে শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাইয়া আরও অভাবে পড়িলাম। অথচ না পাঠাইবার উপায় ছিল না। আমার তিন পুত্রের কোনোটিকেই আমি স্কুলে দিই নাই ; নিজে, ও কোনো বিষয়ের জন্য 'প্রাইভেট টিউটর' (অন্তত দুইজন) রাখিয়া বাড়িতেই পড়াইয়াছি। দেশের সাধারণ স্কুলের উপর কোনও আস্থা আমার ছিল না এবং তথাকথিত 'পাবলিক' স্কুলেও পাঠাইতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, কারণ আমি তাহাদের 'ট্যাঁস-ফিরিঙ্গ' বানাইতে চাহি নাই, অথচ ডিগ্রি না-পাইলে উহাদের চাকুরি পাইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, বিশেষ করিয়া মধ্যমটির, কারণ সে আমাদের কালে যাহাকে 'আর্টস' বলিত ও এখন যাহাকে 'হিউম্যানিটিজ' বলে সেইদিকে ছিল। তাই তাহাকে ডিগ্রির জন্য বিলাত পাঠাইবার প্রয়োজন ছিল। কোনও বৃত্তি পাইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তাহাকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর নিজের খরচেই পড়াইয়াছিলাম। উহার টাকা কখনই সময়মত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সেজন্য তিন বৎসর জুড়িয়া 'টেলিগ্রাফিক ট্র্যান্সফারে' পাঠাইতে হইয়াছিল। সেও অতি কম খরচেই থাকিত, যদিও ভদ্র পরিবারে 'পেয়িং গেস্ট' হিসাবে।

গরীবের ঘোড়ারোগ প্রতিবেশীরা ক্ষমা করে না, আত্মীয়েরা তো আরও করে না। সুতরাং চারিদিক হইতে কটূক্তি কানে আসিতে লাগিল। আগে শুনিয়াছিলাম, 'খেতে পায় না, সিল্কের পর্দা টাঙায়', এখন শুনিলাম, 'বিলাতে ছেলে পাঠিয়ে ধোপাবাড়ি কাপড় দিতে পারে না, বাড়িতে সাবানে কাচে।' ইহার কারণ অবশ্য এই ছিল যে আমার স্ত্রী দৈনন্দিন কাপড় ছাড়িয়াও জলকাচা করিতেন না, হয় নিজে কিংবা চাকর-ঝি দিয়া সানলাইট-সোপে কাচিতেন, বা কাচাইতেন।

তবে এ-কথা মানিতেই হইবে যে, আমাদের দুজনের পরিধানের মধ্যে আগের মত সৌষ্ঠব ছিল না। আমি তখন আমার দ্বিতীয় বই লিখিতেছি, দেখিলাম স্ত্রীর শাড়ি এবং জামা দুই-ই ছেঁড়া। তাঁহার নিত্য-পরিধেয় বস্ত্র দুই-তিনখানায় দাঁড়াইয়াছে। আমি বলিলাম, 'আমি কিছুদিন লেখা স্থগিত রেখে কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখব, এ অবস্থা দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারিনে।' তিনি বলিলেন, 'কখনই না, তোমার বই শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে অন্য কাজ করতে দেব না।' তাঁহার কথা দুঃখের সঙ্গে মানিয়া লইয়া বইখানা শেষ করিলাম।

ইতিমধ্যে আমার বড় ছেলেও বি-এসসি পাশ করিয়া একটি চাকুরি লইল। আমার অবস্থা দেখিয়া সে এম-এসসি পড়িল না। ইহাতে কিছু সুরাহা হইল। তার পর ১৯৫৯ সনের প্রথমে আমার দ্বিতীয় বইটি বাহির হওয়াতে যেমন সুবিধা হইল, মেজ ছেলেও তেমনই অতিকৃতিত্বের সহিত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ অনার্স পাশ করাতে ডক্টরেটের জন্য বৃত্তি পাইল। সুতরাং তাহার শিক্ষার খরচ আর আমাকে বহন করিতে হইল না। আর্থিক চিন্তা হইতে খানিকটা মুক্তি পাওয়াতে আমি আমার তৃতীয় বই 'কন্টিনেন্ট অফ সার্সি' লিখিলাম। উহা ১৯৬৫ সনে প্রকাশিত হইল। উহার পর হইতেই আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল।

বলা বাহুল্য এই সময়ে বিলাত যাইবার কোনো কল্পনাও করি নাই, অবশ্য সম্ভবও ছিল না।

আর্থিক সাচ্ছল্য

এই সময় হইতেই দেশে আমার লেখা সম্বন্ধে বয়কটের'ও অবসান হইল। আমি ক্রমে ক্রমে একাধিক সাময়িকপত্রে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমেই 'স্টেট্সম্যানে'। ইহার সহিত আমার বহুদিনেরই সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ১৯৫৯ সনে একটা কারণে মনোমালিন্য হইয়াছিল, ইহার পর লেখা আর দিই নাই। ১৯৬৫ সন হইতে, তখনকার সম্পাদক মিঃ চার্লটন ঝগড়াটা মিটাইয়া দিবার পর, আমার প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল; ইহার জন্য পারিশ্রমিক মিঃ চার্লটন ক্রমশই বাড়াইতে লাগিলেন।

AMARBOI.COM

ইহার পর সমর সেন তাঁহার সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমাকে লিখিতে অনুরোধ করেন, আমিও কিছু দিন ধরিয়া তাঁহার জন্য লিখি। তিনি আমাকে যথাসম্ভব উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলেন।

তারপরে আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হইল। তাঁহারা আমাকে নিজেদের ইংরেজী দৈনিক 'Hindusthan Standard'-এ নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একটি করিয়া প্রবন্ধ— যাহাকে 'Column' বলা হয়— লিখিতে বলিলেন। ক্রমে ক্রমে যে পারিশ্রমিক দিলেন তাহা উচ্চ মাসিক বেতনের মত। তাঁহাদের সাপ্তাহিক পত্র 'দেশে'ও লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার জন্য আমি আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে বাধিত, বিশেষ করিয়া শ্রীমান অভীক সরকারের কাছে।

সর্বশেষে মিত্র অ্যান্ড ঘোষের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কের কথাও বলিতে হয়। গজেনবাবুই আমাকে আবার বাংলা লিখিতে উদ্যোগী করিলেন। প্রথমে তাঁহাদের মাসিকপত্র 'কথাসাহিত্যে' প্রবন্ধ লিখিলাম। ইহার পর তাঁহারা আমার প্রথম বাংলা বই 'বাঙালী জীবনে রমণী' ১৯৬৮ সনে প্রকাশ করিলেন।

এই সব মিলিয়া আমার আর্থিক অবস্থা ফিরিয়া গেল। ১৯৬৬ হইতে ফ্রেঞ্চ এম্বেসীর চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার জন্য কোনো অসুবিধা হইল না। ১৯৬৭ সন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে ১৯৭০ সনে বিলাত আসা পর্যন্ত আমার আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। সুতরাং বিলাতে আসিবার কথা উঠে নাই, কোনো আবশ্যক ছিল না।

তবে এই সূত্রে একটা কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। আমার পত্নী ও আমার মধ্যে এ-বিষয়ে অনেক দিন হইতেই কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছিল। আমার বৈষয়িক উন্নতি, লেখক হিসাবে সাফল্য, প্রতিষ্ঠা ও যশ, সর্বোপরি আমার জীবনের প্রকৃত সার্থকতার কথা আমার অপেক্ষা আমার পত্নীই বেশি চিন্তা করিতেন। ১৯৩২ সনে আমাদের বিবাহ হইবার তিন-চার বৎসর পর হইতেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'চলো, আমরা কলকাতা থেকে অন্য কোথাও চলে যাই। এখানে তোমাকে কেউ উঠতে দেবে না।' আমি উত্তর দিতাম, 'শোনো, অন্য প্রশ্ন যা-ই হোক, যেখানে উপার্জন সেখানে থাকতেই হবে। অন্যত্র কোথায় জীবিকা উপার্জন হবে?'

অবস্থাচক্রে, দৈবক্রমেই বলিতে পারি, ১৯৪২ সনে দিল্লী আসিবার সুযোগ হইল, অল-ইন্ডিয়া-রেডিও-তে ভাল চাকুরি পাইয়া। উহাতে ক্রমশ উন্নতি হইয়া উচ্চ-বেতনভোগী হইলাম। কিন্তু পত্নীর মনে আবার অসন্তোষ জন্মিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'দেশে থেকে তোমার আর কিছু হবে না।' ইহার পর যখন আমার লেখা প্রথম বিলাতে প্রকাশিত হইল— একটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় পর পর তিনটি, ১৯৪৬ সনের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯৪৭-এর জানুয়ারি মাসে—ও উহার বেশ প্রশংসা হইল। —তখন তিনি বলিলেন, 'চলো, আমরা বিলেত চলে যাই। আগে তুমি গিয়ে দেখ কিছু হয় কিনা, কিছু করতে পারলে পরে ছেলেদের নিয়ে আমি যাবো।' আমি বলিলাম, 'দেখ, এখানে আমি ভাল মাইনেতে আছি, আরো বেশ কিছুদিন থাকবো। ছেলেরা ছোট, তাদের শিক্ষা শেষ হতে অনেক দেরি। এ-অবস্থায় নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের মধ্যে যাওয়া কি সঙ্গত হবে?' কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তবে প্রতিবারেই তাঁহার যে সত্য ধারণা হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯৭০ পর্যন্ত কি অর্থোপার্জনের জন্য, কি প্রতিষ্ঠার জন্য বিলাতে আসার কোনো প্রয়োজন আমার ছিল না। তবু বিলাত আসিলাম। কিন্তু 'ইমেগ্রেন্ট' হইয়া আসি নাই।

॥ ৫ ॥

আমার বিলাতবাসের ইতিহাস

এতক্ষণ ধরিয়া এই কথাটাই বলিলাম যে, দেশ ছাড়িয়া বিলাতপ্রবাসী হইবার প্রলোভন ও সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও আমি দেশত্যাগী হই নাই, হইবার ইচ্ছাও করি নাই। এখন বলিব, তবু কি করিয়া আমার বিলাতবাস ঘটিল, এবং এ-ভাবেই ঘটিল যে, আমার আর দেশে ফিরিয়া আসা হইল না। আমি তেইশ বৎসর বিলাতবাসী, ১৯৭০ সনের জুন মাসে আসিয়াছিলাম। ১৯৯৩ সনের শেষে এই কাহিনী লিখিতেছি।

এই ব্যাপারটা অদৃষ্টলিপি সফল হওয়ার মত। ইহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে— 'ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনাঃ ইব।' বিলাতবাসী হওয়া সম্বন্ধে আমার পুরুষকার যতটুকু ছিল তাহা শুধু এইটুকু— আমার আত্মজীবনীটি লেখা। উহা হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বিলাত যাওয়া হইবে মনে করিয়া বইটি লিখি নাই, লিখিয়াছিলাম সম্পূর্ণ মানসিক প্রেরণায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, তবু একটিও বই লিখিতে পারি নাই, এই ব্যর্থতা আমাকে যন্ত্রণা দিতেছিল। ১৯৪৭ সনের ৪-৫ মে-র রাত্রিতে হঠাৎ আত্মজীবনী লিখিবার সংকল্প জাগিল। এইরূপ আকস্মিকভাবে বইটার উৎপত্তি হইল। ইহার ফলে অবশ্য দেশে আমার অপরিসীম লাঞ্ছনা হইল, দেশবাসীরা আমাকে দেশদ্রোহী বলিয়া প্রচার করিল, কিন্তু বইটির জন্যই বিশ্বের দ্বার আমার সম্মুখে খুলিয়া গেল।

আমি সর্বসুদ্ধ চারবার বিলাতে আসিয়াছি, ১৯৭০ সনে চতুর্থবার আসিবার পর আমি স্থায়ীভাবে বিলাতবাসী হইলাম। কিন্তু উহার সূত্রপাত হইয়াছিল আগে তিনবার বিলাতে আসিয়া। চারিটি বারই অপ্রত্যাশিতভাবে বিলাতযাত্রা করিয়াছি। একে একে সব যাত্রারই পরিচয় দিব।

॥ ৬ ॥

প্রথমবার বিলাতযাত্রা— ১৯৫৫ সন

প্রতিবারই বিলাতযাত্রা স্থির হইবার দশ মিনিট পূর্বেও উহা হইবে জানি নাই। কি-ভাবে ঘটিল তাহার কাহিনী বলি।

১৯৫৫ সনের প্রথমদিকে হেগ এম্বেসী হইতে বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, দিল্লীর বি-বি-সি আপিস হইতে টেলিফোন আসিয়াছে বি-বি-সি-র প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করিবার জন্য। পরদিন গেলে তিনি জানাইলেন যে, বি-বি-সি-র হেড-অফিস জানাইয়াছে যে, তাহারা আমাকে বিলাতে আনিয়া বিলাতের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখাইতে চায়। ইহার জন্য যাওয়া-আসা ও থাকার সমস্ত ব্যয় বি-বি-সি ও ব্রিটিশ কাউন্সিল বহন করিবে। আমাকে কেবলমাত্র চারিটি 'talk' দিতে হইবে, প্রতিটি ৪০ মিনিটের ; ইহার জন্য বি-বি-সি আমাকে খরচবহন করা ছাড়া দুই শত পাউন্ড পারিশ্রমিক দিবে। আমি খুশি হইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম ও ১৯৫৫ মার্চ মাসের শেষে এরোপ্লেনে বিলাতযাত্রা করিলাম। এই আমার প্রথম বিলাতে আসা— ৫৭ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পর। আমি পাঁচ সপ্তাহ বিলাত ছিলাম। Talkগুলি দেশে ফিরিয়া পাঠাইলাম। উহা ১৯৫৬ সনে ব্রডকাস্ট হইল। ইহা হইতে আমার দ্বিতীয় বই 'A Passage to England'-ও লেখা হইল।

॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা—১৯৬৭ সন

১৯৬৬ সনের শেষের দিকে আলফ্রেড ডাফ-কুপারের (ভাইকাউন্ট নরিজের) পুত্র লর্ড নরিজের কাছ হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম যে, আমাকে ডাফ-কুপার মেমোরিয়াল সাহিত্যিক পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। পরে ইহাও জানানো হইল যে, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যয়ে আমাকে বিলাত নিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। আমি মার্চ মাসে আসিয়া এপ্রিল মাসে ফিরিয়া গেলাম। পুরস্কারটি দেওয়া হইয়াছিল আমার 'The Continent of Circe' বইটির জন্য। চ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাস্ উহার প্রকাশক। উহার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাপ হইল। তাঁহারা আমার খুবই আপ্যায়ন করিলেন।

॥ ৮ ॥

তৃতীয়বার বিলাতযাত্রা—১৯৬৮ সন

ইহার পর আবার বিলাত যাওয়া হইবে ভাবি নাই। কিন্তু ১৯৬৭ সনের শেষের দিকে খ্যাতনামা লেখক, কর্নেল ভ্যান ডার পোষ্ট দিল্লীতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন ও চ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাসের পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ও ভারতপ্রেমিক অধ্যাপক ফ্রিড্রিশ ম্যাক্সমূলারের (ভারতবর্ষে ভট্ট মোক্ষমূলর বলিয়া খ্যাত) পৌত্রেরা তাঁহাদের পিতামহের একটি নূতন জীবনী প্রকাশ করিতে চান, চ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাস উহাতে রাজী হইয়াছেন ও জীবনীকার হিসাবে আমার নাম স্থির করিয়াছেন, যদি আমি সম্মত হই। ইহাও জানিলাম, এইবার আমাকে সপত্নীক বিলাত নেওয়া হইবে ও ছয়মাস চ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাসের ব্যয়ে বিলাত থাকার ব্যবস্থা হইবে। আমি ইহাতে সম্মত হইয়া মে মাসে সপত্নীক বিলাতে গেলাম। আমার স্ত্রীও এইবার বিলাতফেরত হইলেন।

ম্যাক্সমূলারের জীবন সংক্রান্ত সব কাগজপত্র— অধিকাংশই হস্তলিখিত— অক্সফোর্ডের বডলীয়ান লাইব্রেরিতে দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং আমি ছয়মাস অক্সফোর্ডেই বাস করিলাম। ইহাতেই আমাদের অক্সফোর্ডের সহিত যোগ হইল। পড়াশোনা যথাসম্ভব করিয়া নভেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া গেলাম। কথা রহিল আমি দেশেই বইখানা লিখিব ও সেখান হইতে পাঠাইব।

AMARBOI.COM

॥ ৯ ॥

চতুর্থবার বিলাতযাত্রা—১৯৭০ সন

কিন্তু বুঝিলাম, দেশে থাকিয়া এই জীবনী লেখা অত্যন্ত দুরূহ এবং কোনোক্রমে লিখিতে পারিলেও উহা উচ্চাঙ্গের জীবনী হইবে না। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু বিশেষ কিছু লেখা হইল না। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না। এমন সময়ে ১৯৬৯ সনের শেষের দিকে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল।

তখন দিল্লীতে 'টাইম্‌স' পত্রিকার প্রতিনিধি আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ওয়াইডেনফেল্‌ড অ্যান্ড নিকলসন কোম্পানির অধ্যক্ষ স্যর জর্জ ওয়াইডেনফেল্‌ড দিল্লী আসিয়াছেন ও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। আমি ওব্রই ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে গেলাম। দেখা হইবামাত্র স্যর জর্জ বলিলেন যে, তাঁহারা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একখানা বই প্রকাশিত করিতে চাহেন, আমি সেই বই লিখিব কিনা ; যদি রাজী হই আমাকে সস্ত্রীক বিলাতে লইয়া যাইবেন ও ছয়মাস বিলাতে থাকিবার খরচ বহন করিবেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ইহাকেই বলে 'বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া'।

'কন্টিনেন্ট অফ সার্সি' লিখিবার পর হইতেই আমার সংকল্প ছিল, ইহার পর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একখানা বই লিখিব। সুযোগ জুটিয়া গেল। কিন্তু শুধু তাহাই নয়, ম্যাক্সমূলারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনীও উপযুক্তভাবে লিখিবার উপায় হইল। আমি জুন মাসে ছয়মাসের জন্য সস্ত্রীক বিলাতে আসিলাম ও অক্স্‌ফোর্ডে থাকাই স্থির করিলাম। আমার স্ত্রীর অক্স্‌ফোর্ড এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি লন্ডনে থাকিতে রাজী হইলেন না। সেই থাকাই চিরস্থায়ী হইয়া গেল। কি করিয়া হইল এখন বলি।

বোধ করি এই কাহিনী হইতেই সকলে জানিবেন যে, আমার বিলাতবাস ইচ্ছাকৃত নয়, দেশবাসীরাও উৎপীড়ন করিয়া আমাকে দেশছাড়া করিতে পারে নাই।

॥ ১০ ॥

বিলাতবাস কি করিয়া স্থায়ী হইল

ওয়াইডেনফেল্‌ড অ্যান্ড নিকলসন কোম্পানি হইতে যে-টাকা পাইয়াছিলাম তাহা হইতে আমাদের দুইজনের এরোপ্লেনে বিলাতে আসার ও দেশে ফিরিবার ভাড়া দিবার পর যাহা হাতে রহিল উহা হইতে ছয় মাস বিলাতবাস চলিত। তাহা ১৯৭০ সনের শেষের দিকে—প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, অথচ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বই দূরে থাকুক, ম্যাক্‌স্‌মূলারের জীবনীও শেষ করিতে পারিলাম না। কি উপায় হইবে ভাবিতেছি, এমন সময়ে আমার জীবনে বার বার সঙ্কটের সময়ে যাহা হইয়াছিল সেইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধারের উপায় দেখা দিল।

এই বৎসরের শেষের দিকে অক্স্‌ফোর্ডের উরস্টার কলেজের অধ্যাপক ও ডীন, মিঃ হ্যারি পিট্‌, সান্ধ্যভোজনের জন্য আমাদের দুজনকে তাঁহার ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে অন্যাদের সঙ্গে ব্যারী অ্যান্ড জেঙ্কিন্‌স্‌ কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ছিলেন। এই কোম্পানি সুপ্রতিষ্ঠিত পুস্তক-প্রকাশক। ডিরেক্টরটির নাম ক্রিস্টফার ম্যাক্‌লেহোস। তিনি যুবক। খাওয়া-দাওয়া হইবার পর তিনি আমার পত্নীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা ক্লাইভের জীবনী বার করবার কথা ভাবছি, মিঃ চৌধুরী কি লিখবেন?' স্ত্রী উত্তর দিলেন, 'ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না।' আমি শুনিয়া ঔৎসুক্য দেখাইতে তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি এ-বিষয়ে ওঁর কাছে চিঠি লিখব।'

সেই চিঠি আসিল। অনেকদিন হইতেই আমার ধারণা জন্মিয়াছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয় নাই, রাজনৈতিক মতভেদের জন্য এই ইতিহাস নিরপেক্ষ হয় নাই, একদিকে বা অন্যদিকে ওকালতির মত হইয়াছিল। আমি ভাবিতাম, এ-বিষয়ে একটা সত্য ইতিহাস-পুস্তক লিখিলে কেমন হয়? ক্লাইভই ব্রিটিশশাসনের প্রবর্তক, সুতরাং তাঁহার জীবনী লিখিলে সেই ইতিহাসই লেখা হইবে। তাই মিঃ ম্যাক্‌লেহোসের প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেলাম। এই কোম্পানির অন্য কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল যে, আমাকে অগ্রিম কিছু টাকা দেওয়া হইবে। যাহা দিতে কোম্পানি প্রস্তুত হইল তাহাতে আমার এক বৎসর বিলাত থাকার খরচ চলিবে। এইভাবে উপস্থিত আর্থিক সমস্যার সমাধান হইল।

এইখানে এরূপ উপায়ে আমার টাকা পাওয়া সম্বন্ধে একটা কথা বলা উচিত। আমি স্যর জর্জ ওয়াইডেনফেল্‌ড ও ব্যারী অ্যান্ড জেঙ্কিন্‌স্‌ হইতে যে-ভাবে টাকা লইলাম উহা আমাদের দেশের দরিদ্র চাষী, তাঁতি, বা অন্য শিল্পকারদের দাদন লওয়ার মত। উহাদের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবসার জন্য দূরে থাকুক, সংসার চালাইবার মতও পুঁজিপাটা থাকিত না। তাই তাহারা জীবিকার জন্য এবং চুক্তির কাজ করিবার জন্য খরিদ্দারের কাছ হইতে অগ্রিম টাকা লইত। কিন্তু একজনের কাজ কিছুতেই সময়মত শেষ করিতে পারিত না, তাই আর একজনের কাছ হইতে নূতন দাদন লইয়া পুরাতন কাজ শেষ করিত। আমার অবস্থাও তাহাই হইল, তৃতীয়বার দাদন লইলাম, প্রথম দাদনের কাজ অর্থাৎ ম্যাক্‌স্‌মূলারের জীবনী শেষ করিবার জন্য। কাজটা ভাল কি মন্দ বিচার করিয়া লাভ নাই। বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্। তবে শেষ পর্যন্ত কাহাকেও ফাঁকি দিই নাই। দেরি হইলেও তিনটি বই-ই লিখিয়াছি ও প্রকাশককে দিয়াছি। তবে যতদিন না দিতে পারিলাম ততদিন শোধ-না-করা দাদন তিনটি গলার ফাঁস হইয়া রহিল।

প্রকাশকেরা এইভাবে টাকা দিয়া বদান্যতা দেখাইয়াছেন। কয়জন প্রকাশক বই-এর একটি ছত্রও না দেখিয়া লেখককে টাকা দেয়? লেখক হিসাবে আমার উপর আস্থা ছিল বলিয়াই তাঁহারা আমাকে এত টাকা দিয়াছিলেন। আমি একদিন আমার এক প্রকাশককে তাঁহাদের উদারতার কথা বলিয়াছিলাম। তিনি উদারতা না মানিয়া শুধু বলিলেন, 'We take an enlightened view of self-interest.' Enlightened কথাটা খুবই প্রণিধানযোগ্য। আমি বুঝিলাম, 'বিশুদ্ধ' স্বার্থপরতা এক, আর 'ভেজাল', enlightened স্বার্থপরতা আর এক। আমি যে-সব প্রকাশকের জন্য কাজ করিয়াছি তাঁহারা সকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বার্থপরায়ণ। ইহা আমার সৌভাগ্য।

এইভাবে পর পর দাদন লইয়া তিনটি বই-ই লিখিলাম; ম্যাক্‌স্‌মূলারের জীবনী প্রকাশিত হইল ১৯৭৪ সনে, ক্লাইভ ১৯৭৫-এ, ও হিন্দুধর্ম ১৯৭৯-এর প্রথম দিকে। ঋণ শোধ হইল, কর্তব্যপালন হইল, অর্থও শেষ। সুতরাং দেশে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই সব অগ্রিম টাকা ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠান হইতেও টাকা পাইয়াছিলাম, বেশ কিছু উপার্জনও করিয়াছিলাম। প্রথমেই আমন্ত্রণ পাইলাম শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, চারিটি বক্তৃতা করিবার জন্য। বক্তৃতা দিলাম, ও যতদিন ছিলাম সস্ত্রীক মিশিগান হ্রদের পারে একটি হোটেলে থাকিয়া একদিকে অভ্রংলিহ স্কাইস্ক্রেপার ও অন্যদিকে আমেরিকার এই অঞ্চলের জলরাশির বিস্তারও দেখিতাম।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ছয় হাজার ডলার দিলেন; ইহা হইতে যাতায়াতের ব্যয়, থাকিবার ব্যয়, কিছু সখের জিনিস কিনিবার ব্যয় করিয়াও বেশ কিছু বাঁচাইয়া অক্‌স্‌ফোর্ডে ফিরিলাম। এই সূত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের আচরণের কথা বলি। বৎসর কয়েক আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে প্রবর্তিত কতকগুলি 'লেকচার' দিবার জন্য আমাকে নির্বাচন করিলেন। রেজিস্ট্রার মহাশয় পারিতোষিকের পরিমাণ জানাইলেন— সেটা এত সামান্য যে উল্লেখ করিবার মত নয়; যাতায়াতের খরচের কথা উত্থাপনও করিলেন না; তবে বলিলেন, বক্তৃতাগুলি তাঁহাদের আগেই পাঠাইতে হইবে, যদি গ্রহণযোগ্য বলিয়া অনুমোদিত হয় তবেই আমি যাইতে আমন্ত্রিত হইব ও পারিতোষিক পাইব। আমি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় যে অগ্রিম দিয়াছিল এবং বক্তৃতার একটি পৃষ্ঠাও দেখিতে চাহে নাই শুধু এই কথা জানাইয়া রেজিস্ট্রার মহাশয়কে জানাইলাম।

ইহার পরে আর একটা সৌভাগ্যও হইল। আমি অস্টিনে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসের জন্য প্রফেসর পদে নিযুক্ত হইলাম। সেখানেও সস্ত্রীক বাস করিলাম। বেতন বেশ উচ্চ ছিল, রাজার হালে থাকিয়া কিছু টাকা লইয়া আবার অক্‌স্‌ফোর্ডে আসিলাম।

আবার বেরালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়িল। ১৯৭৬ সনের শেষে কানাডার এগারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ পাইলাম। তখন আমেরিকার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। এই সব বক্তৃতা উপলক্ষ্যে মন্ট্রিয়াল হইতে ভ্যাঙ্কুভার পর্যন্ত ভ্রমণ করিবার এবং নায়াগারা প্রপাতের অপূর্ব দৃশ্য দেখিবারও সুযোগ ঘটিল। তবে এইবার আমি একাকী।

এই সব উপার্জন ছাড়া বিলাতের অন্য প্রতিষ্ঠান ও ফান্ড হইতেও অর্থ পাইয়াছিলাম। দুইজন বন্ধুও ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যোগ করিলে এই সব প্রাপ্তি এবং উপার্জন এত যে, ধনবান হইয়া দেশে ফিরিয়া কলিকাতায় বাদার দিকে বাড়ি করিবার কথা। কিন্তু নীরদচন্দ্রের যেমন অবস্থা প্রায় তেমনই রহিল, অর্থসমস্যা ঘুচিল না। ইহার কারণ মদ-মেয়েমানুষ নহে, বিদেশে ভদ্রভাবে থাকার ব্যয়। আমি কখনও বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি নাই ; এমন কি কোনো জায়গায় বাঙালী আছেন শুনিয়া তাঁহার বাড়িও চড়াও করি নাই, প্রতিদিন বাঙালীর অভ্যাসমত স্নানের টব ভরিয়া গৃহস্বামীকে গরমজলের খরচে ফেলি নাই। আমি নিজের ব্যয়ে হোটেলে কিংবা বাড়ি ভাড়া করিয়া এ-ভাবে বাস করিয়াছি যে, যাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মানসম্ভ্রম নষ্ট হয় নাই। সুতরাং আমার কাজ করিবার উপায় না মিলিলে বলিতে পারিতাম— 'রন্ধনের চাল চর্বণে গেল।' সকলের শেষে একটা কথা বলিব। এইভাবে যে বিলাতে ও অন্যত্র যাইবার আমন্ত্রণ পাইলাম, অর্থলাভও হইল, উহার একটির জন্যও আমি নিজে অনুরোধ করি নাই, দরখাস্ত করা তো দূরের কথা। বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীরাই আমাকে হাত পাতিবার গ্লানি হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

AMARBOI.COM

কিন্তু ১৯৭৯ সনে যখন দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়াছি তখন আর একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিল। লন্ডনে 'কমনওয়েলথ লিটারেচারের' একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল, উহা উন্মোচন করিয়া একটি বক্তৃতা করিবার অনুরোধ আসিল। সেই সভায় সস্ত্রীক গিয়া দেখিলাম, সেখানে ক্রিস্টফার ম্যাক্‌লেহোসও উপস্থিত। তিনি তখন চ্যাটোর (অর্থাৎ আমার প্রকাশকের) ডিরেক্টর। বক্তৃতার পর পত্নীর সহিত গল্প করিতে করিতে জানিতে চাহিলেন, এখন আমাদের কি করিবার ইচ্ছা। পত্নী বলিলেন, 'দেশে ফিরে যাচ্ছি।' প্রশ্ন হইল, 'কেন ?' স্ত্রী বলিলেন, 'কেন কি। এদেশে থাকবার উপায় নেই।' তখনই ম্যাক্‌লেহোস বলিলেন, 'মিঃ চৌধুরী তো তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় ভাগ লিখতে চান, আমি কাল কন্ট্র্যাক্ট এবং চেক নিয়ে অক্‌স্‌ফোর্ডে আসব কি ?' আসিলেন, চুক্তিপত্র সইও হইল, পূর্বের মত অগ্রিম টাকারও ব্যবস্থা হইল।

তবে একটা প্রশ্নও উঠিল। যে-ভার গ্রহণ করিলাম উহা সময় ও পরিশ্রমের ব্যাপার। মনে রাখিতে হইবে, অবশেষে যে-বইখানি ছাপা হইল উহা বড় পৃষ্ঠায় (ডিমাই-এ) ১০০৭ পৃষ্ঠার। অগ্রিমে থাকার খরচ হইবে না। আপাতত উপায় দেখিলাম না। কিন্তু মিঃ মিকবারের মত 'In case anything turned up' এই কথা বলিয়া থাকাই স্থির করিলাম।

আশ্চর্যের কথা— Something did turn up; তাহাও আবার অন্য কাহারও পক্ষে ডার্বি জেতা যাহা, আমার পক্ষে তাহাই হইল। ইহা হইতেই এর আগে বিলাতবাস সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের যে-ধারণা ছিল তাহা একেবারে বদলাইতে হইল। এ-পর্যন্ত বিলাতে চিরস্থায়ী হইবার কল্পনাও করি নাই, বলিয়াছি আমার স্থান আমার দেশে, বিলাতে নয়। কিন্তু ব্যাপার এমনই ঘটিল যে, বিলাতের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গেলাম।

১৯৮০ সনের শেষে এই দেশের আইন অনুযায়ী আমি পেনশন পাইবার অধিকারী হইলাম ও বিবাহিত ব্যক্তির 'যুগলে' থাকিবার জন্য যাহা নির্ধারিত সেই অর্থ মৃত্যু পর্যন্ত পাইবার ব্যবস্থা হইল। ইহাও বন্ধুদের উদ্যোগেই হইল। আর কেওড়াতলা বা নিমতলাঘাটে যাইবার পথ খোলা রহিল না, অক্স্‌ফোর্ড ক্রেমেটোরিয়ামেই ভস্মীভূত হইতে হইবে।

এই সমস্ত ব্যাপারটাকে অদৃষ্টলিপি সফল হওয়া ভিন্ন কি বলা যায়? আমার শুধু একটিমাত্র কৃতিত্ব আছে। শিকারী কুকুরের দল আসিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান শেয়াল বলিয়াছিল যে, কুকুরের হাত হইতে এড়াইবার জন্য তাহার একশত কৌশল জানা আছে; কিন্তু মোরগ বলিয়াছিল, 'ভাই, আমার শুধু একটি উপায় জানা, গাছের ডালে ওঠা।' আমিও আমার বাঙালী ভাইদের বলিব, 'তোমরা তোমাদের শত কৌশল লইয়া নিরাপদে থাক, আমি স্বল্পবুদ্ধি প্রাণী—একটি কৌশলমাত্র জানি— লেখা।'

কিন্তু ইহাও জোর করিয়া বলিব— লেখা হইতে আমার অর্থোপার্জন হইয়াছে বটে, তবু আমি সারাজীবনে কখনও অর্থের জন্য লিখি নাই, যাহা লেখা উচিত মনে করিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি। আমি সর্বদাই বিশ্বাস করিয়াছি, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ; পরধর্মো ভয়াবহঃ', এবং 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'।

কিন্তু অধিকার না থাকিলেও ফল পাইয়াছি। যাঁহারা আমাকে কর্মের ফল দিবার অধিকারী তাঁহারা আমাকে ফলভোগী করিয়াছেন। আমি যাহা করিতে পারি তাহার যতটুকু মূল্য আছে তাহা আমি পাইয়াছি এবং ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি যে স্ত্রী-পুত্র লইয়া উপবাসী মরি নাই, তীব্র শত্রুতার সম্মুখীন হইয়াও মরি নাই, তাহা হইতে ইহাও জানিয়াছি, মানুষ যদি মানুষ থাকে তাহা হইলে তাহারা নমস্য। অর্থগৃধ্নুতায় নীচ না হইলে কেহই অনুদার হয় না, ও ঈর্ষ্যায় জর্জরিত না হইলে কেহই নিষ্ঠুর হয় না। দরিদ্রেরাই এই বাণী মানিয়া লইয়াছে যে, 'দরিদ্রাণ্ ভর, কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।' আমি সারাজীবন ধরিয়াই এই সত্যের পরিচয় পাইলাম।

আমি কি-ভাবে বিলাতবাসী হইলাম তাহার জবাবদিহি করিলাম। এখন বিলাতে থাকিয়া আমার কি লাভ হইয়াছে এবং বিলাতে না থাকিলে আমার কি হইত না তাহার কথা বলি।

॥ ১১ ॥

বিলাতবাসে প্রথম লাভ : স্ত্রী-পুরুষে বাঁচিয়া আছি

তেইশ বৎসর বিলাতে থাকিয়া সর্বোপরি আমার যে লাভ হইয়াছে উহা উচ্চস্তরের ব্যাপার না হইলেও আমার অন্য সব লাভের মূলে— আমি বাঁচিয়া আছি, মরি নাই। দেশে থাকিলে অনেক আগেই বিগত হইতাম। আমি প্রায় জন্ম হইতে চিররুগ্ন এবং ক্ষীণকায়। আমার দৈহিক শক্তি সর্বদাই সামান্য রহিয়াছে। ১৯৭০ সনে বিলাত আসার পূর্ব পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায়ই রোগে ভুগিয়াছি। উহা মারাত্মক না হইলেও আমাকে দুর্বল করিয়াছে। ইহার উপর মাঝে মাঝে শরীরের এক জায়গায় বা অন্য জায়গায় যন্ত্রণা হইত। এদেশে আসিবার পরে এই সব উপসর্গ একেবারে দূর হইল, কিছু জলবায়ুর জন্য, কিছু শীতলতায় ও কিছু খাদ্যে। সেদিন পর্যন্তও প্রত্যহ চার-পাঁচ মাইল হাঁটিয়া বেড়াইয়াছি, কোনো ক্লান্তি অনুভব করি নাই। এখন বয়স অনেক বেশি হইয়াছে, আর ততটা দৈহিক শ্রম করিতে পারি না। বিশেষ করিয়া বয়সোচিত অবনতিতে চোখে ছানি পড়িয়া একচোখে দেখিতে পারি না, অন্য চোখেও কষ্ট করিয়া পড়ি ও লিখি। এইটুকু বলিতে পারি একেবারে অথর্ব হইয়া পড়ি নাই।

সর্বাপেক্ষা কামনীয় বলিয়া যেটা মনে করি তাহা এই যে, ক্ষীণদেহ হইলেও ক্ষীণবুদ্ধি বা ক্ষীণপ্রাণ হই নাই। এই লেখা হইতেই হয়ত সকলে উহা মনে করিবেন। দেশে থাকিতেও আমার প্রাণশক্তি হারাই নাই, তবে উহা অটুট রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইত। তাহা সত্ত্বেও ১৯৬৯ সনে যখন আমার বাহাত্তর পূর্ণ হইয়াছে, তখনও আমাকে বাহাত্তুরেতে ধরে নাই, ভীমরতি তো হয়ই নাই।

সেই সময়ে একটি মহিলা আমার বয়সের অনুচিত চাপল্য দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আপনার বয়স যত বাড়ছে, নষ্টামি-দুষ্টামিও ততই বাড়ছে।' এখন সাতানব্বুই চলিয়াছে, কম হওয়া দূরে থাকুক, সেই চাপল্য আরও বাড়িয়াছে। একেই বলে, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'— তবে মাইকেলের অর্থে নয়।

অক্স্‌ফোর্ডে আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যুবতীরা আসিলেও ভগীর মেয়ে পঞ্চীর মত বলেন না— 'ও মা, এ বুড়ো মিন্‌সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি ? ও মা, ছিঃ ! ছিঃ ! ও কি গো, এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ? মর্।' কিন্তু হয়ত পুঁটির মত মনে মনে বলেন, 'কত্তা আজ বাদে কাল শিঙে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা ! ছাইতে কি আগুন এতকালও থাকে, গা ?'

ছাইতে যতটুকু আগুন এখনও আছে তার জোরে এখনও তিন-চারটা বাংলা ও ইংরেজী বই লিখিবার সঙ্কল্প রাখি। সেদিনও টাইপ-করা (নিজের হাতে) একটি ৮২ পৃষ্ঠার ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া এক সম্পাদকের কাছে পাঠাইয়াছি। ইহাই আমার পক্ষে বিলাতবাসের ফল। আর কি আশা করা যায় !

এখন পত্নীর কথা বলি। তাঁহার বেলাতেও কম সৌভাগ্য হয় নাই। তিনি এখন চুরাশি বৎসর বয়স্কা। পূর্বে স্বাস্থ্যবতীই ছিলেন, দশ বৎসর পূর্ব পর্যন্তও অত্যন্ত কর্মক্ষমা ছিলেন। কিন্তু ইহার পর প্রথমে তাঁহার আরথ্রাইটিস হয়, ইহাতে চলাফেরা, সিঁড়িতে ওঠা-নামার অসুবিধা হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর হইল ইহা আরও বাড়িয়াছে। তাহার পর ১৯৮৬ সনের শেষে একটা গুরুতর 'হার্ট-অ্যাটাক' হয়, ইহার পরেও আর একবার হয়। তাহার পর একটা বড় অপারেশন হয়।

দেশে হয়ত চিকিৎসা হইত। কিন্তু উহা এত ব্যয়সাধ্য হইত যে, আমার আর্থিক সামর্থ্যে কুলাইত না। এখানে চিকিৎসার কি সুবিধা হইল বলি। ১৯৮৬ সনে তিনি অন্য একটি পরীক্ষার জন্য এখানকার বিখ্যাত হাসপাতাল জন র‍্যাডক্লিফে গিয়াছিলেন। হঠাৎ রাত্রি নয়টার সময় বুকে ব্যথা অনুভব করিলেন। বোতাম টিপিবামাত্র হাসপাতালের সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদরোগের চিকিৎসক, অন্যান্য চিকিৎসক ও নার্স প্রায় সাত-আট জন ছুটিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসিল। তিনি বাঁচিলেন। বাড়িতে থাকিলে আমি টেরও পাইতাম না, কারণ আমি দোতলায় দূরে শোবার ঘরে এই সময়ে থাকি, তিনি থাকিতেন নীচে বসিবার ঘরে এবং দশটার পরে শুইতে যাইতেন। দুর্ঘটনাও আমি পরদিন সকালের আগে দেখিতে পাইতাম না।

পরের চিকিৎসাও রোগ দেখা দিবামাত্র হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ইহার জন্য আমার কোনো খরচ হয় নাই, দেশের যাঁহারা শুনিয়াছেন, সকলেই বলিয়াছেন— এইভাবে হাসপাতালে অথবা নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাইতে গেলে দেশে দুই-তিন লক্ষ টাকা বর্তমানে লাগিত। আমি কোথায় পাইতাম ?

কিন্তু হৃদরোগের কথা বলা যায় না, সর্বদাই ডাক্তারের পরীক্ষা আবশ্যক হয়, নিয়মিত শুশ্রূষার আবশ্যক হয়, ঔষধপত্রের আবশ্যক হয়। ১৯৮৬ সন হইতে গৃহচিকিৎসক (G.P) প্রথমে প্রতি সপ্তাহেই, এখন পনেরো দিন পর, কখনও মাসে একবার আসেন। কোনোদিন অসুস্থবোধ করিলে অবশ্য ডাকামাত্র আসেন। তিনি নিয়মিত পরীক্ষা করেন, ঔষধের প্রেসক্রিপশন দেন। পত্নীকে প্রতিদিন নানা রকমের ট্যাবলেট খাইতে হয়। এই সব বিনামূল্যে পাই। শুনিয়াছি, সবগুলিই অত্যন্ত দামী।

ইহার উপরে 'হোম-কেয়ার' হইতে প্রতিদিন সকালে একটি মেম শুশ্রূষাকারিণী আসিয়া নিত্যকর্ম করিয়া দিয়া যায়। এইভাবে যত্নের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়া এবং চলাফেরার ব্যাপারে আংশিকভাবে অক্ষম হইলেও আমার খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির চিন্তা ও ব্যবস্থা তিনিই করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়াই আমি কর্মক্ষম আছি, ইহা ছাড়াও আমি যতটুকু ভোগাসক্ত ততটুকু ভোগের সুখও পাইতেছি।

সর্বোপরি স্বামীর সেবা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, নিজে বই লিখিতেছেন— ইংরেজীতে একটি রান্নার বই প্রকাশিত করিয়াছেন, বাংলাতে নিজের আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডও প্রকাশিত করিয়াছেন— উহার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে। এই সব দেশে থাকিলে নিশ্চয়ই হইত না।

॥ ১২ ॥

বিলাতে থাকিয়া দ্বিতীয় লাভ : সুষ্ঠুভাবে গৃহস্থালি চালানো

ঘরকন্নার কাজে বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম বা ত্রুটি আমার স্ত্রী কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি কখনই গতরশোঁকা ছিলেন না। বিবাহের পরেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এখন বৃদ্ধা হইয়াও চিরকালের স্বভাব ছাড়েন নাই। কোনও বাঙালী মহিলা তাঁহাকে বলেন, 'এই বয়সেও আপনি ঘরের কাজ করেন কেন ? শুয়ে থেকে বউ-এর সেবা খাবেন।' আমরা বিবাহিত পুত্রের পিতামাতার সঙ্গে থাকিবার একান্ত বিরোধী। তাই না দিল্লীতে, না বিলাতে পুত্রদের সঙ্গে থাকি নাই, নিজেদের সংসার নিজেরাই চালাইয়াছি।

কিন্তু বিনা-ঝামেলায় সংসার চালানো সহজ নয়। দেশেই হোক বা বিলাতেই হোক, যে-বাড়িতে চাকর-ঝি থাকিত তাহাতে গৃহিণী ও ঝি-র মধ্যে বচসা অবিরত চলিত। আমাদের গৃহস্থালিতে তাহা নাই। অথচ গৃহকর্মের জন্য আমাদের লোক আছে। আমরা মাহিনা দিয়া 'হাউস-কীপারে'র মত একটি মেম রাখিয়াছি ; অন্য কয়েকটি মেম সরকারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠান হইতে আসে, তাহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে আমাদের অতি সামান্যই দিতে হয়।

ইহারা বাড়ি পরিষ্কার করে, 'হুভার' করে, বস্ত্রাদি ধুইয়া আনে ও ইস্ত্রি করে, আংশিকভাবে বাজার করে। আমি যে এখানে বাড়িতে ধুতি পরিয়া থাকি ও পত্নী যে সুতি শাড়ি পরিয়া থাকেন, তাহা এইরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন সম্ভব হইত না। মেয়েরাই লন্ড্রিতে লইয়া গিয়া ধুইয়া-শুকাইয়া আনে, ও পরে বাড়িতে ইস্ত্রি করে। আমি আগে নিজের হাতে বাগানের কাজ করিতাম, দৃষ্টি ক্ষীণ হওয়ার পর আর পারি না। একটি মহিলা আসিয়া শ্রমসাধ্য কাজ করিয়া দেন। ইনি উচ্চ-শিক্ষিতা, বাগান ও গাছপালা সম্বন্ধে জানেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছুই বলিয়া দিতে হয় না। আর একটা কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইবেন। সন্ধ্যার সময়ে পত্নীকে আমিই খাবার প্রস্তুত করিয়া দিতাম, কারণ সেই সময়ের জন্য কোনো লোক পাওয়া সম্ভব ছিল না। তিনিও বিকালের দিক হইতে আর একতলায় নামিতে পারেন না।

এই অসুবিধার কথা জানিয়া আমাদের এক ইংরেজ প্রতিবেশিনী একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বাড়ির কাছেই একটি উচ্চশ্রেণীর স্কুল আছে— ইন্টারন্যাশনাল বাকালরেয়ার জন্য। ইহাতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ হইতেই পনেরো বছর হইতে সতেরো বছর পর্যন্ত বয়সের তরুণ-তরুণী আসে। ইহারা সকলেই ধনী পরিবারের ছেলে-মেয়ে, কারণ এই স্কুলে পড়ানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এই ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুক্ষণের জন্য লোকসেবা প্রতিদিন করিতে হয়। প্রতিবেশিনী আমাদের অসুবিধার কথা জানাইবা মাত্র স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল আমাদের কাজের জন্য প্রতি সন্ধ্যায় একটি মেয়েকে পাঠাইবার নির্দেশ দেন। তখন হইতে প্রতিদিন একটি করিয়া ছাত্রী আসিতে লাগিল ; উহাদের একজন ব্রেজিল হইতে, একজন ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে, একজন জার্মানী হইতে ও আর দুইজন জাপান হইতে। ইহারা সকলেই অতি সম্পন্ন ঘরের মেয়ে। শুধু একটির কথা বলিব। এটি, জাপানের বিখ্যাত মিৎসুবিসির যিনি বার্লিনে প্রতিনিধি তাঁহার কন্যা। কোন্ ধনী বাঙালীর মেয়ে এইভাবে আসিয়া একজন অসমর্থ বৃদ্ধার সেবা করিবে ? অথচ ইহারা যে কেবল বাধ্য হইয়া আসে তাহা নয়। ইহাদের অনেকেই আমার স্ত্রীকে বলিয়াছে যে, তাহারা আমাদের প্রয়োজনীয় যে-কোনো বাহিরের কাজ সানন্দে করিয়া দিবে। ইহার কোনো নিয়ম নাই।

বাজার-সওদার জন্য অতিরিক্ত লোকও পাই, অতিসামান্য পারিশ্রমিকে। তাহা ছাড়া, কলিকাতার বা দিল্লীর মত (যাহা এখানের রেওয়াজ নয়) আমাদের মাসকাবারির জিনিস আসে। আমাদের একটি নির্দিষ্ট 'সুপারস্টোর' আছে, ১৯৭২ সন হইতেই। তাহাদিগকে টেলিফোনে বা চিঠিতে অর্ডার দেওয়া হয়, সমস্ত জিনিস ভ্যানে করিয়া বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেয়।

অন্য কাজের ব্যবস্থা করাও সহজ। পত্নী নীচে আসিতে পারেন না বলিয়া শোবার ঘরেও টেলিফোন আছে। তিনি উহা তুলিয়া কথা বলেন, কাজের জন্যই হোক বা জিনিসপত্রের জন্যই হোক, সবই হইয়া যায়। টাকাপয়সার ব্যবস্থাও তিনি টেলিফোনেই করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ১৩ ॥

বিলাতবাসের তৃতীয় লাভ : জীবিকার্জনের ভাবনা হইতে মুক্তি

আমি ইতিপূর্বে ১৯৮০ সন পর্যন্ত সারাজীবনেও জীবিকা অর্জনের চিন্তা, ভার ও পরিশ্রম হইতে মুক্ত হই নাই— কখনও বা পরের দিনের খাদ্যের কথা ভাবিতে হইয়াছে, কখনও বা পরের মাসের। মাঝে মাঝে যাহাতে সচ্ছলভাবে জীবনযাপন হয় সেরূপ অর্থ পাইয়াছি, অনেক সময়েই তাহা পাই নাই, ঋণ হইয়াছে।

দেশে কেহই আমাকে— এক, দশ বৎসরের জন্য ইংরেজ শাসনকর্তারা ছাড়া— উপযুক্ত পারিশ্রমিক অর্থাৎ বেতন দেয় নাই। ইহার জন্য আমার দেশের লোককে আমি দোষ দিই না। গুণানুযায়ী পুরস্কার দেওয়া আমাদের দেশের ধারা নয়— যাঁহারা কর্মপ্রার্থীকে বেতন দেন তাঁহাদের মূল সূত্র— 'এ বাজারে যাবে কোথায় ?' একবার উপার্জনহীন হইয়া থাকার সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশনে আমাকে দুই মাসের জন্য দুই শত টাকা মাসিক বেতনে অস্থায়ী কাজ দিবার কথা হইয়াছিল। যেদিন 'সার্ভিস-কমিটি'তে এই প্রস্তাব উঠিল, এক এম-এ· পাশ ব্যক্তি বলিল, 'আমি আশি টাকায় সেই কাজ করব।' তাই আমার হইল না। আমি তখন মন্তব্য করিলাম, আশি টাকাতেই যদি এই কাজটি করানো যায়, তাহা হইলে এই পদের স্থায়ী কর্মচারীকে মাসিক তাঁরি শত টাকা বেতন কেন দেওয়া হয় ? অবশ্য ইহার কারণ ছিল, সেই স্থায়ী কর্মচারী যখন প্রথম চাকুরি পাইলেন তখন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহার মুরুব্বি ছিলেন। যখন শরৎ বসু মহাশয়ের সেক্রেটারি ছিলাম তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা আমাকে বলিতেন, 'আপনি aptitude-এর কথা এত বলেন কেন ? যে-চেয়ারে যাকেই হোক বসিয়ে দিন না কেন, সে চেয়ারের গুণেই সেই কাজ করতে পারবে, কাঠের বেরালও ইঁদুর ধরে।'

এই ধারণার উৎপত্তি প্রাচীনকালেই হইয়াছিল। বিখ্যাত কাহিনী আছে যে, এক রাখালবালক এক বল্মীক স্তূপের উপর বসিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে অতি বিচক্ষণভাবে বক্তৃতা করিতেছিল। ইহাতে লোকে আশ্চর্য হইয়া উই-এর ঢিবি খুঁড়িয়া দেখিল, মাটিতে ঢাকা একটি রাজসিংহাসন, সুতরাং সে রাজার মত বক্তৃতা করিতে বাধ্য। আমার শিক্ষক মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় আমাকে অতি realistic কথা বলিয়াছিলেন— 'দেখ নীরদ, অমুকে যে তোমাকে এর বেশি মাইনে দিচ্ছেন না তার কারণ খুব স্পষ্ট। তিনি জানেন, তোমার বিশিষ্ট গুণ বা কর্মক্ষমতায় তাঁর মর্যাদা বাড়বে, কিন্তু তুমি না থাকলেও তাঁর কোনো আর্থিক ক্ষতি হবে না। তিনি যা পরিবেশন করবেন দেশের বিচারহীন লোক তাই খাবে।' ইহা যে অতিশয় সত্য তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না।

দেশে প্রথম উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলাম ইংরেজের কাগজ হইতে। এখন বিলাতে যে-পেনশন পাইতেছি উহা এখানকার হিসাবে উচ্চ না হইলেও আমার সভ্যভাবে থাকার কোনো ব্যাঘাত হইতেছে না। সর্বোপরি কথা এই যে, ইহার ফলে জীবিকানির্বাহের জন্য আমাকে কোনো কাজই করিতে হয় না। আমি ইচ্ছা করিলে বিছানায় শুইয়াই দিন কাটাইতে পারিতাম, কোন্ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ এইভাবে থাকিবার কামনা না করে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ১৪ ॥

বিলাতবাসে চরমলাভ : কৃত্যসাধনের অবকাশ

এতক্ষণ পর্যন্ত বিলাতবাস হইতে যে-সব লাভের কথা বলিলাম, তাহার জন্যই বিবেচক ব্যক্তির আনন্দিত হওয়া উচিত। জীবিকার দায় দারুণ দায়, তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? যতদিন ধরিয়া মানুষের মানসিক জীবনের ইতিহাস আছে ততদিন হইতেই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় হওয়াকেই সে চরম কাম্য বলিয়া মনে করিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, মহারাণা প্রতাপ, বনবিড়াল রুটি চুরি করিয়া সন্তানদের খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিল বলিয়াই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করা উচিত মনে করিলেন।

আরও প্রাচীন কাহিনী আছে। বাইবেলের প্রথমভাগে (যাহা হিব্রু ভাষাতে ইহুদীদেরও শাস্ত্র) আছে যে, এই দায় প্রথম মানুষ আদমের অপরাধের শাস্তি। আদম, পত্নী হবার (Eve-এর) প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছিল ; ঈশ্বরের নিষেধ না মানিয়া যে-অপরাধ করিল, তাহার শাস্তিস্বরূপ স্বর্গোদ্যান হইতে মর্ত্যে নির্বাসিত হইল। ঈশ্বর বলিলেন,—

'In the sweat of thy face shalt thou eat bread...'

এই শাস্তি হইতে যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে সে কখনই মুক্তি পাইবে না। এই দায় থাকিবে, ভগবান আরও বলিলেন,—

'In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life...till thou return unto the ground; for dust thou art, and unto dust shalt thou return.'

আমাদের শাস্ত্রেও এই কথাটাই অন্যভাবে বলা হইয়াছে। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা-সংবাদে নচিকেতা বলিল, 'স্বর্গলোকে ভয় নাই···অশন ও পিপাসা উভয়কে অতিক্রম করিয়া লোক আনন্দিত হয়।' (কঠোপনিষদ, ১ম ভাগ, ১ম সর্গ, ১২ শ্লোক)

এই দায়ের জন্যই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের আকিঞ্চন— 'Give us this day our daily bread'. পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রেসিডেন্ট রোজেভেল্টও এই কারণেই ক্ষুধাকে মানুষের চারিটি ভয়ের একটি বলিয়াছিলেন, ও এই ভয় হইতে মুক্তি পাওয়াকে মানুষের একটা বিশেষ অধিকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আমি বিলাতের শাসনব্যবস্থার জন্য অন্নসংস্থানের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি। ইহার জন্য আমি ইংরেজ জাতির কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে (অর্থাৎ বর্তমানে 'ভারত', পাকিস্তান ও বর্তমানের 'বাংলাদেশ' হইতে) যাহারা 'ইমিগ্র্যান্ট' হইয়া আসিয়াছে তাহারা কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, সন্তুষ্টও নহে। তাহারা বলে, ব্রিটিশশাসনের সময়ে ইংরেজ আমাদিগকে যে-ভাবে শোষণ করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাদিগকে শুধু বিলাতে বাস করিবার অধিকারই যে দিতে হইবে তাহাই নয়, ধনী হইবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ইহাও সত্য যে, এই 'ইমিগ্রেন্ট'রা ধনী হইয়াছে, কেহ বা অতি ঐশ্বর্যবানই হইয়াছে। আমি 'ইমিগ্রেন্ট' নই, তাই স্বল্পবিত্ত হইয়া আছি।

কিন্তু ইংরেজজাতির কাছে ও তাহাদের শাসনব্যবস্থার কাছে নিজেকে চিরঋণী মনে করিবার সঙ্গত কারণ আমার আছে— আমি জীবনে এই প্রথম জীবিকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া, অন্যদিকে বিক্ষিপ্তচিত্ত না হইয়া, একাগ্রমনে জীবনের কৃত্যসাধন করিতে পারিতেছি। ইহাই আমার চরম সৌভাগ্য। ইহা বিলাতে হইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কথাটা, অর্থাৎ আমি যে জীবনের কৃত্য করিতে পারিয়াছি ইহা কিন্তু অনেকে বুঝিবেন না, কারণ মানবজীবনে কৃত্য যে আছে তাহার উপলব্ধিই অধিকাংশ লোকের নাই। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য দেশে, আরও বিশেষ করিয়া আমেরিকায়, সাধারণ লোকের ধারণা— মানুষ জন্মে নানাভাবে নিজে সুখী হইবার জন্য। আমেরিকানরা আত্মপরায়ণ হইয়াছে তাহাদের আমেরিকান অস্তিত্বের মূলমন্ত্র, অর্থাৎ Declaration of Independence হইতে। উহার তারিখ ১৭৭৬ সনের ৪ জুলাই। সেইদিন হইতেই আমেরিকানরা আত্মপরায়ণতাকে তাহাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছে, কারণ উহাতে আছে যে, মানবজাতি 'are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.' এই ঘোষণাতেই বলা হইয়াছে এই সব সত্য self-evident.

ইহা সর্বৈব মিথ্যা। মানুষের যদি নিজের জীবন ও স্বাধীনতার উপর এবং সুখী হইবার প্রচেষ্টার উপর অবিসম্বাদিত অধিকার থাকিত, তাহা হইলে সে কি মৃত্যুর অধীন হইত ? মানুষ বিশ্বে স্বাধীন হইয়া জন্মায় না, জন্মায় বিশ্বের দাস হইয়া ; বিশ্বের দাসরূপেই সে সন্তানের জন্ম দিয়া বিশ্বে জীবনস্রোত বহমান রাখে ; এবং ইহার অতিরিক্ত যাহা করে তাহাও বিশ্বেরই নিয়মে ; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য। বিশ্বের দাস হিসাবে তাহার সর্বোচ্চ কর্তব্য সৃষ্টি, অন্য সব কর্তব্য উহার নীচে।

সুতরাং কেহ যদি সৃষ্টির শক্তি লইয়াই জন্মায়—তাহা হইলে সেই শক্তি তাহাকে বিশ্বই দিয়াছে, উহার উপযুক্ত ব্যবহার করিবার জন্য। তাহা না করিলে সে দোষী হয়, বিশ্বের কাছে তাহার যে-ঋণ আছে তাহা পরিশোধ না করিয়া প্রবঞ্চক হয়। সকলেই যে সৃষ্টির ক্ষমতা লইয়া জন্মায় তাহা নহে, তাহারা স্থিতি বজায় রাখিয়া কর্তব্যপালন করিতে পারে, তাহাদের কাছ হইতে বিশ্ব আর কিছুই দাবি করে না। কিন্তু যাহারা সেই শক্তি বিশ্বের কাছে পায়, তাহারা সেই শক্তি দিয়া বিশ্বে কিছু রাখিয়া যাইতে না পারিলে অন্যায় হয়। আমার সর্বদাই ধারণা ছিল যে, আমার মধ্যে একটি সৃষ্টিশক্তি আছে যাহা একমাত্র লেখায় দেখাইতে পারি। তাই আমি শক্তি-অনুযায়ী কৃত্যসমাপন না করিতে পারিয়া অসুখী ছিলাম। বিলাতে সেই কৃত্য করিতে পারিতেছি বলিয়া আমি সুখী ও সৌভাগ্যবান।

॥ ১৫ ॥

বিলাতে না থাকিলে যাহা হইত না

কি করিতে পারিলাম তাহা বলি। পত্নী বলেন, 'বিলেতে না এলে তোমার এতগুলো বই কখনোই লেখা হত না।' বইগুলি (১) ম্যাক্সমূলারের জীবনী, (২) ক্লাইভের জীবনী, (৩) হিন্দুধর্মের বিষয়, (৪) আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড, (৫) 'আত্মঘাতী বাঙালীর' দুই খণ্ড। এই বইগুলির একটাও বিলাতে না থাকিয়া লিখিতে পারিতাম না— প্রথমত, অবকাশ পাইতাম না ; দ্বিতীয়ত, গবেষণার জন্য যে-সব সুযোগ-সুবিধা ও কাগজপত্র, বই ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল তাহাও দেশে পাইতাম না। অবকাশের কথা যথেষ্ট বলিয়াছি, আর বেশি বলিবার আবশ্যক নাই। তাই কেবলমাত্র সুযোগ-সুবিধার কথা বলিব।

বিলাতে থাকিয়া আমি পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরিতে কাজ করিয়াছি। এই দুইটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইব্রেরিতে শুধু যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই বই আছে তাহা নয়, বাংলাসাহিত্যেরও যে-সব বই আছে তাহা কলিকাতায় নাই। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার মাতার 'হেলেনা কাব্য' বলিয়া ময়মনসিংহের আনন্দবাবুর প্রণীত দুই খণ্ড বই ছিল। উহা চুরি হইয়া যায়, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। কিন্তু অক্স্ফোর্ডের বডলীয়ান লাইব্রেরিতে দুটি খণ্ডই পাইলাম। ব্রিটিশ মিউজিয়মের প্রাচ্য বিভাগে বাংলা কতকগুলি নাটক পাইলাম, যাহার কথা আমি কলিকাতায় শুনিও নাই। ইহা ছাড়া ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ও ভারতীয় ভাষায় লিখিত অগণিত পুস্তক রহিয়াছে। বিলাতে থাকিয়া আমি এই সবগুলিতেই কাজ করিতে পারিয়াছি। ইহার অতিরিক্ত লন্ডন লাইব্রেরি খুব বড় পুস্তাকাগার। উহা হইতে বই ধার করিয়া ছয় মাস পর্যন্ত রাখা যায়। এই লাইব্রেরি হইতে বাড়িতে বসিয়া পড়িবার জন্য আমি সর্বদাই বই ধার করিয়া আনিয়াছি। এই লাইব্রেরিগুলিতে কাজ করিতে না পারিলে আমার বইগুলি লেখা হইত না।

শুধু দুইটি বই-এর কথা বলিব। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বই লিখিবার জন্য হিন্দুভূমি ভারতবর্ষে না থাকিয়া বিলাতে থাকিবার কি প্রয়োজন ছিল? দেশের মর্যাদার বিরোধী হইলেও আমাকে বলিতে হইবে— ছিল, নিশ্চয়ই ছিল। কেন? উত্তর— প্রথমত, হিন্দুধর্ম বইটা আমি প্রধানত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে লিখিয়াছি। এই সমস্ত সংস্কৃত বই আমি দেশে, কলিকাতা, বারাণসী, পুনায় গিয়া পাইতাম না। কিন্তু সবগুলি বই-ই বডলীয়ান লাইব্রেরির একটি কক্ষেই পাইয়াছি। শুধু উঠিয়া গিয়া শেলফ্ হইতে নামাইতে হইয়াছে। কিছু বই বডলীয়ানের অন্তর্ভুক্ত ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট লাইব্রেরি হইতে ধার করিয়া বাড়িতে আনিয়া পড়িয়াছি। এই সব বই-এর কতকগুলি আমি দেশে কোথাও পাইতাম না।

কয়েকটির দৃষ্টান্ত দিই। এব্রাহেম রোগেরের (বা রজারের) হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত বই ইউরোপে প্রকাশিত হিন্দুধর্মের বই-এর মধ্যে দ্বিতীয়। উহা ডাচ ভাষায় লিখিত ও প্রথম প্রকাশিত হয় হল্যান্ডের লাইডেন-এ ১৬৫১ সনে। আমি ডাচভাষা জানি না, কিন্তু বইটির বিস্তৃত টীকা সমেত ১৬৭০ সনে একটি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা আমি নিজে কিনিতে পারিয়াছি। ইহাতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে চিত্র আছে, দশাবতারের বিশেষ করিয়া, সর্বোপরি সতীদাহের। দেশে থাকিলে এই বইখানা কেনা দূরে থাকুক, চোখেও দেখিতে পাইতাম না।

আর একটি বই গীতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ, চার্লস উইলকিন্স কৃত ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যয়ে ১৭৮৫ সনে লন্ডনে প্রকাশিত। ইহার ভূমিকা স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস লিখিয়াছিলেন। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে প্রথম বিশুদ্ধ অনুবাদ। হেস্টিংসের ভূমিকাতেও বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ছিল। আমি বইখানা লণ্ডন লাইব্রেরি হইতে ধার করিয়া ছয় মাস রাখিয়াছিলাম।

আর একটা কথাও বলিব— উহা আমাদের শাসক ও অধ্যাপক শ্রেণীর পক্ষে লজ্জার কথা। আমার বিরুদ্ধে মনোভাবের জন্য ইঁহারা আমাকে তাঁহাদের অধিকারস্থ কোনো লাইব্রেরিতে কাজ করিতে দিতেন না। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব। ক্লাইভের জীবনী লিখিবার জন্য আমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্র দেখিবার প্রয়োজন ছিল, উহার অধিকাংশ মুদ্রিত, কিছু কিছু হস্তলিখিত। এই সব কাগজপত্র ও সরকারি পুস্তক আংশিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিল্লীতে ন্যাশনাল আরকাইভস-এ আছে। কিন্তু উহাতে কাজ করিবার নিয়ম এইরূপ যে, উহার জন্য অনুমতি কখনোই পাইতাম না।

পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে সরকারি কাগজপত্র, যাহা একটা কাল উত্তীর্ণ হইলে ঐতিহাসিক বা অন্য কাহারও পড়িবার অধিকার আছে, সেই সব যে-কেহ গিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু ভারত গভর্নমেন্টের নিয়ম—একমাত্র bonafide scholar-রাই অনুমতি পাইবে, অন্য কেহ নয়। এই ছুতায় বিরূপতার জন্যই হোক কিংবা ঈর্ষ্যার জন্যই হোক আমাকে অনুমতি দেওয়া হইত না। অথচ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গিয়া আমি ক্যাটালগভুক্ত দলিলপত্র তো দেখিয়াছি, উহা ছাড়া ক্লাইভ সংক্রান্ত সদ্যপ্রাপ্ত ও তালিকাভুক্ত নয় স্ট্রেচী-পেপারও দেখিয়াছি ও নকল করিয়াছি। উহা হইতে একটি মূল্যবান 'নোট' আমি আমার ক্লাইভের জীবনীতে ছাপাইয়াছি।

সুতরাং আমি বলিব, গবেষণার জন্য আমি সব বই বা কাগজপত্র দেশে পাইতাম না, দেখিবার অনুমতিও পাইতাম না। মনে রাখিতে বলিব, আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড লিখিবার জন্য প্রয়োজনীয় বহু সরকারি কাগজপত্র, বহু সাময়িক পত্র ও বহু দুষ্প্রাপ্য বই আমি বডলীয়ান লাইব্রেরিতে পাইয়াছি। মডার্ন রিভিউ-এর সমস্ত সংখ্যা এই লাইব্রেরিতে আছে; এই মাসিকপত্রে প্রকাশিত আমার নিজের প্রবন্ধের কপিও আমার কাছে অক্সফোর্ডে ছিল না, এই লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িয়াছি।

এই তো গেল বইগুলি লিখিবার কথা। এগুলি ছাপা ও প্রকাশের জন্যও আমার এদেশে থাকার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। না থাকিলে উহা সু-সম্পন্ন হইত না, হয়ত বা প্রকাশিতই হইত না। আরো যে-সব বই লিখিবার সঙ্কল্প রাখি তাহার জন্যও এই দেশে থাকা প্রয়োজন।

AMARBOI.COM

॥ ১৬ ॥

বিলাতবাসের আনুষঙ্গিক লাভ : মনোরঞ্জন

জীবিকার্জনের জন্যই হউক, ধনী হইবার জন্যই হউক, কিংবা মনুষ্যজীবনের চরমকৃত্য সাধনের জন্যই হউক, মানুষ শুধু কাজ করিয়াই সুখী হইতে পারে না। তাহার নানা দিকে মনোরঞ্জনের প্রয়োজন আছে।

পুরুষের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন নারী পাইয়া মনোরঞ্জন, স্ত্রীজাতীয়ার এইরূপ মনোরঞ্জন পুরুষ পাইয়া— উভয়পক্ষেই বিবাহ করিয়া বা না করিয়া, অথবা একই সঙ্গে দুইই করিয়া বা না করিয়া এইরূপ মনোরঞ্জন হইয়া থাকে। যে-সব বিদ্রোহিণী নারীরা MS লিখিয়া অনূঢ়াত্ব অটুট রহিয়াছে প্রচার করিতে চান তাঁহারা সত্যবাদিনী হইলে বলিবেন না যে, মনোরঞ্জনের জন্য পুরুষের প্রয়োজন নাই। এই মুখ্য মনোরঞ্জনের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই যদিও এই বয়সেও আমি একটু খরচ করিলেই প্রতি রাত্রিতে একটি তরুণী পাইতে পারিতাম। আমি শুধু গৌণ মনোরঞ্জনের কথাই বলিব।

উহারও একান্ত প্রয়োজন আছে। আমি যে-তিনটি ব্যাপারে পরিশ্রমের কথা বলিয়াছি, এইগুলির জন্যও মনোরঞ্জনের বিশেষ প্রয়োজন আছে— নহিলে উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে। এইরূপ মনোরঞ্জন না থাকিলে, কাজ দায়সারা অথবা দিনগত পাপক্ষয়ের মত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়া যায়, ক্লান্তিবোধ হয় বেশি, যে-কাজ করা হয় উহা প্রাণবন্ত হয় না। মানুষের শ্রমশক্তির একটা সীমা আছে, আবার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উহা কমিতে থাকে। তখন পরিশ্রম কমাইয়া মনোরঞ্জন বাড়াইতে হয়। নহিলে পরিশ্রমেরই যথোপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। এই কথাটাই আমি দেশবাসীকে বুঝাইতে পারি না। তাঁহারা মনে করেন, মানুষ দুই প্রকারের— এক নিষ্কর্মা আড্ডাবাজ, আর কর্মিষ্ঠ। যাঁহারা কর্মিষ্ঠ তাঁহারা মনে করেন, কর্মের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ লইয়াই থাকিতে হইবে— দোকানদার হইলে সারাদিন গদীতে বসিয়া থাকিবে, শিল্পী হইলে সারাদিন হয় সোনা বা লোহা পিটিবে, সরকারি কর্মচারী হইলে জাগ্রত অবস্থায় ফাইল লইয়া থাকিবে, উকিল-ব্যারিস্টার হইলে সকাল-সন্ধ্যা মক্কেলের সঙ্গে পরামর্শ করিবে ও দিনমান আদালতে থাকিবে।

আমি যখন মিলিটারী অ্যাকাউন্টস-এ কাজ করি, তখন আমার উপরওয়ালা বাঙালী বলিলেন— 'কলিকাতা অত্যন্ত খারাপ জায়গা, উহাতে এত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে যে, কেহই রবিবারে আপিসে আসে না। আমি যখন রাঁচীতে ছিলাম তাহা হইত না। আমোদ-প্রমোদের জন্য বিক্ষিপ্তচিত্ত না হইয়া আমরা সকলেই রবিবার আপিসে যাইতাম।' আমি কলিকাতা বা দিল্লীতেও অতি-উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে বাড়িতে ফাইল লইয়া আসিতে দেখিয়াছি। এই সব কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা মনোরঞ্জনকে ষড়রিপুর অতিরিক্ত সপ্তম রিপু বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু একটা প্রশ্ন বাকি রহিয়া গেল, মনোরঞ্জন কি? সহজ কথায় বলিব, উহা ইংরেজীতে যাহাকে recreation বলে তাহাই। ইহার পরেও প্রশ্ন আছে। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। সকলেই যে কেবল নিজের রুচি অনুযায়ী মনোরঞ্জন করে তাহা নয়। এ-বিষয়ে অভ্যাস ভিন্ন লোকের একটা গোঁড়ামিও আছে। যে-ব্যক্তি মদ্যপান করে অথবা বেশ্যালয়ে যায় সে কিছুতেই স্বীকার করিবে না যে, এইভাবে মনোরঞ্জন বই পড়ার চেয়ে নিকৃষ্ট।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের রুচি ও বিবেচনা অনুযায়ী মনোরঞ্জন করিবার অধিকার আছে তাহা আমি মানি। শুধু একটা কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত— 'যে-ভাবেই মনোরঞ্জন করি না কেন, উহার ফলভোগী হইয়া যেন দুঃখ বোধ বা অভিযোগ না করি।' অনেকেই এই কার্যকারণ সম্বন্ধ মানিতে চায় না।

এখন আমার কথা বলিব। প্রথম জীবনে জীবিকার জন্য এতই পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল যে, মনোরঞ্জনের অর্থাৎ recreation-এর কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কোনো কোনো সময়ে দিনে বারো ঘণ্টাও কাজ করিতে হইত। কিন্তু শেষের দিকে অর্থাৎ যখন ১৯৪৫ সনে যুদ্ধ শেষ হইল, তখন বেতনভোগী কর্মচারী হইলেও অল-ইন্ডিয়া-রেডিও-তে আর দশটা-পাঁচটা আপিস করিবার নিয়ম মানিব না স্থির করিলাম, কর্তৃপক্ষেরাও আপত্তি করিলেন না। ইহার পর কোনো কোনো দিন দুই-তিন ঘণ্টার বেশিও আপিসে থাকি নাই, সেজন্যই আত্মজীবনীখানা লিখিতে পারিয়াছিলাম।

এখন আমার কাজ শুধু নিজের ইচ্ছামত বই বা প্রবন্ধ লেখা। উহার জন্যও আমি দিনে চার ঘণ্টার বেশি কখনও কাজ করি না। দেখিয়াছি, উহার বেশি করিলে লেখা উৎকৃষ্ট হয় না। আরও দেখিয়াছি, বিকালের দিকে লিখিলে মনের ক্লান্ত অবস্থার জন্য সেই লেখা এতই নিকৃষ্ট হয় যে, পরের দিন সকালে পড়িবার পর ফেলিয়া দিতে হয়। সুতরাং লিখিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি লাভ ? তাই সকাল-সকাল উঠিয়া দুপুরের আগেই দৈনন্দিন লেখা সারিয়া ফেলি।

কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি যে, ক্রমাগত চার ঘণ্টাও পূর্ণ উদ্যমে ও মনের সজীবতা বজায় রাখিয়া কাজ করিতে পারি না। তাই ঘণ্টা দুই মত কাজ করিয়া আধঘণ্টা গানবাজনা শুনি। কিন্তু লেখার সময় কম হইয়া গেলেও লেখার পরিমাণ ইহাতে কমিল না। দেখিলাম, অল্পসময় কাজ করিলে যাহা লিখি তাহা দ্রুতবেগে করিতে পারি। ইহা ট্রেনের ত্রিশ মাইল বেগে না চলিয়া ষাট মাইল বেগে চলিবার মত। সে যাহাই হউক চার ঘণ্টা কাজের পর দিনে নয় ঘণ্টা ঘুমাই (বার্ধক্যের প্রয়োজনে), খাওয়া-দাওয়া নিত্যকর্মে তিন ঘণ্টা মত ব্যয় হয়। সুতরাং মনোরঞ্জন অথবা recreation-এর জন্য আট ঘণ্টা পাই। এই অবসরে কি করি বলি।

প্রথমত, লেখার জন্য যতটুকু পড়িতে হয় তাহার অতিরিক্ত সখের পড়া পড়ি। এই বইটি লিখিবার সময়ে কি পড়িলাম বলি— কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', কিপলিং-এ 'কিম্' ও অ্যাস্টনি ট্রলপের 'দি ডিউকস্ চিলড্রেন'। সবগুলিই অবশ্য আমার পড়া, এক 'মৃচ্ছকটিক' ছাড়া।

দ্বিতীয়ত, গ্রামাফোনে বাজনা শুনি—কিছু কিছু বাংলা গান, তবে প্রধানত ইউরোপীয় সঙ্গীত নানাধরনের।

তৃতীয়ত, অশনবসনে বিলাসী অথচ মধ্যবিত্ত, সুতরাং সে-বিষয়ে চিন্তা করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। এই চিন্তাও চিত্তবিনোদন। সব সময়ে ঈপ্সিত জিনিস না পাইলেও।

চতুর্থত ও শেষ— চিত্তবিনোদন ও স্বাস্থ্য রক্ষিবার জন্য কিছু শারীরিক পরিশ্রম করি। খানিকটা সময় সামাজিক ব্যাপারেও যায়, অনেকেই— দেশী ও বিদেশী— আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতে হয়, উহা কর্তব্য বলিয়াই নয়, আনন্দ পাই সেজন্যও। সুতরাং ইহাকেও মনোরঞ্জনই বলিব।

আমার রুচি অনুযায়ী মনোরঞ্জন দেশে যে-ভাবে হইত ও এদেশে যে-ভাবে হইতেছে, উহার পার্থক্যের কথা এখন বলি। ১৯৭০ সন পর্যন্ত এইরূপ মনোরঞ্জন দেশেও করিতে পারিতাম। তবে নানা কারণে ইহার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করিতে হইত, কোনো সময়ে ব্যর্থতাও দেখা দিত, শুধু অসম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখন যদি দেশে থাকিতাম তাহা হইলে চেষ্টা করিয়াও আগে যাহা পাইতাম, তাহা পাইতাম না। প্রথম কারণ আর্থিক। দেশে সব জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি যেরূপ হইয়াছে সেই অনুপাতে উপার্জন আমার কিছুতেই হইত না। দ্বিতীয় কারণ, তখন দেশে যাহা পাইতাম এখন আর তাহা পাওয়া কোনোমতেই সম্ভব হইত না।

সামাজিক আদরের হয়ত অভাব হইত না, বরঞ্চ এখানেই সাক্ষাৎকারীর সংখ্যা কমিয়াছে। তবে শরীরের যা অবস্থা তাহাতে লোকসমাগম আনন্দের ব্যাপার না হইয়া আয়াসের ব্যাপার হইত। বিশেষত, রাজনৈতিক আলোচনা হইতে তিক্ততা দেখা দিত। এখানে রাজনীতির ঐতিহাসিক দিক ভিন্ন দৈনন্দিন কার্যকলাপ লইয়া কথা বলিতে হয় না। ইহা কল্যাণকর, কারণ প্রাত্যহিক রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠিলে আমার মাথা ঠিক থাকে না, আলাপ বাক্‌বিতণ্ডায় পরিণত হয়।

তাই এই প্রসঙ্গ ছাড়িয়া একে একে অন্য মনোরঞ্জনের কথা বলি। খাদ্যপানীয়ের কথাই ধরা যাক। আমি এখানে যে মাছ-মাংস পাই, এমন কি যে চাল-ডালও পাই সেরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের খাদ্যদ্রব্য দেশে থাকিতে তখনও পাইতাম না, এখন হয়ত পাওয়া আরও দুষ্কর হইয়াছে। কেহ কেহ আমাকে বলেন, সবই পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন তাঁহারা সকলেই অতি ধনী। সুতরাং পাওয়া গেলেও আমার কিনিবার সামর্থ্য হইত না। দেশে সর্বোচ্চপদস্থ রাজপুরুষের কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা রোজ মাছ-মাংস খাইতে পারেন না। ইহা আর্থিক কারণে কি কৃপণতার জন্য বলিতে পারি না। তবে চিংড়িমাছেরও যে-দাম শুনিয়াছি, তাহাতে পাঁচদিন চিংড়ি খাইতে হইলে আমার তখনকার দিনের একমাসের বেতন উড়িয়া যাইত, অন্য খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পারিতাম না। আমি দেশে থাকিলে যে-টাকা পরিশ্রম করিয়াও উপার্জন করিতাম তাহা পেটে-ভাতে থাকিবার মতও হইত না। এখানে মূল্যবৃদ্ধি হইলে বেতন বা পেনশন সেই অনুযায়ী বাড়ানো হয়।

পানীয়ের মধ্যে জলের কথাই সর্বাগ্রে বলি। আমি সারাজীবন অজীর্ণে ভুগিয়াছি। এখানেও কলের জল খাইলে উপসর্গ দেখা দেয়। তাই 'মিনারেল ওয়াটার' খাই। উহা দেশে কদাচ পাওয়া গেলেও সর্বদা পাওয়া ও খাওয়া সম্ভব হইত না। কিনিতেও পারিতাম না।

তারপরে ব্যসনজাতীয় পানীয় দ্রব্যের কথা বলি। সুরাপায়ী বলিয়া দেশে আমার খ্যাতি বা অখ্যাতি রটিয়াছে। কোনো কোনো সংবাদপত্রে মদের বোতলসহ আমার ফোটোগ্রাফ বাহির হওয়াতে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। ধারণাটা একেবারেই ভিত্তিহীন। আমি মনোরঞ্জনের জন্য মদ্য কিনিলেও মদ্যপায়ী নেই। আমি এই সব ব্যাপারে অত্যন্ত ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলাম। ১৯৪৬ সন পর্যন্ত মদ্যপান করা দূরে থাকুক পান-তামাক, এমন কি চা পর্যন্ত খাইতাম না। সেই বৎসরে বিশেষ কারণে আমি পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া মদ্যকে গৃহপ্রবেশ করাই। তখন হইতে আমি ঘরে উচ্চস্তরের মদ্য রাখিয়াছি বটে, কিন্তু কখনও হুইস্কি কিনি নাই। আজও বলিবার আছে, আজ পর্যন্ত নিজের জন্য একটি বোতলও খুলি নাই। শুধু অতিথি আসিলে উহাদের সংবর্ধনা ও আপ্যায়নের জন্য যাহা প্রয়োজন হয় খুলি। দেশেও আমি যথাসম্ভব উচ্চশ্রেণীর 'ওয়াইন' কিনিতাম, এখানে উচ্চতম শ্রেণীর কিনি। এই শ্রেণীর মদ্য দূরে থাকুক, গলাধঃকরণের মত মদ্যও দেশে থাকিলে পাইতাম না। এখানে আমি যে-সব 'ওয়াইন' কিনি তাহার নাম করিলে নিজের জাঁক দেখাইবার মত হইবে। তবু আমার কথা যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনটির নাম করি— ক্ল্যারেট পেট্রুস্, হক্ এস্টিসের লেনশেন্ বেরেনআউস্লেজে আইস্ ভাইন (১৯৭১ সন), ও শ্যাম্পেন ডম পেরিনিয়োঁ। যাঁহারা এ-বিষয়ে সন্ধান রাখেন তাঁহারা বুঝিবেন এ-সবের তাৎপর্য কি। আমি বিত্তহীন হইলেও এ-সব রাখি দেশের সম্মান রাখিবার জন্য। অভিজাত ইংরেজ আসিলেও যাহাতে না বলিতে পারেন, 'আহা ! ইহারা ভারতীয়, ইহাদের অজ্ঞতা ও রুচিহীনতা ক্ষমা করিতে হইবে।' আমি নিজের অপমান কখনও সহ্য করি নাই, দেশের অপমানকে তো বাপ তুলিয়া গালির মত মনে করি। আমার মদ্যপানের এই সাফাই।

তারপর বাড়ির কথা। অক্স্ফোর্ডে আমি যে-ভাড়ায় যে-স্তরের বাড়িতে আছি তাহা কলিকাতায় বা দিল্লীতে কখনই পাইতাম না, কারণ উহার সমস্ত আসবাবপত্র, রন্ধনের ও খাইবার বাসনপত্র, এমন কি ঘুমাইবার তোষক-বালিশ কম্বল পর্যন্ত বাড়িওয়ালা দিয়াছে। দিল্লীতে যদি কেবলমাত্র এই কয়খানা কক্ষযুক্ত ফ্ল্যাট পাইতাম তাহা হইলেও শুনিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ততপক্ষে ইহার চতুর্গুণ ভাড়া দিতে হইত। এ বাড়িতে বাগান পর্যন্ত আছে। বলা প্রয়োজন বাড়িটি আজকালকার দেশলাই-এর বাক্স নয়— ভিক্টোরিয়ান যুগের। হয়ত আপত্তি উঠিবে— আমি যে-সব জিনিস ও সুবিধাকে মনোরঞ্জনের ব্যাপার বলিলাম সেগুলি গৃহস্থালি করিবার জন্য অতিপ্রয়োজনীয়। নিশ্চয়ই এই কথা আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু ইহার উপরেও কথা আছে— জীবনযাপনের জন্য যাহা আবশ্যক সেগুলিকেও মনোরম না করিলে জীবনধারণমাত্র হইতে পারে, কিন্তু জীবন সুখের হয় না, জীবনে কোনও বড় কাজ যেন-তেন-প্রকারেণ জীবনধারণ করিয়াই হয় না। আমি plain living and high thinking কথাটায় বিশ্বাস করি না। Plain living অর্থাৎ simple living, shabby living নয়। এথেন্সের প্রাচীন পার্থেনন মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের তুলনায় simple, কিন্তু উহাতে সৌন্দর্যের অভাব নাই।

জীবনে কোন উচ্চ কাজ করিতে হইলে যে, গৃহস্থালিতে যথাসম্ভব সৌন্দর্য রাখিতে হয় তাহা আমি আমার ১৯৬৭ সনে প্রকাশিত 'দি ইন্টেলেকচুয়াল ইন ইন্ডিয়া' বই-এ লিখিয়াছি। আমি বলিয়াছি,—

'All mental and moral energy is dependent on vitality, and vitality can neither be maintained nor increased without attending systematically to the physical foundations of life.'

ইহাও বলিয়াছি, আমার দেশবাসীরা এ-বিষয়েই উদাসীন। দৈহিক ও মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য খাদ্যপানীয় ছাড়া আরও যাহা প্রয়োজন তাহার একটি সম্বন্ধে লিখিয়াছি— 'artistic and pleasant material surroundings at home.' এই যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকেই বলিবেন, এইভাবে থাকিবার জন্য অর্থের আবশ্যক, intellectual-দের অর্থ কোথায়? ইহার উত্তরে আমি বলিব, ইঁহাদের মধ্যে বোধহয় যৌবন হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত আমিই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র। সুতরাং আমি অর্থাভাবকে সৌষ্ঠববর্জিত জীবনযাপনের সাফাই বলিয়া মনে করি না।

ইহার পরও কেহ কেহ বলিবেন, এইভাবে থাকা হয় লোকদেখানো আড়ম্বর, নয় বিলাসিতা। ইহাও আমি মানি না। আমি যদি ঘর সাজাইয়া রাখি, তাহা হইলে নিজের জন্যই রাখি, পরের জন্য নয়। সারাজীবন ধরিয়া একটা উক্তি শুনিয়াছি— 'দোকান সাজিয়ে থাকা যায় না।' আমার সৌন্দর্যের প্রচেষ্টা দোকানদারী নয়।

জীবন যে কেবলমাত্র যাপনীয় নয়, উপভোগ্যও বটে তাহা আমাদের শাস্ত্রেও আছে। মুণ্ডক-উপনিষদে আছে—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিপস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্দত্য
নশনন্যো অভিচাকশীতি ॥'

(৩য় মুণ্ডক ১ম সর্গঃ, ১ম শ্লোক)

সংক্ষিপ্ত অর্থ, একগাছে বসিয়া দুই পক্ষীর একটি ফল খায়, ও অন্যটি দেখে। উপনিষদকার যে-অর্থেই ইহা বলিয়া থাকুন, আমার বক্তব্যের সমর্থনেও উহা খাটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুইপক্ষী একটিমাত্র মনুষ্য, উহা এক persona খায়, অন্য persona দেখিয়া সুখ পায়।

জীবনযাত্রায় সৌন্দর্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহার কিছু কিছু দেশে থাকিয়া পূর্ণ করিতে পারিতাম, এখন তাহা সম্ভব হইত না। কিন্তু এদেশে থাকিয়া বিত্তহীন হইয়াও উহা পাইতেছি। অতঃপর অন্যান্য লাভের পরিচয় দিই।

বই লিখিবার জন্য যে-সব পুস্তকের প্রয়োজন হয় তাহার কথা বলিয়াছি। এখন সখের পড়ার জন্য যে-সব বই-এর আবশ্যক তাহার কথা বলি। এক সময়ে কলিকাতা ও দিল্লীতে থাকিয়া এই ধরনের যে-বইই কিনিতে চাহিয়াছি তাহা পাইয়াছি। ১৯১২-১৩ সন নাগাদ কলিকাতায় ইংরেজ কবিদের গ্রন্থাবলী চামড়ায় বাঁধানো সংস্করণে দশ-বারো টাকায় পাইতাম। এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে আসিয়া অনেকগুলি কিনিয়াছি। আবার কলিকাতায় বাস করিবার সময়েই নন্‌সাচ প্রেসের প্রকাশিত দান্তের 'দিভিনা কম্মেদিয়ার' চিত্রসম্বলিত অতি শোভন সংস্করণ কিনিয়াছিলাম। এখন বিলাতে কিনিতে গেলে উহার মূল্য তিন-চারি শত পাউন্ড হইবে— অবশ্য সেকেন্ড হ্যান্ড। আমি ১৯২৮ সনেই কলিকাতায় কিনিলাম শুনিয়া নন্‌সাচ প্রেসের স্বত্বাধিকারী স্যর ফ্রান্সিস মেনেল (ইনি বিখ্যাত কবি অ্যালিস মেনেলের পুত্র) আশ্চর্য হইয়াছিলেন। দিল্লীতেও এই ধরনের বই অনেক কিনিয়াছি।

এখন আর সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্রকলা বা সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় বই দেশে পাওয়া যায় না। পড়িবার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে যাইতে হয়। কিন্তু সেখানে পড়া একমাত্র অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেই সম্ভব। লাইব্রেরিতে সখের পড়া হয় না।

এইজাতীয় বই পাওয়া গেলেও হয়ত নিকৃষ্ট পেপার-ব্যাকে পাওয়া যায়। আমি কখনও পেপার-ব্যাক কিনি না। সখের বই এই ধরনের ছাপা ও বাঁধানো হওয়াকে মদ্যপানের সখ থাকিলে ধেনো মদ খাইবার মত মনে করি।

এখন সঙ্গীতচর্চার ব্যাপার। আমি ১৯৩১ সন হইতে নানাধরনের ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনিতে আরম্ভ করি— অবশ্য রেকর্ডে এবং উহাতে অনুরাগী হই। তখন হইতে ১৯৭০ পর্যন্ত সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বই এবং রেকর্ডও কিনিতে পারিতাম। এ-দেশে আসার আগে আমার প্রায় পাঁচ শত ৭৮-আবর্তনের রেকর্ড ছিল। আমি দমদমে তৈরি রেকর্ড কিনিতাম না, এইচ· এম· ভি· কোম্পানির বিলাতে তৈরি রেকর্ড কিনিতাম। এখন পাইলেও অর্থসামর্থ্যে কুলাইত না। কিন্তু পাওয়াই যে কত দুরূহ হইত তাহা আমি জানি। এখানে বেটোফেনের নবম সিম্ফনীরই তিন সেট রেকর্ড আমার আছে— একটির কনডাক্টর স্যর জর্জ শল্‌টি, একটির কারায়ান, ও একটির সান্ডারলিং। উচ্চাঙ্গের ইউরোপীয় সঙ্গীতে interpretation-এর প্রশ্ন খুবই গুরুতর, কারণ স্বরলিপি হইতে সঙ্গীতকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সবটুকু বোঝা যায় না। সুতরাং বিচার করিতে হইলে একাধিক কনডাক্টরের interpretation শুনিতে হয়। বেটোফেন ভিন্ন হ্যান্ডেল, মোৎসার্ট প্রভৃতি সঙ্গীতকারদেরও আমার নানাভাবে বাজানো রেকর্ড আছে।

এখন আর একটা রেওয়াজ হইয়াছে। পুরাতন বিখ্যাত সঙ্গীতকারদের রচনা তাঁহাদের সময়কার যন্ত্রে ও স্টাইলে বাজাইবার। এই ধরনের রেকর্ডও আমার আছে। একটিতে আমস্টি-র তৈরি ১৭৩০ সনের পুরানো চেলো বাজানো হইয়াছে ; আর একটিতে ১৭৮৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সনে তৈরি 'ওবয়' (সানাইজাতীয় যন্ত্র) বাজানো হইয়াছে। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম। এই সব রেকর্ড দেশে পাইবার উপায়ও ছিল না।

বাজাইবার জন্য গ্রামোফোন যন্ত্রের কথাও বলি। আমি গ্রামোফোনে বিকৃত ধ্বনি শুনিতে পারি না, সেজন্য কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় যে তাঁহার গানের একটি রেকর্ড আমাকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহা বহুকাল শুনি নাই। সম্প্রতি উপযুক্ত বাজাইবার যন্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছি। ইহাতে তাঁহার গলা প্রায় সম্মুখে বসিয়া শুনিবার মত হয়। উহাতে পশ্চিমবঙ্গীয়দের গলা (উচ্চারণ মাত্র নয়) ও পূর্ববঙ্গীয়দের গলা ধরিতে পারি, একই গায়ক বা গায়িকার নানা বয়সের গলাতে অর্থাৎ অল্পবয়সের ও বেশি বয়সের গলাতে যে পার্থক্য হইয়াছে তাহাও ধরিতে পারি। অথচ আমার equipment তৃতীয় শ্রেণীর। দ্বিতীয় বা প্রথম শ্রেণীর equipment কিনিবার মত আর্থিক সামর্থ্য আমার নাই। এইটুকুও দেশে পারিতাম না।

নিশ্চয়ই কেহ কেহ বলিবেন, এ-সবের প্রয়োজন কি? আমি বলিব, আমি সঙ্গীত ভালবাসি, তা গানই হউক বা বাজনাই হউক— সেজন্য যে-কোনো কলের-গান বা বাজনা শুনিতে পারি না। দেশে থাকিতে আমি কখনও রেডিও শুনিবার যন্ত্র কিনি নাই, উহার আওয়াজ আমার সহ্য হইত না। যে যাহাই বলুন— আমি তো আমি, সৃষ্টিছাড়া হইলেও আমার মতেই সুখী হইতে চাই। সেই সুখ বিলাতে পাইতেছি।

সর্বশেষে শারীরিক শ্রমের দ্বারা চিত্তবিনোদনের কথা বলি। ইহাও দেশে সম্ভব হইত না। প্রথমেই বাগান করা কি-ভাবে হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিই। আমার ও আমার পত্নীর বাল্যকাল হইতেই বাগানের সখ। তাঁহার বাল্যকাল শিলং-এ কাটিয়াছিল। পিতার সুন্দর বাগান ছিল। আমাদেরও কিশোরগঞ্জের বাসায় বড় বাগান ছিল। তাহাতে বেলফুলের (মোতিয়া জাতীয়) গাছই প্রায় ত্রিশটা ছিল, স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, কামিনী ও শিউলি ফুলের গাছ ছিল, পাতাবাহার গাছ অর্থাৎ ক্রোটন নানা রকমের ছিল। তাহা ছাড়া অন্যের বাড়িতে গিয়া বকুলফুল কুড়াইতাম ও চাঁপাফুল পাড়াইয়া আনিতাম।

মনে রাখিতে হইবে তখনকার দিনে বনিয়াদী বাঙালীর বাড়িতে বাগান করাইবার রেওয়াজ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও রবীন্দ্রনাথের জীবনীতে ও নানা গল্পে উহার উল্লেখ আছে। সাধারণ লোকে অন্য প্রয়োজনে না হইলেও পূজার জন্য দু-চারিটি ফুলগাছ রাখিত।

কিশোরগঞ্জ ছাড়িয়া আসার পর, বৎসরখানেক কসবায় থাকিবার সময়ে নিজে কিছু বাগান করিয়াছিলাম, কিন্তু খাস কলিকাতায় ১৯১৩ সন হইতে ১৯৪২ সন পর্যন্ত কোনো বাগান করিতে পারি নাই, সকল সময়েই প্রায় তিনতলাতে বাস করিয়াছি, সুতরাং বাগানের প্রশ্নও ছিল না।

দিল্লীতে আসিয়া প্রথম দশ বৎসর বাগান করিতে পারি নাই। কিন্তু পরে ছাত নিজের না হইলেও জোর করিয়া একটা বাগান করিয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই, গোলাপ গাছই ত্রিশটা ছিল, নানাজাতীয়। কিন্তু ইহার জন্য বাড়ির স্বত্বাধিকারিণীর সহিত প্রচণ্ড ঝগড়া হইত। তিনি বলিতেন, ছাত জখম হইতেছে। গাছে জল দিবারও অসুবিধা ছিল, কারণ তিনতলার ছাতে সকল সময়ে জল উঠিত না। তাহা ছাড়া মাটি ও সার জোগাড় করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল শেষজীবনে অক্‌স্‌ফোর্ডে আসিয়া বাগান করিবার সুযোগ পাইলাম। এ-কথা বলার প্রয়োজন যে, লন্ডনেও যাহারা ফ্ল্যাটে থাকে না তাহাদের সকলেরই বাগান থাকে। আমার মধ্যমপুত্র ফিন্‌চ্‌লী অঞ্চলে বাস করে, তাহার অতিসুন্দর বাগান আছে। আমিও অক্‌স্‌ফোর্ডে যে-বাড়িতে আছি তাহাতে বড় না হইলেও দেখিবার মত বাগান করিয়াছি। উহাতে নানাজাতীয় গোলাপ ভিন্ন রডডেনড্রন পর্যন্ত আছে। মরসুমী ফুলের গাছ বহু করি। ড্যাফোডিল, নারসিসাস ও টিউলিপ বহু হয়। মাটি সার ইত্যাদি পাইবার কোনো অসুবিধা নাই। নিকটবর্তী 'গার্ডেন সেন্টার' ছাড়া কাছের 'ফার্ম' হইতে বস্তা বস্তা সার পাই। আমার সামান্য ক্ষমতায় কি করিতে পারিয়াছি তাহার পরিচয় পাঠকগণ আমার বই ও প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত চিত্র হইতে পাইয়াছেন।

সকলের শেষে সখের শারীরিক পরিশ্রমের কথা বলি। আমার চিরকাল খোলা জায়গায় বেড়াইবার সখ। প্রতিদিন সর্বদাই চার-পাঁচ মাইল হাঁটিয়াছি। কিশোরগঞ্জ থাকিতে অথবা সেখানে গেলে, শহরের বাহিরে অনেক দূর যাইতাম। সেখানকার সাধারণ লোকে এই অকারণ হাঁটা বুঝিত না। পথে কৃষকশ্রেণীর লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হইলে জিজ্ঞাসা করিত— 'কই যাইন্ ?' (কোথায় যাচ্ছেন ?) আমি উত্তর দিতাম, 'কোথাও নয়, বেড়াচ্ছি।' তাহারা হাসিয়া বলিত, 'খালি এই বায়ু বেরাইন্ ?' (শুধু এইভাবেই কি বেড়ান ?) কাছের বাড়ি হইতে কেহ কেহ পরিশ্রান্ত হইয়াছি ভাবিয়া বলিত, 'একটু তামুক খাইয়া যাইন্।' (একটু তামাক খেয়ে যান।)

কলিকাতায় থাকার সময়েও প্রায় প্রতিদিন গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতাম, অথবা ইডেন গার্ডেনে। দিল্লীতে থাকিয়া হাঁটিয়া কাশ্মীর গেট হইতে নূতন দিল্লীতে ব্রডকাস্টিং হাউসে গিয়াছি, যমুনার ধারেও বেড়াইতে গিয়াছি। কিন্তু তাহা খুব প্রীতিকর হইত না। নূতন দিল্লীর পথের বেশিরভাগই বারাঙ্গনাদের বাস। তাহাদের দালাল রাত্রি ছাড়াও দিনের বেলাতেও আসিয়া আমাকে ক্ষুদ্রকায় দেখিয়া উত্তরাপথের বারবনিতার অযোগ্য ভাবিত ও বলিত 'বোম্বাইকী ছোটিসি খুবসুরৎ ছুকরী।' আর যমুনার ধারে গেলে আর এক অপ্রিয় ব্যাপার দেখিতাম। সকলেই জানেন, পশ্চিম অঞ্চলে নদীতীর শৌচাগার। সুতরাং দুর্গন্ধে নাকে ধুতির কোঁচা চাপা দিতে হইত, লাফাইয়া লাফাইয়া হাঁটিতে হইত।

কিন্তু এইভাবে বেড়াইলেও বাল্যকালের দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত দেখি নাই। আমার 'বাঙালী জীবনে রমণী' বই-এ লিখিয়াছি,—

'নদী, জল, উন্মুক্ত উদার নীল আকাশ, কাজলকালো বা মরালশুভ্র মেঘ, দিগন্তপ্রসারিত ক্ষেত ও ঘনশ্যাম বনানী বাঙালী জীবনে প্রাণের অবলম্বন।'

এই সব বারো বৎসর বয়সে ছাড়িয়া আসিয়া, দেহে প্রাণ রাখিবার জন্য প্রতিদিন চেষ্টা করিতে হইয়াছে, হাঁপাইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই সবই আমি জীবনের শেষে অক্‌স্‌ফোর্ডে আসিয়া পাইলাম !

অক্‌স্‌ফোর্ড কৃষি-প্রধান শায়ার, সুতরাং শহরের বাহিরে গেলেই গ্রাম্যদৃশ্য দেখা যায়— যেমন লন্ডনে যাইবার পথে, তেমন সেক্‌স্‌পীয়রের বাসস্থান, স্ট্র্যাটফোর্ডে, তেমনই দক্ষিণে রেডিং বা নিউবেরীতে যাইতে, আবার পশ্চিমে সুইনডনের দিকে যাইতে। সবদিকেই একই দৃশ্য। কিছু দক্ষিণে বার্কশায়ার ডাউনসে গিয়া যে-পথ ধরিয়া খ্রীষ্টীয় তীর্থযাত্রীরা কেন্টারবেরী যাইত, যাহার কাহিনী চসারে আছে, তাহাতেও হাঁটিয়াছি। হোয়াইট-হর্স হিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়া নূতন প্রস্তরযুগের মানুষের তৈরি বিরাট ঘোড়াও দেখিয়াছি।

কিন্তু যাহা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাহা নিজের বাড়িতে থাকিয়া প্রভাতভ্রমণের আনন্দ। আমার আগের বাড়ি হইতে অল্পদূরে একটি বড় পার্ক ছিল। তাহাতে ফুলের বাগান ও বিস্তৃত 'লন' ছাড়া একটি মাঝারি আকারের হ্রদ ছিল। উহাতে হাঁস, জল-মোরগ, ডাহুক ইত্যাদি দেখিতে পাইয়াছি। মাঝে মাঝে রাজহাঁসও আসিত। সবই অবশ্য বন্য। এই সব পাখির মাতারা যখন ছোট ছোট শাবক লইয়া সাঁতার কাটিত তখন দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই পার্কের প্রান্ত হইতেই শস্যক্ষেত্র আরম্ভ হইয়াছিল। আমি পার্ক হইতে বাহির হইয়া পায়ে-চলার পথে নানা শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া তিন-চার মাইল হাঁটিতাম। পথের শেষে চারওয়েল নদীতে পৌঁছিয়া একটা পুলের উপর দাঁড়াইয়া কিশোরগঞ্জের নদীর মত নদীর পারে নল-খাগড়ার বন ও জলে হাঁস ইত্যাদি দেখিতাম। এখন আর এতদূর যাইতে পারি না, তবে যাহা দেখিয়াছি তাহাতেই দেহে ও মনে শক্তি পাইয়াছি।

কি দেখিতে পাইতাম বলি। কোনো জায়গায় কাঁচা গমের ক্ষেত, প্রথমে নবীন সবুজ রঙ-এর, আবার জুলাই-আগস্ট মাসে সোনালী রঙ-এর। দুই অবস্থাতেই ঢেউখেলানো। কোথাও বা 'রাই' বা বার্লির (যবের) ক্ষেত। টেনিসনে পড়িয়াছিলাম,

'On either side the river lie
Long fields of barley and of rye
That clothe the wold and meet the sky...'

সেই দৃশ্য সত্যই দেখিতাম, ঢালু পাহাড়ের শেষে শস্যের ক্ষেত যেন আকাশে উঠিতেছে, তাই দিকচক্রবালকে দেখিতে পাইতাম না। মনে হইত উহা আরও যেন দূরে। কোনো কোনো ঢালু ক্ষেত উজ্জ্বল হলদে সর্ষেফুলে ঢাকা, কোনটাতে গরুবাছুর চরিতেছে, কোনটাতে তুলার স্তূপের মত ভেড়া দাঁড়াইয়া আছে বা শুইয়া আছে। মেষশাবকেরা লাফাইতেছে।

আবার শীতকালে যখন বেড়াইতে যাইতাম, তখন বিস্তীর্ণ ক্ষেতগুলি বরফে ঢাকিয়া থাকিত। পা বরফে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত বসিয়া যাইত। পথ দেখা যাইত না— দূরের পত্রহীন গাছ দেখিয়া দিক ঠিক করিয়া বাড়িতে ফিরিতাম।

শেষ কথা এই বলিব— ইহা দেশে থাকিলে কোথায় দেখিতে পাইতাম? বর্তমান কলিকাতাই তো হিন্দু বাঙালীর বাসস্থান সেখানে কি?

আমি অক্সফোর্ডে থাকিয়া বাল্যের বাংলাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, দেশের প্রায় সকল বাঙালীর অপেক্ষা বেশি খাঁটি বাঙালী আছি। আশা করি, এই কথা স্বীকার করিয়া যে-সব বাঙালী ও বাঙালিনী দেশে থাকিয়াও জীনস্ পরেন তাঁহারাও আমাকে দেশত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিবেন না।

॥ ১৭ ॥

লেখকের নিবেদন

আমার লেখার অনুরাগী পাঠক-পাঠিকারা আমার কাছে চিঠি লেখেন; অনেক চিঠির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর দিই নাই, ইহাতে ভদ্রতার ত্রুটি হইয়াছে। তাই অপরাধ স্বীকার করিয়া একটি নিবেদন করিতেছি।

আমি ৯৭ বৎসরে পড়িয়াছি, দেহ একেবারে অচল না হইলেও ক্ষীণ ও দুর্বল। তাহার উপর ১৯৯১-এর মাঝামাঝি হইতে এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় অন্ধ ছিলাম, চোখে ছানি পড়িয়া। সম্প্রতি অপারেশনের পর ডান চোখে কিছু দেখিতে পারি, কিন্তু অস্পষ্ট, কারণ অপারেশনটি পুরাপুরি সফল হয় নাই, বাম চোখের অপারেশন ঠিক হইয়াছে। সেই চোখে এখন দেখিতে পাই। অনেক কাজ করিবার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু পারিব কিনা বলিতে পারি না। যদিও বা পারি, তাহা হইলেও চিঠিপত্র নিতান্ত আবশ্যকীয় না হইলে লিখিতে পারিব না।

আমার অক্ষমতার কথা জানিয়া, যাঁহাদের প্রতি আমি অভদ্রতা করিয়াছি বা করিব তাঁহারা যেন অপরাধ ক্ষমা করেন। এই নিবেদন দুই বাংলার বাঙালীকেই জানাইলাম। তাঁহারা যে আমার লেখা পড়েন ইহাতেই আমি কৃতার্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বি তী য় ভা গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের কাহিনী

আমার জীবনের যে-কয়েকটা ব্যাপারের জন্য আমার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়, তাহার জবানবন্দি বা 'অ্যাফিড্যাভিট' দিলাম। কিন্তু এইভাবে উত্তর লাঠিখেলা অথবা পাশ্চাত্য ধারায় 'ডুয়েলে'র মত। শুধু পাঁয়তারা কষিয়া লাঠি ও ঢালের ঠোকাঠুকি অথবা 'রেপিয়ারের' ঝন্‌ঝন্ করিয়াই এই আড়াআড়িতে জেতা যায় না, প্রয়োজন হয় শক্ত মাটিতে পা রাখার। অনেকেই অবশ্য কেবলমাত্র খোঁটার জোরেই লড়ে। তবে সেই ধরনের লড়াই কোন্ জন্তুর বিশিষ্ট আচরণ তাহা বাংলা প্রবাদেই বিখ্যাত। বেশির ভাগ বাঙালী তার্কিক মনুষ্যরূপী সেই জীবটি হইলেও আমার সেই আচরণ অবলম্বন করিবার ইচ্ছা মোটেই নাই। আমার সাফাইকে আমি শক্ত মাটির উপর দাঁড় করাইতে চাই, যদিও বা আমি তর্কের খাতিরে লম্ফ-ঝম্প কিছু মাত্রায় করি, তামাসা দেখাইবার জন্য—তবু শক্ত মাটিতেই আমার পা থাকে, উহার উপরেই আমার জোর। সেই শক্ত মাটি আমার জীবন। মাটির উপর পা রাখাতেই আমি জীবনে ধর্মভ্রষ্ট হই নাই। এখন সেই জীবনের কিছু পরিচয় দিব।

তবে সেটা হইবে আংশিক বিবরণ, সারাজীবনের নয়। আমার জীবনের তিনটি পর্যায়ের কথা বলিব—প্রথম, আমার বাল্যাবস্থা হইতে কৈশোর প্রাপ্তি পর্যন্ত ; দ্বিতীয়, আমার সংসারপ্রবেশ হইতে বিবাহ পর্যন্ত ; তৃতীয়, বিবাহিত জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরের কথা। আমার জীবনের প্রথম যুগ সুখের যুগ হইয়াছিল ; পরবর্তী দুইটি যুগ অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের।

আমার বিবাহটা আমার জীবনের একটা বিশিষ্ট ব্যাপার। ইহার ফলে আমি একধরনের জীবন হইতে অন্যধরনের জীবনে প্রবেশ করি। বিবাহের পূর্বে আমার জীবন লক্ষ্যহীন ছিল, কি-ভাবে তাহার পরিচয় এই ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে। বিবাহের পর বাঁচিয়া থাকিবার যেন একটা অবলম্বন পাইলাম। মনে হইল, এখন হইতে আমার মাথার উপর অন্যের জীবনের দায়িত্ব চাপিল—আর প্রবৃত্তির বশে চলিবার অধিকার রহিল না। সেই দায়িত্ব অবশ্য পত্নী ও ভাবী সন্তানের। সেই দায়িত্বই যে আমার মুখ্য দায় তাহা মানিয়া লইতে আমি কিছুমাত্র দ্বিধা করি নাই। যাহা আমি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহাকে অবশ্য ছাড়িলাম না, কিন্তু উহাকে আপাতত গৌণ ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিলাম।

বলা বাহুল্য এই নূতন কর্তব্য আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারি নাই। আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম মাসের বিবরণ হইতেই উহা অনুমান করা যাইবে। উহা এই ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে। তবে আমার অক্ষমতা বিবেকবুদ্ধির অভাব হইতে আসে নাই। সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে আমি জ্ঞানপাপী। ইহার কারণ যেমন দৈহিক তেমনই মানসিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি একাধারে বাঙালী ও ইংরেজ

যাঁহারা আমাকে ইংরেজের চাটুকার, এমন কি গোলাম বলিয়াও প্রচার করেন, তাঁহাদের প্রতিবাদ করিয়া এই অধ্যায়ের বক্তব্যকে আমি কলঙ্কিত করিব না। এইভাবে ও অন্যভাবে আমার একটা-না-একটা স্বকপোলকল্পিত মূর্তি গড়িয়া দেশের পণ্ডিতেরা আমাকে বধ করিবার চেষ্টা আমার সারা লেখকজীবন জুড়িয়াই করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের এই প্রয়াস চিতোর রাণার নকল বুঁদীগড় ভাঙিয়া আসল বুঁদীগড় ধ্বংসের আনন্দ পাইবার মত। আমি কিন্তু নকল বুঁদীগড়কেও রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব না। উহা অর্থহীন আত্মবলিদান হইবে। আমি শুধু আমার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সত্যকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। কার্ডিন্যাল নিউম্যান বলিয়াছিলেন—অসত্যের খণ্ডন তর্কের দ্বারা হয় না, হয় সত্যকে উপস্থাপিত করিয়া। নিজের সম্বন্ধে সত্য বলিয়া আমার যাহা ধারণা তাহা প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়া ফেলি। পরে সারাটা অধ্যায়ই এই সূত্রের বিস্তারিত ভাষ্য হইবে। তবে আমি ইহাও জানি যে, আমার কথা বিশ্বাস করানো আমার বলার উপর নির্ভর করিবে না। যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা নিজের গরজেই করিবেন।

AMARBOI.COM

আমার ব্যক্তিত্ব আসলে কি ?

উহা একদিক হইতে যেমন দ্বিধাবিভক্ত, আর একদিকেও তেমনই দ্বিধাসংযুক্ত। আমি যে ইংরেজের প্রশংসা করি ও ইংরেজের জীবন ও সভ্যতা সম্বন্ধে গৌরব অনুভব করি, তাহা ইংরেজের অধীন বাঙালী হিসাবে নয়, করি নিজেকে ইংরেজ মনে করি বলিয়া ; অর্থাৎ জন্মে না হইলেও মানসিক ধর্মে এবং আংশিকভাবে জাতীয়তাবোধেও, আমি ইংরেজ, ইহা মনে করিয়া। সুতরাং বলিব, ইংরেজ জাতির কীর্তি সম্বন্ধে আমার গর্ব জাতীয় গর্ব, পরাধীন ব্যক্তির বিজাতীয় শাসকের উদ্দেশে স্বার্থপ্রণোদিত অথবা দাসমনোবৃত্তি-প্রসূত স্তুতি নয়। ইংরেজের সহিত এই একাত্মতাবোধের জন্যই অন্যদিকে আমি ইংরেজের আধুনিক জীবন ও আচরণের কঠিন সমালোচনাও করি। উহা ১৯৭০ সন হইতে করিতেছি ; আবার উহা ইংলণ্ডের বড় বড় সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজ সম্পাদকেরা আমার এই সমালোচনা জাতিবৈরের দ্বারা প্রণোদিত মনে করেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ যদি নিজের দেশ ও জাতিকে সত্যই ভালবাসে তাহা হইলে সে উহাদের কোনটিরই বিপথে যাওয়া সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারে না। আমি যে বর্তমানে ইংরেজের সমালোচনা করি উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের দোষ সম্বন্ধে দেশপ্রেমিকের অসহিষ্ণুতার ফল। উহার সামান্য আভাষমাত্র দিব। আমি ১৯৭০ সনে এখানে আসিবার পরই লিখিয়াছিলাম যে, ইংরেজ সমাজের উচ্চস্তরেও একটা ক্ষুদ্র অর্থপরায়ণতা দেখা দিয়াছে; সম্প্রতি কার্ডিন্যাল হিউমেরও দোষ ধরিয়াছি; সর্বোপরি বাঙালী হইয়া (অর্থাৎ ভারতপ্রবাসী তৎকালীন ইংরেজের মতে বাবু ইংলিশের লেখক হইয়া) 'ডেলী-টেলিগ্রাফ' সংবাদপত্রে লিখিয়াছি যে, আজিকার ইংরেজ বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিতেও পারে না। উহার একটি শব্দও সম্পাদক বাদ দেন নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিব যে, ইংরেজজীবনের আধুনিক গতি সম্বন্ধে এই ধরনের কঠিন কথা ছাপার অক্ষরে বলিবার সাহস বা ক্ষমতা কোনও 'দেশপ্রেমিক' বিলাতবাসী ভারতীয়ের হয় নাই। তাঁহার দেশে উচ্চ মাহিনার চাকুরি পাইবার জন্য অক্স্‌ফোর্ড কেম্‌ব্রিজের ছাপ লইতে আসেন, বেশি টাকার লোভে চিরজীবনের মত দেশত্যাগী হন। ইঁহারা সকলেই জ্ঞানপাপী, কিন্তু ইঁহারা মনে করেন যে, অন্তরে-অন্তরে ইংরেজবিদ্বেষে দগ্ধ হইলেই তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। খুব উগ্র 'দেশপ্রেমিক' হইলে ইঁহারা গোপনে ইংরেজের বাপান্ত করিয়া বলেন, 'আমরা ইংরেজের যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে উহারা বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।' আমার ইংরেজ-নিন্দা এই জাতীয় নয়।

এইবার আমার দ্বিত্বের বাঙালী দিকটার কথা বলি। ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমার জীবনে ও আচার-ব্যবহারে যে ইংরেজী ভাব দেখা দিয়াছিল তাহার বশে আমি ইংরেজ সম্বন্ধে যেমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছি, জন্মে ও কুলে শীলে বাঙালী হইয়া বাঙালী সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই করিয়াছি। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি যে, একদিকে আমি যেমন বাঙালীর কীর্তি সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করি, অন্যদিকে বাঙালীর অধোগতি ও ধর্মভ্রষ্টতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হই। আমার মনোভাব ইংরেজ সম্বন্ধে যাহা, বাঙালীর সম্বন্ধেও তাহাই। ইংরেজ সম্বন্ধে আমার বিচারহীন পক্ষপাতিত্ব নাই, বাঙালী সম্বন্ধেও বিচারহীন অনুরাগ নাই।

আমি এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াও ঐক্য লাভ করিয়াছি। উহার কারণ আমি বাঙালী হিসাবেও খাঁটি, ইংরেজ হিসাবেও খাঁটি। ইহা আজিকার বাঙালীর বোধগম্য হইবে না। না হইবার কারণ এই যে, ইঁহারা বাঙালী হিসাবেও মেকী, সাহেব হিসাবেও মেকী। আমি দুই কুল বজায় রাখিয়া কোনো কুলই ছাড়ি নাই। ইহা দেশের পণ্ডিতেরা বুঝেন নাই, হয়ত বা বুঝিতে চাহেনও নাই। ইচ্ছা থাকিলে ইঁহাদের মত বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা আমাকে চিনিতে পারিতেন না, উহা সম্ভব হইত না। তবে ইহাও বলিব—ইঁহাদের বিদ্যা দোকানদারী মাত্র, ইঁহারা অর্জিত বিদ্যাকে নিজেদের জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভূত করিতে পারেন নাই। উহা বাহিরের পোষাক, অর্থাৎ গান্ধীযুগে বাঙালীর 'মিটিংকা কাপড়া'র মত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু একজন বিদেশী পণ্ডিত আমার ব্যক্তিত্বের আসল রূপ চিনিতে পারিয়াছেন। তিনি শিকাগো ও কেম্‌ব্রিজের অধ্যাপক এডোয়ার্ড শিলস। তিনি ত্রিশ বছরেরও বেশি কাল ধরিয়া আমাকে জানেন। কিছুদিন আগে তিনি 'আমেরিকান স্কলার' বলিয়া যে-একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকা আছে তাহাতে আমার সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন,—

'Mr. Chaudhuri's being an Indian and a Bengali, and a European and Englishman, all at the same time, is unique. He is perhaps the only one of his kind and there is no established name for the likes of him. Perhaps the old designation of "citizen of the world" is the only one available.... Mr. Chaudhuri is the real thing.'

ইহা একদিকে আমার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য কিন্তু অন্যদিকে নয়, কেন নয় বলিতেছি।

বাঙালী চরিত্রের দ্বৈত ও অদ্বৈত রূপ

আসলে আমি 'unique' অর্থাৎ একক বা বিশিষ্ট নই। প্রফেসর শিলস যে ইহা বলিয়াছেন তাহা স্বাভাবিক, কারণ বাঙালীর সমগ্র জীবন ও সেই জীবনের ইতিহাস তিনি জানেন না। ইহা তাঁহার অপরাধ নয়, এই ইতিহাস কেহই লেখে নাই। যাঁহারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নূতন জীবন—Vita nuova-র সন্ধান রাখেন, তাঁহারা সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন যে, আমি বাঙালীর নবজীবনে আবির্ভূত একটা সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি ভিন্ন কিছুই নই। ইহার অর্থ—আমি একটা 'ম্যাক্রোকজমে'র মধ্যে 'মাইক্রোজম' মাত্র। আমার জীবন এক যুগের সমগ্র বাঙালী জীবনের একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।

গত শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত যত বাঙালী ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া ছিল, তাহাদের সকলেই একাধারে বাঙালী ও ইংরেজ হইয়া গিয়াছিল—উহার মধ্যে কেহ বা সাধারণ স্তরে, কেহ বা অতি উচ্চ স্তরে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সকল মহান বাঙালীকেই 'বাঙালী-ইংরেজ' অথবা 'ইংরেজ-বাঙালী' বলা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ, এবং রবীন্দ্রনাথও তাহাই। এই সব অসাধারণ 'ইংরেজ-বাঙালী'র সহিত সাধারণ 'ইংরেজ-বাঙালী'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, কারণ মুষ্টিমেয় অসাধারণ 'ইংরেজ-বাঙালী'র শিষ্য হিসাবে অগণিত সাধারণ 'ইংরেজ-বাঙালী' না থাকিলে পথপ্রদর্শকদের কৃত্য মরুভূমিতে নদীর মত ধারা হারাইয়া ফেলিত।

ইহার অতিরিক্ত, অসাধারণ 'ইংরেজ-বাঙালী'র মধ্যে যাঁহারা লেখক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের গল্প-উপন্যাসেও প্রধান চরিত্রগুলি তাঁহাদের মত 'ইংরেজ-বাঙালী'রই রূপ। এই সব গল্প ও উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্রেও, আমি যে-দ্বিত্বের কথা বলিতেছি তাহা দেখা যায়, এবং দ্বিত্বের উপরেও যাহা অর্থাৎ দ্বিত্বের সমন্বয়, তাহাই বিশেষ করিয়া লক্ষীভূত হয়। এই ধরনের কল্পিত চরিত্রের দৃষ্টান্ত আমি শুধু দুই জোড়া করিয়া চারিটি দিব। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'তে দ্বিত্ব ও দ্বিত্বের সমন্বয়ের একটা দিক পাই গোরা ও সুচরিতাতে, অপরটা পাই বিনয় ও ললিতাতে। তেমনই শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাসে' পাই, একটা বিপ্রদাস ও সতীতে, আর একটা দ্বিজদাস ও বন্দনাতে। সকলগুলিই 'বাঙালী-ইংরেজে'র বিভিন্ন রূপ।

এই ব্যাপারটা বিশদ করিবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিব যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর, এমন কি অসম্ভব বলিয়াও মনে হইতে পারে। বিপ্রদাস সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলম্বন করিতে চলিয়াছে। উহা কি প্রাচীন হিন্দুর চতুর্থাশ্রম! মোটেই নয়। শ্রীমদ্ ভগবদ্-গীতায় অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্ন্যাসই কি, ত্যাগই বা কি? কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, কাম্য কর্মের নাশকেই ঋষিরা সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাও বলেন যে, সকল কর্মের ফলকেই ত্যাগ করা প্রকৃত ত্যাগ। বিপ্রদাসের সন্ন্যাস অবলম্বন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। বন্দনা তাহাকে বলিল,—

'কি কঠোর আপনার মন, একে না পারা যায় গলাতে, না পারা যায় টলাতে। দেবেন না উত্তর?...আর আপনাকে পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু মনকে শান্ত করি কি করে বলে দিন। এ যে কেবল কেঁদে উঠতে চায়।'

বিপ্রদাস উত্তর দিল,—

'মন আপনি শান্ত হবে, বন্দনা! যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝবে তোমার দাদা দুঃখের মাঝে ঝাঁপ দিতে গৃহত্যাগ করেনি, কিন্তু তার আগে নয়।'

বন্দনা স্বীকার করিল যে, তাহার 'বড়দা', যেখানে আছে মানুষের পরম শ্রেয়ঃ, সেই তীর্থেই যাত্রা করেছেন। তখন বিপ্রদাস আরও স্পষ্ট করিয়া বলিল,—

'হাঁ, তোমার মনকে বুঝিয়ে বলো, যা সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে মধুর, বড়দা' সেই পথের সন্ধানে বার হয়েছেন।'

ইহা সকল কর্মের ফলকে ত্যাগ করা নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা।

তবে এই কথা কিন্তু শরৎচন্দ্রই প্রথম শুনান নাই। তাঁহার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছিলেন। ভ্রমরের মৃত্যুর বারো বৎসর পরে সন্ন্যাসী গোবিন্দলাল ভাগিনেয় শচীকান্তকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন এবং শচীকান্ত যখন তাঁহাকে বিষয় ফিরিয়া লইতে অনুরোধ করিল, তখন তিনি উত্তর দিলেন,—

'যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য তাহা আমি পাইয়াছি। ভ্রমরের অপেক্ষাও মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র আমি পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি।'

শচীকান্ত প্রশ্ন করিল,—

'সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?'

গোবিন্দলাল উত্তর দিলেন,—

'কদাপি না। ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার ভ্রমর, ভ্রমরাধিক ভ্রমর।'

সংসার হইতে বিমুখ হওয়া যে হিন্দুর নাস্তিক্য প্রণোদিত বৈরাগ্য নয়, পক্ষান্তরে বাসনাকে উচ্চতম স্তরে তুলিয়া অসীম ও অনন্ত আনন্দলোকে যাত্রা, এ-কথা হিন্দুর কোনো শাস্ত্রে নাই। উহা খ্রীষ্টধর্মের বাণী। এ-বিষয়ে অন্য তথ্য দেখাইবার আগে দান্তের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। দান্তে বলিয়াছিলেন, 'E'n la sua volontate e nostra pace' 'তাঁহার নিজের ইচ্ছাতেই আমাদের শান্তি।' গোবিন্দলালের উক্তি ইহা হইতেই আসিয়াছিল।

এখন অন্য প্রমাণও দিতেছি। বাইবেলে সেন্ট জন এইরূপ বলিয়াছেন,—

'Love not the world,...for all that is in the world, the Lust of the flesh, Lust of the eyes, and Pride of Life, is not of the Father, but is of the world.' 'Beloved, let us love one another; for love is of God. ...He that

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

loveth not knoweth not God, for God is love.'

কিন্তু এই প্রেম লৌকিক প্রেম নয়, লোকোত্তর প্রেম। লৌকিক প্রেম হইতে লোকোত্তর প্রেমে আরোহণ খ্রীষ্টধর্মের একটা বড় কথা। প্রথম যুগের খ্রীষ্টানেরা প্রেমের এই দুইটি রূপের জন্য দুইটি শব্দ ব্যবহার করিত। লৌকিক প্রেমের গ্রীক ভাষায় নাম ছিল eros ; লোকোত্তর প্রেমের নাম ছিল agape. বঙ্কিমচন্দ্র যখন নিশার মুখে এই উক্তি দিয়াছিলেন যে, 'ভক্তি এক ভালবাসা আর', তখন তিনি agape এবং eros-এর মধ্যে পার্থক্যের কথাই স্মরণ করিয়াছিলেন। দান্তে ইহার কথা প্রচার করিয়াছিলেন বেয়াত্রিচের প্রতি তাঁহার প্রেমের রূপান্তর দেখাইয়া। 'ভিতা-নুয়োভা'তে তিনি লৌকিক প্রেমের রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, 'ডিভিনা কম্মেদিয়া'-তে করিয়াছিলেন উহার লোকোত্তর রূপের—বেয়াত্রিচেকে স্বর্গের পথপ্রদর্শিকা করিয়া।

আমি এ-কথা বলিব না যে, বঙ্কিমচন্দ্র সেন্ট জনের বাণী পড়িয়াই গোবিন্দলালের মুখে উক্তিটি দিয়াছিলেন। কিন্তু সেন্ট জনে যে-মনোভাবের আদি রূপ পাই উহা সমস্ত খ্রীষ্টীয় ধর্মজীবনে কালক্রমে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের কাছেও পৌঁছিয়াছিল।

আমি শুধু ধর্মানুভূতি সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম এই জন্য যে, আমাদের ধারণা বাঙালীর নূতন যুগের হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুধারা হইতে উদ্ভূত ; ইহার মধ্যেও যে ইউরোপীয় ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, এ-কথা কেহই সহজে বিশ্বাস করিবে না। তবু বলিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের নব্য হিন্দুত্ব, আমরা মানসিক ধর্মে ইংরেজ না হইলে সৃষ্টিও করিতে পারিতাম না, গ্রহণও করিতে পারিতাম না।

আসলে আমাদের মানসিক জীবনের সর্বত্রই তখন বাঙালীত্ব ও ইংরেজত্বের মিশ্রণ হইয়া গিয়াছিল। উহা বাঙালীর উনবিংশ শতাব্দীর জীবনযাত্রার একটা ব্যাপক লক্ষণ। আজকাল উহার উপলব্ধি নাই বলিয়াই এই ঐতিহাসিক তথ্যটা আমাকে পুনঃপ্রচার করিতে হইতেছে। আমি কি করিতেছি তাহার পরিচয় একটা গল্প বলিয়া দেখাইব।

১৯০৭ সনের শেষে আমি আমার এক জ্ঞাতিসম্পর্কে ভাইপোর বিবাহ দেখিবার জন্য পৈতৃক গ্রাম বনগ্রামে যাই। ভাইপো হইলেও সে আমার অন্তত বারো বছরের বড় ছিল, আমার বয়স তখন সবে দশ হইয়াছিল। ভাইপো আমাদের বড় শরিকের দিকের। তাহার বিবাহ অতিশয় ধুমধাম করিয়া হইতেছিল। অন্য আমোদ-প্রমোদের মধ্যে গানবাজনার জন্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ভাই আফতাব্‌উদ্দিনকে আনা হইয়াছিল। তিনি বাঁশী বাজাইতেন এবং গানও শুনাইতেন। আমি আসরে বসিয়া তাঁহার মধুর বাঁশী বাজানো শুনিলাম। তিনি হঠাৎ বাঁশী বাজানো বন্ধ করিয়া একহাতে বাঁশীটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে গাহিয়া উঠিলেন,—

'পুরান কথা জাগাইয়া দে রে,
নূতন হইয়া উঠুক দেশে।'

আমিও পুরাতন কথাকেই নূতন বলিয়া প্রচার করিতেছি। উহা আমার কল্পিত কথা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালীর ধর্মে ও ইংরেজের ধর্মে আমার দীক্ষা

এই দীক্ষা দুই দিকেই জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং সূত্রপাতের কথা আমার স্মৃতিতেই নাই। এই সূত্রপাত আমার পিতামাতার জন্যই হইয়াছিল। আমি যে অগণিত সাধারণ 'ইংরেজ-বাঙালী'র কথা বলিয়াছি উঁহারা তাঁহাদেরই দুই জন ছিলেন। সুতরাং নিজেদের প্রত্যেকটি সন্তানকেও তাঁহারা নিজেদের জীবনের ধারা অনুযায়ী বড় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লালন-পালনে শিশুকালেও আমি কি-ভাবে 'ইংরেজ-বাঙালী' হইয়াছিলাম তাহার বাহ্যিক, বস্তুগত প্রমাণ আমি জ্ঞান হইবার পর দেখিতাম। দুইটির কথা বলি।

একটি আমার আড়াই বৎসর বয়সে তোলা ফটোগ্রাফ, আমার পিতা, বড় ও ছোট ভাই ও অন্যান্যের সহিত। চেয়ারে-বসা পিতার দুইদিকে দাদা ও আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, দুজনেই সাহেবী পোষাক পরা অর্থাৎ গায়ে শার্ট ও গলাখোলা কোট, নীচে পশমী হাফ প্যান্ট ও পায়ে জুতা মোজা। পিছনে চাকরের কোলে আমার ছয়মাস বয়স্ক ছোট ভাই (ক্ষীরোদ) ছিল। বাঙালী হইবার বস্তুগত প্রমাণ কিন্তু এইভাবে ফোটোগ্রাফে দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ সাধারণত তিন-চার বৎসর বয়স পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া ঘুরিতাম, শুধু গলায় সোনার পাটা, হাতে মলা—সেও সোনার, আর কোমরে সোনাবসানো ঘুনসী পরিয়া। এই অলঙ্কারগুলি আমি সাত-আট বৎসর বয়সের হওয়া পর্যন্ত গায়ে না পরিয়া হাতে লইয়া নাড়াচড়া করিতাম। তবে শীতকালের জন্য আমাদের কোট-প্যান্ট ছাড়া সুন্দর পশমী ওভারকোটও ছিল। এগুলির রং ছিল কমলালেবুর, আমরা ওভারকোট পরিয়া রোদে দাঁড়াইয়া সিদ্ধ হইতে আনা কমলালেবু খাইতাম, উহার খোসার রস টিপিয়া পরস্পরের চোখে ছিটকাইয়া দিতাম, ও জ্বালায় উহু-আহা করিতাম।

এইভাবে সূত্রপাত হইয়া আমার 'ইংরেজ-বাঙালী' হওয়া অব্যাহত গতিতে চলিল। কিন্তু দেহেমনে এই রূপ হইবার ইতিহাস আমি প্রধানত আমার প্রথম বারো বৎসর হওয়া পর্যন্ত দিব, সামান্য আরও সংবাদ আমার ষোলো বৎসরের হইয়া ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষা পাশ করা অবধি জীবন হইতে দিব। ইহার পরের কিছুতেই এইভাবে জীবন পূর্ণবিকশিত হওয়ার পথে বাধা পড়ে নাই, শুধু অনিবার্য পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং আমার বিবরণ 'ইংরেজ-বাঙালী' জীবনের বুনিয়াদ গড়ার কাহিনী মাত্র হইবে। ইহার পরের ইতিহাস দিবার প্রয়োজন নাই এই জন্য যে, বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের জীবন যে ছাঁচে গঠিত হয়, উহা মৃত্যু পর্যন্ত থাকে। এই জীবনে পরবর্তী অভিজ্ঞতা হইতে যাহা আসে তাহা নূতন অর্জন যোগ করা মাত্র হয়, মূলত অন্য ধর্মের হয় না। অর্থাৎ প্রথমে একতলা বাড়ি তৈরি করিয়া উহাতে উপরের তলা যোগ করার মত হয়, নূতন বাড়ি গড়া হয় না। এই কারণে কেহ যদি বারো বৎসর বয়সের হইবার আগেই খাঁটি না হয়, তাহা হইলে কখনও খাঁটি হয় না, মেকী হইয়াই সারাজীবন কাটায়।

এটাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমার 'ইংরেজ-বাঙালী' রূপ কলিকাতায় গঠিত হয় নাই, হইয়াছিল ময়মনসিংহ জেলার মহকুমা-শহর কিশোরগঞ্জে। সেখানে আমরা টিনের আটচালায় বাস করিতাম, মেঝে ছিল মাটির, দেয়াল ছিল দরমার। কিন্তু মনে ও চরিত্রে ইংরেজীভাবাপন্ন হইতে বাধা আমাদের বাহ্যিক জীবনের গ্রাম্যতা হইতে আসিত না। ইহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় দিব। আমি ১৯১৩ সনে গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতা হইতে পৈতৃক গ্রাম বনগ্রামে গিয়া দেখিলাম, সেখানকার স্কুলের ছাত্রেরা ডিকিন্সের 'টেইল অফ টু সিটিজ' হইতে সিডনী কার্টনের দ্বারা ডার্নের উদ্ধার অভিনয় করিতেছে। সেখানেই 'টম ব্রাউনস স্কুল ডেজ'ও পড়িলাম। উহার মত নিভাঁজ ভিক্টোরিয়ান ইংরেজী গল্প আর একটিও ছিল না। ইহাতে ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তা শোনানো হইয়াছিল,—

টম—'What a noble game it is too!'

আর্থার—'Isn't it?'

টম—'But it's more than a game. It's an institution, the birthright of British boys old and young, as habeas corpus and trial by jury are of British men.'

একটি অসঙ্গত উপস্থিতি সম্বন্ধে মলিয়েরের উক্তি আছে—'What the devil was he doing in that galley?'

বনগ্রামে 'টেইল অফ টু সিটিজ' হইতে অভিনয় ও 'টম ব্রাউনস স্কুল ডেজ' হইতে ক্রিকেট খেলার কথা পড়া সম্বন্ধে ঠিক এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের বাল্যকালে দুইটিই বাংলার গ্রামে গ্রামেও সম্ভব হইয়াছিল। কলিকাতায় যে নূতন বাঙালী মনের সৃষ্টি হয়, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিতে বাঙলার গ্রাম্য মনের মূর্তিও অন্য রূপ ধারণ করিয়াছিল।

আমি এই প্রবন্ধে আমার খাঁটি হিন্দু বাঙালী হইবার পরিচয় দিব, পরে 'ইংরেজ-বাঙালী' হইবার কাহিনী বলিব। দুই ধরনের বাঙালী আমি একই সঙ্গে বারো বৎসর বয়সের মধ্যেই হইয়া গিয়াছিলাম। পরে যাহা হইয়াছি তাহা চারা গাছ বাড়িয়া পূর্ণবর্দ্ধিত গাছের মত, দুই-এর মধ্যে ঐক্যের কোন অভাব হয় নাই। এখন একই সঙ্গে বাঙালী ও ইংরেজ হইবার আরও বিস্তারিত বিবরণ দিব।

আমার পৈতৃক ভিটা ও পিতৃকুল

আমি যে খাঁটি বাঙালী হইয়াছিলাম ও তাহাই রহিয়াছি উহার মূলগত কারণ পৈতৃক ভিটা ও পিতৃকুলের সহিত অবিচ্ছিন্ন মানসিক যোগ। আমার সাতানব্বুই বৎসরের জীবনের মধ্যে শুধু বারো বৎসর আমার জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ ও পৈতৃক গ্রাম বনগ্রামে কাটিয়াছিল। তবু এই দুইটি জায়গাই আমার জীবনের বুনিয়াদ হইয়া রহিয়াছে।

এ-ব্যাপারটা কিন্তু আমার বাল্যকালে ভদ্র ও বনিয়াদী বাঙালীর জীবনের ধারাতেই ছিল। তখন ভদ্র বাঙালী জীবিকার জন্য শহরবাসী হইলেও পৈতৃক গ্রামকেই নিজেদের আসল বাসস্থান বলিয়া মনে করিত। ইহাদের সন্তানেরা শহরে জন্মিলেও পিতার গ্রামকেই নিজেদের প্রকৃত ভিটা বলিয়া ধরিত। সেজন্য জীবিকার জন্য শহরবাসী হইলেও ভদ্রলোকেরা শহরের বাড়িকে 'বাসা' বলিত, শুধু গ্রামের পৈতৃক ভিটাকে 'বাড়ি' বলিত। এই ধরা আমিও অনুসরণ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ 'বাসা' ও 'বাড়ি' এই দুইটি শব্দ সম্বন্ধে এই পার্থক্য বজায় রাখিতেন। তাই তিনি 'গোরা'তে গোরাদের কলিকাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসস্থানকে 'বাড়ি' লিখিয়াছেন, কিন্তু বিনয়ের বেলাতে লিখিয়াছেন 'বাসা'। (যেমন, তিনি লিখিলেন, 'বিনয় গোরার বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চাদর কাঁধে বাহির হইয়া পড়িল।' কিন্তু বিনয় সম্বন্ধে আনন্দময়ীর মুখে দিলেন, 'বিনয় বলছিল, "বিয়ে আমার বাসাতেই হবে"।')

এইভাবে পৈতৃক গ্রাম ও ভিটার সহিত যোগ রাখিবার কারণ এই ছিল যে, বনিয়াদী বাঙালী হইতে হইলে ভদ্র বাঙালীকে ভূসম্পত্তির অধিকারী হইতে হইত। ব্যবসায়ে বা পেশায় অর্থ উপার্জন করিলেও সত্যকার ভদ্রলোক হইবার জন্য বাঙালী ভূসম্পত্তি কিনিত, শুধু ব্যাঙ্কে টাকা রাখাই, ব্যবসায়ী অথবা পেশাদার হইতে ভদ্রস্তরে উন্নীত হইবার জন্য যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইত না। ঠাকুর-বংশ ও লাহা-বংশের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল।

আমার ক্ষেত্রে আমার পিতাই প্রথম পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া শহরবাসী হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আমার কোনও পূর্বপুরুষ বনগ্রামের বাড়ি হইতে অন্যত্র বাস করিতে যান নাই। ইহাও ঘটিয়াছিল আমার জন্মের মাত্র চার বৎসর আগে। আমার খুল্লপিতামহস্থানীয় কয়েকজনের অমিতব্যয়িতার জন্য ঋণ হওয়াতে শেষ বয়সে আমার পিতামহের অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থা হইয়াছিল। ইহার ফলে আমার পিতাকে আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার জন্য কিশোরগঞ্জে আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের বাড়ির সকলেই সম্পন্নতা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। আমার পিতাও নূতন ভূসম্পত্তি কিনিয়াছিলেন। আমার জ্ঞান হইবার পর যখনই বনগ্রাম গিয়াছি, তখনই সম্পন্ন বাঙালীর জীবনযাত্রাই দেখিয়াছি। বারো মাসে তেরো পার্বণ তো হইতই, দুর্গাপূজাও অতিশয় ধুমধাম করিয়া হইত।

এখন বংশ পরিচয় দিব। আমরা আমাকে লইয়া ছয়-পুরুষে চৌধুরী, উহার পূর্বে রায় ছিলাম। আমাদের কুলোপাধি নন্দী (কায়স্থ) ছিল। শুনিতাম, ষোল পুরুষ আগে এই নন্দীরা রাঢ়দেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিল। তবে আমাদের প্রতিষ্ঠা আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ কীর্তিনারায়ণ চৌধুরীর দ্বারা হয়। তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে অন্য ভাইদের সংসার হইতে পৃথক হইয়া অন্য বাড়ি করেন। সেজন্য উহার নাম হয় 'নূতন বাড়ি'। আমার বাল্যকালেও আমরা বনগ্রামের 'নূতন-বাড়ি'র চৌধুরী বলিয়াই পরিচিত ছিলাম।

এই কীর্তিনারায়ণই আবার বনগ্রাম হইতে মাইল ছয়েক দূরে ব্রহ্মপুত্রের পারে মঠখলা নামে একটি গ্রামে কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর সেবার জন্য একটি দেবোত্তর সম্পত্তি করেন। আমার পিতাও উহার একজন সেবায়েৎ ছিলেন।

বাংলাদেশের সর্বত্র প্রত্যেকটি বনিয়াদী হিন্দুর বাড়িতে পূজাঘর, মণ্ডপ, নিজস্ব মন্দির (শিব অথবা কালীর), ইত্যাদি থাকিত, আমাদেরও ছিল। আমরা শাক্ত হইলেও গৃহদেবতা ছিলেন বৈষ্ণব—গোপীনাথ ও গোপিনীজী। ইঁহাদের পূজার ঘর একটি নিজস্ব উঠানের একদিকে ছিল। উহার এককোণে আমাদের নিজস্ব রথ ছিল। রথযাত্রার সময়ে গোপীনাথ ও গোপিনীজীকে উহাতে চড়াইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। তখন এই রথের সারথি হিসাবে একটি কাঠের উদ্ধবের মূর্তি বসাইয়া দেওয়া হইত। মূর্তিটি আমি দেখিয়াছি।

সকলেরই জানা আছে যে, হিন্দুবাড়িতে মৃত্যু ঘরে হইতে পারিত না। সুতরাং মৃত্যু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসন্ন হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তিদের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত। আমাদের বাড়িতে তাহাদের আনা হইত এই ঠাকুরঘরের উঠানে, এবং রাখা হইত গোপীনাথ ও গোপিনীজীর দিকে মুখ করিয়া। এই আচার পালন করিতে গিয়া আমার এক খুল্লপিতামহীর বেলাতে এক বিভ্রাট হইয়াছিল। জ্ঞানলোপ হওয়াতে তাঁহার মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া সকলে তাঁহাকে আনিয়া উঠানে শোয়াইল। কিছুক্ষণ পরে তিনি চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'এ কি।' সকলে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, 'না, আমি গোপীনাথের পায়ে এসেছি, এখানেই থাকবো। তোরা আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিসনে।' তখন একটি চাঁদোয়া খাটাইয়া তাঁহাকে সেখানেই রাখা হইল। সাতদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ততদিন তিনি অস্ফুটস্বরে নামজপ করিয়াছিলেন।

এই পূজাঘর ছাড়া আমাদের বাহিরের বাড়িতে পূজামণ্ডপ ছিল। তাহার অতিরিক্ত শিব মন্দির আমাদের বংশের পুরানো বাড়ির বিশাল দিঘির পারে ছিল। সেটা পাকা, চূড়াযুক্ত মন্দির ছিল। ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে উহা ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং আমি উহা দেখি নাই। কিন্তু উহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি, উহাতে তিনটি শিবলিঙ্গ ছিল, তাহাও দেখিয়াছি। লিঙ্গগুলি সরানো হয় নাই। সেগুলি সারা বৎসর জুড়িয়া মুক্ত আকাশের নীচে বৃষ্টিতে সিক্ত ও শিশিরে স্নাত হইত, সেখানে কোনো পূজা হইত না, হইত উহার কাছেই আর একটি নূতন পাকা মন্দিরে নূতন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া। শুধু বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যায় নূতন ও পুরানো বাড়ির সকলে মিছিল করিয়া সেই ভাঙা মন্দিরে গিয়া পরিত্যক্ত অথচ চিরজাগ্রত শিবকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। যাইবার সময়ে বা ফিরিবার সময়ে আমি কখনও কাহারও মুখে একটি কথাও শুনি নাই। গৃহহীন শিবকে নীরবে প্রণাম করিয়া সকলেই নীরবে ফিরিয়া আসিত। মৃত বা বালকদের সেই নীরবতা অসহনীয় মনে হইত। তাই আমরা বালকেরা বেশ সান্ত্বনার জন্য ঘরে ঘরে গৃহিণীদের কাছে যাইতাম। তাঁহারা ধান দূর্বা লইয়া প্রস্তুত থাকিতেন, ও আমাদের মাথায় দিয়া আশীর্বাদ করিতেন।

এখনকার দিনে হয়ত বলিয়া দিতে হইবে যে, গৃহদেবতার দৈনন্দিন পূজার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণ রাখা হইত। তাহার উপরের পর্যায়ে ছিল পূজাপার্বণে ও বিবাহ ইত্যাদি দশ-সাংস্কারিক কৃত্যে পৌরোহিত্য করিবার জন্য আর এক ব্রাহ্মণ বংশ, কুলপুরোহিত হিসাবে। সর্বোপরি ছিল আমাদের কুলগুরু বংশ, সে-বংশের যখন যিনি গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, তিনি আমাদের বীজমন্ত্র দিতেন। সেই বংশের বারো বৎসর বয়স্ক গুরুকুমার আসিলেও আমার বৃদ্ধ জ্যাঠামহাশয় পদধূলি লইয়া প্রণিপাত করিতেন। আমি এই সব তথ্য এইজন্য দিতেছি যে, বনিয়াদী বাঙালী ভদ্রলোকের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য কি-ধরনের ব্যবস্থা থাকিত তাহার কোনো ধারণাই আজিকার শিকড়-উপড়ানো বাঙালীর নাই।

আমি কিন্তু স্কুলে পড়িবার সময়েই হিন্দু আচরণ অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের পূজারী ব্রাহ্মণকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিলাম। আমরা কায়স্থ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের চোখে শূদ্র, আমাদের গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করা দূরে থাকুক জানিবারও অধিকার ছিল না। আমার সমবয়সী ব্রাহ্মণ বালকদের জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত, 'শূদ্রের শুনবার অধিকার নাই।' শাস্ত্রীয় বিধান অবশ্য ছিল কোনো শূদ্র যদি গায়ত্রীমন্ত্র শুনে, তাহার কানে তপ্ত গলিত লৌহ ঢালিয়া দিতে হইবে। আমি কিন্তু রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী হইতে মন্ত্রটা কি জানিয়া মুখস্থ করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলিয়াছিলাম। তাই একদিন স্নান করিবার সময়ে স্নানরত পূজারী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গায়ত্রীমন্ত্রটা কি বলুন, জানেন তো?' তিনি গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, 'শূদ্রের কাছে উচ্চারণ করতে নেই।' আমি শয়তানী হাসি হাসিয়া 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রচোদয়াৎ ওঁ।' পর্যন্ত বলিয়া ফেলিলাম। ব্রাহ্মণের মুখ কঠিন ও সাদা হইয়া গেল, কিন্তু মুনিবের পুত্র, কিছু অপমানসূচক উত্তরও দিতে পারেন না, তাই শুধু বলিলেন, 'এটা উচ্চারণ করে আপনি কি ভাল কাজ করলেন?"

ধর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থার কথা বলিলাম। ইহার পর অনুষ্ঠানের কথা বলিতে হয়।

দুর্গাপূজা

আগেই বলিয়াছি, আমাদের পৈতৃক বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ হইত। এগুলির মধ্যে শুধু দুর্গাপূজার কথাই বলিব। বাঙালীর ধর্মজীবনে দুর্গার স্থান এমনই ছিল যে, বাঙালী 'পূজা' বলিতে শুধু দুর্গাপূজাই বুঝিত। যে-বাঙালীর দুর্গাপূজার সহিত পরিচয় নাই সে কখনও বাঙালী হইতে পারে না। তাই আজও বাঙালীরা অন্য সব বাঙালী ধারা ছাড়িলেও, দুর্গাপূজার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে নাই। কলিকাতার বাঙালী পুরুষ প্যান্ট পরিয়াও দুর্গাপূজায় যোগ দেয়, কেহ তাহাতে আপত্তি করে না। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন ইংরেজী পড়ার ফলে বাঙালী যুবকদের মধ্যে এক অহিন্দু ঔদ্ধত্য দেখা যাইত, তখন একটি বাঙালী বালক পিতার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়া কালীকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করে, পরে পিতার পীড়াপীড়িতে শুধু হাত বাড়াইয়া ইংরেজীতে বলে, 'Good morning, madam.' ইহাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে থাকে। অন্যেরা তাহাকে বলে, 'ক্ষান্ত হোন, মন্দিরের শান্তি ভঙ্গ করিতে নাই।' পিতা উত্তর দেয়, 'যে-জগন্মাতার পদতলে ব্রহ্মাবিষ্ণু পর্যন্ত মস্তক-অবনত করিয়া প্রণিপাত করেন, তাঁহাকে কিনা এই বেল্লিক বালক যাবনিক সম্ভাষণ করিল।'

আজকাল আর সেই বিসম্বাদিত্বের বোধ নাই, পিতারা প্যান্টপরা পুত্রের দুর্গার সম্মুখে যাওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করা দূরে থাকুক, কন্যারা সালোয়ার-কামিজ এমন কি 'জীনস্' পরিয়াও দুর্গাকে প্রণাম করিলে আপত্তি করিবেন না। তবু দুর্গাপূজা আছে, ও তাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা-নিরপেক্ষ জনসমাগম বজায় রহিয়াছে। সুতরাং বাঙালীত্বের আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, এইটুকু যে আছে তাহার সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের ভাষায় বলিব,—

'আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥'

আমার বাল্যকালে 'বিস্তর ঠাট' সত্যই বিস্তর ছিল। তাহার বিবরণ আমাদের বাড়িতে যেমন দেখিয়াছি তাহা হইতে দিব।

প্রথমেই বলিব, তখনকার দিনে কোনো বনিয়াদী বাঙালী ভদ্রলোক নিজের বাড়ি ভিন্ন জ্ঞাতিদের বাড়িতেও পূজায় যোগ দিত না। আমিও পিতৃপুরুষের ভিটার বাহিরে দুর্গাপূজা দেখি নাই, শেষ দেখা ১৯১৮ সনে হইয়াছিল। আমি অবশ্য আমাদের পুরানো বাড়ির দুর্গা-প্রতিমা দেখিতে যাইতাম, তবে উহা শুধু আমাদের প্রতিমার সহিত তাহাদের প্রতিমার তুলনা করিবার জন্য। কোনো বনিয়াদী ভদ্রলোকের বারোয়ারী পূজায় যাওয়া অকল্পনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। কিশোরগঞ্জ শহরে বারোয়ারী পূজা হইত, কিন্তু উহাতে যাইত কেবল শহরের আমলা-মুহুরীরা, দোকানদাররা ও চাকরবাকর। শহরের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা অবশ্য পূজার সময়ে পৈতৃক ভিটায় যাইতেন।

আমার পৈতৃক ভিটায় বনগ্রামের 'নূতন বাড়ি'তে পূজা কি-ভাবে হইত এখন তাহার পরিচয় দিই। প্রায় তিন মাস আগে হইতেই প্রতিমাগুলি গড়া আরম্ভ হইত। আমাদের কুমোরটি নিজে ভক্ত ও সাধক ছিল। সে চাহিত দেবদেবীর মূর্তি তাহার মানসচক্ষুতে যেমন, ধ্যানে যে-ভাবে বর্ণিত, তাহার রূপ মাটির মূর্তিতে দিতে। তাই সামান্য খুঁত থাকিলেও সে দোমেটের সময়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিন-চার বার গড়িত। সে আমাকে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মুখের একটি ছাপ দিয়াছিল। তাহা হইতে আমি সেই মুখ গড়িতাম। পরজীবনে দেখিলাম, এই মুখ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের দেবদেবীর ও পালবংশের সময়কার ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবীর মুখের মত। শত শত বৎসর ধরিয়াও মুখের গড়ন অপরিবর্তিত ছিল। বলা বাহুল্য, প্রতিমাতে দেবদেবীর মুখের রূপ পরিবর্তন ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করা হইত। যখন এই বিকৃতি ঘটে, তখন ধর্মও নিষ্ঠার প্রকাশ না হইয়া তামাসায় পরিণত হয়।

আমরা দুর্গাপূজার জন্য কিশোরগঞ্জ হইতে নৌকায় বনগ্রামে যাইতাম ষষ্ঠীপূজার দিনে। তারপর কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা পর্যন্ত থাকিয়া আবার কিশোরগঞ্জে ফিরিয়া আসিতাম। এই কয়দিনেই শত শত বৎসরের বাঙালীত্বের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়া যাইত। আমরা পৌঁছিবার আগেই বোধন শেষ হইয়া যাইত। দেখিতাম, মণ্ডপে প্রতিমাগুলি ও কাঠামো বসানো হইয়া গিয়াছে, দেবীদের বস্ত্রালঙ্কার ও চালচিত্রের সজ্জা ঝকমক করিতেছে। উপরে বিলাতি ঝাড়-লন্ঠন, দেয়ালে দেয়ালগিরি সবই উজ্জ্বল কাঁচের ; নীচে পূজার সামগ্রী, প্রদীপ, কোষাকুষী, ঘন্টা ; ঘটে ফুল বেলপাতা ইত্যাদি।

উঠানে মণ্ডপের ধাপের কাছেই দুইটি যূপকাষ্ঠ (হাড়িকাঠ) পোঁতা—ছোটটি পাঁঠা বলির জন্য, বড়টি মহিষ বলির জন্য। মণ্ডপের পূর্বদিকের বড় আটচালার বাহিরে একদিকে সাত-আটটি পাঁঠা বাঁধা, সম্মুখে পুকুরের পাড়ে একটা খোঁটায় বলির মহিষটি বাঁধা।

মণ্ডপের উঠানে হাড়িকাঠের পিছনেই বড় চাঁদোয় খাটানো, নীচে সতরঞ্চ পাতা, ও একদিকে চেয়ার-বেঞ্চি ইত্যাদি বসানো। এই চাঁদোয়ার নীচে পূজার সময়ে দর্শকেরা বসিত, ও পরে যাত্রা হইত। উঠানের পশ্চিমদিকে ভিতরের বাড়িকে আড়াল করিয়া লম্বা রঙ্গ দেখার ঘর, উহার সম্মুখে বেড়ার বদলে চিক খাটানো, পিছনে বসিয়া বাড়ির মেয়েরা পূজা, বলি, তামাসা, যাত্রা ইত্যাদি দেখিতেন। উঠানের পাশে বাদকেরা দণ্ডায়মান—সকলেই কিন্তু মুসলমান। পূজার বাজনাদারেরা মুসলমান হইত। হিন্দু বাদক ও যুবকেরা শুধু মণ্ডপের ভিতরে ঘন্টা-কাঁসর বাজাইত, ও মেয়েরা শাঁখে ফুঁ দিত।

মণ্ডপের সামনে যে-আটচালাকে আমরা নাটমন্দির বলিতাম, তাহাতে থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা থাকিত। তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক বনিয়াদী ও সম্পন্ন ঘরে বিলাতি থিয়েটারের সরঞ্জাম থাকিত ; আমাদেরও ড্রপসিন, সিন, উইঙ্গ ইত্যাদি সবই ছিল। ড্রপসিনে সমুদ্রের ছবি, ও দুই কোণের আকাশে দুইটি পরী যবনিকা ধরিয়া রহিয়াছে। স্টেজ ছাড়া আমাদের 'ঐক্যতান' বাদনের দলও ছিল—উহাতে দেশী বিলাতি দুই রকমের বাজনাই ছিল—দেশী—এস্রাজ, সেতার, বাঁশী ; বিলাতি—ফ্লুট, ক্ল্যারিওনেট ইত্যাদি। নাটক আরম্ভ হইবার আগে প্রচণ্ড উদ্যমে এই ঐক্যতান বাজিতে থাকিত, আরতির শঙ্খ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘন্টা ঢোলকে টেক্কা দিয়া। আমি এই পারিবারিক স্টেজে 'বিল্বমঙ্গল' ও 'প্রতাপাদিত্য' দেখিয়াছিলাম।

পূজার সময়ে ও বিবাহাদিতে যাত্রার দল আনা হইত। আমি কর্ণবধ, সীতার বনবাস, অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ, কার্ত্তবীর্যার্জুন বধ, ইত্যাদি দেখিয়াছি। একবার কর্ণবধের অভিনয় হইতেছে, কর্ণের রথ বসিয়া গিয়াছে, কর্ণ 'নিয়তি, নিয়তি!' বলিয়া আত্মপ্রবোধ দিতেছেন। আমি (বয়স তখন দশও হয় নাই) চাঁদোয়ার বাহিরে আমার এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের সঙ্গে বসিয়াছিলাম। যখন অভিনয় চলিতেছে তখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে কর্ণবধ আবৃত্তি করিয়া আমার এই দাদামহাশয়কে মুগ্ধ করিয়া দিলাম।

আশ্চর্যের বিষয়, 'অভিমন্যুবধ' অত্যন্ত জনপ্রিয় যাত্রার পালা হইলেও এই পালাটি আমি কখনও দেখি নাই। তবে মা দেখিয়াছিলেন, ও উহা হইতে গান শুনাইতেন। আমিও সেগুলি সর্বদাই গাহিতাম, ও অভিমন্যুবধের দৃশ্য চোখে ভাসিয়া উঠিত। দুটি গান উদ্ধৃত করিব, বাল্যবয়সে শোনা, কিন্তু কখনও ভুলি নাই।

প্রথমটিতে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র (দ্রৌপদেয়রা) অভিমন্যুকে যুদ্ধে যাইতে নিরস্ত করিতে চাহিতেছে, এইভাবে—

'দাদা, অভি! কেন যাবি,
এ ঘোর শ্মশানে?
সে তো যুদ্ধক্ষেত্র নয়,
মৃত্যুর আলয়,
কত শত হত হয় সেখানে!'

অভিমন্যু অবশ্য গেল ও সপ্তরথীর দ্বারা নিহত হইল। তখন যাত্রার ছোকরারা দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত আকাশের দিকে তুলিয়া, মাটিতে পদাঘাত করিয়া গাহিল,—

'ধিক্ ধিক্, কুরু কাপুরুষগণে—
ক্ষত্রিয় নাম কুৎসিত হলো।
দেখরে জগৎ, সজল নয়নে
অন্যায় সমরে বালকের সনে
কলঙ্ককালিমা মাখিয়া বদনে
সপ্তরথী পিশাচ সাজিল!'

অভিমন্যুর জন্য অশ্রুপাত বাঙালী চিরদিন করিয়াছে।

কিন্তু অভিমন্যুবধেই হউক বা সীতার বনবাসেই হউক, করুণরসের অবতারণাই যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, উহাতে যথেষ্ট নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা থাকিত। বস্তুত, হিন্দুর পুরাতন ইতিহাসের কথা অবিস্মৃত রাখা ছাড়া হিন্দুর ধর্মবোধ লোকসমাজে প্রচলিত রাখাও যাত্রার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সত্যই যাত্রা শুনিয়া আমাদের ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম বোধ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

তবে কেবল নীতিশিক্ষা দিয়া লোকের মনোরঞ্জন করা যায় না, তাই প্রতিটি পালাতেই একভাবে না হয় অন্যভাবে হাস্যরসের অবতারণা করা হইত। উহা হইত স্থূল এবং দেওয়া হইত একটি ভাঁড়ের মুখে। কেন জানি না ভীমই অনেক সময়ে এইরূপ রসিকতার উপলক্ষ্য হইত, হয়ত বা তাহার সকল অবস্থাতেই বড়াই করিবার অভ্যাসের জন্য। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো পালাতে যখন ভীম গদা কাঁধে লইয়া গোঁফে তা দিতে দিতে পদচারণা করিত, তখন একটি ভাঁড় তাহাকে দেখিতে দেখিতে এই গানটি গাহিত,—

'বাহবা, বাহবা, কেয়া মজার ভীম !
তানা-নানা, তানা-নানা, তানা-নানা ধিন্ ।
আচ্ছা কি ঠাণ্ডা বেলেল্লা গুণ্ডা,
প্রাণটা করে দিলে হিম,
আসল পাজি, কড়া মেজাজী
বদ-আওয়াজি ভীম,
তানা-নানা, তানা-নানা, তানা-নানা ধিন্ !'

ইহা শুনিয়া শ্রোতারা হাসিয়াই খুন হইত। মহাভারতের সহিত এই গানের বিচিত্র অসঙ্গতির ধারণা মনেও জাগিত না। আমরাও ছেলেবেলায় গানটি মহোৎসাহে গাহিয়াছি, রসবোধ সূক্ষ্ম না-হওয়া পর্যন্ত।

তবে ভীম যে ধর্মের দিকে তাহা আমরা কখনও ভুলি নাই। তাই এক ভাইকে কিংবা বাল্যবন্ধুকে দুর্যোধন সাজাইয়া তাহার সহিত তুমুল গদাযুদ্ধ করিতাম (ব্যায়াম করিবার গদা অবশ্য প্রতি বাড়িতেই থাকিত) ও উচ্চকণ্ঠে বলিতাম 'পাপিষ্ঠ নরাধম !' এই গালিটা আমাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল, আমাদিগকে অন্যপ্রচলিত গালি উচ্চারণ করিতেও দেওয়া হইত না, কিন্তু 'পাপিষ্ঠ নরাধম' সম্বন্ধে কোনও নিষেধ ছিল না।

দুর্গাপূজায় আমার পৈতৃক ভদ্রাসনে আমোদ-প্রমোদের যে ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিচয় দিলাম। এই সূত্রে আর একটা কথাও বলার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকটি সম্পন্ন বাঙালী পরিবার-বংশ যে আড়ম্বর করিয়া দুর্গাপূজা করিত তাহা আমোদ-প্রমোদের দিকেই হউক, কিংবা ধর্মাচরণের দিকেই হউক, শুধু পারিবারিক মঙ্গল বা বংশোচিত মর্যাদার জন্যই করিত না, সামাজিক কর্তব্য হিসাবেও করিত। তাহাদের সকল অনুষ্ঠানেই যে-কেহ আসিয়া বিনা ব্যয়ে যোগ দিতে পারিত। তাহারা নিজেদের বলি ও ভোগ লইয়াও আসিত। সম্পন্ন ভদ্রলোক মনে রাখিত যে হিন্দুর ধর্মজীবনের ধারা অব্যাহত রাখিবার ভার তাহার উপর, কারণ তখন দেশ বিধর্মীর শাসনে, হিন্দু রাজা নাই, সুতরাং ধর্মকে রক্ষার ভার হিন্দু ভদ্র সমাজের উপর।

বলি ও পূজার অন্যান্য অনুষ্ঠান

এখন আমাদের বাড়িতে পূজার বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের কথা বলিব। বলি উহার মধ্যে একটা প্রধান ব্যাপার ছিল, বিশেষ করিয়া আমরা শাক্ত বলিয়া। বনগ্রামে আসিয়া যে বলির পাঁঠা ও মহিষ বাঁধা আছে দেখিতাম তাহার কথা আগেই বলিয়াছি। পাঁঠাগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছিল বাড়ির বালকদের উপর। আমি জীবজন্তু খুবই ভালবাসিতাম, তাই এই ছাগ-পরিচর্যার কাজে আনন্দে যোগ দিতাম, উহাদের ঘাস, কাঁঠাল পাতা ও জল খাওয়াইতাম। উহাদের প্রতি খুবই স্নেহ জন্মিত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই ছিল যে, যখন বেলা নয়টার সময়ে চাকরেরা আসিয়া চার-পাঁচটা পাঁঠা লইয়া যাইত, তখন এগুলিকে বলি দিবার জন্য নেওয়া হইতেছে জানিয়াও উদ্বেগ বা দুঃখ অনুভব করিতাম না। অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোরগঞ্জে কোনো পাঁঠা বা খাসী কেনা হইলে, আমার সম্মুখে এগুলিকে কাটিবার জন্য নিতে আসিলে আমি প্রবল বাধা দিয়া অনর্থ ঘটাইতাম। বনগ্রামে আসিলে এই 'জীবে-দয়া' কোথায় উবিয়া যাইত।

এমন কি পাঁঠাগুলি ও মহিষকে বলি দিবার খড়্গ সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল জাগিত। তাই যে-ঘরে এগুলি বেড়াতে বাঁধা একটি মোটা বাঁশ হইতে ঝুলিত সেই ঘরে গিয়া খড়্গগুলিকে অত্যন্ত মন দিয়া দেখিতাম। পাঁঠাবলির খাঁড়া মাঝারি আকার ও ভারের হইত, কিন্তু মহিষবলির দেখিতাম যেমন বড় তেমনই ভারি। আমরা সেটাকে তুলিতে পারিতাম না। এই খড়্গগুলি বেশ বড় ও অত্যন্ত ভারি হইলেও গড়নে অনেকটা নিত্যব্যবহৃত দা-এর মত ছিল, কিন্তু ভেড়াবলির খড়্গ সম্পূর্ণ অন্য আকৃতির ছিল, প্রাচীন মূর্তি বা প্রতিমাতে খাঁড়া যে আকৃতির দেখান হইত সে রকম। এই পার্থক্য যে কেন হইয়াছিল বলিতে পারি না। নীচে মেঝের উপর একটা মোটা বাঁশ ও থালায় কড়া বাল থাকিত। দেখিতাম, একজন চাকর এক-একটা খড়্গ নামাইয়া কচ্-কচ্ করিয়া ধার দিতেছে। কারণ বলির সময়ে কোনোক্রমে খাঁড়া পাঁঠার গায়ে ঠেকিয়া গেলে বাড়ির ঘোর অশুভ হইবার ভয় ছিল।

সপ্তমীর দিনে এক প্রস্থ পূজা শেষ হইলেই বলি আরম্ভ হইত। চাকরেরা পাঁঠাগুলিকে স্নান করাইয়া গলায় ফুলের মালা দিয়া হাড়িকাঠে আবদ্ধ করিত। দেখিতাম, পুরোহিত খাঁড়া লইয়া পাশে দাঁড়াইয়া। পাঁঠা আর্তস্বরে ডাকিতে থাকিত। সেই ডাককে চাপা দিবার জন্য মুসলমান বাদকেরা তুমুল উৎসাহে ঢোল ও কাঁসি বাজাইতে আরম্ভ করিত। ঈশ্বর গুপ্ত কিন্তু পাঁঠার এই আর্তনাদের অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যাহা বাঙালী দুর্গা উপাসকের পক্ষে লেখা স্বাভাবিক। তিনি পাঁঠা সম্বন্ধে লিখিলেন,—

'সাধ্য কার একমুখে, মহিমা প্রকাশে,
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে।
হাড়কাঠে ফেলে দেই ধরে দুটি ঠ্যাঙ্গ,
এ সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাঙ্গ ছ্যাড্যাঙ্গ ॥'

হঠাৎ দেখিলাম খড়্গ নামিয়া আসিল, পাঁঠার মুণ্ড ছিন্ন হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল, গলা হইতে ফিনিক দিয়া রক্ত ছুটিল। পুরোহিত হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া একটা থালাতে খানিকটা রক্ত লইয়া, মাথাটাও থালায় তুলিয়া দৌড়িয়া গিয়া দেবীর পায়ের কাছে রাখিল, কারণ তিনি রক্ত ও মাংস-প্রিয়া। এইভাবে একটার পর একটা পাঁঠার শিরশ্ছেদ হইতেছে, আমিও বিস্ফারিত চোখে দেখিতেছি।

বনগ্রামে আমার এই আচরণ অবশ্য শাক্ত মতের জন্য হইত। বৈষ্ণব বাড়িতে পশুবলি হইতে পারিত না, কুমড়াবলি হইত। আমরা কিন্তু বৈষ্ণবদের 'জীবে দয়া, নামে রুচি'-কে ভান মনে করিতাম ও বিদ্রূপ করিয়া বলিতাম, আসলে সেটা 'জীবে রুচি ও নামে দয়া।' সুতরাং ব্যঙ্গ করিয়া 'বোষ্টম, টমটম, পাঁঠা খাবার যম'-ও আবৃত্তি করিতাম। বৈষ্ণবদের প্রতি ইহার অপেক্ষাও অবজ্ঞাসূচক ও বিদ্রূপাত্মক একটা গান শুনিয়াছিলাম। সেটা আমিও গাহিতাম। গানটা এই—

'শ্রীপাট খড়দার ঘাটে
মহাপ্রভু পাঁঠা কাটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীচৈতন্য ধরে তার ঠ্যাঙ্গ,
ঠ্যাঙ্গ রে ॥
আসন্নকাল স্মরণ করি,
পাঁঠায় বলে হরি হরি...'

—ইত্যাদি

এই তো পাঁঠাবলির বিবরণ। মহিষবলিতে বনগ্রামের বাড়িতে যাহা দেখিতাম তাহা আরও উদ্দাম কাণ্ড। সেখানে মহিষবলি নবমীর দিনে হইত, একটা বিশেষ কারণে। মহিষকে ছিন্নমুণ্ড করিবার মত গায়ের জোর আমাদের যুবা ছিপছিপে পুরোহিতের ছিল না। তাই আমাদের কালীবাড়ির পুরোহিতকে মঠখলা হইতে আনা হইত। একই পুরোহিতকে দুই জায়গায় মহিষবলি দিতে হইত, সেজন্য মঠখলাতে বলি হইত অষ্টমীতে, বনগ্রামে নবমীতে।

এই পুরোহিতটি প্রৌঢ় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মত দীর্ঘকায়, বলবান, সুপুরুষ বাঙালী আমি কম দেখিয়াছি। সেই উন্নত গৌরবর্ণ মূর্তি এখনও চোখে ভাসে। তিনি যখন মহিষবলির প্রকাণ্ড খড়্গটি হাতে লইয়া হাড়িকাঠের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি যোদ্ধা, হয়ত বা ভীষ্মেরই মত।

মহিষকে স্নান করাইয়া, ফুলের মালা পরাইয়া হাড়িকাঠে আবদ্ধ করিবার পর চাকরেরা এবং আমার প্রবীণ জ্ঞাতিরাও মহিষের ঘাড় ঘি দিয়া মালিশ করিতেন, যাহাতে চামড়াটা নরম হয়, ও খড়্গ না আটকাইয়া যায়। আমি বড় আটচালার দরজায় দাঁড়াইয়া অপলকচক্ষে এই বলি দেখিতাম।

মর্দন শেষ হইলেই ঢাক-ঢোল-কাঁসি বাজিয়া উঠিত, দেখিতাম পুরোহিতের হাতে খড়্গটা মাথার উপরে উঠিতেছে, একটু কাঁপিতেছে বটে, তবু দৃঢ়মুষ্টিতে বদ্ধ। হঠাৎ উহা নামিয়া আসিল, রুপার মত সাদা ফলক আলোকে ঝলসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মহিষের মুণ্ড ছিন্ন হইয়া উঠানে পড়িয়া গেল, রক্ত বেগে বাহির হইতে লাগিল।

ইহার পর যে কাণ্ড হইত, তাহা অন্য সময় হইলে অবিশ্বাস্য মনে করিতাম। চাকরেরা এবং আমার বয়স্ক আত্মীয়রাও উন্মত্ত হইয়া মাটিতে বসিয়া মহিষের রক্তের সঙ্গে ধূলা মিশাইয়া ঢিল তৈরি করিয়া পরস্পরের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিতেন। সকলের কাপড় ও শরীর রক্তে লাল হইয়া যাইত। এমন কি তাঁহারা রক্ত অঞ্জলি করিয়া তুলিয়া তেলের মত চুলে মাখাইতেন। দশ-পনের মিনিট ধরিয়া এই তাণ্ডব নৃত্য চলিত। আমি হতভম্ব হইয়া চাহিয়া থাকিতাম।

পরে অবশ্য জানিয়াছি, এই আচরণ শাক্তের বলির সহিত সমঞ্জস। অসুরবধের সময়ে দেবী নিজেও কম উন্মাদনা দেখান নাই। 'চণ্ডী'-তে তাঁহার আচরণের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে প্রথম মহিষাসুর বধের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। মহিষাসুর যখন পরপর বিভিন্ন মূর্তি ধরিয়া দেবীকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ দিব্য সুরা পান করিতে লাগিলেন, ও আরক্তনয়না হইয়া অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, 'রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধু পান করি, ততক্ষণ তুই গর্জন কর। ইহার পর আমি তোকে বধ করিব।' মহিষাসুর নিহত হইল, দেবগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন, উর্বশী ও অন্য অপ্সরাগণ দেবীর চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্তবীজের বধ আরও উন্মাদক। রক্তবীজ যুগল-দৈত্যরাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনাপতি। উহারা ব্রহ্মার পূজা করিয়া বর পাইয়াছিল যে, তাহারা পুরুষের অবধ্য হইবে ও একমাত্র কোনও অযোনিসম্ভূতা কুমারী কন্যা তাহাদের নিহত করিতে পারিবে। তখন দেবী তাঁহার শরীর হইতে কৌশিকী নাম দিয়া এক অপরূপ রূপবতী কন্যা সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার মত রূপসী দেবতারাও দেখেন নাই। দূত গিয়া সংবাদ দিল, 'মহারাজ, অতীব সুমনোহরা এক নারী হিমাচল আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন, এরূপ স্ত্রীরত্ন কেহ কখনও দেখে নাই। আপনি গিয়া তাঁহাকে দেখুন।' শুম্ভ তখন বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন। কৌশিকী উত্তর দিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে পারিবে, আমি তাহাকেই বিবাহ করিব, অন্যকে নয়। সুতরাং বিলম্বে কাজ কি, শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে আসিয়া আমাকে পরাজিত করিয়া পাণিগ্রহণ করুক।' এই কথা শুনিয়া শুম্ভ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, 'সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণপূর্বক বিহ্বল করিয়া এখানে আনয়ন কর।'

ইহা চণ্ডীর বিবরণ। আমরা কিন্তু উহার লৌকিক বাংলা বিবরণ আবৃত্তি করিতাম। উহা এইরূপ। শুম্ভের দূত গিয়া বলিল,—

'মহারাজ, দেখে এলেম নবনলিনী,
বলেছি বিনয় করে তোমারে ভজিবার তরে,
সে বললে যে জিনতে পারে,
ভজবে তারে বিনোদিনী।'

এই গানের সুর এখনও আমার মনে আছে।

সেনাপতির পর সেনাপতি গিয়া কৌশিকী ও মাতৃকাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। তখন কৌশিকীর যে-মূর্তি দেখা গেল তাহা 'নবনলিনী'র নয়, অন্য প্রকারের। আমি শেষ সেনাপতি রক্তবীজের সহিত যুদ্ধের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, রক্তবীজ আহত হইলে তাহার প্রতি রক্তবিন্দু হইতে একটি নূতন রক্তবীজ উঠিয়া যুদ্ধ করিত। সুতরাং রক্তবীজকে পরাজিত করিবার জন্য কৌশিকী অন্য মূর্তি দেখাইলেন। মাতৃকাগণের প্রচণ্ড আক্রমণের পরও যখন অসংখ্য নূতন রক্তবীজ দেখা দিতে লাগিল, তখন চণ্ডিকা সহাস্যে কালীকে বলিলেন, 'চামুণ্ডে, শীঘ্র বদন বিস্তৃত কর।' তখন চামুণ্ডারূপিণী কৌশিকী রক্তবীজের রক্ত হইতে সৃষ্ট অসুরদের ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়িবার আগেই লেহন করিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাসুর রক্তবীজ আহত ও রক্তশূন্য হইয়া ভূপতিত হইল। দেবগণ পরম আনন্দলাভ করিলেন ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকাগণ অসুররক্ত পানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আমরা রক্তবীজ নিহত হইবার সংবাদ কি করিয়া শুম্ভের নিকট পৌঁছিল তাহা একটি গানে গাহিতাম। সেটি এই—

'রক্তবীজ মৈল, এহি রব হৈল,
মহারাজ হে,...'

—ইত্যাদি

এই গানটা গাহিবার সময়ে আমরা জিব বাহির করিয়া রক্তবীজের রক্ত লেহন করিবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনয় করিতাম।

যদি দেবীই অসুরবধের সময়ে রক্তপিপাসু মূর্তি দেখাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার আত্মীয়গণ মহিষবলির পর উন্মাদনা দেখাইবেন, তাহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। সেই বলির পর যখনই আমি মণ্ডপের সম্মুখ দিয়া যাইতাম, তখনই দুইদিন ধরিয়া ফুলবেলপাতা ও ধূপধুনার গন্ধের সহিত মিশ্রিত রক্তের গন্ধও পাইতাম।

ইহার পরই কিন্তু পূজার আর এক দিক দেখা যাইত—উহাতে ভক্তির প্রকাশ হইত, তাহা শ্যামাবিষয়ক গানে। উঠানে চাঁদোয়ার নীচে বাড়ির কর্তারা, ছেলেরা ও চাকরেরা মিলিয়া প্রায় বিশজনের কণ্ঠে একঘন্টা ধরিয়া এই গান চলিত। আমার জ্যাঠামহাশয় এই সব গানে যাত্রার অধিকারীর মত হইতেন। তিনি কোন গান হইবে বলিয়া দিতেন, আমরা পরে সমস্বরে গাহিতাম। প্রথমেই যে গানটি হইত উহাতে অসুরদের সহিত দেবীর যুদ্ধের সংশ্রব রাখা হইত। উহা অসুরদের উক্তি, গানে—

'কার বামা কাল হয়ে এল গো রণে,
বামা এল গো রণে।
ডাকিলে না কথা কয়,
সমরে না করে ভয়—
এই তো বামা সামান্য নয় মেয়ে।
কেহ বলে প্রাণ গেল,
সমরে শঙ্করী এল,
কেহ বলে সে আসিবে কেমনে—
জগজ্জননী এসে
মায়ে কি সন্তানে নাশে ?
অসুরনাশিনী বেশ হেরি নয়নে,
কার বামা কাল হয়ে
এল গো রণে ॥

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই গানে অসুরদেরও দেবীর সন্তান করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য পুরাণসম্মত। সমস্ত পৌরাণিক বিবরণেই অসুর ও দেবতাদের অতি নিকট আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এক পিতা ও দুই ভগিনীর সন্তান। সুতরাং দুই পক্ষেরই সর্বোচ্চ দেবতা এক। শাম্যবিষয়ের গ্রাম্য কবিও উহা ভোলে নাই।

এই গানটির পর জ্যাঠামহাশয় মানুষের মুখ হইতে ভক্তির গান দিতেন। আমরা গাহিতাম,—

'আর সহে না এ ভবযন্ত্রণা,
আমি এ-রাজ্যে নই অভিলাষী,
হব যেয়ে কাশীবাসী,
কাশী বসি দিবানিশি,
করব কাশীনাথের সাধনা,
স্থান দিলে ও রাঙ্গা চরণে,
শমনভয় আর রবে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবে গানের পর গানে দেবীর নিকট ভক্তের, আর্তের, দুঃখীর নিবেদন পৌঁছিত। গানের পালা শেষ হইলে সকলে স্নান-খাওয়ার জন্য উঠিতাম। চারিদিক নিস্তব্ধ হইত।

কিন্তু সন্ধ্যার পরই আরতির কোলাহল আরম্ভ হইত, উহা উৎসবের কোলাহল—ভক্তিমিশ্রিত, তবু আনন্দপ্রধান। মণ্ডপের উপরের কড়ি হইতে ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলিত, নীচে সারি সারি প্রদীপ জ্বলিত, পুরোহিত প্রতিমার সামনে পঞ্চপ্রদীপ লইয়া নৃত্যের ভঙ্গীতে আরতি করিত। আমাদের বাড়ির মেয়েরা তাঁহাদের বেনারসী শাড়ি ও সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া, ঘোমটা সীমন্তে তুলিয়া প্রায় উন্মুক্তমুখে দুইদিকে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

উঠানে চাঁদোয়ার তলায় পুরুষেরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইত, ও কিছুক্ষণ পর পর 'জয় দুর্গা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। তবে যুবকেরা শুনিতাম, ফিস ফিস করিয়া কে কার বউ আলোচনা করিতেছে—'ঐ যে লাল শাড়ি পরা ওটি অমুকের', 'ঐ যে নীল শাড়ি পরা ফরসা মোটমতন সে অমুকের', ইত্যাদি। আমরা বালকেরা অবশ্য সব বৌদিদিদেরই চিনিতাম, সুতরাং এই অসঙ্গত কৌতূহল না দেখাইয়া আরতির শোভাই দেখিতাম।

বিজয়া-দশমী

এই নামেই বোঝা যায় যে এই তিথি যুদ্ধযাত্রার সহিত জড়িত। বর্ষা শেষ হইয়া শরৎকাল আরম্ভ হইলেই প্রাচীন ভারতে রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, কোন-না-কোনো 'জয়স্কন্ধাবারাৎ' যাত্রা আরম্ভ করিয়া। কালিদাসের রঘুবংশেও আছে, যখন আকাশে হংসশ্রেণী ও তারা, এবং সরিতে ও সরোবরে কমলকুমুদ দেখা দিল, সেগুলি যেন রঘুকে জয়যাত্রায় আহ্বান করিল।

বাঙালীর মধ্যে কিন্তু এই স্মৃতি প্রায় বিলুপ্ত হওয়াতে বিজয়া-দশমী, এমন কি সমগ্র দুর্গাপূজাও বাঙালীর পারিবারিক জীবনের একটা চিরমধুর ও চিরকরুণ সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উহা কবে বা কেন ঘটিয়াছিল তাহা জানা নাই। তবে ঘটিয়াছিল যে উহা সকলেরই জানা। এই সম্পর্কটা বিবাহিতা কন্যা ও তাহার মাতার মধ্যে।

এই আশ্লেষ বাঙালীর মধ্যে দুর্গাপূজার একটা বিশিষ্ট রূপ সৃষ্টি করিয়াছিল। লৌকিক ধারণা ছিল, দুর্গাপূজার তিনটি দিন দেবীর কৈলাস হইতে আসিয়া পিতৃগৃহে মায়ের সহিত বৎসরে একবার করিয়া মিলনের কাল। তাই দুর্গাপূজার আবাহন আগমনী গান দিয়া হইত। আমি পূজার এই দিকটার পরিচয় শৈশবেই পাইয়াছিলাম—আমার মার মুখে আগমনীর গান শুনিয়া। তিনি একটা গান গাহিতেন এই রূপ,—

'গিরিরাজ, মনে আমার এই বাসনা,
জামাতা সহিতে আনিব দুহিতে,
গিরিপুরে করব শিবস্থাপনা...'

তারপর মেয়ের জন্য মেনকার উৎকণ্ঠার পরিচয় আর একটা গানে পাইতাম। সেটা সুপরিচিত গান। আমার মা গাহিতেন,—

'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো।'

অভিমানভরে মা বলিলেন, 'মায়ের প্রতি মায়া, নাই মহামায়ার!' কিন্তু তখনই কন্যাকে দোষী না করিয়া কন্যার পিতাকেই দোষী করিলেন, বলিলেন —

'আবার ভাবি, গিরি, কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো।'

আমি মার কাছে শিখিয়া এই গানগুলি সর্বদাই গাহিতাম। আগমনীর গানের পর বিজয়া-দশমীতে বিদায়ের গানও মার মুখে শুনিতাম। মেনকা পরের দিনের দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,—

'নবমী নিশি গো, পোহায়ো না,
তুমি গেলে অভাগীরে কে বলিবে মা।'

এই গানটা শৈশবে শোনা ও গাওয়ার পরে যখন মধুসূদনের সনেটে পড়িলাম,—

'যেও না রজনী আজি লয়ে তারাদলে,
তুমি গেলে, দয়াময়ি! এ পরাণ যাবে,
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে...'
—ইত্যাদি

তখন বুঝিতে কোনো কষ্ট হইল না।

AMARBOI.COM

আমাদের বাড়িতে মেয়েরা দেবীকে শেষ প্রণাম করিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে অন্তঃপুরে ফিরিতেন। বালক হইলেও তখন একটা গভীর বিষাদ আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

অথচ একাদশীর সকালে একটা অনুষ্ঠান আমাদের বাড়িতে হইত, যাহাতে বিজয়া-দশমীর প্রাচীন রূপের স্মৃতি থাকিত। বাহির বাড়ির উঠানে পাতা সতরঞ্চের উপর গিয়া আমরা সকলে বসিতাম, বিশেষত বাড়ির বালকেরা। দেখিতাম সামনে পূজার সামগ্রী ও একটি খড়্গ সাজানো। পুরোহিত মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া আমাদের সকলের কপালে প্রথমে রক্তচন্দনের ফোঁটা দিয়া খড়্গ স্পর্শ করাইতেন। 'গম্যতাম্ কীর্ত্তিলাভায়, ক্ষেমায়, বিজয়ায় চ'... বলিতেন কি না মনে নাই। তখন এই অনুষ্ঠানের অর্থ বুঝিতাম না, পরে অবশ্য জানিয়াছিলাম।

কুলোচিত শীলতায় দীক্ষা

কোনো বনিয়াদী বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে বংশ ও পিতৃপুরুষের কথা ভুলিতে দেওয়া হইত না। এই ধারার জন্য প্রাচীনপন্থী বাঙালী গ্রামবৃদ্ধেরা ইতিহাস পড়া সম্বন্ধে একটা অবজ্ঞাসূচক উক্তি বরাবরই করিত। তাহারা বলিত, 'নিজের ঠাকুরদাদার নাম জানে না, আকবরের ঠাকুরদাদার নাম মুখস্থ করে।' আমি ইতিহাস ভালবাসিতাম, ইহা জানিয়া আমার প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা দেখাইলে আমি বাচালের মত উত্তর দিতাম, 'আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরদাদার জন্য দেশের অবস্থার ওলটপালট হইয়া যায় নাই, আকবরের ঠাকুরদাদার জন্য হইয়াছিল। তবে আমি আকবরের ঠাকুরদাদার নাম যেমন শিখি, নিজের ঠাকুরদাদার নামও তেমনই ভাল করিয়াই জানি।' আমার উপরে পনের পুরুষ পর্যন্ত নাম আমাদের কাছে রাখা বংশাবলীতে ছিল, এবং ছয় পুরুষের সকলের নাম মুখে মুখে রাখিতাম।

বংশ ও পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে এইভাবে সজ্ঞান থাকার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল। আমাদিগকে ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়-অন্যায়বোধসম্পন্ন, চরিত্রবান, এবং ভদ্র হইবার জন্য শিক্ষা পূর্বপুরুষের দৃষ্টান্ত দিয়াই হইত। এই কাহিনী শুনাইবার ভার ছিল বাড়ির প্রবীণা গৃহিণীদের এবং ভৃত্যদের উপর। সেইজন্য বনগ্রামে গেলেই আমার পিতামহ হইতে বৃদ্ধপ্রপিতামহ পর্যন্ত বংশের সকলের চরিত্রকীর্তন শুনিতে পাইতাম। অবশ্য সেই সঙ্গে কোনো অযোগ্য পর্বপুরুষের কথা বলিয়া সেই ধরনের না-হইবার জন্যও আমাদের সাবধান করিয়া দেওয়া হইত।

এই 'বংশকীর্তনে' আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ কীর্তিনারায়ণের কীর্তির কথা শুনিতাম, আবার এক খুল্লপিতামহের দায়িত্বহীনতার কথাও শুনিতাম। সর্বদাই উপদিষ্ট হইতাম কীর্তিনারায়ণের কীর্তি যেন বিস্মৃত না হই। সেইজন্য আমি দেশাচার না মানিয়া আমার মধ্যম পুত্রের নাম কীর্তিনারায়ণ রাখিলাম ১৯৩৪ সনে।

এখন আমার পিতামহস্থানীয়দের কথা বলি। আমার পিতার বাল্যকালে আমাদের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা ছিলেন কীর্তিনারায়ণের পৌত্র ও আমার জ্যেষ্ঠ পিতামহ ধর্মনারায়ণ। তাঁহার আচরণের একটি গল্প বিশেষ করিয়া শোনানো হইত। একদিন তিনি অন্তঃপুরে আসিয়া উঠানের কোণে এক ছোট লাউ গাছ পোঁতা হইয়াছে দেখিতে পান। বৃদ্ধ কুলোচিত আচরণের বিরোধী এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এই তরকারির চারা কে পুঁতিয়াছে। সকলে ভয় পাইয়া এক বধূর নাম করিয়া দিল। কর্তারা ঝি-বৌ-এর আইনে যাহাকে cognisance বলে তাহা নিতে পারেন না, তাই ধর্মনারায়ণ শুধু বলিলেন, 'উপড়ে ফেলে দাও, আমি যদি তরকারি করতে আরম্ভ করি, তাহলে কার বাড়িতে লোকে তরকারি বেচবে?' কৃষকের ভাত মারা অধর্ম এই ধারণা হইতে তিনি এই আচরণ দেখাইলেন। এই কাহিনীটা আমার মনে এমনই গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, আমি নিজে হাতে ফুলের বাগান করিলেও তরকারির গাছ করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করি।

তবে ফুলের গাছ পোঁতা ভদ্রলোকের কৃত্য ছিল। আমার জ্যাঠাইমা বলিতেন যে, আমার পিতামহ কৃষ্ণনারায়ণের এমনই ফুলগাছের প্রতি অনুরাগ ও লক্ষ্য ছিল যে, যুঁই-এর ঝাড়ের একটি পল্লবও বিস্রস্ত দেখিলে তিনি মালীকে ডাকিয়া ঠিক মত বাঁধিয়া দিতে বলিতেন।

পক্ষান্তরে আমার এক খুল্লপিতামহের আচরণ সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত। তাঁহার দোষ ছিল অমিতব্যয়িতা ও ঋণ করা। তিনিই সমস্ত পরিবারকে আর্থিক সঙ্কটে ফেলিয়াছিলেন। বোধ হয় সেজন্যই আমরা তাঁহার নারায়ণযুক্ত আসল নাম শুনিতাম না, শুনিতাম শুধু ডাকনাম—হরাধন চৌধুরী। তিনি ধন হারাইতে সুপটু ছিলেন। তবে তাঁহার এই অভ্যাসও বনিয়াদী বংশের সন্তানের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'সকল লোকেরই প্রায় এমন-না-এমন একদিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, "হয় সাবেক চাল ছাড়, নয় আমায় ছাড়।" অনেকেই উত্তর দেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মা, তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।'" হারাধনও ইঁহাদেরই একজন ছিলেন।

তবে আর এক ব্যাপারে তাঁহার আচরণ সুদৃষ্টান্ত বলিয়া কীর্তন করা হইত। আমার জ্যাঠামহাশয়—যিনি শ্যামাবিষয় গাহিতেন ও আমাদের বাল্যকালে কর্তা ছিলেন—তিনি যৌবনে ঢাকায় পড়িবার সময়ে ব্রাহ্মধর্মের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। হারাধন তখনই ঢাকায় গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসেন ও বলির মহিষের রক্ত দিয়া স্নান করাইয়া দেন। এই প্রায়শ্চিত্তের পর জ্যাঠামহাশয়ের ব্রাহ্মভাব একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল।

আমার আর এক খুল্লপিতামহের দৃষ্টান্ত কিন্তু অনুসরণীয় বলিয়া কীর্তিত হইত। তিনি অল্পবুদ্ধি ও চঞ্চলমতি হইয়াও যুবাবয়সেই বংশের সম্মান রক্ষায় অসাধারণ দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার নামে 'নারায়ণ' বজায় রহিল। সেই নাম ছিল, কমলনারায়ণ।

আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে যদি কেহ কৌলীন্যে সমান ঘরে বিবাহ না দিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশে সম্বন্ধ করিত, আমরা তাহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতাম না। আমাদের গ্রাম হইতে মাইল তিন-চার দূরে আর এক গ্রামে আমাদের এক আত্মীয় পরিবার এইরূপ বিবাহ দিয়াছিল বলিয়া আমরা তাহাদের 'বয়কট' করিয়াছিলাম। ইহাতে তাহারা অপমানিত বোধ করিয়া আমাদিগকে জব্দ করিবার জন্য একদিন কমলকে ভুলাইয়া নৌকায় করিয়া তাহাদের ঘাটে লইয়া গেল। সেখানে পৌঁছিয়া যখন কমল ষড়যন্ত্রটা বুঝিতে পারিলেন, তখন নৌকা হইতে নামিতে অস্বীকার করিলেন। তাহারা তখন মাঝিদের বিদায় দিয়া, নৌকার দাঁড়, লগি ইত্যাদি লুকাইয়া রাখিয়া বাড়িতে উঠিয়া গেল এই ভরসায় যে কমল ক্ষুধায় অস্থির হইয়া তাহাদের বাড়িতেই যাইবেই।

এদিকে আমাদের বাড়িতে কর্তারা এই চালাকির কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—স্বল্পবুদ্ধি ও অস্থিরমতি কমল কুলের মর্যাদা বিনষ্ট করিয়া না ফেরে। যখন সন্ধ্যা হইল তখন আরও দুর্ভাবনায় তাঁহারা বাহিরের বাড়িতে গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি হইতে লাগিল, তবু কমলের কোনো খোঁজ নাই। কিন্তু যখন রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইল, তখন অন্ধকারে কমলের মূর্তি দেখা গেল, আপাদমস্তক দেহ ও ধুতিখানা জলে ভিজা। কমল দ্রুতপদে আসিয়া বলিলেন, 'আমি কমলনারায়ণ হাজির।' জানা গেল উপায়ান্তর না দেখিয়া কমল কিছু বিলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া, কিছু জলার ভিতর দিয়া হাঁটিয়া বংশকে অকলঙ্কিত রাখিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও এই কাহিনী বলিবার সময়ে জ্যাঠাইমার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিত।

বংশমর্যাদার এই অহঙ্কার আমার ছাত্রাবস্থা পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯১৩ সনে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া স্কুলে পড়ি, গ্রীষ্মের ছুটিতে বনগ্রামে আসিয়াছি, অন্য দুই-একজন আত্মীয়ও আসিয়াছেন, তাঁহারা কাজ করেন। তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য পাশের গ্রাম হইতে তাঁহাদের এক পুরাতন সহপাঠী আসিলেন। তাঁহার নাম সতীশ দে, বনগ্রামের হাই স্কুলে তিনি তখন শিক্ষকতা করিতেন। তিনি কলিকাতায় এক মেসে তাঁহাদের সঙ্গে অন্য সহপাঠী বা সহকর্মীর মতই থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাকে আমাদের বড় আটচালার বৈঠকখানায় অন্য ভদ্রলোকের মত ফরাসেই বসানো হইল। বাড়ির অন্য বালকেরা, আমার মত ও আমার দাদার মত কলিকাতার অনাচারে বংশের গৌরব বিস্মৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় নাই, তাহারা গিয়া গৃহিণীদের খবর দিল যে, সতীশ দে ফরাসে বসিয়াছে। তিনি চলিয়া গেলে যখন আমি ভিতরে গেলাম তখন দেখি গৃহিণীরা সিংহীর মত গর্জন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই তর্জন করিয়া বলিলেন, 'তোরা সতীশ দেকে ফরাসে বসিয়েছিস !' আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাতে কি হয়েছে ?' ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর আসিল, 'কি হয়েছে ? আমাদের ভাণ্ডারীর নাতি এসে আমাদের ফরাসে বসবে ?' সত্যই সতীশবাবুর ঠাকুরদাদা আমাদের ভাণ্ডারী ছিল, কিন্তু তাহার পিতা ভৃত্যের কাজ ছাড়িয়া পাশের গ্রামে মুদী হইয়া পয়সা করিয়াছিল, সতীশবাবু নিজে বি-এ পাশ। আমি শেষ প্রশ্ন করিলাম, 'তাহলে কোথায় বসানো উচিত ছিল ?' জ্যাঠাইমা বলিলেন, 'কেন ? মেঝের ওপর পিঁড়িতে।' আমি নিরুত্তর হইয়া গেলাম।

বলাই বাহুল্য, বংশমর্যাদা এইভাবে পুরুষানুক্রমে বজায় রাখিবার জন্য আমরা সামাজিক আচরণে আদর্শস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত হইতাম। আমাদের এই খ্যাতি ১৯২৭ সন পর্যন্তও কিরূপ ব্যাপ্ত ছিল তাহার একটি গল্প বলি।

সে-বৎসর নভেম্বর মাসে আমি শেষবার কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতা আসিতেছি, 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকতা করিবার জন্য। আমার কামরায় দুইটি মুসলমান ভদ্রলোক উঠিলেন, তাঁহারা সেরোয়ানী-পাজামা পরা। পরের স্টেশনে একটি হিন্দু যুবকও উঠিলেন। ট্রেন আঠারবাড়ি স্টেশনে পৌঁছিবার আগে পিপাসা বোধ হওয়াতে আমি একটা কমলালেবু ছাড়াইয়া খাইতে লাগিলাম। তখন দেখি, যুবকটি আমাকে চোখ টিপিয়া কি ইশারা করিতেছেন। বুঝিতে না পারিয়া আমি কমলালেবু শেষ করিলাম। আঠারবাড়ি স্টেশনে মুসলমান ভদ্রলোকেরা একটু পায়চারী করিবার জন্য প্ল্যাটফর্মে নামিয়া গেলেন। তখন যুবকটি আমাকে বলিলেন, 'আপনি এ কাজটা করলেন !' কি কাজ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন, 'কামরায় মুসলমান ছিল, তবু কমলালেবু খেলেন ?' কমলালেবুতে জল আছে সেজন্য অবশ্য জলচলার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ; আমি তাহা জানিতাম না ; বলিলাম, 'আমি ওসব মানি না।' তখন যুবকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার বাড়ি ?' 'বনগ্রাম' বলাতে আবার প্রশ্ন করিলেন, 'বনগ্রামের চৌধুরী ?' বলিতেই হইল, 'হাঁ।' তখন তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, 'বনগ্রামের চৌধুরী হয়েই আপনি যদি এ-রকম দৃষ্টান্ত দেখান, তাহলে সাধারণ লোকে কি না করবে ?' ১৯২৭ সন, তখন মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন—হায়, হরিজন ! হায়, মৌলানা আবুল কলাম আজাদ ! হায়, মহম্মদ আলি ও শৌকত আলি !

স্বীকার করিতেই হইবে খাওয়া-ছোঁয়াতে এইরূপ গোঁড়ামি অযৌক্তিক ; ইহারও অতিরিক্ত, একদিকে হাস্যকর ও অন্যদিকে অনিষ্টকর। তবু মানুষের জীবনে গোঁড়ামির স্থান আছে। আমি আমার বংশের ধারার বাঞ্ছনীয় গোঁড়ামিতেও দীক্ষিত হইয়াছিলাম। আমি শিখিয়াছিলাম, এই বংশের সন্তান আমি অন্যায় বা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করিতে পারি না, স্বার্থের জন্য পরের অনিষ্ট করিতে পারি না, নিজের জন্য অন্যের ভাত মারিতে পারি না, অর্থ বা পদমানের জন্য নির্লজ্জ হইয়া বন্ধুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারি না। এইরূপ আত্মসংযমের বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমার পিতৃপুরুষের কাছে এই শিক্ষার জন্যই আমি দেশ হইতে নির্বাসন বরণ করিয়াছি।

প্রকৃতপ্রস্তাবে সকল কাজে ও সকল অবস্থায় মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ মানা হিন্দুধারার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। এই ধারারই মন্ত্র—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

এই বিশ্বাসের বশেই এক হিন্দু বলিত, 'আপনি যে হেঁট হইয়া নিজেকে খাটো করিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে আসিবেন এ অগৌরব আমি সহ্য করিতে পারিব না। আপনি যেখানে আছেন সেইখানেই অবিচলিত হইয়া থাকিবেন, এই আমি চাই।'

তেমনই অপরপক্ষ উত্তর দিত, 'আপনার যেখানে প্রতিষ্ঠা আপনিও সেখানে স্থির থাকিবেন, কিছুমাত্র আপনাকে নড়িতে হইবে না। প্রীতি যদি প্রভেদকে স্বীকার করিতে না পারে, তবে জগতে কোনো প্রভেদ কোথাও আছে কেন?'

আমার মাতার গ্রামের বাঙালীত্ব

এরপর আমার মাতার গ্রামে কি ধরনের বাঙালীত্বে আমার দীক্ষা হইয়াছিল, তাহার কথা বলিব। আমি পিতৃপুরুষের গ্রামে একধরনের বাঙালীত্ব দেখিতাম, আমার মাতার গ্রামে গিয়া দেখিতাম সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তবে দুইটিই খাঁটি বাঙালীত্ব। বনগ্রামের বাঙালীত্ব ছিল রাজসিক; আমার মাতার গ্রামে, ত্রিপুরা জেলার কালিকচ্ছ গ্রামে তাহার যে-রূপ দেখিতাম তাহা বাংলার ছায়ানিবিড় পল্লীতে পল্লীতে বিকশিত লৌকিক রূপ।

এই গ্রামটা খুবই বিস্তৃত ছিল, অনেকগুলি পাড়াতে। এগুলি বনবাদাড়, খাল-পুকুর-ডোবা, নলখাগড়ার সারি, বাঁশের ঝাড় দিয়া বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইতে হইলে কাঠের অথবা বাঁশের পুল দিয়া পার হইতে হইত। ভদ্রাসনগুলিও ছিল দূরে দূরে, উহাদের মাঝখানেও ঘন বন ছিল। শুধু এক একটি বাড়িকে ঘিরিয়া তাহার কৃষক প্রজাদের বাড়ি ছিল। সুতরাং সেই গ্রামের পথ দিয়া চলাফেরাতে আমাদের কখনও রোদে কষ্ট পাইতে হইত না, বরঞ্চ লতাতে চুল বিস্রস্ত হইত, কাঁটায় হাত-পা কাটিত, এবং নন্দিনীকে চরাইতে গিয়া দিলীপ যেমন হরিণদের দেখিয়াছিলেন, আমরা দেখিতাম ঝোপের নীচে কটা-রং-এর বনবিড়াল, বড় বড় চোখ করিয়া আমাদের দেখিতেছে। কালিকচ্ছে গাছপালাই যেন আত্মপ্রকাশ করিত, মানুষ যেন আত্মগোপন করিয়া থাকিত।

এই জন্য মনে করিলে চলিবে না যে, এই গ্রামের ভদ্রগৃহে যশস্বী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমার মামার আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে দুই তিনজন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমার মামাও এই পদেই ছিলেন। গ্রামে মহেন্দ্র নন্দী বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। উহাতে দুইটি কুলীন কায়স্থ বংশ ছিল, একটি দত্ত, অপরটি নন্দী। নন্দীবংশই আমার মাতুলবংশ। এই বংশের রামদুলাল নন্দী আগরতলার মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। সেজন্য তাঁহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকাযুক্ত বাড়ির নাম ছিল দেওয়ানবাড়ি। আমার মামার বাড়িরও নাম ছিল রায়বাড়ি।

ইহা ছাড়া আধুনিক যুগে গ্রামের খ্যাতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হইয়াছিল। উহার দুইটি যুবক মানিকতলার বোমার দলের সহিত যুক্ত ছিল। একটি, উল্লাসকর দত্ত, সে দ্বীপান্তরে যায়; অপরটি অশোক নন্দী, বিচার শেষ হইবার আগেই যক্ষ্মাতে মারা যায়। আমি তাহাকে মৃত্যুশয্যায় দেখিয়াছিলাম। আবার অন্যদিকে আরও একটি যুবক, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ১৯১৭ সনে যখন ভারতীয়দের প্রথম 'কিংস-কমিশন' দেওয়া হইল, তখন সেও নির্বাচিত হইয়া স্যান্ডহার্স্টে গিয়াছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইরূপ নানাভাবে কালিকচ্ছের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও মামার বাড়িতে গিয়া যে বাঙালীত্বের সহজ সরল গ্রাম্যরূপই দেখিতাম, তাহার কারণ আমার মাতামহের অকালমৃত্যুতে পরিবারের অবস্থাহীনতা। তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পূর্বেই তাঁহার বড় ভাই দুইটি বালক পুত্র রাখিয়া গত হইয়াছিলেন। তাই আমার দাদামহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার বিধবা পত্নী, তাঁহার নিজের এক পুত্র ও দুই কন্যা, ও সেই দুই বালক লইয়া দুরবস্থায় পড়িলেন। তিন বালক কষ্টেসৃষ্টে যথাসম্ভব লেখাপড়া করিয়া শিলং ও শিলচরে চাকুরি পাইয়াছিলেন। আমার মাসীর ও মাতার বিবাহও কোনক্রমে হইল। আমি যখন ১৯০৪ সনে প্রথম কালিকচ্ছ গেলাম, তখন আমার দিদিমা একটি মাত্র আটচালায় থাকিতেন। বাকী ঘরগুলি ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছিল।

আমার মা তাঁহার শৈশবের দুরবস্থার কথা বলিতেন। একদিনের একটা ঘটনার কথা বলিব। তিনি ও তাঁহার দিদি বাহিরের বাড়ির উঠানে গলাগলি করিয়া বসিয়া এই গানটি গাহিতেছিলেন,—

'আমার কপাল গো তারা,
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, কোনোকালে।
শিশুকালে পিতা মলো,
মাগো রাজ্য নিল পরে,
আমি শিশু অল্পমতি,
ভাসালে সায়রের জলে ॥'

AMARBOI.COM

তখন তাঁহাদের কুলপুরোহিত, ঠাকুরমহাশয় আসিলেন। তিনি পিছনে দাঁড়াইয়া এই গান শুনিয়া কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছিতে মুছিতে মেয়ে দুটিকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেলেন।

এই ঠাকুরমহাশয় ও কয়েকটি কৃষক প্রজাই আমার দিদিমা ও শিশুদের রক্ষক ছিল। এই কৃষক প্রজারা তিন ভাই ছিল, তাহাদের বাড়িগুলি আমার দিদিমার বাড়ির চারিদিকে ছিল। সেগুলিকেও তাঁহার বাড়ির চেয়ে সম্পন্ন মনে হইত। বড় ভাই-এর নাম ছিল কাশী, দীর্ঘকায় বলবান গৃহস্থ। তাহাকে আমরা কাশীমামা বলিয়া ডাকিতাম।

এই অবস্থার জন্য মামার বাড়ি গেলে বাঙালীত্বের গ্রাম্য সহজ সরল রূপই দেখিতাম। কিন্তু উহাতে সৌষ্ঠব ও নিষ্ঠা ছিল, অতি সরল ও স্বাভাবিক আনন্দ এবং হাস্যপরায়ণতাও ছিল। এ-সকলের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিব।

কাশীর সকলের ছোট সন্তান একটি মেয়ে ছিল। তাহার নাম ছিল মোহনবাঁশী, তখন বয়স ছিল পাঁচ-ছয়। সে এক রূপার ঘুনসী ছাড়া সম্পূর্ণ নগ্না থাকিত, ও কোমর বাঁকাইয়া গাহিত,—

'বাঁক্-বাঁকা তার বংশী বাঁকা,
বাঁকা কইরা ধরে গো ;
বাঁকা নয়ন টেড়া কইরা,
রমণীর মন হরে গো।'

এই গান শুনিয়া সকলেই হাসিয়া খুন হইত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালিকচ্ছের কৃষকদের মধ্যে অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়তা ছিল। গ্রামে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটিলেই তাহারা সেটা উপলক্ষ্য করিয়া গান বাঁধিয়া গাহিত। কাশীর মেজ মেয়ের সম্বন্ধে একটি গান শুনিতাম। তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির মধ্যে বিরোধ হওয়াতে তাহাকে আর স্বামীর কাছে যাইতে দেওয়া হইত না। সুতরাং বিরহিণী হইয়া সে দুঃখিনীর মত আচরণ করিত। একবার জ্বর হওয়াতে সে আরও বেশি আকুলতা প্রকাশ করিল। তখন তাহার খুড়তুতো ভাইরা একটা গান সারা গ্রামে প্রচার করিয়া দিল। গানটি দিদির প্রতি বিরহিণীর উক্তি—

'দিদি গো, ওষুধ আইনা দিলি না,
মুখপোড়ারে চোখে দেখলাম না।'

সে-যুগে বাঙালীর মধ্যে নূতন পত্নীপরায়ণতা দেখা দিয়াছিল। তাই প্রাচীনপন্থীরা স্ত্রৈণতা লইয়া নানা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিত। কালিকচ্ছে এইরূপ একটি যুবক-পতি সম্বন্ধে একটি গান শুনিতাম। সে নাকি গাছে উঠিবার সময়ে পাছে পড়িয়া মরে এই ভয়ে বন্ধুদের বলিত,—

'তোরা ধরিস্ রে,
আমি যদি মইরা যাই
আমার বউ-এর কেহ নাই,
বউ মরিলে ধড়া লইবো কে?'

অর্থাৎ এমনই কালবিপর্যয় হইয়াছে যে, পুত্র মা মরিলে আর ধড়া লইবে না, কিন্তু স্ত্রী মরিলে ধড়া লইতে প্রস্তুত।

এই সব কৃষকদের মেয়েদের মধ্যেও কবি এবং গানরচয়িত্রী দেখা দিত। আমার মামার এক সম্পন্না গৃহস্থ প্রজা ছিল একটি আধবয়সী বিধবা। তাহার নাম ছিল কালী, তাহাকে আমরা কালীদিদি বলিয়া ডাকিতাম। সে অতিরসিকা ছিল। তামাক খাইত বলিয়া নিজের সম্বন্ধে এই গানটি গাহিত,—

'আমার মন কেমন করে,
না খাইলে তামুক...'

আবার পল্লীগ্রামে সর্বত্রদ্রষ্টব্য ও অনিবার্য খোস-পাঁচড়া সম্বন্ধেও আর একটা গান সে গাহিত,—

'শুকনা খুজলীর ওষুধ নাই,
ভিরকুটি করিয়া মুখ
চুলকাইতে বড় সুখ...'

সে আর একটি গান গাহিত পাটের চাষ সম্বন্ধে। তখন কৃষকেরা পয়সার জন্য ধানের চাষ ছাড়িয়া পাট চাষ ধরিয়াছে, পয়সাও করিতেছে বিস্তর, তাই কালীদিদি তাহার নিজের রচিত এই গানটি গাহিত,—

'নাইল্লার সমান কিরষি নাই
নাইল্লা বেপারী, চৌখণ্ড বাড়ি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জওয়ানশাহী খুঁটি দিয়া
বাঁধছে চৌয়ারী।'

কিন্তু কালিকচ্ছের কৃষককবিরা কেবল হাসি-তামাসার গানই রচনা করিত ও গাহিত বলিলে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। তাহাদের ধর্মে নিষ্ঠা গভীর এবং অবিচল ছিল। ভদ্রলোকের বাড়িতে গাহিতে আসিলে তাহার কখনই হাসির গান গাহিত না, গাহিত ধর্মবিষয়ক গান। কাশীমামার ছোট ভাই বিষ্ণুর দুইটি ছেলে ভক্তির গানও গাহিত, যাত্রার গানও গাহিত। সেই যাত্রার গান প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর হইত না, হইত বাঙালীর লৌকিক কাহিনীর। ব্যাধ কালকেতু ও তাহার পত্নী ফুল্লরার যাত্রা সম্বন্ধে একটি গান তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম। প্রথমে গাহিত—সরস্বতীর বন্দনা, অতি সাধু ভাষায়—

'ফুল্লকমল তুল্য বিমল,
ধবলবরণ রূপিণী,
কালকেতুর গানে
বাসনা, বরদে মা !'

তারপর গাহিত,—

'ব্যাধজাতি তাদের নাহিকো সম্বল,
শিকার-অভাবে ফেলে অশ্রুজল,
বল্, মাগো, বল্, দুর্গানামের ফল,
এই কি তার হলো গো, পাষাণী !'

ইহারা ভক্তির গানও গাহিত, দুইটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করিব,—

'দয়াল গুরু দুখ দিও,
আর কম দিলে না...'

এবং

'আমার একলা যেতে ভয় করে।
চল গুরু, দুইজনে যাই পরে॥'

কালিকচ্ছের বাঙালীত্বের কাহিনী শেষ করিবার জন্য কৃষির সহিত সম্পর্কিত একটা উৎসবের কথা বলি। সেটা অল্পবয়সে দেখিয়াছিলাম বটে, তবু মানসপটে ছাপা রহিয়াছে। মনে নাই পর্বটা কি, কিন্তু উহা গরুদের লইয়া হইয়াছিল। চাষের বলদগুলিকে চিত্রিত করা হইয়াছিল, তাহাদের শিং সোনার জলে রঞ্জিত করা হইয়াছিল, গলায় মালা দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে সাজাইয়া উহাদের সারি দিয়া উঠানে মণ্ডলাকার পদক্ষেপে ঘুরানো হইয়াছিল। উহার যখন দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল তখন নাচের মত মনে হইয়াছিল। এই ধরনের দৃশ্য পরজীবনে কাংড়ার চিত্রে দেখিয়াছিলাম, সেগুলি গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার চিত্র। এরূপ দৃশ্য চোখে ভাসিয়া উঠিত কৃষ্ণলীলার গান শুনিবার সময়ে। একটি রেকর্ডে এক বাঙালী গীতব্যবসায়িনীর গান শুনিয়াছিলাম,—

'গোঠে হইতে আইল
নন্দদুলাল আমার,...'

তখন কালিকচ্ছের গরুগুলির ছবি মনে জাগিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবে আমার বাঙালীত্বে দীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে হইল—বনগ্রামে উহার গরিমা দেখিয়া ও কালিকচ্ছে উহার মাধুর্য দেখিয়া। এর পর আমি বাংলা সাহিত্য হইতে বাঙালীত্বে আমার মানসিক দীক্ষার কথা বলিব।

বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীত্ব

আমার বাল্যকালে যে-বাঙালীত্ব পূর্ণ বিকশিত রূপে ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর নূতন বাংলা সাহিত্য উহাকে গড়িয়াছিল তাহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এই নূতন বাঙালীত্বের ভিত্তি ছিল পুরাতন বাঙালীত্ব, উহার পিছনেও ছিল সাহিত্য—পুরাতন বাংলা সাহিত্য। যতদিন ধরিয়া বাঙালী-মনের ইতিহাস আছে, ততদিন ধরিয়াই এই মনের উপর সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায়। সুতরাং বলিতে হইবে সাহিত্য ছাড়া খাঁটি বাঙালী মন ও চরিত্র কল্পনা করা যায় না। তাই বাঙালীর মানসিক ও চারিত্রিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যাইত।

সেই ধারা অনুযায়ী আমরা প্রথম পড়িলাম পুরাতন বাংলা সাহিত্য, পরে পড়িলাম নূতন বাংলা সাহিত্য। সেজন্য আমি সর্বাগ্রে পড়িলাম কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত। ১৯০৪ সনে বাবা এই দুইটি বই-এর সম্পূর্ণ সংস্করণ কিনিয়া আমাদের দেন। আমাদের সময়ে কেহই রামায়ণ-মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বা পরিবর্তিত আধুনিক সংস্করণে পড়িত না। অথচ সেই পুরানো ভাষা বুঝিতেও আমাদের কষ্ট হইত না। বেশ কঠিন হইলেও কাশীরাম দাসের মহাভারতের একটি ছত্র যেন মনে গাঁথিয়া গেল। সেটি এই,—

'দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥'

ইহা অবশ্য ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের রূপবর্ণনা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যাইবার সময়ে।

আমি বলিব, বাল্যবয়সে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ না পড়িলে কেহই খাঁটি বাঙালী হইতে পারিত না, এখনও হয় না। আমি দুই বৎসরের মধ্যেই দুইটিই প্রায় মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। কিছুদিন পরেই বর্ধমানের মহারাজার দ্বারা প্রকাশিত সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদও দেখিয়াছিলাম। তবে উহা পড়ি নাই, কেবল উহার ছবি দেখিতাম।

এই সূত্রে আমাদের শালীনতা-শিক্ষার কথাও বলি। উহার ভার সেকালের বাঙালীসমাজে ছিল পরিবারের পুরুষানুক্রমিক ভৃত্যদের উপর। আমার পিতার সময় পর্যন্তও কর্তারা পুত্রদের সঙ্গে আলাপ করিতেন না, 'পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ' দূরে থাকুক। প্রাচীন ভৃত্যেরাই বালকদের কি উচিত, কি অনুচিত তাহা বলিয়া দিত। বাবা বলিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে অপরাধ করিলে তাহারা মারও দিত। তিনিও নাকি বাল্যবয়সে পিতার প্রতিভূ চাকরের হাতে মার খাইয়াছিলেন। আমার পিতা অবশ্য সকল বিষয়েই পুত্রদের সঙ্গে আলাপ করিতেন। তবু চাকরদের কাছ হইতে শিক্ষাও কিছু কিছু বজায় ছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—সেটা মহাভারত পড়া সম্বন্ধে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বিবরণ পড়িতে গিয়া পাইলাম,—

'একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রজঃস্বলা' শব্দের অর্থ সে-বয়সে আমার ভাবিবার নয়। কাছারি ঘরের ফরাসে বসিয়া এই বিবরণ পড়িতেছি, তখন আমাদের আধবয়সী একটি চাকর ঘরে আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রজনীদাদা, "রজঃস্বলা" অর্থ কি ?' (কিশোরগঞ্জে থাকা পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯১০ সন পর্যন্ত আমরা কখনও 'মানে' কথাটা ব্যবহার করিতাম না। সর্বদাই বলিতাম 'অর্থ', যেমন 'অর্থপুস্তক', 'মানে-বই' নয়।) রজনীদাদা উত্তর দিল, 'দাদা, এখন বুঝবে না, বড় হলে আপনিই জানবে।' পরজীবনে শুনিতাম, জমিদার পুত্রকে চাকরেরাই দুর্নীতি ও অশ্লীলতা শিখাইত। আমরা কিন্তু উহার বিপরীত ধারাই দেখিয়াছিলাম।

যাহা হউক, রামায়ণ-মহাভারত পড়ার কথাতে ফিরিয়া আসি। তখন আমাদের কাছে রামায়ণ-মহাভারত প্রাচীন ভারতের একমাত্র ইতিহাস ছিল। বাবা এ-বিষয়ে একটা বুক্‌নী আমাদের কাছে সর্বদাই আওড়াইতেন, 'যাহা নাই "ভারতে" তাহা নাই ভারতে।' এই দুইটি মহাকাব্য বাংলাভাষায় পড়িয়াই আমাদের প্রাচীন হিন্দুর জীবন, গৌরব, ধর্ম ও সভ্যতার ধারণা জন্মিয়াছিল। আর একটা ধারণাও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, ধর্মের জয় হইবেই, অধর্ম কখনই টিকিবে না। কিন্তু ইহাও বলিব, মহাভারতেই ধর্মযুদ্ধে জিতিবার শেষ পরিণামের বিবরণ বালকবয়সে পড়িয়াই মানবজীবনের চরম গতি সম্বন্ধে ভয় জন্মিয়াছিল। সেটা হইয়াছিল, স্ত্রীপর্ব ও মহাপ্রস্থানিক পর্ব পড়িবার জন্য। মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, এই যদি ধর্মযুদ্ধে জিতিবারও পরিণাম হয়, তাহা হইলে ধর্মযুদ্ধই বা কেন, জয় লাভই বা কেন ? সবই তো অদৃষ্টের পরিহাস।

মহাভারতের বাণীর মধ্যে যে জাতিমাত্রেরই শিরের উপর একটা করাল অভিসম্পাত থাকে তাহার ইঙ্গিত ছিল। উহার কথা পরে বঙ্কিমচন্দ্রেও পড়িয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'এই অদৃষ্ট জনসমাজে বিলক্ষণ পরিচিত। যে কবিগুরু কুরুকুলসংহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি এই মোহমন্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে দীক্ষিত; কৌরব-পাণ্ডবের বাল্যক্রীড়াবধি এই করাল ছায়া কুরুশিরে বিদ্যমান; শ্রীকৃষ্ণ ইহার অবতারস্বরূপ।' বঙ্কিমচন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে এই অদৃষ্টবাদ দেখিয়াছিলেন।

আশ্চর্যের কথা এই যে, মহাভারতে যে অদৃষ্টবাদ আছে, এমন কি উহা যে অপরাজেয় অদৃষ্টের লীলারই কাহিনী তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও দেখিয়াছিলেন। জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ডালমান মহাভারতকে 'epic of fatality' বলিয়া বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ অবশ্য মহাভারতের অনেক জায়গায় আছে। সভাপর্বে বিদুর যখন বলিলেন যে, কুলনাশ হইবে বলিয়া তিনি ভীত হইতেছেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন, 'ক্ষত্ত, কোন কলহই আমাকে আশঙ্কিত করিবে না যদি দৈব (অদৃষ্ট) প্রতিলোম (বিরোধী) না হয়।' আবার উদ্যোগপর্বেও আছে, 'দিষ্টম্‌ এব ধ্রুবং মন্য, পৌরুষং তু নিরর্থকম্‌।'

বাল্যকালে যখন মহাভারত পড়িলাম, তখন এই সব জানি নাই। তবু সমস্ত ঘটনাপরম্পরা দেখিয়াই আমার মনে জাতির গতি সম্বন্ধে একটা স্থায়ী আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। এই ভয় কখনও মন হইতে দূরীভূত হয় নাই। তাই যখন ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইল, তখন মহাভারত হইতে লব্ধ ভীতির বশে উহার পরিণাম কল্যাণকর না হইতে পারে এই ধারণা আপাতত যুক্তিনিরপেক্ষ হইলেও আমার মনে জন্মিয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতকে আমি বাল্যকালেও নিষ্ঠুর 'ট্র্যাজেডি' বলিয়াই মনে করিতাম। দুইটিরই শেষের দিক পড়িতে কষ্ট হইত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহার পর আমি আধুনিক বাংলা কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমাদের অল্পবয়সে উপন্যাস পড়িতে দেওয়া হইত না, তবে মার মাসিক পত্রিকা হইতে ছোট গল্প পড়িয়া ফেলিতাম, বিশেষ করিয়া প্রেমের গল্পগুলি। উপন্যাস প্রথম পড়ি, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', ১৯১০ সনে, তাহাও চুরি করিয়া। উপন্যাস পড়িবার 'লাইন ক্লীয়ার' মা আমাকে দিলেন ১৯১১ সনে, তাহাও মশারির নীচে গভীর রাত্রে লুকাইয়া 'দেবীচৌধুরাণী' পড়িতে দেখিয়া। তিনি হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সাহিত্য হইতে বাঙালীত্বে দীক্ষা আমার প্রথম ও প্রধানত হইয়াছিল মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' আদ্যোপান্ত পড়িয়া ও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র কিছু কিছু পড়িয়া। তখন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র দশরথের প্রতি কৈকেয়ীর পত্রই বোধগম্য হইয়াছিল ও বেশি ভাল লাগিয়াছিল। মহোৎসাহে পড়িতাম,—

'এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ ! কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা...' ইত্যাদি

আসলে 'মেঘনাদবধ কাব্যই' আমার অতিশয় প্রিয় ছিল, এবং ১৯০৭ সনে আমি উহা আদ্যোপান্ত পড়িয়া প্রায় মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। যাহার জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' বেশি উপভোগ্য মনে হইত, তাহা প্রতিটি সর্গে একটি বিশিষ্ট রসের প্রাধান্য। প্রথম সর্গে রাবণের বিলাপ পড়িতাম, সবই যাইতে বসিয়াছে দেখিয়া সে বলিল, 'একে একে শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী, তবে আর আমি কেন থাকি রে এখানে !' তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কাযাত্রাও খুব ভাল লাগিত, বিশেষত প্রমীলা যে বলিল, 'দানবনন্দিনী আমি রক্ষকুলবধূ, আমি কি ডরাই সখি ! ভিখারী রাঘবে' তাহার সখী নৃমুণ্ডমালিনীর সহিত হনুমানের বাকবিতণ্ডা পড়িয়া খুব আমোদ পাইতাম। চতুর্থ সর্গে অশোক বনে সীতার কথা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতাম--'ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে, কপোতকপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে।' এমন কি অষ্টম সর্গ, যাহাতে দাস্তের অনুকরণ করিয়া মধুসূদন রামকে নরকদর্শনে নিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতেও কষ্ট হয় নাই। ভয়াবহ মনে হইয়াছিল। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লাগিত ষষ্ঠ সর্গ, যাহাতে মেঘনাদ বধের বর্ণনা আছে। ১৯০৮ সন হইতে ১৯১৮ সন পর্যন্ত আমরা বাড়িতে স্টেজ গড়িয়া ভাই-বোনেরা মিলিয়া ও সঙ্গীদের লইয়া অভিনয় করিতাম। তাহা কখনও কখনও পুরা নাটকও হইত যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' ও 'ডাকঘর'। কিন্তু বেশির ভাগ হইত কাব্য ও নাটক হইতে আবৃত্তি। প্রথম বৎসরেই দশ বছর বয়সে মেঘনাদ বধ অভিনয় করিয়াছিলাম। দাদা হইয়াছিলেন লক্ষ্মণ, আমি হইয়াছিলাম মেঘনাদ, ঘন্টা কোষাকুষী হইতে পূজার সমস্ত সামগ্রী সম্মুখে রাখিয়া যখন অগ্নি ভাবিয়া মেঘনাদ লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন, তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, 'নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া, রাবণি !' আমি উত্তর দিলাম,—

'সত্য যদি তুমি রামানুজ ভীমবাহু
লক্ষ্মণ, সংগ্রাম সাধ অবশ্য মিটাব,
মহাহবে আমি তব। বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিত ?'

শেষে ঘোর গর্জন করিয়া বলিলাম,—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় পুনঃ আপন বিবরে পামর ?
কে তোরে হেথায় আনিল দুর্মতি ?'

আমার কোষাকুষী দাদাকে ছুঁড়িয়া মারিলাম।

আশ্চর্যের কথা এই, বাঙালীর তখন এমনই সাহিত্য-প্রীতি ও বিশেষ করিয়া কাব্যে অনুরাগ ছিল যে, প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরাও উঠানে দল বাঁধিয়া বসিয়া দুই ঘন্টা ধরিয়া বালকদের ইংরেজীতে ও বাংলায় আবৃত্তি শুনিত। আমাদের প্রথম অভিনয়েই দাদা লক্ষ্মণের পার্ট ছাড়া পলাশীর যুদ্ধের মোহনলাল হইয়া শুইয়া 'কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্রলোচন' আবৃত্তি করিয়াছিলেন, আমি মন্ত্রণাসভায় জগৎ শেঠ হইয়াছিলাম, আমার ভগিনী রাণী ভবানী হইয়া আবৃত্তি করিয়াছিল,—

'রাণীর কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ?
আমা হতে এই কার্য হবে না সাধন।'

প্রতিটি স্কুলেই হয় গ্রীষ্মের অথবা পূজার ছুটির মুখে, এই ধরনের আবৃত্তি হইত, শহরের সকলে আসিয়া অতিশয় মনোযোগের সহিত শুনিত।

১৯০৮ সনের প্রথম দিকে কিশোরগঞ্জের মিডল ইংলিশ অথবা 'বাংলা' স্কুলে এইরূপ আবৃত্তি শুনিয়াই আমরা বাড়িতে অভিনয় আরম্ভ করি। উহাতে একটি ছাত্র 'দুই বিঘা জমি' আবৃত্তি করিয়াছিল, আর দুইটি ছাত্র রাইচন্দ্র ও ভবানন্দের কথাবার্তা 'আনন্দমঠ' হইতে আবৃত্তি করিয়াছিল। ভবানন্দ মহেন্দ্রকে 'জমিদারের ছেলে, দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান !' বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু যেই 'বন্দেমাতরম্' গাহিবার সময় আসিল তখন কটিতে তরবারি ঝুলানো ভবানন্দ দৌড়িয়া উইঙ্গ-এর পিছন হইতে হারমোনিয়াম আনিয়া চাদর দিয়া উহা গলায় ঝুলাইয়া গাহিতে আরম্ভ করিল, 'বন্দেমাতরম্, সুজলাং সুফলাং...' ইত্যাদি। কেহ হাসা দূরে থাকুক, দেশভক্তিতে অভিভূত হইয়া শুনিতে লাগিল।

'মেঘনাদবধ কাব্য' আমার মনে এইরূপ অভিঘাত করিলেও, আশ্চর্যের কথা এই যে, আমি প্রত্যেকটি বিখ্যাত বাংলা বই আজ পর্যন্ত বহুবার পড়িয়াছি, কিন্তু ১৯০৮ সনের পর 'মেঘনাদবধ কাব্য' আর আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া পড়ি নাই। সুতরাং সবগুলি কথাই ১৯০৮ সনের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। কলিকাতার পণ্ডিতেরা যেন আমার স্মৃতিভ্রংশ পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য না করেন। এইরূপ একটি মাত্র তারিখের ভুল 'আত্মঘাতী বাঙালী'তে পাইয়া তাঁহারা যে এইরূপ নৃত্য করিয়াছিলেন, সে-সংবাদ বিলাতেও বাঙালীর মধ্যে উল্লাসের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল।

এখন স্মৃতি হইতেই সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীত্বলাভের শেষ পরিচয় দিয়া লেখাটির প্রথম অংশ শেষ করি। যে-সংস্করণে মাইকেলের এই কবিতাটি পড়িয়াছিলাম, তাহার পাতাটি চোখে ভাসিতেছে। মধুসূদন বঙ্গোপসাগরে জাহাজে বিলাত চলিয়াছেন, জাহাজটির নাম 'সোনাই'। শিরোনামার নীচে বায়রণের উক্তি—'My native land, Good Night !' উদ্ধৃত। তারপর পড়িলাম,—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রেখো মা দাসেরে মনে,
এ মিনতি করি পদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে,
মধুহীন করো না গো,
তব মন কোকনদে!'

তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, জীবনের শেষে আমাকেও এই কথাই বলিতে হইবে। দৈববশে নয়, প্রাকৃতিক নিয়মেই বিদেশে, অথবা আমার দ্বিতীয় মাতৃভূমি ইংলন্ডে, আমার জীবতারা খসিবে, ইহা জানিয়া মধুসূদনের নিবেদনেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

ইংরেজত্ব লাভ

আমার বাঙালীত্ব লাভের বিবরণ মাত্র বারো বৎসর হওয়া পর্যন্ত দিলাম। তবু উহা সুদীর্ঘ হইয়া গেল। কিন্তু ইহা জানিয়া-শুনিয়াই করিয়াছি। আমার ইংরেজত্ব ও ইংরেজ ভক্তি শুধু যে সর্বজনবিদিত তাহাই নয়, সর্বজননিন্দিতও বটে। কিন্তু আমার খাঁটি বাঙালীত্বের কথা কেহই জানে না, জানিতে চাহে-নাই বলিব, কারণ উহার বিস্তারিত বর্ণনা আমার ইংরেজী আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে আছে। তাই আমার বাঙালীত্ব যে কতটা খাঁটি ও খানদানী তাহা বিশ্বাস করাইবার জন্য সেই কাহিনী এত সবিস্তারে বলিলাম। উহাতে ইউরোপীয়ত্বের নামগন্ধও নাই। আজিকার দিনের বাঙালীর কয়জন আমার মত বাঙালীত্বের দাবি করিতে পারেন? অবশ্য বৃদ্ধ বাঙালীর মধ্যে উহার অস্পষ্ট স্মৃতি থাকিলেও উহা অটুট আছে হয়ত কেহই বলিতে পারিবেন না।

ইহার পর আমার ইংরেজত্বে দীক্ষার পরিচয় দিব। যদিও আমার বিবরণ প্রধানত বারো বৎসর পর্যন্ত ইংরেজত্ব লাভেরই হইবে, তবু উহাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১৯১৪ সনে ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষা দেওয়া, অর্থাৎ ষোল-বৎসর-বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত টানিব।

ইহা হইতেই অনুমান করা যাইবে যে, বাঙালীত্ব ও ইংরেজত্ব আমার জীবনের পারস্পরিক ধর্ম নয়, দুইটিতেই দীক্ষা একসময়ে, একসঙ্গে আমার অতিশৈশব হইতেই হইয়াছিল—অর্থাৎ একটিকে লাভের জন্য আমাকে অন্যটিকে ছাড়িতে হয় নাই। এ-দুটির একত্র মিলন হইয়াছিল ইউরোপীয় সঙ্গীতে যাহাকে 'কাউন্টারপয়েন্ট' বলে তাহারই মত। এখন পর্যন্ত এই দুইটি ধারা আমার জীবনে একইভাবে চলিতেছে।

আমার ইংরেজত্ব সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিবারও প্রয়োজন আছে। উহা বিলাত-ফেরত বাঙালীর সাহেবিয়ানা নয়। আমি মিস্টার হই নাই, চৌধুরীসাহেব বলিয়াও কেহ আমার উল্লেখ করে না, নিন্দা করিতে হইলেও 'নীরদবাবু' বলিয়াই নাম করে। দ্বিতীয়ত, বিলাত-ফেরত বাঙালীর ইংরেজত্ব দেখা যাইত গৃহস্থালীর ব্যবস্থায়, খাওয়া-দাওয়ায় এবং পোশাকেই প্রধানত, কিছু আচার-ব্যবহারেও। এই সব আমার কখনও হয় নাই। অতিশৈশবে কোট-প্যান্ট পরিলেও পাঁচ বৎসর হইতে চুয়াল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আমি বিলাতি কাপড়চোপড় পরি নাই, ১৯৫০ সন পর্যন্ত মেঝেতে আসন পাতিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁসার থালাতেই খাইয়াছি, প্রাতঃকৃত্য ১৯৭০ সন পর্যন্ত উচ্চাসনে বসিয়া করি নাই। এখন অক্‌স্‌ফোর্ডেও বাড়িতে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়া থাকি, সর্বোপরি ঘুমাইবার জন্য পাজামা পরি না। আমি ছাড়া আর কোনো বিলাত-প্রবাসী বাঙালী এইভাবে বাঙালীত্ব বজায় রাখিয়াছেন তাহা আমি দেখি নাই, উহার সংবাদও শুনি নাই।

সকলের শেষে আর একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিবার আছে। আমি বাহ্যিক ব্যাপারে ইউরোপীয় না হইলেও মানসিক জীবনে, অর্থাৎ ধ্যান-ধারণায়, নৈতিক আদর্শে, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির প্রস্ফুরণে যে প্রধানত ইংরেজত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা কি উচিত হইয়াছিল ? আমি যে-যুগে জন্মিয়াছিলাম তখন বাঙালীর জীবনে অতি উগ্র একটা আর্যামি ছিল, উহার প্রকাশ দেখা যাইত নব্য-হিন্দুত্বে। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'তে উহার সর্বোচ্চ রূপ দেখাইয়াছিলেন। আবার ১৯০৫ সন হইতে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল, এবং ১৯০৮ সনের মধ্যে উহা ইংরেজবিরোধী বিপ্লববাদেও পৌঁছিল। ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যখন এইরূপ প্রচেষ্টা চলিতে ছিল, ঠিক তখনই মনে ইংরেজ হইবার চেষ্টা ও উদ্যম কি দেশদ্রোহিতা নয় ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে, এবং এই অধ্যায়ের শেষে নিশ্চয়ই দিব। আপাতত শুধু ইহাই বলিয়া রাখি যে, এই প্রচেষ্টা যদি দেশদ্রোহিতা হয় তবে একা আমিই দেশদ্রোহী নই, প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালীই দেশদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ইংরেজত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমার ক্ষেত্রে উহা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার কথা এখন বলি।

AMARBOI.COM

ইংরেজত্বে মৌখিক ও চাক্ষুষ দীক্ষা

বিখ্যাত ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের নাম যে কখন জানিয়াছিলাম তাহার কথা সর্বাগ্রে বলি। মহারাণী ভিক্টোরিয়া, প্রিন্স এলবার্ট, নেপোলিয়ন, সেকসপীয়ার ও রাফায়েলের নাম আমি কখন শুনিয়াছিলাম তাহা মনে নাই, কোনোদিন জানিতাম না সে-সময়ের কথাও মনে নাই। সাত বৎসর বয়স হইতে আমার জীবনের সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সুতরাং এই নামগুলির সহিত পরিচয় সেই বয়সের আগেই নিশ্চয়ই হইয়াছিল, পিতামাতার কথাবার্তা হইতে। ইহার পর মিল্টন, বার্ক, ওয়ারেন হেস্টিংস, ওয়েলিংটন, সপ্তম এডোয়ার্ড ও রাণী আলেকজান্দ্রা, মার্টিন লুথার, দান্তে, জুলিয়াস সীজার-এর নাম শুনিয়াছিলাম, উহা অস্পষ্ট মনে আছে। স্মৃতির স্পষ্টতা হইবার পর যে-নামগুলি শিখিলাম সেগুলি এই—ইংরেজের মধ্যে গ্ল্যাডস্টন ও লর্ড রোজবেরীর ; ফরাসীদের মধ্যে মিরাবো, রোবসপীয়ার, দাঁতো, মারা ইত্যাদির ; আমেরিকানদের মধ্যে ওয়াশিংটন ও বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের ; জার্মানদের মধ্যে ফ্রেডেরিক দি গ্রেট, গ্যেটে, বিসমার্ক ও মল্টকের ; ইটালিয়ানদের মধ্যে দান্তে ছাড়া, মাৎসিনি ও গারিবাল্ডির ; রুশিয়ানদের মধ্যে পীটার দি গ্রেট, জেনারেল স্কোভেলেভ ও কুরোপাটকিনের এবং তুর্কদের মধ্যে ওসমান পাশার।

ইউরোপীয় নামের সহিত পরিচয়ের এই জগাখিচুড়ির কারণ সে-যুগের বাঙালীর মানসিক জীবনের মধ্যে পাওয়া যাইবে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভক্তি প্রতি বাঙালীরই ছিল, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত বাঙালী মহিলাদের। সুতরাং তাঁহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান-সন্ততির নামের সহিতও সকলেই পরিচিত হইত। তেমনই নেপোলিয়ন-পূজাও বাঙালীর প্রায় দুর্গাপূজার মত ছিল, সেই সূত্রে ওয়েলিংটনও আসিলেন। পরাধীনতার জন্য অত্যাচারী রাজা বা শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে বাঙালীর একটা প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। এই কারণে আমেরিকান স্বাধীনতা-যুদ্ধ ও ফরাসীবিপ্লবের কথা সকল বাঙালীই পড়িত। বাঙালী একলা বসিয়া কি-ভাবে 'বীর ক্রমওয়েল পাড়িল রাজার মাথা'র কাহিনী পড়িত, তাহার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন। সুতরাং আমি অতিশৈশবেই ফরাসীবিপ্লবের কথা শুনিয়াছিলাম এবং নামগুলিও শিখিয়াছিলাম। আমার পিতামাতা তো বটেই, সকল শিক্ষিত বাঙালীও ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের পক্ষপাতী ছিল। বাবা 'লিবারেল' ও 'কনসারভেটিভ' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিতেন, মা বলিতেন, 'উদারনৈতিক' ও 'রক্ষণশীল' তবে লেবার-পার্টির নাম আমি বড় হইবার পর শুনিয়াছিলাম। উদারনৈতিকদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য ডিজরেলী ও সলস্‌বেরী যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাহা আমি বড় হইয়া শিখিয়াছিলাম। বাল্যকালে মনে করিতাম, লর্ড রোজবেরীর পর স্যর হেনরী ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। এই পক্ষপাতের জন্য লিবারেল দলের প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে অল্পবয়সেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। ১৯০৮ সনের প্রথম দিকে বাবা একদিন সকাল-সকাল কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবা, সকাল-সকাল ফিরলে যে?' বাবা উত্তর দিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ('ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী' নয়) স্যর হেনরী ক্যাম্পবেল-ব্যানারম্যান মারা গেছেন তাই।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'প্রধানমন্ত্রী কে হলো?' বাবা বলিলেন, 'মিঃ অ্যাসকুইথ।' অ্যাসকুইথ অবশ্য ইহার আগেই প্রধানমন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন।

নামজানার জগাখিচুড়ির কারণ দেখাইবার জন্য আমাদের রাজনৈতিক মনোভাবের কথা আনিয়া ফেলিলাম। এইবার ইংরেজ ও ইউরোপীয় জীবনের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের কথা বলি। এই পরিচয় অবশ্য প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ পরিচয় নয়, ছবির ভিতর দিয়া চাক্ষুষ পরিচয়। এই পরিচয়ও স্মৃতিশক্তি উন্মেষের আগেই আরম্ভ হইয়াছিল। একটি ছবি আমাদের শোবার আটচালার বড় দরজার উপর একটা হরিণের শিং-এর উপর বসানো ছিল। এই ঘরটিতেই আমার জন্মও হইয়াছিল। সুতরাং ছবিটি সম্ভবত তার আগে হইতেই সেই জায়গায় ছিল। আমি জ্ঞান হইবার পর হইতেই ঘুম হইতে উঠিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত ছবিটি দেখিতাম। উহা ম্যাডোনার ছবি ছিল, মা বলিয়া দিতেন, 'এটা রাফেলের (রাফায়েলের নয়) ম্যাডোনা ডিলা সেডিয়ার ছবি।' রাফায়েলের নাম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলিয়া আমাদের কাছে প্রচার করা হইত। তখন আমরা মনে করিতাম, রাফায়েল কেবল যীশুর মাতা ও যীশুর চিত্রই আঁকিয়াছেন। কিছুদিন পরে 'প্রবাসী'তে তাঁহার অঙ্কিত আরও অনেক ম্যাডোনার ছবি দেখিলাম, তার সঙ্গে 'নাইটস ড্রীম', সেন্টজনের ড্র্যাগন বধ, ও রাফায়েলের নিজের আঁকা নিজের প্রতিমূর্তির প্রতিলিপিও দেখিলাম।

ইউরোপীয় চিত্রকলার প্রতিলিপি ছাড়া ইংলন্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঘরবাড়ি ও ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্রও মাসিক পত্রিকা অথবা ইংরেজী-বাংলা বই-এ দেখিতাম। সেগুলির অল্পকয়েকটার উল্লেখ করিব। 'মহারাণী'-ভক্তির জন্য (অনেক সময়ে আমরা নামটা বলিতাম না) তাঁহার বিভিন্ন প্রাসাদের ছবি অতি অল্পবয়সেই দেখিয়াছিলাম, যেমন উইনসর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাসল, অসবর্ণ হাউস, সান্ডরিংহাম, বাকিংহাম প্যালেস ইত্যাদি। তবে ইংরেজ-জীবনের ছবি ও ইংলন্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দেখিতেই বেশি ভাল লাগিত—বিশেষত কৃষকদের বাড়ির। জানি-না কি করিয়া ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল ইংলন্ডের বেশির ভাগ বাড়িই 'ফার্ম-হাউস'।

তাহা ছাড়া ইংলন্ডের ইতিহাসের ছবি অতি অল্পবয়সেই দেখিয়াছিলাম। যেটা সকলের আগে দেখিয়াছিলাম সেটি—শুনিয়া পাঠকেরা আশ্চর্য হইবেন—দ্বিতীয় হেনরীর পারিষদদের দ্বারা ক্যান্টারবেরীর আর্চ-বিশপ টমাস-এ-বেকেট বধ। এই ঘটনার কথা মনে এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, ১৯৫৫ সনে প্রথম ইংলন্ডে আসিয়া যখন ক্যান্টারবেরী দেখিতে গেলাম তখন একটা ব্যাপারে অত্যন্ত অবাক হইয়া গেলাম। বেকেটের সমাধির সামনে দাঁড়াইয়া আছি, কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া উহার কাছে যাইতে হয়। শত শত বৎসর ধরিয়া ইংরেজরা এই সমাধিতে ভক্তি-নিবেদন করিতে আসিত, তাহারা হাঁটু গাড়িয়া উহার কাছে যাইত, তাহাদের হাঁটুর ঘষায় সিঁড়ির পাথর ক্ষয় হইয়া দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমি দেখিলাম একটি পাদ্রী একদল ইংরেজ দর্শককে টমাস-এ-বেকেট কে তাহা বলিয়া দিতেছে। ভাবিলাম, ইংরেজের কি হইল?

আর একটি বই-এ প্রায় সেই বয়সেই 'ওয়ার্স-অফ-রোজেজ' আরম্ভ হওয়ার ছবি দেখিলাম—মুখোমুখি হইয়া ল্যাঙ্কাস্ট্রিয়ান ও ইয়র্কিস্ট দলের নেতারা দুইটি ঝোপ হইতে দুই রং-এর (লাল ও সাদা) গোলাপফুল ছিঁড়িতেছে। কিছুদিন পরে ইংলন্ডের ইতিহাসের আরও অনেক ছবি দেখিলাম স্যামুয়েল রসন গার্ডিনারের তিন খণ্ড ইতিহাসে। আমাদের পাশের বাড়ির একটি যুবক—তিনি দূর সম্পর্কে আমার দাদা ছিলেন—কলিকাতায় এম-এ পড়িতেন, বইগুলি তাঁহার ছিল।

তখন আমার সবচেয়ে ভাল লাগিত সামুদ্রিক জাহাজের ছবি, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের জাহাজের। পালের জাহাজ ও কলের জাহাজ দুই-এরই ছবি অনেক দেখিয়াছিলাম। যুদ্ধের জাহাজের ছবির মধ্যে একটি বিশেষ করিয়া মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল—উহা ১৮৯০-১৯০০ সনের মধ্যে নির্মিত 'ম্যাজেস্টিক' শ্রেণীর জাহাজ ছিল। উহার নীচে ছাপা ছিল এই ছত্রটি—

'Hearts of oak are our ships,
Hearts of oak are our men.'

আর একটি ছবি ১৯০৮ সনের প্রথম দিকে দেখিয়াছিলাম, সেটি ট্রাফালগার যুদ্ধের, তাহাতে দেখান হইয়াছিল 'ভিকট্রি' জাহাজের ডেকের উপর নেলসন ও ক্যাপটেন হার্ডি দাঁড়াইয়া। তখন ইংরেজী ভালই পড়িতে পারি, সুতরাং যুদ্ধের বিবরণও পড়িলাম। ইহার ফল আচরণে কি-ভাবে দেখা দিয়াছিল তাহার কথা বলি।

এই ছবি দেখিবার ও যুদ্ধের কাহিনী পড়িবার কয়েকদিন পরে আমি খেলা করিতে করিতে আমাদের কিশোরগঞ্জের বাসার সম্মুখের রাস্তা হইতে নামিয়া, একটা চড়া পার হইয়া নদীর ধারে গেলাম। ফিরিবার সময়ে হঠাৎ ট্রাফালগার যুদ্ধের কথা মনে পড়িয়া গেল, তাই মহোৎসাহে 'England expects every man to do his duty', নেলসনের এই নির্দেশ উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে দৌড়িয়া রাস্তায় উঠিতে গেলাম। তখন উঁচুতে রাস্তা দিয়া কিশোরগঞ্জের একটি উকিল হাতিতে চড়িয়া নিজের বাসায় যাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। তিনি আমার চীৎকার শুনিয়া হাতি থামাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যা বলছ, কথাগুলি কি জানো?' আমি উত্তর দিলাম, 'হাঁ, এটা ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেলসনের সিগন্যাল।' তিনি খুশি হইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। পরে বাবার কাছে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আসলে এই ব্যাপারে আমার যত না ইংলন্ডের ইতিহাসের জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার চেয়ে ইংরেজ জাতির সহিত একাত্মতা বেশি দেখা গিয়াছিল। তখন হইতেই আমার জাতীয় গৌরবের বোধ ভারতবর্ষ ও ইংলন্ডের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছিল।

ইহার পর মৌখিক শিক্ষার কথা বলি। ১৯০৪-০৫ সন হইতে আমি বাংলা ভাল করিয়াই পড়িতে পারিতাম, কিন্তু ইংরেজী পড়া আরম্ভ করিতে আরও দুই বৎসর লাগিয়াছিল।

ততদিন পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান হইল, উহা মার মুখে শুনিয়া। তিনি অবশ্য ইংরেজী জানিতেন না, কিন্তু তখনকার দিনে ইংরেজী গল্প, উপন্যাস ও নাটকের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তসার বাংলাতে অনেক প্রকাশিত হইত—বই আকারে এবং প্রবন্ধ আকারেও মাসিক পত্রিকায়। মা পর পর তিনটি মাসিক পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন—'বামাবোধিনী', 'প্রদীপ', ও 'প্রবাসী'। এগুলির চামড়ায় বাধাঁনো ভলুম আমি জ্ঞান হইবার পর হইতেই দেখিতাম, প্রথমে অবশ্য ছবিগুলি।

মার ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয় এই সব বই ও পত্রিকা হইতেই হইয়াছিল। তিনি আমাদের প্রথম বলিলেন সেকসপীয়ারের দুইটি গল্প—'কিং লীয়ার' ও 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'। প্রথমটির গল্প শুনিয়া আমরা কর্ডেলিয়াকে প্রায় সীতাদেবীর মত ভক্তি করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এ-কথাও বলিব—যখন শুনিলাম কর্ডেলিয়া পিতাকে বলিল সে তাহাকে যতটুকু কর্তব্য ততটুকুই ভালবাসে বেশিও নয় কমও নয়, তখন আশ্চর্যই হইয়াছিলাম। মা তখনই বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা কর্ডেলিয়ার সত্যপরায়ণতা ও চাটুবাদের প্রতি বিমুখতার জন্য। 'কিং লীয়ার' হইতে আমরা নীতিশিক্ষা পাইলাম। পক্ষান্তরে মার্চেন্ট অফ ভেনিসের গল্প শুনিয়া আমোদই পাইয়াছিলাম। প্রায় সেই সময়েই 'প্রবাসী'তে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ও 'টুয়েলফথ নাইট' হইতে দুইটি ছবিও দেখিয়াছিলাম—প্রথম ছবিটি ব্যাসানিওর কৌটা খুলিবার; দ্বিতীয়টিতে দেখিলাম ম্যালভোলিও হাসি হাসি মুখে অলিভিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে ও মারিয়া অলিভিয়ার পিছনে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

আমার মা যে সেকসপীয়ারের গল্প আমাদের বলিবেন তাহা সে সময়ে প্রায় অবশ্যকর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন বাঙালীর মধ্যে সেকসপীয়ার-পূজা দুর্গাপূজার চেয়ে কম প্রচলিত ছিল না। ইহার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ পরে দিব। এখানে বলি, শিক্ষিত বাঙালীর সহধর্মিণী হইয়া মার পক্ষে ইংরেজী না-জানিয়াও সেকসপীয়ারের গল্পের সহিত পরিচিত না-হওয়া ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার মতই হইত। বাবা মাত্র এনট্রেন্স-পাশ হইলেও সর্বদাই সেকসপীয়ারের মূল নাটক পড়িতেন।

কিন্তু মার কাছে যে আর এক কাহিনীও শুনিয়াছিলাম, তাহার সংবাদ পাইয়া আজিকার বাঙালীমাত্রেই বিস্মিত হইবেন। উহা ইলিয়াডের গল্প। এই গল্প শুনিয়া হোমার তো বটেই, এমন কি গ্রীক দেবদেবী ও গ্রীক ও ট্রোজান বীরদের সহিতও পরিচিত হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম—হেলেন, মেনেলউস, প্যারিস, প্রায়াম, হেক্টর ইত্যাদি। তখন হোমারকে বাল্মীকির মত মনে হইত এবং আরও ধারণা জন্মিত ইলিয়াড ও রামায়ণের গল্পের মধ্যে যেন সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু আমি মার কাছ হইতে এই কাহিনী কি করিয়া শুনিলাম ? উহার উত্তর শুনিয়াও সকলেই আশ্চর্য হইবেন। ময়মনসিংহ শহরের আনন্দ বাবু নামে এক ভদ্রলোক 'হেলেনা কাব্য' নাম দিয়া একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা সম্ভবত পোপের অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। উহার প্রথম খণ্ডটি ছাপা হইয়াছিল ময়মনসিংহ শহরেই, কিন্তু বইটা বেশ চলাতে দ্বিতীয় খণ্ড কলিকাতাতেই ছাপা হইল। এই বইটি আমার এক মামা মাকে দিয়াছিলেন, এই উপদেশ লিখিয়া দিয়া—

'আদরের হেলেনারে রাখিও আদরে।
দেখো পাছে দুষ্টলোকে ছিন্নভিন্ন করে ॥'

কিন্তু দুষ্টলোকে উহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাই আমি বইটি দেখি নাই। মা দুঃখে দাদার উপদেশটি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন, সেজন্য কথাগুলি মনে আছে। আরও আশ্চর্যের কথা—এই বই-এর দুইটি খণ্ডই আমি অক্সফোর্ডে আসিয়া বডলীয়ান লাইব্রেরিতে দেখিলাম। কিমাশ্চর্য্যম অতঃপরম।

মা অবশ্য ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ হইতে গল্প ছাড়া বহু ঐতিহাসিক কাহিনী এবং নীতিমূলক কথাও বলিতেন। তাহার পুরা হিসাব দিব না, যেটুকু লিখিলাম তাহা হইতেই আমি পড়িতে শিখিবার আগে ইংরেজ-জীবন ও ইংরেজের ইতিহাস সম্বন্ধে কি জানিয়াছিলাম তাহার একটা মোটামুটি ধারণা পাঠক-পাঠিকা করিতে পারিবেন।

AMARBOI.COM

ইংরেজী সাহিত্যের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়

এই পরিচয় আরম্ভ হইল ইংরেজী বই নিজে পড়িয়া। ইহা কিছু কিছু ১৯০৬ সনেই আরম্ভ করিয়াছিলাম, যদিও তখন সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতাম না। কিন্তু সূত্রপাত হইয়াছিল কবিতা দিয়া, গদ্যরচনা দিয়া নয়। ভাষাতে অধিকার সাধারণত কাব্য দিয়া সহজে হয়, উহার ছন্দ ও ধ্বনিমাধুর্যের জন্য। শুধু কাব্যের ধ্বনি হইতেই নূতন মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া কোনো কবিতা না বুঝিলে বাবা বুঝাইয়া দিতেন। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যে-সব কবিতা তাঁহার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হইত, তিনি আমাদিগকে সেগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলিতে বলিতেন।

আমার কবিতা পড়া কিন্তু আমার বয়সোচিত হয় নাই, বয়সের তুলনায় ও স্কুলের পাঠ্যের তুলনায় দুই বৎসর আগে হইয়াছিল। ইহার কারণ আমার দাদা। শিশুকাল হইতে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তিনিই সব বিষয়ে আমার দৃষ্টান্ত ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, যেমন অন্য ব্যাপারে তেমনই পড়ার ব্যাপারেও। তাই আমি দুই বৎসর আগেই নীচের ক্লাসে থাকিলেও দাদার পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া ফেলিতাম। অর্থাৎ ১৯০৬ সনে দাদা ছিলেন ক্লাস ফাইভে, আমি ছিলাম থ্রীতে! তবু নিজের বই-এর উপরে তাঁহার বইগুলিও পড়িয়াছিলাম। তাই আমার ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের প্রমাণ নিজের বই হইতে না দিয়া, তাঁহার বই হইতেই দিতে হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯০৬ সনে প্রথম যে ইংরেজী কবিতাটি পড়িয়াছিলাম, তাহার কথা বলি। ইহা হইতে ইংরেজী কাব্যের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মে নাই, তবু এটিই প্রথম, সেজন্য উহার উল্লেখ করিতেছি। দাদার দেশে ছাপা ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকে একটি ছবি দেখিলাম, সেটি একটি হিন্দুস্থানী অন্ধ বালকের, একতারার মত একটা বাদ্যযন্ত্র লইয়া বসিয়া আছে। আসলে কবিতাটি একজন ইংরেজ অন্ধ বালকের—উহার নাম The Blind Boy (কলি সিবারের লেখা)। উহার প্রথম চরণগুলি এই—

'O say what is that thing call'd Light,
Which I shall ne'er enjoy;
What are blessings of the Sight
O tell your poor blind boy.'

পড়িয়া প্রথমে ছেলেটির উপর করুণা হইল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়িলাম না। তখন আমাদের শিক্ষকদের একটা অভ্যাস ছিল উপদেশমূলক কবিতা পড়ানো, যেমন বাংলাতে তেমনই ইংরেজীতে। এগুলি আমার কখনই ভাল লাগিত না। তবে আর একটি উপদেশমূলক কবিতা সেই সময়েই পড়িয়াছিলাম তাহাতে সন্তোষের মহিমা কীর্তিত হইলেও খুবই মজার মনে হইয়াছিল। সে-কবিতাটি

Miller of the Dee
'He worked and sang from morn till night,
No lark more blithe than he.'

সে বলিত,

'I care for nobody, not I
If nobody cares for me.'

এবং

'I envy nobody,
Nobody envies me.'

কিন্তু রাজা অষ্টম হেনরীও আসিয়া তাহার মত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এটি পড়িয়া আমোদ পাইয়াছিলাম।

আসলে ইংরেজী কাব্যের প্রতি অনুরাগ আমার ক্লাসে-পড়া কবিতা হইতে হয় নাই, হইয়াছিল অন্য বই-এ নিজের বাছা অন্যরকমের কবিতা পড়িয়া। পরের বছরেই দাদার পাঠ্যপুস্তকে দুইটি কবিতা পড়িলাম। উহার শিরোনামা ছিল না, শুধু চারটি চরণ ছাপা ছিল, তার নীচে একটি ছবি, তাহার পর আর চারটি চরণ।

ছবিতে দেখিলাম একটা খুব উঁচু খাড়া পাহাড় সমুদ্রের একেবারে ধারে, নীচে এক চিলতা বেলাভূমি, উহার উপর একটি নৌকা ডাঙ্গায় তোলা, নৌকাটির পাশে দুইটি বালক-বালিকা বসিয়া আছে। ১৯৬৮ সনে ইংলিশ চ্যানেলের উপর বীচী-হেড-এ গিয়া ঠিক এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। ছবির উপরে ও নীচে পড়িলাম,—

'Break, break, break,
On thy cold gray stones, O Sea!
And would that my tongue could utter
The thoughts that arise in me.'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহার পর—

'O well for the fisherman's boy,
That he shouts with his sister at play!
O well for the sailor lad,
That he sings in his boat on the bay!'

এই কবিতা কাহার রচিত বলিয়া দিতে হইবে না। পড়িয়া মনে যে কি অনির্বচনীয় আবেগের অলোড়ন উঠিল বলিতে পারি না। সেই বয়সে উহা ভাল করিয়া বুঝি নাই, তবু ভাবে বিভোর হইলাম। বৎসর চারেক পরে কীটসের—

'...magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn.'

—পড়িয়াও এত বিচলিত হই নাই।

ইহার কারণ বোঝা কঠিন নয়। কাব্যের উপলব্ধি মূলত বুদ্ধি দিয়া হয় না, হয় হৃদয় দিয়া। তাই মানবজাতির বুদ্ধি পূর্ণবিকশিত হইবার আগেই কাব্যরচনা হইয়াছে। কাব্য যদি বুদ্ধির অপেক্ষা রাখিত, তবে আমি ইহারও আগে, সংস্কৃতভাষা শিখিবার বহু পূর্বে, 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম অধ্যায়টি দাদার একটি বাংলা পাঠ্যপুস্তকে যে উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহাতে একটি শ্লোক পড়িয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সারাজীবনেও ভুলি নাই, তাহা ঘটিত না। শ্লোকটি এই—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥

ইহার পর সেই সময়েই আর একটি ইংরেজী কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিব। সেটি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Upon Westminster Bridge। উহা বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ত ছিল, ভাষাগত বাধা যাহা ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া দূর করিলাম। দৃশ্যটা মনে এমনই গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, ১৯৫৫ সনের ২৭শে মার্চ তারিখে সাতান্ন বৎসর বয়সে প্রথম ইংলন্ডে আসিবার পর দিনই ভোর ছয়টার সময়ে হাইড পার্কের কাছে যে-বাড়িতে ছিলাম তাহা হইতে হাঁটিয়া ওয়েস্টমিন্‌স্টার ব্রীজে চলিয়া গেলাম। তখন সেখান হইতে খোলা মাঠ ও উন্মুক্ত আকাশ দেখিলাম না বটে, তবে টেমস নদী ''glideth at his own sweet will' এবং ships, towers, domes, ইত্যাদি দেখিলাম।

ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সূত্রপাতের কথা আরও কিছু বলিব। পরের বছরই অর্থাৎ ১৯০৭ সনে দাদার একটি পাঠ্যপুস্তকে কয়েকটা বিখ্যাত ইংরেজী কবিতার কয়েকটি করিয়া চরণ উদ্ধৃত দেখিলাম। বাবা আমাদিগকে এগুলি বিশেষ করিয়া পড়িতে বলিলেন, এবং যেখানে প্রয়োজন হইল, অর্থও বুঝাইয়া দিলেন।

যে কথাগুলি পড়িলাম সেগুলি এই,—

সেকসপীয়ার

'Blow, blow, thou winter wind,
Thou art not so unkind
As man's ingratitude.'

—ইত্যাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টমাস গ্রে

'Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear.'

—ইত্যাদি

ও কোলরীজ

'Water, water, every where,
And all the boards did shrink
Water, water, every where
Not any drop to drink.'

এই সব পড়া সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিব যে, আমার ইংরেজী কবিতা পড়া স্কুলের পড়ার মধ্যে ছিল না। পরে স্কুলে পাঠ্য বলিয়া পড়িলেও কবিতাগুলিকে কখনও স্কুলের পড়া বলিয়া মনে করি নাই।

ইংরেজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়

এ-পর্যন্ত ইংরেজী কবিতা পড়ার কথা যাহা বলিলাম উহা ছাড়া ছাড়া ভাবে হইয়াছিল। ইংরেজী কাব্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আরম্ভ হইল ১৯০৮ সনে আমার দশ বৎসর পূর্ণ হইবার পর। তবে এই পড়াও চলিল দাদার বই হইতে ও আমার নিজের সখের বশে। বাবা বা শিক্ষকেরা আমাকে এই সব করিয়া পড়িতে বলেন নাই। তবু দাদার নূতন কবিতার বইটি প্রায় আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলাম। এটি দেশী বাজে ছাপা ও বাজে বাঁধানো পাঠ্যপুস্তক নয়, একেবারে খানদানী বিলাতে ছাপা ও বিলাতি-বাঁধানো বই—ফ্রান্সিস টার্নার পলগ্রেভের—যিনি সুবিখ্যাত 'গোল্ডেন ট্রেজারী' সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাঁহারই সঙ্কলিত বালক-বালিকাদের জন্য বই; উহার নাম—The Children's Treasury of Lyrical Poetry.

বইখানা কিশোরগঞ্জ স্কুলের দপ্তরী মনুর পরিচালিত বই-এর দোকান হইতে কেনা হইবামাত্র আমি উহা দিনের পর দিন পাতার পর পাতা উল্টাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। যে-কবিতাগুলির দ্বারা খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম সেগুলির প্রথম ছত্র দিতেছি, আর কোনো পরিচয় না দিয়া।

১। The dew was falling fast, the stars began to blink
I heard a voice: it said, 'drink, pretty creature drink.'
২। A Spanil, Beau, that fares like you...
৩। The post-boy drove with fierce career...
৪। John Gilpin was a citizen...
৫। Ye Mariners of England...
৬। Right on our flank the crimson sun went down...
৭। I am monarch of all I survey...
৮। Come, live with me and be my love...
৯। Turn, gentle Hermit of the dale,...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০। The dews of summer night did fall...

বইটা ১৫৫ পৃষ্ঠার ছিল, উহার প্রথম ৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে-কবিতাগুলি ছিল সেগুলি হইতে এই কয়টা চরণ বাছিয়া দিলাম। ইহার পর অন্য যে-সব কবিতা দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করিয়াছিল সেগুলি বাদ দিয়া শুধু বইটার শেষ দুটি কবিতার প্রথম চরণ উদ্ধৃত করিব।

১১। On either side the river lie...

১২। Half a league, half a league, half a league onward...

এই কবিতাগুলির শুধু আভাস দিলাম, এখন যে-কবিতাগুলি মনে বিশেষভাবে সাড়া জাগাইয়াছিল সেগুলির কথা বলা প্রয়োজন আরও সবিস্তারে। পল্‌গ্রেভের সঙ্কলনে দুইটি কবিতা পর পর ছাপা হইয়াছিল—একটি সেকসপীয়ারের, অপরটি তাঁহারই প্রায় সমসাময়িক জন ওয়েবস্টারের। প্রথমটি সুপরিচিত, 'টেম্পেস্ট' হইতে গান—

'Full fathom five thy father lies...'

দ্বিতীয়টির কয়েকটি চরণ এইরূপ,

'Call for the robin-redbreast and the wren,
Since o'er shady groves they hover,
And with leaves and flowers do cover,
The friendless bodies of unburied men,'

বইটার শেষে পল্‌গ্রেভের টীকা-টীপ্পনী ছিল, দেখিলাম তাহাতে তিনি এই দুইটি কবিতা সম্বন্ধে ল্যামের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা এইরূপ—সেকসপীয়ারের গান সম্বন্ধে—'As that is of water, watery'; ওয়েবস্টারের কবিতা সম্বন্ধে—'So this is of the earth, earthy.' আশ্চর্যের কথা এই যে, সে-বয়সেও উহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইল না, অবশ্য অনুভূতিতে, বুদ্ধিতে নয়—গায়ে যেন জল লাগিল একটিতে; আর একটিতে লাগিল মাটি। ভাবিলাম, কি অপূর্ব এই দেশ, যেখানে জলে ডুবিয়া মরিলে প্রবাল ও মুক্তা হইয়া যাইব; বনে জঙ্গলে মরিলে দেহ পাখিরা আসিয়া পাতা দিয়া ঢাকিয়া দিবে। সেই দেশে কি মরিতে পাইব?

ইহার পর Jock of Hazeldean পড়িয়া সম্পূর্ণ অন্য অনুভূতি হইল।—

'Why weep ye by the tide, ladie?
Why weep ye by the tide?
I'll wed ye to my youngest son,
And ye s'all be his bride.
And ye s'all be his bride, ladie,
Sae comely to be seen —'

কিন্তু স্কটিশ লেয়ার্ড তরুণীটিকে প্রলুব্ধ করিবার এত চেষ্টার পরও বিবাহের দিনই স্কটল্যান্ডের কন্যা ইংরেজ প্রণয়ী জক অফ হেজেলডীনের কাছে দেশের সীমান্ত পার হইয়া পলাইয়া গেল।

কিন্তু সে-বয়সে যে-কবিতাটা মনকে বেশি চঞ্চল করিয়াছিল সেটি এই,—

''O Brignall banks are wild and fair,
And Greta woods are green,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

And you may gather garlands there
Would grace a summer queen.
And as I rode by Dalton Hall
Beneath the turrets high
A Maiden on the Castle-wall
Was singing merrily:

"O Brignall banks are fresh and fair,
And Greta woods are green;
I'd rather rove with Edmund there
Than reign our English queen."

যে-যোদ্ধা তরুণীর গানটি শুনিল, সে উত্তর দিল, —

'Maiden! a nameless life I lead,
A nameless death I'll die!
The fiend whose lantern lights the mead
Were better mate than I.'

তখন আমার বয়স দশ, ইংরেজীও খুব ভাল করিয়া জানি না, সর্বোপরি এই সব দৃশ্য ও ভাব বঙ্গদেশ ও বাঙালী জীবনের দৃশ্য ও ভাব হইতে অতি বিভিন্ন। তবু আমি কেন এইভাবে মুগ্ধ হইলাম, এইগুলি পড়িবার আগ্রহই বা আমার কেন হইল ?

পূর্ববঙ্গের একটি ছোট শহরে বাস করি, রেল স্টেশন হইতে সতেরো মাইল দূরে ; বাস টিনের আটচালায়—তাহার বেড়া দরমার, মেঝে মাটির ; নিজে বেশির ভাগ সময়েই খালি গায়ে ও খালি পায়ে ঘুরিয়া বেড়াই। তবু মনের এই ইংরেজত্ব কি করিয়া আসিল ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। ব্যাপারটা যুক্তিগোচর নয়।

কিন্তু সেই বয়সেই, অর্থাৎ ১৯০৮ সনেই কেন সেকসপীয়ার তাঁহার ভাষাতেই পড়িয়াছিলাম, ও তাঁহার জুলিয়াস সীজার হইতে একটা অংশ অভিনয় করিয়াছিলাম, তাহার কারণ বলিতে পারিব। এ-ব্যাপারটা যুক্তিগোচর। তখন শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই সেকসপীয়ার পড়াকে ধর্ম-সংক্রান্ত নিত্যকর্মের মত মনে করিত। উহা আরম্ভ হয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হইতেই, কিন্তু পূর্ণ পরিণতি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের কাল হইতে। সেজন্যই তিনি ১৮৭৬ সনে লিখিয়াছিলেন, 'উদ্যান মধ্যে রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রেরই কণ্ঠস্থ।' সেকসপীয়ারের প্রতি শ্রদ্ধার বশে তিনি নিজেও শকুন্তলা ও মিরাণ্ডা চরিত্রের তুলনা করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ একপ্রকার লুকোচুরি খেলা...শকুন্তলার ও সব "বাহানা" আছে, মিরন্দার সে সব নাই...মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে, মিরন্দা বনের পাখী, প্রভাতের অরুণোদয়ে গাহিয়া উঠিতে পারে, লজ্জা করে না।'

সেকসপীয়ার পূজার ইহার অপেক্ষাও আশ্চর্যকর প্রমাণ দিব বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতেই। তাঁহার 'রজনী' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সনে। উহাতে অমরনাথ ও শচীন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তার বিবরণ আছে। প্রথম পরিচয়ের পর একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবকাশ পাইয়া অমরনাথ শচীন্দ্রের টেবিলের উপর 'সেকসপীয়র গেলেরী' দেখিয়া উহার ছবিগুলি আদ্যোপান্ত দেখিলেন, পরে এগুলি লইয়া আলোচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথের মুখে কয়েকটা ছবির যে বর্ণনা দিলেন তাহাতে মনে হয় তিনি নিজেও স্বচক্ষে ছবিগুলি দেখিয়াছিলেন ; আমিও নিজে ছবিগুলি দেখিয়াছি সুতরাং অমরনাথের বর্ণনা যথাযথ এই কথা বলিতে পারি।

তবে এই 'সেকসপীয়র গেলেরী' বইটা কি ? কোনো বাঙালী লেখক ইহার উত্তর দিয়াছেন বলিয়া জানি না। আমি কৌতূহলী হইয়াছিলাম, তবে দেশে ইহার উত্তর পাওয়া সম্ভব নয় জানিয়া, ১৯৭০ সনে বিলাতে আসিবার পর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম ও কয়েক বৎসর খোঁজাখুঁজির পর যাহা আবিষ্কার করিলাম তাহা সত্যই বিস্ময়কর—'সেকসপীয়র গেলেরী' বইটি ১৮০২-১৮০৫ সনে প্রকাশিত প্রকাণ্ড দুইটি খণ্ডে সেকসপীয়ারের সব নাটকের সবগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও দৃশ্যের চিত্রাবলী। ছবিগুলি খুব বড় 'সাইজের'—দৈর্ঘ্যে সাড়ে বাইশ ও প্রস্থে সতরো ইঞ্চি। বাঙালী সেকসপীয়ারের প্রতি অনুরাগের বশে এই পুরাতন ও বহুমূল্য বইগুলি কিনিয়া কলিকাতায় নিয়াছিল। এই চিত্রসংগ্রহ জন ও জোশুয়া বয়ডেলের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই বইটির ইতিহাসও কম উল্লেখযোগ্য নয়। বয়ডেলরা প্রথমে সেকসপীয়ারের নাটক হইতে সে-যুগের বিখ্যাত চিত্রকরদের দ্বারা অয়েল-পেন্টিং করাইয়া লন্ডনের পেল-মেলে 'সেকসপীয়ার গ্যালারী' নাম দিয়া একটা প্রদর্শনী স্থাপিত করেন। চিত্রকরদের মধ্যে স্যর জোশুয়া রেনল্ডস, রমনে, হপনার, ফুজেলি, এঞ্জেলিকা কাউফমান, বেঞ্জামিন ওয়েস্ট প্রভৃতি ছিলেন। ছাপা ছবিগুলি এই সব অয়েল-পেন্টিং হইতেই করানো হইয়াছিল। সেকসপীয়ারের নাটকের চিত্রাবলী সংগ্রহের আর কোনো বই-এর নাম আমি ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা বডলীয়ান লাইব্রেরির ক্যাটালগে পাই নাই।

আমি বইটার সন্ধান পাইয়া কিনিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখিলাম উহা দুষ্প্রাপ্য ও উহার দাম আমার সঙ্গতির বাহিরে। তাই একটা ছবির দোকানে এই বই-এর কতকগুলি আলগা চিত্র পাইয়া একটি কিনিলাম। উহা সেকসপীয়ারের শিশুমূর্তির, রমনের আঁকা, ১৭৯৯ সনে মুদ্রিত, প্রথম খণ্ডের ২য় চিত্র।

বাঙালীর মধ্যে যদি সেকসপীয়ারের এইরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পিতা আমাকে সেকসপীয়ার বাল্যবয়সেই পড়াইবেন, তাহা বিচিত্র নয়। ১৯০৮ সনের প্রথম দিকে—আমার বয়স দশ পূর্ণ হইয়াছে, এগারোতে পা দিয়াছি—আমাদের কিশোরগঞ্জের বাসার বাহিরের উঠানে খেলা করিতেছি, দেখিলাম সেখানে বাবা পায়চারি করিতেছেন ও একটি বই পড়িতেছেন। আমাকে হঠাৎ ডাকিলেন, 'নীরু, এদিকে এস।' আমি নিকটে গেলে বইটির একটি পৃষ্ঠা আমার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, 'পড়।' তখনও সেকসপীয়ার পড়িবার মত ইংরেজী উচ্চারণে দখল আমার হয় নাই, তাই কোনক্রমে পড়িলাম, 'That you have wronged me doth appear in this.' অবশ্য জুলিয়াস সীজারে ব্রুটাসের প্রতি ক্যাসিয়াসের উক্তি। বাবা আমাকে ক্যাসিয়াসের পার্ট শিখাইলেন ও দাদাকে ব্রুটাসের। সেই বৎসরের অক্টোবর মাসে পূজার ছুটি হইবার আগে আমি ও দাদা এই দৃশ্যটা স্কুলের স্টেজে আবৃত্তি করিলাম। ইহার আগে অবশ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'টেমপেস্ট' ও 'রোমিও-জুলিয়েটে'র বাংলা অনুবাদ পড়িয়াছিলাম। মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেকসপীয়ার পড়া ১৯০৮ সনে আরম্ভ হইল।

এইভাবে কিশোরগঞ্জ ও বনগ্রামে আমার যতটুকু ইংরেজত্বে দীক্ষা হইয়াছিল তাহার বিবরণ দিলাম। কিন্তু বাঙালীত্বে দীক্ষার বিবরণের মত উহা বারো বছরেই সমাপ্ত করিতে পারিব না, কলিকাতায় ১৯১০ সনে গিয়া ১৯১৪ সনের প্রথম দিকে, ষোল বৎসরের হওয়া পর্যন্ত যতটুকু পরিচয় ইংরেজ-জীবনের সঙ্গে হইয়াছিল তাহার কথাও বলিতে হইবে।

কলিকাতায় ইংরেজত্ব লাভ

আমার ইংরেজত্বের ইতিহাস আরও চার বৎসর টানিবার কারণ এই যে, কিশোরগঞ্জে আমি ইংরেজী গদ্য যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহাতে একটি ভিন্ন অন্য কোনও বই-এ ইংরেজ-জীবনের বর্ণনা ছিল না। আমি অ্যান্ড্রু ল্যাঙ্গের 'অ্যানিমাল স্টোরী-বুকে' জীবজন্তুর কাহিনী পড়িয়াছিলাম, গ্রীমস ফেয়ারী টেলসে ইউরোপীয় রূপকথা পড়িয়াছিলাম, তাহা ছাড়া ইংরেজ কৃষকদের বাড়ি ও খেলাধূলা সম্বন্ধে ছোট বর্ণনা পড়িয়াছিলাম। তখন শুধু একটি বই-এ ইংরেজ-জীবনের নানাদিকের ও ইংরেজ-জীবনের নানা স্তরের বিস্তারিত বর্ণনা পাইলাম, উহা তখনকার দিনে একটি বিখ্যাত বই বলিয়া খ্যাত ছিল—উহার নাম 'ইভনিংস-অ্যাট-হোম'। বাবা বইটা কলিকাতা হইতে আনাইয়াছিলেন, ও অতি মন দিয়া পড়িতেন। তিনি ওটা রাখিয়া দিলেই আমিও উসিয়া বসিয়া পড়িতাম। উহা হইতে ১৯০৮ সনে 'Eyes and No Eyes' বলিয়া একটি কথোপকথন দাদার সঙ্গে স্কুলের স্টেজে অভিনয়ও করিয়াছিলাম। ইহাতে ইংরেজ-জীবন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হইলেও উহার ধর্মের পুরাপুরি উপলব্ধি হয় নাই। উহা হইল কলিকাতায় আসিবার পর গল্প-উপন্যাস পড়িয়া। গল্পের বইটি মেরী মিটফোর্ডের Our Village। আর কোনো বই-এ ইংরেজ গ্রাম্য জীবনের এমন চিত্তাকর্ষক ও সুমিষ্ট বর্ণনা পাই নাই। তাই বইখানা পড়িতে খুবই ভাল লাগিত।

কিন্তু তখন পর্যন্ত ইংরেজী উপন্যাস পড়ি নাই, ১৯১১ সনে স্কটের 'ট্যালিসম্যান' ও 'কেন্‌লওয়ার্থ' পড়িতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বিশেষ বোধগম্য হইল না। আমার ইংরেজী উপন্যাস পড়িবার আসল অভিজ্ঞতা হইল, মিসেস হেনরী উডের 'ঈষ্ট লীন' পড়িয়া। তখন বাঙালীর মধ্যে এই উপন্যাসটি অবশ্যপাঠ্য ছিল। আমি পড়িতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেলাম, সারা ১৯১১ ও ১৯১২ সন জুড়িয়া এই বইখানা সময় পাইলেই বার বার পড়িতাম, ফলে বইটা প্রায় মুখস্থ হইয়া গেল। ইহা হইতে কথাবার্তার বহু ধরণ শিখিয়া স্কুলে রচনা লিখিবার সময় প্রয়োগ করিতাম—যেমন নির্লজ্জতা সম্বন্ধে, 'You must have a face of brass', আভিজাত্য সম্বন্ধে 'out and out aristocrat'. লেডী ইসাবেলের কষ্টে দুঃখ হইত, কর্নেলিয়া কারলাইলের আচরণে আমোদ অনুভব করিতাম, সবচেয়ে মজা লাগিত মিঃ জাস্টিস হেয়ারের ফরাসী বলিবার চেষ্টা দেখিয়া—'Nang Parlay Frangsay me,' অর্থাৎ 'je ne parle pas Français.'

ইহার পর সেই মিসেস হেনরী উডেরই 'চ্যানিঙ্গস' পড়িয়াও খুব ভাল লাগিল, উহাতে বিলাতের স্কুলে শিক্ষার পরিচয় পাইলাম। এখন অবশ্য দুইটা উপন্যাসের কোনটাকেই আমি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস বলিয়া মানিতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজী অথবা ইউরোপীয় উপন্যাসের উচ্চস্তরের সহিত পরিচয় হইল লর্ড লিটনের 'Last Days of Pompei' পড়িয়া, ভিক্টর হুগোর 'Les Miserables,' এবং সিঙ্কিভিচের 'Quo Vades' পড়িয়া। এই তিনটি বই পড়িবার কারণ ছিল, তখন তিনটিরই 'বাক্যহীন' ফিল্‌ম হইয়াছিল, ১৯১২-১৩ সনে তিনটিই দেখিয়াছিলাম। এর মধ্যে Les Miserables এত ভাল লাগিয়াছিল যে, সারা ১৯১৩ সন জুড়িয়া এই উপন্যাসটি ইংরেজীতে পড়িয়া প্রায় মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। উহার প্রধান চরিত্র না হইলেও, অঁজোলরাস সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা হইয়াছিল, তাহাকে আদর্শ বিপ্লববাদী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।

সর্বোচ্চস্তরের ইংরেজী উপন্যাসের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল ১৯১৪ সনের প্রথম দিকে, জেন অস্টিনের 'Pride and Prejudice' পড়িয়া। কি ভাল লাগিয়াছিল বলিতে পারি না। ডার্সিকে আমি কিছুমাত্র নিন্দনীয় মনে করি নাই, কারণ তাহার মত বংশের অহঙ্কার আমাদেরও ছিল। এলিজাবেথ যে তাহার বিবাহের প্রস্তাব অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল তাহাতে দুঃখিত হইলাম। তেমনই পেম্বারলীতে গিয়া দুজনের মধ্যে যে বিবাহের সম্ভাবনা হইয়া গেল তাহাতে আনন্দ পাইলাম। এখনও এই উপন্যাসের মধ্যে পেম্বারলীর বর্ণনা ও কথাবার্তা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। অভিজাত ইংরেজের বাড়ি যে কি ধরনের তাহা জানিলাম প্রথম ইহা হইতেই।

একটি বর্ণনা এতই মনে লাগিয়াছিল যে, উহাতে উল্লিখিত একটি ফলের নাম না জানাতে ১৯৬৮ সনে ইংলন্ডে আসিয়া উহা আসলে কি আবিষ্কার করিলাম। এই প্রশ্ন মনে জাগিয়াছিল এই বাক্যটি পড়িয়া—'The beautiful pyramids of grapes, nectarines, and peaches, soon collected them round the table.' অন্য ফল চিনিলাম, কিন্তু নেক্টারিন কি বুঝিলাম না, তাই ভুলিতে না পারিয়া চুয়ান্ন বৎসর পরে ইংলন্ডে ফলের দোকানে গিয়া আবিষ্কার করিলাম উহা পীচেরই মত, শুধু খোসাটা মসৃণ।

এই উপন্যাসে ইংলন্ডের ভদ্রসমাজের আচরণের যে বর্ণনা ছিল, তাহা অত্যন্ত ইংরেজীপনা হইলেও বুঝিতে কোনো কষ্টই হয় নাই। এইভাবে ইংরেজ-জীবন সম্বন্ধে পরিচিত হওয়ার ফলে ছয়মাসের মধ্যেই শুধু যে শার্লেটি ব্রন্টির 'জেন আয়ার' পড়িতে পারিয়াছিলাম তাহাই নয়, টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যান্ড পীস' ইংরেজী অনুবাদে পড়িয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এখন কলিকাতা আসিবার পর আরও ইংরেজী কাব্য পড়িয়া ইংরেজত্ব লাভকে কি করিয়া পূর্ণতর করিলাম তাহার কথা বলিয়া আমার কাহিনী শেষ করি। সেই সময়ে কাব্য-নাটক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি ও নাটককারদের, তাঁহাদের বাসস্থানের ও তাঁহাদের কবিতাতে যে-সব জায়গার বর্ণনা আছে, সবেরই ছবিও দেখিলাম। উহাতে পড়ার বিষয়বস্তু দৃষ্টিগোচর হইল। তখন কলিকাতায় সকল বড় ইংরেজ কবির সচিত্র গ্রন্থাবলী পাওয়া যাইত, দামও খুব বেশি হইত না। আমি এই ধরনের অনেকগুলি বই দেখিয়াছিলাম ও পড়িয়াছিলাম। প্রথমেই দেখিলাম সেকসপীয়ারের নাটকের বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ফোটোগ্রাফ হইতে ছবি—স্যর হেনরী আর্ভিং ও এলেন টেরী হইতে আরম্ভ করিয়া লিলি ল্যাংট্রি, ফোবর্স-রবার্টসন, বিয়ারবম ট্রি, ম্যাথিসন ল্যাং পর্যন্ত—ম্যাথিসন ল্যাং ১৯১১ সনে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। কাব্যগ্রন্থাবলীতে দেখিলাম, মিল্টন হইতে আরম্ভ করিয়া টেনিসন পর্যন্ত সকলের চেহারা ও বাসস্থানের ছবি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বাসস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাইডেল মাউন্ট ও ডোভ কটেজ ও বায়রণের বাসস্থান নিউস্টেড অ্যাবির ছবি দেখিয়া খুব ভাল লাগিয়াছিল। একটু আশ্চর্য হইয়াছিলাম টেনিসনের বাসস্থান ফ্যারিংফোর্ডের ছবি দেখিয়া, কারণ উহাতে দেখিলাম টেনিসন স্বয়ং একটা প্রকাণ্ড ঝাঁটা হাতে করিয়া তাঁহার বাগানের পথ হইতে ঝরা পাতা সরাইতেছেন। অমন বিখ্যাত কবি কেন ঝাঁট দিতে লাগিয়া গেলেন বুঝি নাই। এই সব ছবি দেখিয়া কবিরা মূর্ত হইলেন।

তখন অবশ্য সব বড় কবিদের দীর্ঘ এবং কঠিনতর কবিতাও পড়িলাম। তবে সেগুলির উল্লেখ না করিয়া শুধু একটি কবি ও তাঁহার কয়েকটি কবিতার কথা বলিব যাহা বাঙালী বালকের উপভোগ্য হইল জানিয়া সকলেই আশ্চর্য হইবেন। সেগুলি স্কটল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ কবি রবার্ট বার্ণসের। গ্রন্থাবলীতে তাঁহার বাসস্থানের, তাঁহার প্রণয়িনী, পত্নী, ও বন্ধুদের, এবং কবিতাতে বর্ণিত জায়গাগুলি ও ঘটনার ছবিও অনেক দেখিলাম। কবিতাও অনেকগুলি পড়িলাম। তবে যে-চারটি কবিতা মনে আলোড়ন তুলিয়াছিল শুধু সেগুলির কথাই বলিব, এগুলির সঙ্গে ছবিও ছিল, দুইটি রঙীন। কবিতাগুলি এই,—

'Ye banks and braes o' bonnic Doon,
How can ye bloom sae fresh and fair?
How can ye chant ye little birds,
And I sae weary fu' o' care?'

ছবিতে দেখিলাম একটি নদী ও উহার পারে পারে অগণিত হথর্নগাছের সারিতে থোকা-থোকা সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

উহার পর পড়িলাম Auld Lang Syne। উহাতে যে ছবি ছিল তাহাতে দেখান হইয়াছিল হাঁটুজলে দাঁড়াইয়া একটি বালক ও একটি বালিকা মাতামাতি করিতেছে। নীচে এই চরণগুলি ছিল,—

'We twa hae paidled i'the burn
From morning sun till dine,
But seas between us braid hae roar'd
Sin'auld lang syne.'

ছবিটা সুখের হইলেও শেষ চরণ দুটি পড়িয়া মনে কেমন একটা উদাস ভাব আসিল। পরে পড়িয়াছিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, 'বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।' বোধ হয় আমার মনে উহারই পূর্বাভাস জাগিয়াছিল।

তৃতীয় কবিতাটিতে কিন্তু অবিমিশ্র আমোদই পাইয়াছিলাম। উহার ছবিটি ছিল রঙীন—উহাতে দেখিলাম শস্যক্ষেত্রের মধ্যে চারিদিকে শস্যের শিষে বেষ্টিত হইয়া একটি সুশ্রী ও সুবেশ ভদ্রযুবক হাসিমুখে দুষ্টামি করিতেছে, ও একটি কৃষক শ্রেণীর সুন্দরী তরুণী রাগ দেখাইবার চেষ্টা করিলেও হাসিয়া ফেলিতেছে। নীচে এই কথাগুলি পড়িলাম,—

'Gin a body meet a body
Coming through the rye;
Gin a body kiss a body,
Need a body cry?'

দেখিয়া ও পড়িয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইলাম।

চতুর্থ কবিতাটি বিখ্যাত 'জন এন্ডারসন মাই জো'। ছবিটি রঙীন ছিল, ইহাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিলাম একটি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা হাত ধরিয়া আগুনের কাছে চেয়ারে বসিয়া আছে, নীচে পড়িলাম,—

'Your locks were like the raven,
Your bonnie brow was brent;
But now your brow is beld, John,
Your locks are like the snow;
But blessing on your frosty pow,
John Anderson, my joe.'

এই কবিতাটি পড়িয়া যেমন আমোদ পাইলাম, তেমনই বিস্মিতও হইয়াছিলাম, কারণ বাঙালীর দাম্পত্য জীবনে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মধ্যে প্রেম অটুট থাকিতে সাধারণত দেখিতাম না। বৃদ্ধা পত্নীরা স্বামীর সম্বন্ধে নির্লিপ্ততা দেখাইতেন, এমন কি স্বামীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তিও করিতেন, আবার কোনো ক্ষেত্রে স্বামীর আচরণে মর্মাহত হইয়া কাশীবাসিনী হইতেন। বার্ণসের কবিতাটিতে ইহার বিপরীত দেখিলাম।

এই কবিতাগুলি প্রথম ১৯১৩ সনে পড়িয়াছিলাম, ছবিও সঙ্গে সঙ্গেই দেখিয়াছিলাম—ছবিগুলি আর দেখি নাই, তবু আজও চোখে ভাসিতেছে।

ইহার পর শুধু একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার ইংরেজত্বলাভের ইতিহাস সমাপ্ত করিব। আই-এ পড়িবার সময়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার একটি দীর্ঘ সঙ্কলন দাদার পুরাপুরি পাঠ্য ছিল, যে-সংস্করণটিতে ম্যাথিউ আর্নল্ডের ভূমিকা ছিল। উহার বহু কবিতাই দাদা আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, কিন্তু একটি বিশেষ করিয়া মনে গভীর ছাপ দিয়াছিল। ১৯১৪ সনের প্রথম দিকে তিনি হঠাৎ আমাকে 'The Education of Nature' কবিতাটি শুনাইলেন। যখন এই কয়টি কথা পড়িলেন,—

'And vital feelings of delight
Shall rear her form to stately height,
Her virgin bosom swell;
Such thoughts to Lucy I will give
Where she and I together lie
Here in this happy dell.'

পড়িতে পড়িতে দাদার মুখ যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল, এখনও তাহা আমার কাছে স্পষ্ট। আমি প্রথমে একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিশোরীর দৈহিক বিকাশের উল্লেখ শুনিয়া, কিন্তু তখনই শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়া আসিল। তখন আমার বয়স সবে ষোল হইয়াছে।

ইংরেজত্বলাভের কাহিনী শেষ করিলাম। বাঙালীত্বলাভের কাহিনীর সহিত ইহার এমনই বৈষম্য যে, একই ব্যক্তির চরিত্রে দুই লক্ষণই কি করিয়া একই সঙ্গে দেখা দিল, কি করিয়া দুই বিসম্বাদী জীবনধারার সমন্বয় ঘটিল, তাহা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হইবে। আমি উহা যুক্তিগোচর করিতে পারিব না। শুধু যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সত্য বিবরণ দিলাম।

ইংরেজত্ব ও জাতীয়তাবোধ

কিন্তু আর একটা প্রশ্নের যুক্তিগত ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারিব, উহাই আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজত্বলাভের সাফাই হইবে। আমি এবং অন্যেরা যে ইংরেজত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহা কি দেশদ্রোহিতা ? কেহই উহা অনুভব করে নাই, আমিও করি নাই। আমরা যেমন ইংরেজী পড়িয়াছি, তেমনই জাতীয় আন্দোলনেও যোগ দিয়াছি। এ-দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ আছে, তাহা আমাদের নেতারাও অনুভব করেন নাই। তাই তাঁহারা যে, 'ন্যাশনাল স্কুল' স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতেও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারি স্কুলের মতই ছিল। আমি স্কুলের স্টেজে যে সেকসপীয়ার অভিনয় ১৯০৮ সনে করিয়াছিলাম, উহা কিশোরগঞ্জের নূতন ন্যাশনাল স্কুলেই, আমি সে বৎসর সরকারি স্কুল ছাড়িয়া ন্যাশনাল স্কুলে গিয়াছিলাম। সেই স্কুলে আমি ও আমার দাদা ছাড়া অন্য ছাত্রেরাও সেকসপীয়ার হইতে অভিনয় করিয়াছিল—সেটা জুলিয়াস সীজারকে হত্যা।

আমি যে-সময়ে ইংরেজত্বে দীক্ষা আরম্ভ করি সেটা স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ, ১৯০৫ সনে বঙ্গবিভাগের উপলক্ষ্যে। প্রথম ৩০শে আশ্বিন অরন্ধন ও রাখীবন্ধনের দিনে সকালে উঠিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিলাম, মোটা কাপড়ের ধুতি পরিলাম, সেই কাপড়েরই পাঞ্জাবিও পরিলাম—তাও গেরিমাটিতে রঞ্জিত করিয়া—মাথায় পাগড়ি বাঁধিলাম, বিকালে সভায় গিয়া বক্তৃতা শুনিলাম। তখন হইতে বঙ্গবিভাগ থাকা পর্যন্ত কায়মনোবাক্যে, যতদূর সম্ভব কার্যেও স্বদেশী-আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলাম। আমার মনোভাবও ছিল 'এক্‌স্‌ট্রিমিস্ট', মডারেট নয়। তাই ১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেসে জুতা ছোঁড়াছুঁড়ির সংবাদ মহানন্দে পড়িয়াছিলাম।

তখন লাঠিখেলা, এমন কি ছোরাখেলা পর্যন্ত শিখিয়াছিলাম ; মিলিটারি ড্রিল করিতাম ; 'বর্তমান রণনীতি' বইটি পড়িয়াছিলাম ; স্বদেশী মিছিল হইলেই তাহাতে যোগ দিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতাম। প্রথমে গাহিতাম প্রধানত দেশপ্রেমের গান যেমন, 'আমার সোনার বাংলা', 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী' ইত্যাদি। ক্রমে 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' গাহিলাম। ক্রমে বীররসের প্রাধান্য হইতে আরম্ভ করিল, শুধু দেশপ্রেমের গানে যেন শানাইত না। তাই গাহিতাম কাব্যের দিক হইতে অনেক নিম্নস্তরের গান—'কাঁপায়ে মেদিনী, কর জয়ধ্বনি, জাগিয়া উঠুক মৃতপ্রাণ।' সুর আরো চড়িল, তাই একদিন একটা মিছিলে দাঁড়াইয়া কিশোরগঞ্জের ট্রেজারীর বন্দুকধারী পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া সকলে মিলিয়া স্পর্ধা করিতে করিতে গাহিলাম,—

'লালটুপী আর কালো কোর্তা
জুজুর ভয় কি আর চলে,
দেখে রক্তারক্তি, বাড়বে শক্তি
মানুষ হব মা বলে।'

পুলিসটি হাবা হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া ছিল।

ইহার পর সুর আরও চড়িয়া শাক্ত দেশপ্রেম দেখা ছিল। আমরা মুকুন্দ দাসের গান গাহিলাম,—

'আয় মা তারিণী করালবদনী
ডাকিনী-যোগিনী সব নিয়ে আয়'

অবশ্য ইংরেজকে রক্তবীজের মত নিধন করিবার জন্য। কিন্তু এই সব জাতীয়তা সম্বন্ধে মাতামাতি করিবার সময়ে একদিনও ইংরেজী কাব্য পড়া সম্বন্ধে কোনো বিরাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব করি নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে যাঁহারা বাঙালীর নূতন জীবনের পথনির্দেশ করিয়াছিলেন তাঁহারাও কোনো বিরোধ দেখেন নাই, উহার সম্ভাবনাও মনে আনেন নাই। অথচ রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই পাশ্চাত্য ধারা অবলম্বন করা কতদূর বাঞ্ছনীয়, কতদূর অবাঞ্ছনীয় তাহার বিচার করিয়াছিলেন। তখন বাঙালী কোনো মানসিক বা সামাজিক পরিবর্তন নির্বিচারে করে নাই। তাই বাঙালী শুধু অন্ধের মত এক সংস্কার ত্যাগ করিয়া আর এক সংস্কারের দাস হয় নাই। যে-প্রশ্নটার আলোচনা করিতেছি, উহার সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক অনেক হইয়াছিল, কিন্তু মোটের উপর সিদ্ধান্ত একই হইয়াছিল, অর্থাৎ কমই হউক কিংবা বেশিই হউক ইউরোপীয় ভাব ও জীবনের ধারা গ্রহণ করিতে হইবেই। উহার কিছু আভাস দিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে'র 'ইংরাজস্তোত্রে' ইংরেজের প্রতি, দাসমনোবৃত্তির প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলেও মানসিক জীবনে ইংরেজের অনুকরণ বাঞ্ছনীয়ই মনে করিয়াছিলেন। তাই তিনি রাজনারায়ণ বসুর প্রতিবাদ করিয়া অনুকরণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন,—

> 'যখন উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায় উৎকৃষ্ট যেরূপ করে সেরূপ কর, সেইরূপ হইবে। বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্যে, সুখে সর্বাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা করে, তাহা করিলে ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন ও সুখী হইবে।'

তিনি বলিলেন, এই আচরণ দূষণীয় নয়, স্বভাবের দোষে বাঙালীর এই অনুকরণপ্রবৃত্তি হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র নব্য-হিন্দুত্বের প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন, তাঁহার শিষ্যেরাই তাঁহার এই উক্তির উত্তর দিল। নব্য-হিন্দুর কথা সবচেয়ে উন্নতভাবে রবীন্দ্রনাথ গোরার মুখে দিলেন। গোরা সুচরিতাকে বলিল,—

> 'দেখুন একটি কথা মনে রাখবেন—যদি এমন ভুল সংস্কার আমাদের হয় যে, ইংরেজরা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন আমরাও ঠিক ইংরেজটি না হলে কোনমতে প্রবল হতে পারব না ; তা হলে সে অসম্ভব কোনোদিন সম্ভব হবে না এবং কেবল নকল করতে করতে আমরা দুয়ের বার হয়ে যাব। এ কথা নিশ্চয় জানবেন ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে, সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই সার্থক হবে, ভারত রক্ষা পাবে।'

স্বীকার করিতেই হইবে উহা অতি উচ্চাঙ্গের যুক্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের অভিমত ১৯১৭ সনে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বলিলেন, 'এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপোস হইয়া গেছে ; বিষয়বিভাগের মত উভয়ের মহলবিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্মে কর্মে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচারে বিচারে যত সঙ্কীর্ণতা, যত স্থূলতা, যত মূঢ়তাই থাক, উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তাহার প্রতিবাদ নাই, এমন কি সমর্থন আছে।' তার পর বলিলেন,—

'য়ুরোপে ঠিক ইহার উল্টো। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে, ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে কোনো খুঁৎ দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে-শক্তি, যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়।'

পাশ্চাত্য ধারা অবলম্বনের পক্ষে আমাদের সকলেরই এই বিশ্বাসই ছিল—উহা মুক্তির সন্ধান।

এইজন্যই আবার ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্যও আমাদের ইংরেজ হওয়া প্রয়োজন, এই ধারণা আমাদের জাতীয়তাবাদের অংশ হইয়া গেল। এই যুক্তি অতি স্পষ্টভাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'জাতিবৈর' প্রবন্ধে দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—

'এখন আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণই আমরা ইংরেজদের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাহাদের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু, বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না—কেন না সে গায়ে-জ্বালা থাকিবে না।'

রবীন্দ্রনাথও এই যুক্তি একটু অন্যভাবে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতাতে দিয়াছিলেন। ১৯১৭ সনে তিনি বলিলেন,—

'আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই একই কথা বলিয়া থাকেন—"তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে না।"

'আর যাই হোক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা।'

ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যে আমাদের অনেকাংশে ইংরেজ হইবার প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা সকলেই মনে করিতাম, সেজন্যই নানাদিকে ইংরেজত্বলাভের চেষ্টাও করিতাম, মনে করিতাম ইহা জাতীয়তাবোধের সহিত সঙ্গত, বিরোধী নয়। আমাদের কৈফিয়তের আভাসমাত্র দিলাম, উহার সম্পূর্ণ উপস্থাপন এখানে সম্ভব নয়।

আমার শেষ কথা

আমার ইংরেজত্বলাভের বিবরণ প্রধানত বারো বৎসরের হওয়া পর্যন্ত, কিছু ষোল বৎসরের হওয়া পর্যন্ত। তাহার পর অন্ততপক্ষে আশি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন আমার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব কি? বাহিরের দিক হইতে আমার জীবনযাত্রায় বহু পরিবর্তন দেখা দিয়াছে সত্য, কিন্তু মনেপ্রাণে আমি সেই বাঙালী ও সেই ইংরেজই মূলত রহিয়াছি, শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুয়েরই বিস্তার ও গভীরতা বাড়িয়াছে, ধর্মের কোনও পরিবর্তন হয় নাই।

তবে যে-কারণে আমি এখন আমার যুগের বাঙালী হইতেও অন্য ধরনের হইয়া গিয়াছি তাহা এই—আমি ১৯১৪ সনে ঠেকিয়া যাই নাই, ইংরেজ-বাঙালী বা বাঙালী-ইংরেজ হইবার প্রচেষ্টা বজায় রাখিয়াছি। তাই আজ আমি হয়ত আরও গভীরভাবে বাঙালী ও গভীরভাবে ইংরেজ।

দ্বিতীয় পার্থক্য দেখা গিয়াছে, আমার জীবনযাত্রার অবস্থানে। ১৯১৪ সন পর্যন্ত, এমন কি ১৯৫৫ সন পর্যন্তও বাঙালী-জীবনই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল, ইংরেজ-জীবন ছিল মানসিক জীবন। এখন চব্বিশ বৎসর ধরিয়া ইংরেজ-জীবনই প্রত্যক্ষগোচর, বাঙালী-জীবন মানস। তবু একটার চেয়ে অন্যটা প্রবল কোনো দিকেই নয়, কোনদিন ছিল না। আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো বিভেদ আছে মানি না। আমার বাঙালীত্ব ও ইংরেজত্ব সমান বজায় রহিয়াছে।

পরজীবনে এই দুই দিকেই যে আমি আমার যুগের বাঙালীর কাছেও অপরিচিত ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছি তাহার প্রমাণ আমি বিলাতেও পাইতেছি, দেশে গেলে হয়ত আরও বেশি করিয়া পাইব। আমার একটা ধারণা জন্মিয়াছে, আমি যদি এখন দেশে ফিরিয়া যাই, আমার লেখার অনুরাগী বাঙালীরাও বলিবেন,—

'মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে—
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে।...
গোধূলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরী খানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি তোমার শেষে
ফের নি আপন দেশে।
বিরামবিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে॥'

আমার জীবনে গোধূলিলগ্ন অনেকদিন হইল আসিয়াছে, তবু পাখির মত নীড়ে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই, অপরদিকে রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা সারা করিয়া তরীতে তুলিয়াছি, তবু ঘাটে ভিড়া হইবে না।

পুনশ্চ : আমাদের যুগের সহিত বর্তমান যুগের কি প্রভেদ দেখা দিয়াছে তাহার একটি প্রমাণ দিব। একটি কলিকাতার এম-এ পাশ ও অক্‌স্‌ফোর্ডের ডক্টরেট-প্রার্থিনী বাঙালী যুবতী 'দেশে' প্রকাশিত হইবার পর আমার ইংরেজত্বলাভের কাহিনী পড়িয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, উহা সত্য নয়, বানানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষমের ক্ষমতা

আমি কি সত্যসত্যই অক্ষম ?

যাঁহারা আজিকার দিনে, অর্থাৎ ৯৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পর, আমার কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠা দেখিতেছেন, তাঁহাদের হয়ত বিশ্বাস হইবে না যে, আমি অক্ষমতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। সুতরাং অন্য কথা বলিবার আগে আমি কি-ভাবে অক্ষম তাহার পরিচয় দিব, এবং প্রথম জীবনে অন্যেরা আমাকে কি-ভাবে বিচার করিত তাহার কথাও বলিব।

॥ ১ ॥

পরের মত

পরের মত লইয়াই আরম্ভ করি। আমাকে বাল্যকাল হইতে যাহারা দেখিয়াছিল, দুই-চারিজন নিকট আত্মীয় ও শিক্ষক ভিন্ন, তাঁহাদের কেহই আমার মধ্যে অসাধারণ কিছু দেখে নাই ; হয়ত সাধারণও কিছু দেখে নাই, below average মনে করিয়াছে। অতি অল্পবয়সে আমাকে দুর্বল ও কর্মবিমুখ বলিয়া সকলেই মনে করিত। আমি 'মিটমিটে ডান' ছিলাম, তাই আমার বিশেষ বুদ্ধি আছে বলিয়া মনে না হইলেও ধারণা জন্মিত এই ছেলেটার সম্ভবত লুকানো নষ্টামি আছে। পরে যখন বাল্যাবস্থা ও তারুণ্যে উপনীত হইলাম, তখন আমার বাচালতা দেখিয়া 'ফাজিল' বলিত। আমি পড়াশোনায় খুব ভাল তাহাও কেহ মনে করিত না।

এ-বিষয়ে আমি আমার দাদার ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার 'ভাল ছাত্র' বলিয়া নাম ছিল, আমাকে সকলেই তাঁহার উপগ্রহ বলিয়া মনে করিত, —এমন কি চেহারাতেও। দাদাকে সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিয়া স্বীকার করিত, আমাকে বলিত কালো। ১৯১৮ সনে বহু বৎসর কলিকাতাবাসের ফলে কালো রঙ খানিকটা ধুইয়া গিয়াছিল। তাই একরাত্রিতে ভৈরববাজার রেলস্টেশনে টিকিট কিনিতেছি, তখন একজন আমাকে অনেকক্ষণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি চারু ?' বুঝিলাম, কোনও পূর্বপরিচিত ব্যক্তি— কিশোরগঞ্জ শহরের। আমি উত্তর দিলাম, 'না, আমি নীরু।' তখন ভদ্রলোক বলিলেন, 'আপনি ফর্সা হয়েছেন।' একদিকে অন্তত দাদার সমকক্ষ হইতেছি মনে করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু উৎসাহ বোধ করিলাম।

সংসারে, অর্থাৎ কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার পর ইতিপূর্বে ভাল পাশ করিবার জন্য আমার সম্বন্ধে যেটুকু ভাল ধারণা হইতেছিল তাহাও লোপ পাইল। তখন দয়াপরবশ হইলে অন্যেরা আমাকে 'পাগল' বলিত, সাদা চোখে দেখিলে মনে করিত 'বয়ে যাওয়া ছোকরা'। ক্রমে ক্রমে সকলের চক্ষে একেবারে অপদার্থ হইয়া গেলাম। আমার যখন ২৭-২৮ বৎসর বয়স হইয়াছে তখনও কোনো আত্মীয় বলিলেন, 'এটাকে ধরে কেবল চাবুক মারা উচিত।' আমার ভরসা সকল আত্মীয়-বন্ধু ছাড়িয়া দিলেন।

সাংসারিক দিক হইতে দেখিলে, তাঁহারা যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। হয়ত রাগ ও অবজ্ঞা হইতে অতিরিক্ত কঠিন বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু মূলত অবিচার করেন নাই। তবে এই বিচার শুধু সাংসারিক বা লৌকিক গুণের হিসাব করিয়া। আমার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গুণ তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই। পড়িবার কথাও নয়।

এখন আমার সত্যকার অক্ষমতার কথা বলি। এই অক্ষমতা লোকের মতামতের অপেক্ষা রাখে না, আমার বিনয়েরও অপেক্ষা রাখে না। উহা লোকের সৃষ্ট ধারণা নয়, আমার দিক হইতেও অস্বীকার্য নয়। উহা মানিয়া লইয়াই আমি জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছি। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতার হিসাব নিরপেক্ষভাবে করিতে পারে, একদিকে আত্মপ্রত্যয় রাখিয়া অন্যদিকে আত্মপ্রবঞ্চনা করে না, সেই একমাত্র তাহার শক্তিতে যতটুকু সম্ভব ততটুকু কৃতিত্ব দেখাইতে পারে। সার্থক জীবন যাপন করিবার এই একমাত্র উপায়।

আমার অক্ষমতা নানাদিক হইতে আসিয়াছিল, প্রথম জন্মগত, পর পর বংশগত, শিক্ষাগত, ও আমার বাল্যবয়সে বাঙালীর যুগধর্মগত। একে একে সবগুলি অক্ষমতার পরিচয় দিব।

AMARBOI.COM

॥ ২ ॥

জন্মগত অক্ষমতা—দৈহিক

আমি আমার মাতার সাত মাস গর্ভের সন্তান, সুতরাং দেহের পুরাপুরি বৃদ্ধি লইয়া জন্মাই নাই। সেইরূপ বৃদ্ধি লইয়া জন্মিলেও বর্ণে গৌর ও মুখে সুশ্রী হইতাম না, দীর্ঘাকৃতি এবং বলবানও হইতাম না। জন্মেই আমি খর্ব ও ক্ষীণকায় এবং নিতান্ত চলনসই চেহারার হইয়াছিলাম। বিখ্যাত ও মান্য হইবার জন্য যে দীর্ঘাকৃতি ও বলবান, গৌরবর্ণ ও রূপবান, কণ্ঠস্বরেও শ্রুতিমধুর হইতে হয়, তাহা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন না।

ইহার পর বড়কিছু হইবার পথে আরও বাধা জন্মিল। আমার জন্মের মাসতিনেক পরেই আমার মাতার গুরুতর পীড়া হইল। ইহার জন্য আমি মাতৃদুগ্ধ খাইতে পারিলাম না, তখন হইতেই একমাত্র বাজারে-কেনা গাই-এর দুধ খাইতাম। আমাদের দেশে এরূপ দুধে নানারকম রোগের জীবাণু থাকে, তাই আমার গ্রহণীরোগ হইল। পাঁচবছর বয়স পর্যন্ত কিছুই হজম করিতে পারিতাম না, যখন ভাত ধরানো হইল তখন ভাতের সঙ্গে কবিরাজী বড়ি ও হিং মিশানো হইত। সেই অভ্যাসের বশে এখন পর্যন্ত কবিরাজী 'হিঙ্গাষ্টক' খাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই ও দেশ হইতে আনাই। বলা যায়, ইহাতে আমার চরিত্রে একটা জীবনব্যাপী হিং (asafoetida) syndrome রহিয়া গেল।

রোগ লইয়া জীবন আরম্ভ হইল ও সারাজীবনই রুগ্ন রহিলাম। বছর বারো-তেরো হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স হওয়া পর্যন্ত কিছু সুস্থ ছিলাম। তাহার পর হইতে ১৯৭০ সনে বাহাত্তর বৎসর বয়সে বিলাত আসা পর্যন্ত একটা-না-একটা রোগ লাগিয়াই রহিল। ১৯২৪ সন হইতে ১৯৪৪ সন পর্যন্ত অর্শে কষ্ট পাইলাম। দুইবার গুরুতর অসুস্থতায় (১৯৩৩-১৯৩৪ ও ১৯৪৯-১৯৫১) অনেক সময়েই শয্যাগত থাকিতে হইত, চলাফেরা করিলেও টলিতাম। ডাক্তারগণ—এর মধ্যে স্যর নীলরতন সরকার পর্যন্ত সন্দেহ করিলেন হৃদ্‌রোগ। ১৯৩৩ সনে আক্রান্ত হইবার পর অল্পবয়স্কা পত্নী ভয় পাইলেন পাছে সেই বয়সেই একটি সন্তান লইয়া বিধবা না হইতে হয়। ১৯২৫ সন হইতে দাঁত পড়িতে আরম্ভ হইল ও কৃত্রিম দাঁত করাইতে হইল, ১৯৪৫ সন হইতে (অর্থাৎ ৪৮ বৎসর বয়স হইতে) একবারে দন্তহীন।

সংক্ষেপে দৈহিক অক্ষমতার হিসাব দিই। আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট আধ ইঞ্চ ; ওজন একমনের অতি সামান্য উর্ধে সারাজীবন ধরিয়া ; দেহ হাড়-জিরজিরে কৃকলাশের মত ; রঙ আধ-ময়লা ; মুখের বিশেষ শ্রী নাই।

যৌবনে উপনীত হইবার পর বুঝিলাম ইহাতে বিবাহেও বাধা জন্মিতে পারে। কিন্তু অল্প বয়সে তাহা বুঝি নাই। স্বভাবে ডেঁপো বা জ্যাঠা হওয়াতে ১৩-১৪ বৎসর বয়স হইতেই জীবনের নানা অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতাম। নানা অবস্থার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক আকার ও শক্তির অনুপাত কি হওয়া উচিত তাহাও স্থির করিয়া রাখিলাম ; সিদ্ধান্ত করিলাম অনুপাত এরূপ হওয়া উচিত যে স্বামী অবলীলাক্রমে স্ত্রীকে কোলে করিয়া বেড়াইতে পারে। তখনও দৈহিক বৃদ্ধির আশা ছিল। ১৮-১৯ বছর বয়স হইবার পর সন্দেহ উপস্থিত হইল। বিবাহের পর আমার ধারণা একবারে ভ্রান্ত প্রমাণ হইল। দেখিলাম, যদিও নববধূ স্থূলাঙ্গিনী নহেন, তবুও তাহাকে কোলে করিয়া ঘুরিবার শক্তি আমার নাই। তিনি স্বামীর দৈহিক যোগ্যতা বিবাহের রাত্রিতেই কি-ভাবে বিচার করিলেন, তাহার কথা পরে বলিব।

তবে জিজ্ঞাসা করিবেন—ছিয়ানব্বুই বৎসর পার হইলাম কি করিয়া। ইহার উত্তর সহজ। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে ক্ষুদ্র জন্তু ও আগাছা যত সহজে বাঁচে, যেমন ইঁদুর বা ঘাস, বৃহদাকার প্রাণী ও ভাল ফল ও ফুলের গাছ এত অযত্নে বাঁচে না।

সুতরাং দেখা গেল আমার survival যতটা unfittest-এর বাঁচিয়া থাকা, ততটাই lowliest-এরও বাঁচিয়া থাকা। অবশ্য দৈহিক যোগ্যতার কথাই বলিতেছি। ইহার পর মানসিক যোগ্যতা— ক্ষমতা বা অক্ষমতার কথা বলি।

॥ ৩ ॥

জন্মগত অক্ষমতা—মানসিক

আমার মানসিক অক্ষমতা যে খানিকটা দৈহিক অক্ষমতা হইতেই আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবুও আমার মনে হয়, সবল এবং সক্ষম হইলেও আমার এই সব মানসিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্ষমতা দেখা যাইত। এই সব অক্ষমতার পরিচয় প্রথমেই দেখা গেল আমার চরিত্রগত কর্মবিমুখতায়।

তবে এই কর্মবিমুখতার মধ্যে একটা বিচিত্রতা ছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার সকল মানসিক ক্ষমতা ও অক্ষমতাই একটু বিশেষ ধরনের ছিল। সকলের আগে পরিশ্রমবিমুখতারই বিশিষ্টতার কথা বলি।

আমার পরিশ্রমবিমুখতা দেখা গেল বিশেষ করিয়া বিচারবুদ্ধি বা সাংসারিক জ্ঞান দিয়া নিয়ন্ত্রিত হইবার বেলায়। আমি কিছুতেই সাংসারিক উন্নতির জন্য যে-পরিশ্রম করিতে হয় তাহা করিতে চাহিতাম না। যেমন, প্রথম বয়সে পরীক্ষার পড়া কিছুতেই পড়িতাম না। ম্যাট্রিকুলেশ্যন দিবার আগে পুরা এক বৎসর পাঠ্যপুস্তক খুলি নাই, অথচ ইংরেজী উপন্যাস ও কাব্য অনেক পড়িয়াছিলাম। পরে আপিসে ঢুকিয়াও শৈথিল্য দেখাইলাম।

কিন্তু প্রবৃত্তির বশে অর্থাৎ সখে আমি অতি কঠিন পরিশ্রম করিতেও অনিচ্ছা দেখাই নাই, অক্ষমতাও দেখাই নাই। আমি যাহা পড়িয়াছি তাহা সখের পড়া। সেই পড়ার সময়ে কখনও অর্থোপার্জনের কথা ভাবিতাম না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার সামরিক ইতিহাস ও যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখিয়া বন্ধু বিভূতিভূষণ বলিতেন, 'তুমি এসব পড় কেন? তুমি কি স্বাধীন ভারতের ডিফেন্স মিনস্টার হবে?' তাহা হই নাই সত্য, তবে নিঃস্বার্থভাবে পড়াও কাজে লাগিয়াছিল। তাহা হইতে ধারণা জন্মিয়াছে নিষ্কাম কর্মও ফলপ্রসূ।

তারপর আমি বাল্যকালে ও প্রথম জীবনে ভীরু, লাজুক, লোকসমক্ষে মুখচোরা ও কুনো ছিলাম। সেজন্য অপরিচিত লোকের সঙ্গে সহজে মেলামেশা করিতে পারিতাম না। আজকাল যাঁহারা আমাকে দেখেন তাঁহারা কিছুতেই এই কথা বিশ্বাস করেন না। সামাজিক জীবনে এইরূপ অসামাজিক আচরণ আমি ছাড়িলাম চল্লিশ বৎসরে পৌঁছিবার পর, অবস্থাচক্রে।

অথচ অন্তরঙ্গ সমাজে আমি এত কথা বলিতাম যে সকলেই আমাকে বাচাল বলিত ও এতই পাকামো দেখাইতাম যে, আমার 'জ্যাঠা' ও 'ফাজিল' দুর্নাম হইল। এই ধারণা আজও বলবৎ আছে। এই অধ্যায়টি পড়িয়াও বাঙালী পণ্ডিতেরা বলিবেন যে, আমি বয়সের অনুচিত ফাজলামো দেখাইতেছি।

আর একটা অক্ষমতা যাহাকে দোষ বলা চলে, তাহাও আমার ছিল। সেটা বাহ্যিক গর্বিত ভাব। নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হওয়ার ফলে আমি সাধারণ বুদ্ধির লোকের সঙ্গে মিশিতে পারিতাম না। ইহার জন্য তাহারা আমাকে দেমাকে মনে করিত, তবে ভীত হইত না, কারণ তাহারা বলিত উহা আমার গুণহীনতা চাপা দিবার উদ্দেশ্য হইতে আসিতেছে। এই গর্ব থাকার জন্য আমি কখনই সাম্যবাদী হইতে পারি নাই। গণতান্ত্রিক যুগে এর চেয়ে অক্ষমতা আর কিছু হইতে পারে না।

তবে লোকে যাহাকে সাধারণত গুণ বলিয়া স্বীকার করে তাহা যে আমার মধ্যে ছিল না সেরূপ নয়। কিন্তু সেগুলিও আমার সাংসারিক উন্নতির পথে বাধা হইয়া গেল। সেই গুণগুলির যেগুলি আমার ক্ষেত্রে বৈগুণ্য হইল উহাদের কথা একে একে বলি।

প্রথমত, আমি চরিত্রধর্মেই অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলাম। কাহারও অধীনতা স্বীকার করা আমার স্বভাবের জন্য অসম্ভব হইল, কাহারও কাছে কিছু চাওয়া বা কাহারও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোসামোদ করা তো অকল্পনীয় ছিল। আমি জীবনে কোন পথ ধরিব বা ধরিব না সে সম্বন্ধে অন্যের পরামর্শ বা উপদেশ শোনা দূরে থাকুক, পিতার সঙ্গেও পরামর্শ করিতাম না।

দ্বিতীয়ত, আমি অসদাচরণ ও নীচতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতাম এবং যাহাদের অসৎ বা নীচ বলিয়া মনে করিতাম তাহাদের সঙ্গে কিছুতেই মিশিতে পারিতাম না। ইহাতে পরজীবনে আমার যে অভিজ্ঞতা ঘটিল তাহা 'ঠক বাছতে গাঁ উজোড়' দেখিবার মত।

তৃতীয়ত, আমি কিছুতেই অন্যায় সহ্য করিতে পারিতাম না, অন্যায় দেখিলে ক্ষেপিয়া যাইতাম। সেজন্য যৌবনে উপনীত হইবার পর পিতা একটি চিঠিতে লিখিলেন, 'তুমি অন্যায় দেখিলে অত্যন্ত বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া যাও। মনে রাখিও সংসারে বাস করিতে হইলে অনেক অন্যায় মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হয়।' আমি তাঁহার এই উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে পারি নাই।

সর্বশেষে আমার তিনটি গুণ, যাহা পরবর্তী যুগধর্মের জন্য গুরুতর দোষে পরিণত হইল, তাহার কথা বলি। সত্যের প্রতি আমার অটল ভক্তি ছিল, যে-ধারণা অসত্য তাহা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিলাম না। অথচ আমাকে জনপ্রচলিত অনেক ধারণাই অসত্য বলিয়া ছাড়িতে হইল। ইহার জন্যই আমি 'দেশদ্রোহী' বলিয়া অখ্যাত হইয়াছি।

ইহার পর আমার জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল, ফলে আমার যে বিদ্যা এবং জ্ঞান হইল (দুইটি এক জিনিস নয়) তাহাতে সাংসারিক জীবনে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইতে পারিত না। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিই। আমার তখন চব্বিশ বৎসর বয়সও পূর্ণ হয় নাই। একদিন কোনো বিষয়ে মাতাকে কয়েকটা খুব স্পষ্ট কথা বলিলাম। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া, আমি তাঁহাকে অপমান করিয়াছি বলিয়া পিতার কাছে অভিযোগ করিলেন। পিতা আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এরকম কথা তোমার মাকে বলেছ?' যখন স্বীকার করিলাম, তিনি বলিলেন, 'অত্যন্ত অন্যায় করেছ।' আমি প্রগল্‌ভতা দেখাইয়া উত্তর দিলাম 'এতে অন্যায় কি হয়েছে? এ তো philosophical truth.' পিতা প্রত্যুত্তর দিলেন, 'পারিবারিক জীবনে philosophical truth প্রচার করতে গেলে দুঃখ ও মনোমালিন্য হয়। এ-অভ্যাস ছেড়ে দাও।'

শেষ গুণ, যাহা সমস্ত জ্ঞানস্পৃহার মূলে তাহা, সব বিষয়েই আমার অত্যুগ্র ও অদমনীয় কৌতূহল। কোন কিছু দেখিলেই আমি যে শুধু কারণ নির্ণয় করিতে চাহিতাম তাহাই নয়, উহার একেবারে মূলে কি আছে তাহাও আবিষ্কার করিতে চাহিতাম। এই অদমনীয় কৌতূহলের ফলে আমার জীবনব্যাপী অনুসন্ধান অনেক সময়েই কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির করার মত হইয়াছে।

দোষেগুণে মানুষ, এ-কথা সকলেই বলে। আমার কপালগুণে আমার ক্ষেত্রে সকলই দোষ হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং আমার জন্মগত ধর্মের কথা এই উক্তি করিয়া শেষ করিব। 'কে তোমায় দোষে মা গো, আমার কর্মদোষে, মা, আমারে দেখিয়ে সাগর শোষে, মা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ৪ ॥

বংশগত অক্ষমতা

বাঙালী ভদ্রবংশে জন্ম হওয়ার ফলে আমি জাতিকুল সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হইয়া গেলাম। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ছাড়া অন্য জাতিকে নিম্নস্তরের বাঙালী মনে করিতাম ধনী হইলেও। আমার সমকক্ষতাজ্ঞানে অর্থের হিসাব ছিল না। তাই ধনী লোক হইলেই তাহার বশম্বদ হইব ইহা কখনও ভাবি নাই।

তখনও ময়মনসিংহের ভদ্রলোক ভূসম্পত্তিশালী ছিল তাই এইরূপ মনোভাব বজায় রাখিতে পারিয়াছিলাম। বিক্রমপুরে স্থানাভাবে কুলীন ভদ্রলোকের সম্পত্তি ছিল না। তাই তাহারা অল্পবেতনে সরকারি বা অন্য চাকুরি লইত। বিবেকানন্দ ইহা বেশ জানিতেন। সেজন্য তিনি একটি বিক্রমপুরী উক্তি বানাইয়াছিলেন, 'ব্যাতন না জানলে বদ্র-অবদ্র বুজবো ক্যামনে?' বঙ্কিমচন্দ্রও এ-বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'পোস্টমাস্টার বাবু বঙ্গদেশীয়— নিবাস বিক্রমপুরে, আপনার কাজ বুঝিতে সুচ্যাগ্রবুদ্ধি।' পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চবংশীয় কায়স্থ মাধবীনাথ 'দেখিলেন একটি বানর।' পক্ষান্তরে আমরা মোটেই এরূপ বিক্রমপুরীয় ছিলাম না; ছিলাম মাধবীনাথের মত— ভদ্র-অভদ্র স্থির করিতাম চেহারা ও আচরণ দেখিয়া।

বলিতে কি, বেতনভোগী কর্মচারী সম্বন্ধে আমার কিছু অবজ্ঞাই ছিল। পৈতৃক পরিবারে আমিই প্রথম বেতনভোগী সরকারি চাকুরে হই। আমার পিতামহ প্রপিতামহ আটচালায় বসিয়া দিব্য খাইতে পরিতে পারিতেন। আমি এই আকাঙ্ক্ষা কখনও ত্যাগ করিতে পারি নাই। সাংসারিক উন্নতির পথে উহা গুরুতর বাধা হইয়া দাঁড়াইল।

তারপর আমরা বনগ্রামের চৌধুরীরা সে-অঞ্চলের কুলীন ছিলাম। আমাদের বাড়ির লোকেরা যে-ভদ্র লোক সমানঘরে বিবাহ দেয় নাই ও যাহারা ব্যবসা করে তাহাদের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিত না।

বংশগৌরব হইতে কতকগুলি ধারণা জন্মিল যেগুলিকে প্রশংসনীয় বলা যায়— যেমন, বনগ্রামের চৌধুরী হইয়া আমি অনুদারতা দেখাইতে পারি না, নীচ আচরণ বা অর্থভিক্ষা করিতে পারি না, কাহারও সঙ্গে আড়াআড়ি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারি না, ইত্যাদি। এক কথায় মোটেই সাম্যবাদী হইলাম না। সুতরাং যে-যুগে 'ডেমোক্র্যাটিক' না হইলে সমাদর হয় না, তাহাতে অনাদৃত হইয়া রহিলাম।

॥ ৫ ॥

শিক্ষাগত অক্ষমতা

আমার বাল্যকাল পর্যন্ত বাঙালী সমাজে শিক্ষার যে-ধারা প্রচলিত ছিল তাহাতে বিদ্যা অর্জন ছাড়া চরিত্রগঠনের দিকে বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল। শিক্ষায়তন অর্থকরী বিদ্যা লাভের জন্য ইহা অবশ্যই স্বীকৃত ছিল। জনপ্রচলিত বুকনী, 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই', আমি ছাপার অক্ষরেই পড়িয়াছিলাম। তবু সে-যুগের শিক্ষকেরা এবং অভিভাবকেরাও ইহাকে একমাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানিতেন না। চরিত্রবান মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়িয়া তুলিতে হইবে ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া সকলেই মনে করিত এবং সচ্চরিত্র হইবার জন্য সর্বোপরি প্রয়োজন সংযমের, ইহা শিক্ষা দেওয়া হইত।

সকল কুপ্রবৃত্তি ও লোভ দমন করিতে হইবে, বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা ত্যাগ করিতে হইবে, দেহেমনে সহিষ্ণু হইতে হইবে, ইহাই প্রচার করা হইত। আদর্শপরায়ণ ছাত্রদের কাছে সংযমের অভ্যাস কৃচ্ছ্রসাধনের মত হইয়া যাইত।

সংযম সম্বন্ধে স্কুলে পড়ার সময়ে দুইটি বই হইতে উপদেশ লাভ করিতাম। উহার প্রথমটি অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ', দ্বিতীয়টি চন্দ্রনাথ বসুর 'সংযমশিক্ষা'। প্রথমটি স্বাধীনতালাভের জন্য বলিয়া কখনও স্কুলে পাঠ্যপুস্তক হয় নাই, তবে আমরা সকলেই অতি ভক্তিভরে পড়িতাম। দ্বিতীয়টি আমাদের পাঠ্যপুস্তক হইয়াছিল। এই দুইটি বই যদি এখন কেউ পড়েন তাহা হইলে বুঝিবেন, কি সংযমের ধারণা তখন সর্বস্বীকৃত ছিল। এইরূপ সংযম বালক-বালিকাদের উপর চাপানো আজিকার দিনের আলালের ঘরের দুলালেরা অমানুষিক অত্যাচার বলিয়া মনে করিবে। আমি সম্পন্ন ঘরের সন্তান হইয়াও কি করিতাম তাহা বলি। শুধু পায়ে থাকিতাম, পরিষ্কার থাকিবার জন্য অপারতপক্ষে কঠিন খড়ম পরিতাম। চুল পাট করা দূরে থাকুক, আই-এ পাশ করা পর্যন্ত আমি মাথায় চিরুনিও ব্যবহার করি নাই।

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সে-সময়ে আমার অত্যন্ত উদাসীনতা ছিল। এ-বিষয়ে কলেজে পড়িবার সময়ে দাদার সঙ্গে আমার প্রকৃতির পার্থক্য ছিল। ১৯১৪ সনে অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে থাকি, একদিন সকালে বারান্দায় আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ফাদার প্রায়রের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময়ে দাদা কলেজ হইতে ফিরিয়া হস্টেলের নীচের উঠানে প্রবেশ করিলেন। ফাদার প্রায়র (ইনি কবি Prior-এর বংশধর ছিলেন) বলিয়া উঠিলেন, 'Here comes Charu dressed in the height of fashion.' পোশাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা আমার অল্পবয়সে ছিল না, ইহা এখন কেহই বিশ্বাস করেন না।

ক্রমে ক্রমে আরামের প্রতি অবজ্ঞা বাড়িয়া চলিল। মনে করিলাম, চেয়ারে বসিয়া পড়া পৌরুষের অভাবের লক্ষণ, সুতরাং টেবিলের উপর একটা ডেস্ক বানাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। স্কুল-কলেজে শুনিতাম, শিক্ষক বা অধ্যাপক, যে ছাত্রেরা ঝুঁকিয়া উত্তর দেয় তাহাদের বলিতেছেন, 'Stand erect.' আমাকে কখনও তাহা বলিতে হয় নাই। বরঞ্চ আমি সব সময়েই এত বুক চিতাইয়া দাঁড়াইতাম যে, অন্য বালকেরা বলিত, 'তুমি এত বুক চিতিয়ে থাক কেন?'

যৌবনে উপনীত হইয়া একদিকে সংযম আরও বাড়িয়া গেল। খাটে তোষক পাতিয়া শোয়াকে আমি দুর্বলচরিত্রতা বলিয়া মনে করিতাম। তাই শক্ত মেঝেতে শুধু মাদুর পাতিয়া একটা বালিশ মাথার নীচে রাখিয়া ঘুমাইতাম। বিবাহের পরে অবশ্য অত্যন্ত নরম বিছানায় উঠিতে হইল। কিন্তু তাহা সহ্য হইল না, গায়ে ব্যথা হইত। তাই আবার মাদুরে ফিরিয়া গিয়াছিলাম।

দৈহিক বলিষ্ঠতার জন্য আমরা স্কুলে এবং বাড়িতে সর্বদাই ব্যায়াম করিতাম। পিতা যে কেবল মুগুর ও ডাম্বেলই কিনিয়া দিয়াছিলেন তাহা নয়, স্যান্ডোর 'ডেভেলপার'ও দিয়াছিলেন। স্কুলেও প্যারালাল বার ছিল। খোলা জায়গায় ব্যায়াম হইত তাই রিং এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরাইজন্টাল বার ছিল না। কলেজে পড়ার সময়ে হস্টেলে তাহাও পাইলাম।

পূর্ববঙ্গের সকল স্কুলেই ইহার অতিরিক্ত ড্রিল ছিল। সরকারি স্কুলে ড্রিল ছিল শুধু ব্যায়াম। কিন্তু কিছুদিনের জন্য যখন ন্যাশনাল স্কুলে গেলাম তখন শিখিলাম সামরিক ড্রিল। ইহাতে আমার অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। তাহা ছাড়া ন্যাশনাল স্কুলে ছোরা খেলা, লাঠি খেলা ও তরোয়াল খেলাও কিছু কিছু শিখিয়াছিলাম। দেশীয় ডন-বৈঠক তো সর্বদাই করিয়াছি।

এই সব অভ্যাস যে-সব স্কুলের বালকের ছিল তাহারা সে-সময়ে পুলিসের নজরে পড়িত ও উত্যক্ত হইত। দাদা এবং আমি ১৯১০ সন হইতে কলিকাতায় পড়িতে আরম্ভ করিলাম। সেখানে ব্যায়াম ইত্যাদি ছিল না। কলিকাতায় ব্যায়াম হইত আখড়ায়। তাহাতে কখনও যোগ দিই নাই। তাই পুলিসের নজরে তখন পড়ি নাই। আমার অব্যবহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরগঞ্জে ছিল, তাহার নাম বিপ্লববাদী বলিয়া পুলিসের খাতায় উঠিল ও সে ছাত্রাবস্থায় বিশেষ ঝামেলায় পড়িল।

এ-বিষয়ে দেশীয় ধারায় যাহা শিখিলাম, ও আরও একটু বড় হইয়া, বিশেষ করিয়া কলেজে যাইবার পর যাহা ইংরেজীতে পড়িলাম তাহা চরিত্রগঠন ও সংযম সম্বন্ধে আমার পূর্বার্জিত ধারণা ও অভ্যাস আরও দৃঢ়মূল করিয়া দিল। সেই সব ধারণা ভিক্টোরিয়ান যুগের muscular Christianity প্রচার হইতে আসিয়াছিল। আমি উহা বিশেষ করিয়া পাইয়াছিলাম টেনিসনের কবিতা হইতে। তাহার অনেকগুলি কবিতা আমার আই-এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। উহার মধ্যে তিনটি কবিতা জীবন নিয়ন্ত্রণ করা সম্বন্ধে আমার মনে অত্যন্ত সাড়া জাগাইয়াছিল। উহার প্রথমটি Oenone, দ্বিতীয়টি Ulysses, তৃতীয়টি Sir Galahad.

প্রথমটিতে পড়িলাম,—

'Self-reverence, self-knowledge, self-control,
These three alone lead life to sovereign power.
Yet not for power...
...but to live by law
Acting the law we live by without fear;
And, because right is right, to follow right
Were wisdom in scorn of consequence.'

ইহা হইতে শিক্ষা পাইলাম যে, জীবনে সাংসারিক লাভ ক্ষতির হিসাব না করিয়া ন্যায়পথে থাকিতে হইবে, কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে, ও 'ডিসিপ্লিন' মানিতে হইবে। কোনটাই বাঙালীর সাংসারিক জীবনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল না।

Ulysses কবিতাতে পড়িলাম,—

'... that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to find, and not to yield.'

এই কথা কয়টি তখন মনে কি আলোড়ন তুলিয়াছিল, কি উৎসাহ ও ভরসা জাগাইয়াছিল, সাধক হইবার কি আকুলতা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা এখনও স্পষ্ট মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। আমি বার্ধক্যের জন্য দুর্বল হই নাই, তবুও দুর্বল ছিলাম সেজন্যই কথাগুলি আমাকে এইভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

Sir Galahad-এ পড়িলাম,—

'My good blade carves the casques of men,
My tough lance thrusteth sure,
My strength is the strength of ten,
Because my heart is pure.'

যখনই তারুণ্য ও যৌবনসুলভ প্রবৃত্তিতে মনে অপবিত্রতা জাগিত এই কথাগুলি স্মরণ করিতাম। সর্বশেষে বলা প্রয়োজন, বাঙালীর জীবনে সে-যুগে নৈতিক ধারণার পিছনে ছিল ইংরেজের Puritanism. ব্রাহ্ম ও নব্যহিন্দু পন্থী সকলেই অত্যন্ত 'পিউরিটান' ছিলেন। আজ এই ধরনের আত্মসংযম, আত্মসম্মানবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা ও 'ডিসিপ্লিন' ইংরেজজাতির মধ্যেও লোপ পাইয়াছে। বাঙালীসমাজে আমার কর্মজীবন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই সব ধারণা ও অভ্যাস সাংসারিক উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

॥ ৬ ॥

যুগধর্মগত অক্ষমতা

আমি যে-যুগধর্মের কথা বলিতে যাইতেছি সেই ধর্মের সহিত সকলদিকে সঙ্গত যে-ধরনের বাঙালী চরিত্র বিগত শতাব্দীর শেষে দেখা দিয়াছিল তাহার অতি সত্য ও করুণ চিত্র আঁকিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দুইটি বিখ্যাত গল্পে। উহাদের একটি 'মেঘ ও রৌদ্র', অপরটি 'একরাত্রি'। সেই চরিত্রের দুইটি যুবকের জীবনই দুঃখে ও ব্যর্থতায় অবসান হইয়াছিল। তাহার পরে শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে অবলম্বন রহিল দুইজনের— উহা একজনের বেলাতে হইল এক বিধবার করুণা, যে একদিন তাহার বালিকা সখী ছিল ; অন্যের বেলাতে একটিমাত্র রাত্রির স্মৃতি।

'মেঘ ও রৌদ্রে'র নায়ক 'একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্য হৃদয় লইয়া কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বাধীনতা পাইলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাইরে তাঁহার আর কেহ অথবা আর কিছু ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন— কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এত বড় জগৎ সংসার অত্যন্ত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।'

'একরাত্রি'র নায়ক নিখিল, 'আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্‌ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাষ্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল— আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের চরম সার্থকতা।'

এই দুইটি যুবক যে-যুগধর্মে প্রসূত, আমিও তাহার দ্বারাই প্রসূত। আমার দীর্ঘ জীবন অবসান হইতে চলিয়াছে, তবে উহাদের জীবনের মত অবসান হইবে বলিয়া মনে করি না। কি সৌভাগ্যে আমি ইহা হইতে নিস্তার পাইলাম তাহা বলিতে পারি না। তবে কি-ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইয়াছি বলিতে পারি। পাইয়াছি, প্রথমত ১৯৪২ সনে কলিকাতা হইতে দিল্লী গিয়া ও ১৯৭০ সনে দেশ হইতে ইংলন্ডে আসিয়া।

এখন সেই যুগধর্মের পরিচয় দিই। উহা সৃষ্ট হইয়াছিল ইংরেজী ভাষা শেখা ও ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করিবার ফলে। উহার পূর্ণতা তিনটি পর্যায়ে হইয়াছিল— প্রথমত, ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ স্থাপনে, দ্বিতীয়ত, ১৮৩৫ সন হইতে মেকলের উদ্যোগে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার প্রবর্তনে, তৃতীয়ত, ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। ভুলিলে চলিবে না যে, বাঙালীর নূতন মনের সর্বোচ্চ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট।

তখন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই বাঙালী-জীবনে সকল নূতনত্বের উৎস হইল। দশ বৎসরের মধ্যে দেখা গেল উহার প্রভাব কত দূরগামী ও গভীর হইয়াছে। উহাতে যে-শিক্ষা দেওয়া হইল তাহার ফলে বাঙালী-জীবন আমূল পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিল। এই পরিবর্তন সর্ববিষয়ে— যেমন বাহিরে তেমনই অন্তরেও দেখা গেল, চিন্তায়, ভাবে, অনুভূতিতে, আবেগে, কার্যকলাপে, ও আচরণে। এই পরিবর্তন কত গভীর তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার স্যর হেনরী মেন (তিনি বড়লাটের মন্ত্রিসভার সদস্যও ছিলেন) উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ও ১৮৬৬ সনের কনভোকেশনের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—

> 'There is not one in this room to whom the life of a hundred years since would not be acute suffering if it could be lived again.'

তিনি বলিলেন, শিক্ষিত বাঙালীরা যাহা আয়ত্ত করিয়াছে তাহা 'Some of the knowledge and many of the susceptibilities of the nineteenth century— indeed, perhaps too many of them.' অবশ্য ইউরোপীয় উনবিংশ শতাব্দীর।

বিলাতে ফিরিয়া যাইবার পর মেন কেমব্রিজে অধ্যাপক হন। সেখানে ১৮৭১ সনে একটি বক্তৃতায় বাঙালী সম্বন্ধে বলেন,—

'I have had unusual opportunities of studying the mental condition of the educated class in one Indian province [Bengal]; though it is so strongly Europeanized as to be no fair example of native society taken as a whole, its peculiar stock of ideas is probably the chief source from which influences proceed and which are more or less at work everywhere. Here has been a complete revolution of thought, in literature, in taste, in morals and in law.'

তখন হইতে বাঙালী মনের প্রভাব সারা ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করিল। তাই, বাঙালী একটু বড়াই করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল— 'What Bengal thinks today, all India will think tomorrow.' আজ অবশ্য বাঙালীর সেই মানসিক সার্বভৌমত্বের কণাটুকুও অবশিষ্ট নাই।

বাঙালী মন কেন ইউরোপের দিকে আকৃষ্ট হইল। মেন ইহার উত্তর দিলেন,—

'Finding that their own systems of thought was embarrassed in all its expressions by the weight of false physics, elaborately inaccurate, careless of precision of magnitude, number and time, the educated

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Bengalis were turning to Western thought, especially in its scientific form.'

বাঙালী ইহা করিতে পারিয়াছিল তাহার নিজস্ব মানসিক ধর্মে, তাহা বুঝিতে পারিয়া মেন বলিলেন, 'To a way quick and subtle minded people which has hitherto been denied any mental food but this, mere accuracy of thought is by itself an intellectual luxury of the highest orders.'

যাহারা এই মনোবৃত্তি দেখাইল তাহাদের নাম হইল— Young Bengal, নব্যবঙ্গ। তাহাদের নিজেদের এ-বিষয়ে যে টনটনে জ্ঞান ছিল তাহাই নয়, স্পষ্ট আত্মাভিমানও ছিল। সেজন্য ইংরেজ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের অহঙ্কারী, অবিনয়ী ও প্রগল্‌ভ বলিত। মেন এই অভিযোগের উত্তর দিলেন,—

'I wonder whether it is considered how young they are, compared with English graduates, and how wide is the difference which their education makes between them and their fellow-countrymen.'

নব্যবঙ্গ দেখিল, তাহার মনের পরিধি পুরাতন বাঙালীর মনের পরিধির তুলনায় কত বেশি বিস্তৃত। এ-সম্বন্ধেও মেন বলিলেন,—

'The new generation of Bengalis saw in the intellectual life of Europe a force to extend their mental horizon.'

কিন্তু সে-যুগে ইহারাই একমাত্র জীবন্ত ও সক্রিয় বাঙালী হইলেও সংখ্যায় সাধারণ বাঙালীর তুলনায় কম ছিল। তখনকার দিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের 'মমি' বলা যাইত, তবে একেবারে মৃত নয়, জীয়ন্তে মরা। কিন্তু তাহাদের ভার বাঙালী সমাজের উপর পাষাণের ভারের মত ছিল। নব্যবাঙালীকে পরাজিত করিবার মত শক্তি তাহাদের ছিল না সত্য, তবে অনেক ক্ষেত্রে তাহারা, বেকায়দায় পাইলে একক নব্যবাঙালীকে পরাজিত করিতে পারিত। রবীন্দ্রনাথের গল্পের যে দুইটি নায়কের কথা বলিয়াছি, তাহাদের পরাজয় এইভাবেই হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই গল্প দুটি লিখিয়াছিলেন এই কারণে যে, তিনি এই জীয়ন্তে মরা সমাজের ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি এই সমাজের সঙ্গেই সারাজীবন যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। তাঁহার ভয় ও বিরোধিতা তিনি বারবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম পরিচয় পাই 'অচলায়তন' নাটকে, তার অব্যবহিত পরেই 'জীবনস্মৃতি'তে। যে-জীবনের মধ্যে তিনি আছেন তাহার সম্বন্ধে বলিলেন,—

> 'এ তো বাঁধা পুকুর, এখানে স্রোত কোথায় ও ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে ?'

নিজের মনের আকুলতা সম্বন্ধে লিখিলেন,—

> 'আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনই বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়-লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম, সে যে দূরবর্ত্তী।'

তবে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলই জীবনের উপর চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।'

'সবুজপত্রে'র কবিতায় তিনি এই জীর্ণ পুরাতনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু বুঝিলেন, পুরাতন হার মানে নাই। তাই ১৯১৭ সনে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'-এ আবার পুরাতন নিগড় ভাঙ্গার উপদেশ দিলেন। জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁহার এই পুরাতনের প্রতি বিরোধিতা বজায় ছিল।

এখন আমার কথা বলি। আমি এই পুরাতনকে কখনও ভয় পাই নাই, উহাকে অবজ্ঞাই করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মপন্থী পরিবারে বড় হইয়াছিলাম। পুরাতনের সংস্পর্শে আসি নাই, তাই সেই পুরাতন হইতে আমি কোনো বাধা পাইব তাহা মনেও করি নাই।

বাঙালী-সমাজের সঙ্গে বিরোধিতার সম্ভাবনা আমার মনে জাগিল ১৯২০ সনের পরে, যখন আমি কর্মজীবনে প্রবেশ করিলাম। ১৯১৪ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পর আমি কয়েক বৎসর অধ্যয়নে এত নিমগ্ন ছিলাম যে, বাহিরের ব্যাপারের খবর বেশি রাখিতাম না। বরঞ্চ পড়াশোনাতে ব্যাঘাত হয় বলিয়া উহা সম্ভব এড়াইয়া যাইতাম।

বাহিরের জগতের সঙ্গে যখন আবার যোগাযোগ ঘটিল তখন দেখিলাম সে জগতের রূপ-পরিবর্তন হইয়াছে। তাহা আর আমার চেনা বাঙালী সমাজ বা জীবন নয়। কিন্তু পরিবর্তিত জীবন আমাকে পীড়া দিতে জাগিল সবদিকেই— রাজনৈতিক আন্দোলনে, সাহিত্যে, সামাজিক আচরণে, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় চিন্তায়। সর্বোপরি যাহা অনুভব করিলাম তাহা এই, বাঙালীর জীবনীশক্তি যেন ক্ষয় হইয়াছে, জীবন অচল হইতেছে, শুকাইয়া যাইতেছে।

ইহাতে আমার মনে গভীর বিষাদ জাগিল। একে তো আমার ব্যক্তিগত জীবনেই নিরুৎসাহের কারণ ছিল। উহার কথা পরে বলিব। কিন্তু বাঙালী-জীবনে যাহা দেখিলাম তাহাতে সেই নিরুৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। উহার কথা আমি আমার ১৯৫১ সনে প্রকাশিত ইংরেজী আত্মজীবনীতে বলিয়াছি। তাহা হইতেই খানিকটা বাংলা অনুবাদ করিয়া দিই। (বলিয়া রাখি সে-অনুবাদ তেমন জোরালো হইবে না। আমি নিজেও আমার ইংরেজীকে বাংলা করিতে পারি না ; তেমনই নিজের বাংলারও উপযুক্ত ইংরেজী অনুবাদ দিতে পারি না।) তবু কিছু দিব।

'আমার মনে হইল কাল (time) যেন স্থানে (space) পরিণত হইয়া গিয়াছে, একটা lagoon -এ রূপান্তরিত হইয়াছে। (এই ইংরেজী শব্দটার বাংলা নাই, সুতরাং এই আবদ্ধ প্রাণহীন হ্রদের জন্য ইংরেজী রাখিতে হইল)। উহাতে মাঝে মাঝে বীচিভঙ্গ হইতেছে বটে, তবুও উহা মৃতপ্রায়, কারণ উহার সহিত প্রাণবন্ত স্রোতের আর কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু এই অচল অবস্থাতেও উহাতে একটা ভীতিজনক রূপান্তর দেখা গেল। উহার উপরটা শুধু দেখিলে, উহার তলদেশে যে একটা রোগের উদ্ভব হইয়াছে তাহা প্রথমে বোঝা যাইত না। কিন্তু একটু অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা গেল, উহার চারিদিকে একটা কালো রেখা দেখা যাইতেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর একটা কালো বৃত্ত, এবং উহা ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতেছে। শেষকালে বোঝা গেল যে, এই আবদ্ধ জলাশয়ও শুকাইয়া একটা পঙ্কের স্তরে পরিণত হইতেছে।'

১৯২১ সনের পর হইতে এই ক্ষয়ের অনুভূতি বাড়িতে লাগিল। আমি ক্ষয়ের সহিত সংস্রব রাখিব না স্থির করিলাম। তখন হইতে আমার প্রাপ্তবয়সের সমকালীন বাঙালী সমাজ ও জীবনের সহিত আমার বিরোধ ঘটিল। উহা আজ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। আমি চলিয়াছি এবং চলিব। তাহারা অচল হইয়াছে।

যে-জিনিসটা আমাকে সকলের চেয়ে বেশি পীড়া দিতে লাগিল তাহা এই— আমি দেখিলাম বাঙালীর অস্তিত্বে আর একটা নূতন অচলায়তন দেখা দিতেছে। সেই অচলায়তনের সবচেয়ে আশঙ্কাজনক রূপ দেখা গেল ইহাতে— যে-যুগধর্মে বাঙালী উনবিংশ শতাব্দীতে নবজন্ম লাভ করিয়াছিল তাহারই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় রূপ। অর্থাৎ সেই বাঙালী-জীবনও আর জীবন্ত ও সচল রহিল না, নবজীবনের ধারাকে প্রবহমান রাখিয়া আরও প্রশস্ত, গভীর ও উদার করিবার চেষ্টা করিল না। যেখানে পৌঁছিয়াছিল সেখানেই ঠেকিয়া গেল। সুতরাং বিগতযুগের ধারণা ও আচরণগুলিও কঠিনতা লাভ করিয়া মানসিক পাথরের অচলায়তন গড়িয়া তুলিল, বাঙালী-জীবনের চারিদিকে প্রাচীর উঠিল। আমি এই প্রাচীরের মধ্যে কিছুতেই থাকিতে পারিলাম না। ইহাতে আমার সাংসারিক উন্নতির পথে অলঙ্ঘ্য বাধা জন্মিল।

প্রথমেই আমাদের জাতীয়তাবোধের মধ্যে যে-সঙ্কীর্ণতা দেখা গেল তাহার কথা বলি। তাহার একদিকে দেখিলাম, নিজেদের জীবন সম্বন্ধে মনোভাবে, তাহারই ফলে অন্যদিকে দেশ সম্বন্ধে অনুভূতিতেও।

আমার বাল্যকাল পর্যন্তও সকল বাঙালী মনে করিত যে, জীবনযাপনে তাহাদের প্রথম কৃত্য ও কর্তব্য সাংসারিক জীবনে সাফল্য বা সমৃদ্ধি লাভ করা নয়, দেশের সেবা। ইহার অর্থ এই নয় যে জীবিকার্জন বা ধনার্জনকে তাহারা অবহেলার বস্তু মনে করিত, তাহারা শুধু সেই সব চেষ্টাকে জীবনধারণের আবশ্যিক দায় বলিয়া ধরিত, সুতরাং সে-বিষয়ে চিন্তা না করিয়াই শুধু উদ্যোগী হইত। তাহারা চিন্তা করিত ও বিচার করিত দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে। সেই কর্তব্যই তাহাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য তাহা সকলেই ধরিয়া লইত।

দেশের সেবাতে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে ইহাই সকল শিক্ষিত ও আদর্শপরায়ণ বাঙালী যুবক জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া জানিত। তাহারা মনে করিত এই উৎসর্গিত জীবন ছাড়া অন্য জীবনকে কাম্য বলিয়া মনে করিবার অধিকার তাহাদের নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'একরাত্রি' গল্পে একটু পরিহাসের সুরে হইলেও এই কথাই গল্পের নায়কের মুখে দিয়াছিলেন। সে বলিল, 'দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না।' এই বিশ্বাসের বশেই তাহারা যৌবনধর্ম অগ্রাহ্য করিয়া বিবাহের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাইত। এ-বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পের নায়কের মুখে এই উক্তি দিলেন, 'আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব।'

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সুচরিতারও এই মনোভাব দেখাইলেন। সে একদিন ছোট ভাই সতীশকে ডাকিয়া বলিল, 'আমাদের যে দেশ, আমাদের যে জাত, সে কত বড় তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিস ! সে আমি তোকে বোঝাব কেমন করে !... এই আমাদের ভারতবর্ষ !... খুব বড় একটা দেশে তুই জন্মেছিস, সমস্ত হৃদয় দিয়ে এই বড় দেশকে ভক্তি করবি, আর সমস্ত জীবন দিয়ে এই বড় দেশের কাজ করবি।' সতীশের কল্পনাবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে কহিল, 'বড় হলে আমার যখন অনেক টাকা হবে তখন—।' সুচরিতা কহিল, 'না, না, না— টাকার কথা মুখে আনিসনে, আমাদের দুজনের টাকার দরকার নেই, বক্তিয়ার ! আমরা যে কাজ করব তাতে ভক্তি চাই, প্রাণ চাই।'

রবীন্দ্রনাথ তখনকার মনোভাব বুঝাইবার জন্য যে-সব কথাবার্তা একটি তরুণীর মুখে দিলেন তাহাতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন ছিল না। আমিও বাল্যকালে এইরূপ মনোভাবই পোষণ করিতাম।

এইরূপ মনোভাবের মূলে ছিল দেশ সম্বন্ধে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা। সকলেই মনে করিত দেশ যেন আমাদের দুঃখিনী জননী, তাঁহাকে দুঃখ ও দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিবার কঠিন দায় আমাদের। তিনি আমাদের কাতরস্বরে আহ্বান করিতেছেন। এই আহ্বান আমাদের হৃদয়কে এত প্রবলভাবে আঘাত করিত যে, প্রতিদিনই দেশের সেবা বলিয়া মনে করা যায় এরূপ একটা-না একটা অতি তুচ্ছ কাজও না করিলে মনে হইত যে, সেদিন বিফল গিয়াছে ও আমাদের কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে।

মাতৃভূমি যে আমাদের দুঃখিনী জননী, তাঁহাকে এই দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, সমৃদ্ধ করিতে হইবে, তাঁহার গৌরব যে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, এই বাণী সকল মহান বাঙালীই আমাদের শুনাইলেন, কারণ তাঁহাদের মনেও এই ধারণাই ছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বাণী প্রচার করিলেন— 'মা যা ছিলেন, মা যা হইয়াছেন, মা যা হইবেন' আনন্দমঠে দেশমাতৃকার এই ত্রিমূর্তি দেখাইয়া। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সনের ৩ অক্টোবর বিলাত হইতে একটি চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লিখিলেন, —

> 'এদেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে মা বলে মনে হয়। এদেশের মত তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালবাসে।.. এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনই ভোলাতে পারবে না— আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি।'

জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থী অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলাল ঘোষও মাতৃভূমির দুর্দশা কি-ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার একটা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯০৫ সনে ভাবী সম্রাট পঞ্চম জর্জ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন ও সেই উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া গভর্নমেন্ট হাউসে ছিলেন। তখন স্যর ওয়াল্টার লরেন্স তাঁহার সেক্রেটারি ছিলেন। লরেন্সের সহিত মতিলালের অনেকদিন হইতেই বন্ধুত্ব ছিল। তাই তিনি যখন লরেন্সের সহিত দেখা করিতে গভর্নমেন্ট হাউসে গেলেন, তখন লরেন্স একটি বিশিষ্ট ধরনের ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবার জন্য যুবরাজের অনুমতি চাহিলেন, তিনি সম্মত হইলে মতিলালকে লইয়া গেলেন। মতিলাল হিন্দুধরনে তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'My future Emperor, remember poor India. She is in a bad way'. যুবরাজ তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন।

১৯১৫ সনে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন স্যর এস্ পি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহ (ভবিষ্যৎ লর্ড সিংহ)। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতবর্ষকে সর্বাঙ্গে আঘাতগ্রস্ত পীড়িতা নারীর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে সুস্থ, সবল অবস্থায় ফিরাইয়া আনাই সকল ভারতসন্তানের কর্তব্য। ইহাতে মিসেস বেসান্ট অত্যন্ত আপত্তি জানাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষ কিছুমাত্র পীড়াগ্রস্ত নয়।

আমি ১৯২১ সন হইতে দেখিতে লাগিলাম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই ভাবনা লোপ পাইতেছে, এমন কি আমাদের জাতীয়তা হইতে দেশপ্রেমও নিষ্কাশিত হইতেছে। পূর্বেকার ধ্যানধারণার স্থলে যাহা আসিতেছে তাহা নিছক ইংরেজবিদ্বেষ, দেশের প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি নয়। এই ইংরেজবিদ্বেষও আত্মপরায়ণ হইল। ইহার এক উদ্দেশ্য হইল বিদ্বেষ চরিতার্থ করিয়া তৃপ্তি এবং অপরটি ইংরেজের হাত হইতে ধনোপার্জনের সুযোগ ছিনাইয়া লইয়া ধনী হইবার সুখ। জাতীয় আন্দোলনের এই নূতন রূপ দেখিয়া আমরা উহার সহিত একাত্মতা হারাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেশদ্রোহী বলিয়া নিন্দিত হইবার পথও ধরিলাম।

নূতন যুগধর্মের রাজনৈতিক রূপকে গ্রহণ করিতে না পারার জন্য আমার যে অক্ষমতা জন্মিল, এই ধর্মেরই আর একটা দিক হইতেও আমি অক্ষম হইলাম। সেটা একটা নূতন ধরনের অর্থপূজা ও অর্থলিপ্সা। আজ যে স্বাধীন ভারতের সমস্ত শাসনব্যবস্থা—তা কেন্দ্রীয়ই হউক বা প্রাদেশিকই হউক—একমাত্র ধনসৃষ্টির কলেই পরিণত হইয়াছে, সেই কারখানাটি তখন হইতেই নির্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমিও তখন হইতেই এ-বিষয়ে সজ্ঞান ও বিরূপ হইলাম।

আগের যুগেও বাঙালীর মধ্যে যে ধনবান হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, মোটেই তাহা নয়। ধনবান হওয়াই মানুষের উচ্চাশার গোড়াকার রূপ। বাঙালীর ক্ষেত্রেই উহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? তবে ধনী হইবার বাসনা দুইটি কারণে সীমাবদ্ধ ছিল। উহার একটা বাহ্যিক, আর একটা অভ্যন্তরীণ। ইংরেজের শাসনব্যবস্থার জন্য দেশীয় লোকের অর্থোপার্জন একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া পুরাতন এবং নূতন ধর্মবোধ হইতেও অসৎ উপায়ে ধনবান হওয়া সম্বন্ধে ঘৃণা ছিল।

আমি যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইংরেজের ব্যবস্থাও কিছু শিথিল হইতেছিল, কিন্তু সর্বোপরি শিথিল হইতেছিল ধর্মের বাঁধন। দেশোদ্ধারের কামনা ছাড়িয়া বাঙালী যুবক বড় চাকুরি পাওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া ধরিল। উহার চরম রূপ কিরূপ হইল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বিলাতে আসিবার অল্প কিছুদিন আগে আমি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে বলিয়াছিলাম বাঙালীর আদর্শপরায়ণতা লোপ পাইতেছে। বক্তৃতার শেষে পঞ্জাবি অধ্যাপক, যিনি সভাপতিত্ব করিতেছিলেন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি এই কথা বলিলাম কেন? আমি উত্তর দিবার আগেই একটি বাঙালী যুবক আমার কাছে আসিয়া সহাস্যমুখে একটু অবজ্ঞাভরেই বলিল, 'I don't care for faith and ideals, I shall be quite happy if I get a good job.' আমি সভাপতি মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, 'Now you understand ?'

চাকুরিপূজার পরিণতির আর একটা দৃষ্টান্তও দিই। এখানে কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে অন্যেরা খবর দেন, 'উনি মেয়ের বিয়ে খুব ভাল দিয়েছেন।' (মনে রাখিতে হইবে বিলাতে বাঙালী সমাজে আত্মীয়বন্ধু সম্বন্ধে প্রধান আলোচনার বস্তু ছেলের চাকুরি ও মেয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহ।) আমি জিজ্ঞাসা করি, কি-ভাবে? সকলেই বড় চাকুরির সংবাদ দেন। আমি বলি, 'ওঃ, চাকরির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, মানুষের সঙ্গে নয়।' আজকাল এই যে রেওয়াজ হইয়াছে, তাহার জন্য আমার বন্ধুস্থানীয় একজনের কন্যার বিবাহবন্ধন বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আমি এই কথা শুনিয়া কন্যার পিতাকে বলিলাম, এই বিবাহ দেওয়া আপনার উচিত হয় নাই। তিনি বলিলেন, 'কেন, ছেলে এবং ছেলের পিতা দুইজনেই উচ্চ বেতনে চাকুরি করে।'

আমি এই ধারার সূত্রপাত কি-ভাবে হইল তাহার পরিচয় দিই। বাঙালী গৃহিণীদের মুখে (স্বকর্ণে) প্রশ্ন শুনিতাম— কোনও অভ্যাগত আসিবার কথা উঠিলে— 'অবস্থা কেমন?' অর্থাৎ সেই অবস্থা অনুযায়ী আপ্যায়নের আয়োজন হইবে। আমার মনে ঘৃণা জন্মিত।

অর্থ সম্বন্ধে বাঙালীর ন্যায়-অন্যায় বোধ যে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাইলাম। উহাও স্বকর্ণেই শুনিলাম। তখন একজন বাঙালী দুই-তিন লক্ষ টাকা তহবিল তছরূপ করিয়াছিল। তাহার কয়েক বৎসর জেল হইল। দাদা হাইকোর্টের উকিল, তিনি এই সংবাদ খুব খুশি হইয়া আমাদের দিলেন। কাছে তাঁহার এক নিকট আত্মীয়া ছিলেন— তিনি বি-এ পাশ, বলিলেন, 'তাতে কি হয়েছে? টাকাটা তো রইল!' বুঝিলাম এই নূতন যুগে আমার সুখে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। টাকার প্রতি উদাসীনতা আমার অক্ষমতার একটা অলঙ্ঘনীয় দিক।

আমার শেষ অক্ষমতার কথা বলিয়া আমার সাংসারিক অযোগ্যতার হিসাব শেষ করি। ইহা আসিল আগেকার অর্থাৎ আমার বাল্যকালের যুগধর্ম হইতে। নূতন যুগধর্মের আবির্ভাবের পরও আমি উহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না। সেই অক্ষমতা কল্পনাপ্রবণতা— যাহা চড়াতে উঠিয়া স্বপ্নাবিষ্ট হইবার দুর্বলতায়।

সে-যুগে মানসিক জীবন থাকিলে কোনও বাঙালীর পক্ষে কল্পনাপ্রবণ, এমন কি স্বপ্নপ্রবণ না হইয়া সুখে দিন কাটানো সম্ভব ছিল না। ধনগর্বে স্ফীত হইয়া কৃত্রিম রসস্থতা না পাইলে বাঙালীর দিনগত জীবনে কোনও রস ছিল না।

এইরূপ অবস্থা নানা কারণেই হইয়াছিল। সেকালের বাঙালী-জীবন অত্যন্ত অনাড়ম্বর, বাহুল্যবর্জিত ও সাদাসিধা ছিল। সুতরাং সাধারণ ভদ্র বাঙালীর মানসিক জীবনও ছিল মোটা ভাত খাইয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া দৈহিক জীবনযাপন করিবার মত। তাহার পর ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে আসিল একটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ 'পিউরিট্যানিজম্'। বাঙালী 'পিউরিটান'রা বাস্তব জীবনে শ্রী বা সৌষ্ঠব আনিবার চেষ্টাকে বিলাসিতা বলিত। সাধারণ ভদ্র বাঙালীর মধ্যে এই বিলাসিতা প্রায় দুশ্চরিত্রতার মত মনে হইত।

সেজন্য সাংসারিক কার্যকলাপে, চাকুরিতে বা পেশায় অর্থোপার্জন ভিন্ন অন্যদিকে যে-বাঙালী ঝুঁকিত তাহার অকেজো এমন কি 'বাউণ্ডুলে' বলিয়াও দুর্নাম হইত।

সেকালের ভাবুক বাঙালী এই কারণে বাউল, সাধক, এমন কি সন্ন্যাসীও হইয়া যাইত। নূতন যুগে সেইভাবে বৈষয়িকতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা কমিয়া গেল, কিন্তু তাহার বদলে কবি হইবার ইচ্ছা জন্মিল, এবং যাহারা লিখিয়া কবি হইতে পারিত না, তাহারা ভাবুক হইত, অর্থাৎ কল্পনাপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট চরিত্রের।

আমি সেই চরিত্রেরই ছিলাম। সেজন্য আমার কার্যকলাপে কল্পনার প্রভাবই বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যাইত। তবে খুব অল্পবয়স হইতেই দেখিতে আরম্ভ করিলাম যে, আমার কল্পনাসৃষ্ট জগৎ ও বাস্তব জগৎ বিভিন্ন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই আমার জীবনে এই দুয়ের সংঘাতের পরিচয় দিব।

১৯১৩ সনে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া স্কুলেই পড়ি— প্রথম শ্রেণী বা ক্লাস-টেন-এ। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা-মা ও ভাইবোনদের কাছে পৈতৃক বাসস্থান বনগ্রামে গিয়াছি। কবিতা পড়ার ফলে গ্রাম্যদৃশ্যের মধ্যে রাখাল বালকের মূর্তিই জাগরূক থাকিত। পড়িয়াছিলাম—

'বেলা যায় যায় ধু ধু করে মাঠ,
দূরে দূরে চরে ধেনু,
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।'

আরও—

'তখন রাখাল ছেলে
পাঁচনি ধূলায় ফেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে বটতলাতে ;
বাঁশবাগানের ছায়ে
এক মনে এক পায়ে
খাড়া হয়ে আছে বক জলাতে।'

এইরূপ দৃশ্য দেখিবার সুযোগ বনগ্রামে গিয়া ঘটিল। বৈশাখ মাস, পাটের ক্ষেত কচি নালিতায় সবুজ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের বড় দিঘির পারে একটা খোলা চৌচালায় বসিয়া চারিদিক দেখিতেছি। পুবদিকে প্রায় এক মাইল মত খোলা মাঠ। তাহার ওপারে গচিহাটা গ্রামের বাঁশঝাড় ও তরুশ্রেণী 'তমালতালী বনরাজিনীলা'র মত। সামনেই একটা অশত্থ গাছ। উহার নীচে এক রাখাল বালক, গরু ছাড়িয়া দিয়া, পাঁচনি ঘাসের উপর ফেলিয়া, গান গাহিতেছে। মেঠো সুরের গান, অত্যন্ত মিষ্ট লাগিল।

কিন্তু হঠাৎ রাখাল বালক দেখিল, তাহার গাই পাট ক্ষেতে ঢুকিয়া কচি নালিতা খাইতেছে। সে গান থামাইয়া তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া দাঁড়াইল ও পাঁচনিটা কুড়াইয়া লইয়া চীৎকার করিল—

'ও হালার গাই, ও পুঙ্গীর বাই,
আইলে ?
আরাঙ্গি মারাম্ কুইল !'

(ও শালার গাই, ও পুঙ্গীর ভাই— প্রচলিত গালি, অর্থ কি জানি না— এলি ? ঢিল ছুড়ব কিন্তু !) গাই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

আমার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। এখন জিজ্ঞাস্য— স্বপ্নের রাখাল বালক সত্য, না এই ঘোর বাস্তব রাখাল বালক সত্য। এইরূপ হাস্যকর অভিজ্ঞতার পরও বলিব, হাঁ, স্বপ্নের রাখাল বালকই সত্য।

সংসারে বাস করিতে গেলে অবশ্য প্রতিদিন 'পুঙ্গীর ভাইদের' সংসর্গে আসিতে হয়, এড়াইবার কোনই উপায় নাই ; এমন কি দুর্ভাগ্য হইলে রাত্রিতে 'পুঙ্গীর বোনদের' সঙ্গেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক শয্যায় শুইতে হয় ; দুর্ভাগিনী হইলে পুঙ্গীর ভাইদের সঙ্গে শুইতে হয়। তবুও বলিব— বাস্তব পুঙ্গীর ভাইবোন হইতে স্বপ্নের আপনভোলা বাঙালী সত্য।

এই বিশ্বাস লইয়াই আমি সারাজীবন কাটাইয়াছি, সেজন্যই হয়ত বিলাতবাস করিতে হইতেছে। এখানেও তেইশ বৎসরের মধ্যে মাত্র দুইটি বাঙালী পরিবার আমার সহিত সামাজিক সম্পর্ক রাখিয়াছে। আমি এখানে একঘরে। সেটা সৌভাগ্য মনে করি।

আমার সর্ববিষয়ে অক্ষমতার আর কি প্রমাণ দিব ?

আমার এই কল্পনাপ্রবণতা বাহির হইতে ধরা যায় না, কারণ বাল্যবয়স হইতে দেশীয় ও বিদেশীয় সংযমে দীক্ষা পাওয়ার ফলে আমি বাহিরে আবেগ প্রকাশ করিতে পারি না। আমার মন অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী। তাই আমাকে সকলে শুষ্ক কাষ্ঠ মনে করিয়াছে এবং করে।

আমার জীবনের ধারা

এই সব সর্বতোমুখীন অক্ষমতার জন্য আমার জীবন একটা অদ্ভুত পথে চলিয়াছিল। ইহাতে অক্ষমতা যেমন দেখা গিয়াছিল, একধরনের ক্ষমতার প্রভাবও অব্যাহত রহিল। তবে অক্ষমতাটাই প্রকাশ পাইত, ক্ষমতাটা অন্তর্নিহিত ছিল। ব্যাপারটার পরিচয় দিবার জন্য একটা ইংরেজী প্রবন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার পুনরাবৃত্তি করিব।

লন্ডনের Independent সংবাদপত্র 'Second Thoughts' নাম দিয়া বিশিষ্ট ইংরেজ লেখকদের কাছ হইতে ছোট ছোট প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতেছিল। সম্পাদক আমাকেও সেই 'সিরিজে' কিছু লিখিতে বলেন। আমি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বলিলাম উল্টা কথা— অর্থাৎ আমার কখনও কোনোকালে কোনো বিষয়ে 'second thoughts' হয় নাই।

'Second thoughts' অর্থ, সাংসারিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রথমে এক পন্থা স্থির করিয়া পরে আরও বিচারের ফলে উহা ছাড়িয়া অন্য পথ স্থির করা। আমি বলিলাম, এই কাজ আমি কখনও করি নাই, করাকে মতিস্থিরতার অভাব বলিয়া মনে করিয়াছি। আমি অগ্রপশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোনো সিদ্ধান্ত করি না, তাই কখনও মত বদলাই নাই। এখনও আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি ১৯৫১ সনে প্রকাশিত আমার আত্মজীবনীতে যে-সব মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা পরবর্তী অবস্থা বা ঘটনার কথা বিবেচনা করিয়া ত্যাগ বা পরিবর্তিত করিব কিনা। আমি উত্তর দিই, 'না, যদি পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইত তবে সেই সব মত প্রকাশই করিতাম না।' ভদ্রলোকের এক কথা।

তবে এটাও বলা প্রয়োজন যে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত হইয়া কিছু বলিতে পারে না, কার্যকলাপও নিশ্চিত হইয়া করিতে পারে না। এখানে শুধু কার্যকলাপের কথাই বলি। ভবিষ্যতের জন্য কার্যকলাপ যাহা করা যায় এবং করা উচিত তাহা শুধু ভাল-মন্দের হিসাব সাদা চোখে দেখিয়া করা। সব পথ ধরার মধ্যেই যেমন ভাল থাকে, তেমনই মন্দও থাকে। এইটুকুমাত্র দেখিতে হয়, ভালর সম্ভাবনা বেশি না মন্দের সম্ভাবনা বেশি। তাহার বিচার করিতে হয় নির্লিপ্ত হইয়া, আশার ছলনায় ভুলিয়া কোনো পথ ধরিলে বিপদের সম্ভাবনা সবসময়েই থাকে। আমি সারাজীবনে মন্দের জন্য প্রস্তুত না হইয়া, শুধু ভাল ফলের প্রত্যাশা করিয়া কোনো পথ ধরি নাই। সুতরাং আমি মতপরিবর্তনের প্রয়োজন কখনও অনুভব করি নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যে এইভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলাম তাহা বুঝাইবার জন্য সেই প্রবন্ধে একটা উপমা দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম— আমার জীবন চলিয়াছিল একটা ট্রেনের মত। যাত্রার পথ ও লক্ষ্য স্থির করিয়া উহাকে যাত্রারম্ভের স্টেশনে দাঁড় করানো হইয়াছে, এবং উহা সেই লাইনেই চলিয়া লক্ষ্যে পৌঁছিবে তাহা স্থির করা আছে। আমার জীবনেও তাহাই ঘটিয়াছে— বলিতে পারি, সংসারে প্রবেশ করিবার আগেই আমার লক্ষ্য স্থির ছিল, এবং সেই লক্ষ্যেই পৌঁছিয়াছি।

কিন্তু ট্রেনটি 'টাইম-টেবল্'-মত চলে নাই, কারণ ইঞ্জিনটি প্রথম হইতেই ছিল ছোট ও কম শক্তির ; তারপর ছিল ভঙ্গুর। তাও রওনা হইবার আগেই ভাঙিয়া পড়িল। আমার ইঞ্জিন ছিল আমার বাল্যকালে ই-বি-আর লাইনের A-Class ইঞ্জিনের মত ; যাহার চোঙ্গা বেশ উঁচু হইত। তখন ইঞ্জিনটা শুধু 'শান্টিং'-এর জন্য ব্যবহৃত হইত ; মেল ট্রেন চলিত D-Class -এর বা আরও শক্তিশালী ইঞ্জিনে। আমি জন্মেই A-Class -এর ইঞ্জিন হইয়াছিলাম। সুতরাং আমার জীবন 'লোকাল ট্রেন' হইয়া গেল। 'ব্রেক-ডাউন' না হইলেও সেই ট্রেনকে পাশের লাইনে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত দ্রুতগামী 'মেল-ট্রেন'কে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য।

আমি হাওড়া-বর্ধমানের লোকাল ট্রেন হইলাম। কোনোক্রমে ব্যান্ডেল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছি ; তখন পিছন হইতে দিল্লী মেল অথবা তুফান মেল আসিতেছে ; তাই 'সাইডিং'-এ দাঁড়াইয়া আছি। যে-সমবয়সীরা তখন মেল ট্রেনের মত তাঁহারা আমাকে পার হইয়া চলিয়া গেলেন। দুজনের কথাই বলি— আমি জীবনপথে সেই স্টেশনের 'সাইডিং'-এ দাঁড় করানো। দেখিলাম, দিল্লী-মেলরূপী সুভাষচন্দ্র বসু ও তুফান-মেলরূপী দিলীপ রায় বিদ্যুৎবেগে গর্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। আমি ফ্যাল ফ্যাল চোখে চাহিয়া রহিলাম। তখন অন্যেরা দূরে থাকুক, আমি নিজেও কল্পনা করিতে পারি নাই যে, এই লোকাল ট্রেনটা ঢকর-ঢকর করিয়া চলিলেও এবং অনেকবার অচল হইয়া পড়িলেও একদিন বোম্বে-মেল হইয়া আমাকে বিলাতগামী জাহাজে পৌঁছাইয়া দিবে। কালস্য বামা গতি !

আমার সংসার-প্রবেশ

ইঞ্জিনটি রওনা হইবার আগেই যে ভাঙিয়া পড়িল, উহার কথা বলি। আমার সাংসারিক জীবন আরম্ভ হইয়াছিল পরাজয়ে। ইহার জন্য আমার সমস্ত সাংসারিক জীবন চলিল দান্তের 'দিভিনা কম্মেদিয়া'র তিন পর্যায়ে— গোড়াতে 'ইনফের্নো (পাপের জন্য নরকে গমন) ; মাঝখানে 'পুরগাতোরিও" (ইহজগতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি) ; শেষে বেয়াত্রিচের চালনায় 'পারাদিজো' (স্বর্গে প্রবেশ)। সুতরাং সংসার-প্রবেশের দ্বারেই দেখিলাম, উপরে এই কথাগুলি জ্বলজ্বল করিতেছে—

'Per me si va ne La Citta dolente,
Lasciate Ogni Speranza voi ch'entrate.'

মাইকেল-কৃত অনুবাদ দিতেছি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চিরদুঃখ ভোগে,—
হে প্রবেশি ! ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।'

ইংরেজীতেও অল্পবয়সেই পড়িয়াছিলাম,—

'All hope abandon, Ye who enter here,'

আমারও একেবারে তাহাই হইল। আমার সাংসারিক জীবন আরম্ভ হইল পরাজয়ে। সে-পরাজয় কি বুঝিবার আগে জীবনে পরাজয় সম্বন্ধে দু-চারিটা সাধারণ কথা বলিব। পরাজয় আসলে মার খাওয়াতে নয়, পরাজয় স্বীকারে। মার খাওয়া জীবনে অনিবার্য। সারাজীবন আদরে ও উৎসাহদানে কাটিবে, শিশুকাল হইতে প্রাপ্তবয়স্ক-হওয়া পর্যন্ত অন্যেরা 'হাঁটি হাঁটি পা পা, খোকা হাঁটে রাঙা পা' বলিয়া উৎসাহিত করিবে, এই বিশ্বাস বা আশা যে পোষণ করে সে নির্বোধ। প্রতি পদে বাধা পাওয়া, সমস্যার সম্মুখীন হওয়া, বারবার ব্যর্থমনোরথ হওয়া—ইহাই সংসারধর্ম। তবে বাধা, সমস্যা ও ব্যর্থতার কমবেশি হইতে পারে। আমার বেলায় প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহাই হউক না কেন, সেই সময়ে মনে হইয়াছিল আমার পরাজয় চূড়ান্ত, ইহার পর আর জয়লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। তখন পরাজয়কে অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই।

তাই ১৯২১ সনে সংসার প্রবেশের মুখে মনের অবস্থা যাহা হইয়াছিল তাহা বৌদ্ধধর্মে মানবজীবন সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই অনুযায়ী। বৌদ্ধ অভিমত এইরূপ—'সব্ব দুক্খ, সব্ব অন্নত, সব্ব অনিচ্চ'—সকলই দুঃখ, সকলই অনৃত, সকলই অনিত্য। পরজীবনে, নিজের চরিত্রধর্মের জন্য এই পরাজয়ই আমার একমাত্র পরাজয় স্বীকার হইল বটে, কিন্তু সদ্যসদ্য উহার আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। আমার মন গভীর নিরাশা ও নিরুদ্যমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। যদিও তখন আমার বয়স ছিল মাত্র তেইশ অর্থাৎ পূর্ণ যৌবন।

হিন্দু নীতিপ্রচারকেরা যৌবনকে গর্ব, অন্ধ মোহ, ও ঔদ্ধত্যের কাল বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। শুকনাশ চন্দ্রাপীড়কে উপদেশ দিয়াছিলেন, 'তাত চন্দ্রাপীড়, যৌবন হইতে স্বভাবতই যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়, সূর্যের আলোক তাহা ভেদ করিতে পারে না, রত্ন ছিন্ন করিতে পারে না, প্রদীপ দূর করিতে পারে না, যৌবন হইতেই জীবনে গভীর তমসার সৃষ্টি হয়।' যৌবনের এই উচ্ছলতা আমি কখনও অনুভব করিতে পারি নাই, আমার জীবনে তমসা আসিয়াছিল যৌবনে অকালবার্ধক্য হইতে। আমার মানসিক যৌবন আরম্ভ হইয়াছিল দৈহিক বার্ধক্যের প্রারম্ভ হইতে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পর। সুতরাং উহা মানসিক যৌবন মাত্র হইল।

এখন সেই প্রথম পরাজয়ের কথা বলি। ইহার কারণ হইয়াছিল, এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারা। ঠিক 'ফেল' হই নাই। দুই দিন পরীক্ষা দিবার পর দেখিলাম সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। আমার স্বভাবে একটা অক্ষমতা ছিল যে, ভাল না লাগিলে আমি কিছু করিতে পারিতাম না, পড়িতেও পারিতাম না। পরীক্ষা পাশ করিতে গেলে সকল বিষয়ে ও প্রসঙ্গে সমান মন দিতে হয়। তাহা করিতে পারি নাই। তাই ভয় হইল, পরীক্ষার ফল ভাল হইবে না। বি-এ অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলাম, এম-এতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করিলে শুধু যে লজ্জার বিষয় হইবে তাহাই নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবিকার দিক হইতেও অনিষ্ট হইবে। সুতরাং পরীক্ষা আর দিলাম না। ফল 'ফেল' হইবার মতই হইল।

ইহাতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি যেন ধ্বসিয়া পড়িল। অল্পবয়স হইতেই জীবনের কৃত্য ও জীবিকা সম্বন্ধে ধারণা ছিল এম-এ পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোনো কলেজে অধ্যাপকত্ব করিব ও জীবনের কৃত্য হিসাবে ঐতিহাসিক গবেষণা করিব। ইহার সম্ভাবনা রহিল না। প্রথমে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলাম, কারণ কখনও কোনো পরীক্ষায় 'ফেল' হওয়া দূরে থাকুক খারাপ ফলও কখনও করি নাই। তবে একটু ভরসা জাগিতেছিল যে, পরের বৎসর আবার পরীক্ষা দিয়া ভাল করিয়া এম-এ পাশ করিব। আমাদের বাঙালী সমাজে প্রথা ছিল যে, পত্নীবিয়োগ হইলে তাহাকে চিতায় তুলিয়া দিবার পরেই শোকার্ত স্বামীকে কোনো নিকট আত্মীয় বলে, 'আবার বিবাহ কর, এত দুঃখের কোনো কারণ নাই।' আমিও একাধারে শোকার্ত স্বামী ও নিকট আত্মীয় হইয়া নিজেকে প্রবোধ দিলাম।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা ঘটিল না। পরীক্ষার পর কয়েক মাস আমার দাদার বিবাহের হুজুগে মাতিয়া রহিলাম। তাহার পরেও দেখিলাম, দেহেমনে যেন একটা গভীর অবসাদ আসিয়াছে। কিছুতেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। ১৯২১ সনের প্রথম দিকে কিশোরগঞ্জে পিতার কাছে ছিলাম। জুন মাসে তাঁহাকে বলিলাম, পরীক্ষা দিব না, কলিকাতায় গিয়া কোনও চাকুরির সন্ধান করিব।

আমার আগের বছরের ব্যর্থতা পিতা অত্যন্ত উদারভাবে ক্ষমা করিয়াছিলেন, যদিও আমার সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ আশা থাকাতে তিনি নিরাশ হইয়াছিলেন। এবার তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। আগে কখনও আমার উপর এত বিরক্ত হইতে তাঁহাকে দেখি নাই। তিনি আমার সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক অনেক উক্তি করিলেন। ইহাতে আমার মনে গভীর আঘাত লাগিল। ঘোর বিষাদ ও নিরুৎসাহ লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। চাকুরির বাজারের খবর ভাল করিয়াই জানা ছিল। সুতরাং চাকুরির ভরসা হইতেও আশ্বাস পাইলাম না। আহত পশু যেমন গুহায় লুকাইয়া আরোগ্য হইবার অথবা মরিবার অপেক্ষায় থাকে আমারও সেইভাবে থাকিবার মত হইল। এলোমেলো ভাবে দুয়েকটা দরখাস্ত করিলাম। কিছুই হইল না। ইহার পর আর সারাজীবনেও চাকুরির জন্য দরখাস্ত করি নাই।

চাকুরি জুটিল তবে...

কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার একমাসের মধ্যেই চাকুরি পাইলাম। যে-বিপদটা আসন্ন ও অনিবার্য মনে করিয়াছিলাম, সেটা সৌভাগ্যক্রমে কাটিয়া গেল। দরখাস্ত ছাড়াও, এমন কি চাকুরি যে আছে তাহাও না জানিয়া, চাকুরি পাইলাম, তাও 'গভর্নমেন্ট সার্ভিস', সকল শিক্ষিত যুবকের রূপসী স্ত্রী পাইবার মত কাম্য। ইহা ঘটিল আমার এক নিকট আত্মীয়ের সহায়তায়।

তিনি আমার এক পিসতুতো দাদা, বয়সে আমার অনেক বড়। তিনি মিলিটারি অ্যাকাউন্টস বিভাগে উচ্চপদের কর্মচারী ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়াছিলাম, তিনি আমার জন্য কিছু করিতে পারেন কিনা। তিনি তখনই বিশেষ কিছু ভরসা না দিয়া শুধু বলিয়া দিলেন, 'আচ্ছা, দেখব।' আর গেলাম না। আপাতত কোনো খবরও পাইলাম না।

কিন্তু জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি আমাদের বাড়িতে আসিলেন ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার আপিসে চাকুরি করবি?' আমি সম্মতি জানাইতেই বলিলেন, 'তবে, কাল একটা দরখাস্ত নিয়ে যাস যেন দশটার সময়ে।' আমি জানিলাম যে, তিনি আমার জন্য চাকুরি একেবারে ঠিক করিয়া আসিয়াছেন, শুধু আমারই রাজি হইবার অপেক্ষা। পরদিন যাওয়ামাত্র দাদা আমাকে বহাল বিভাগে লইয়া গেলেন। কর্মকর্তা একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'Why, he is only a boy.' তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত হইয়া যে-সেকসনে কাজ হইল সেখানে গেলাম। অন্য কেরানিরাও একটি ক্ষুদ্রকায় বালক সদৃশ সহকর্মী দেখিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল। চক্ষু বিস্ফারিত হইবার কারণ বলি।

আমি কেরানির পদে ঢুকিলাম বটে, তবে সেই 'গ্রেডে' প্রথম প্রবেশের মাহিনায় নয়, তাহার দ্বিগুণ মাহিনায়—মাসিক একশত টাকা বেতনে। সহকর্মীদের মধ্যে যাঁহারা পাঁচ-সাত বৎসরও কাজ করিতেছিলেন, তাঁহাদের চেয়েও বেশি বেতনে। তাহা হইয়াছিল, আমার দাদার সুপারিশে—আমি বি-এ পরীক্ষায় অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলাম ও এম-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলাম এই কারণে। যোগ্যতা ছাড়াও ইহার মধ্যে 'nepotism' (অবশ্য অনুক্তভাবে) ছিল সন্দেহ নাই। আমার আপিসের উপরওয়ালা ছিলেন ইংরেজ। পরে শুনিয়াছিলাম, তিনি নাকি কেরানিনিয়োগ সম্বন্ধে বলিতেন, 'Don't we know that a Chatterji takes in a Banerji and a Mitra a Bose? But what can we do about that ; we can't recruit our staff directly.'

কাজটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর হিসাবপত্র রাখিবার বিভাগে। ইহার কর্তা মিলিটারি অ্যাকাউনটেন্ট-জেনারেল। এই বিভাগের বহু আপিস ভারতবর্ষ জুড়িয়া ছিল। আমার আপিস হইল কলিকাতায়। বাড়িটিও প্রকাণ্ড এবং সুন্দর, এসপ্ল্যানেডের উপরে, কার্জন পার্কের সম্মুখে ও গভর্নমেন্ট হাউসের কাছে। বারান্দা হইতে সমস্ত গড়ের মাঠ দেখা যাইত, দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। হর্ম্যটি লর্ড কিচ্‌নার তাঁহার দপ্তর হিসাবে তৈরি করাইয়াছিলেন। সামরিক হিসাবপত্র রাখার যে শাখায় আমি ঢুকিলাম উহার কাজ ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম যে-সব কারখানায় তৈরি হইত তাহার হিসাব রাখা ও অর্থব্যয় মঞ্জুর করা।

প্রথমে খুবই উৎসাহ ও আনন্দ হইল। উপার্জনহীন হইবার লজ্জা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যে কোনো চাকুরি যে কোনও মাহিনায় পাইলেই বর্তিয়া যাইতাম, হইল যাহা তাহা টাকার দিক হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি হইলে প্রথমে যাহা পাইতাম তাহার চেয়ে বেশিই হইল। ভবিষ্যতের ভরসা অবশ্য অনেক বেশি হইল।

কাজে যোগ দিবার পর শুভাকাঙ্ক্ষীরা খুবই উৎসাহ দিলেন, বলিলেন যে ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ৭৫ টাকা বেতনে কেরানির পদে ঢুকিয়া এখন আমার ডিপার্টমেন্টের উচ্চতম কর্মচারী হইয়াছেন। পরে তিনি বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য হইয়া স্যর ভূপেন্দ্রনাথ পর্যন্ত হইয়াছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্যতও আমার সঙ্গে যাহারা ঢুকিয়াছিল তাহারা অনেক উচ্চপদে উঠিয়াছিল। আমি যে-দিন চাকুরি পাইলাম সেদিনই একটি এম-এ পাশ বাঙালী যুবক একই বেতনে ঢুকিয়াছিল। সে ডেপুটি মিলিটারি অ্যাকাউন্টটেন্ট-জেনারেল হইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিল। আমি ঢুকিবার কিছুদিন পরেই আমার এক ভাগিনেয় (আপন পিসতুতো বোনের ছেলে) ২৫ টাকা বেতনে ঢোকে। সেও উচ্চপদে উঠিয়াছিল ও অবসর লইবার আগে কলিকাতায় বাড়ি করিয়াছিল এবং ধনবান হইয়াছিল। আমার আরও তাড়াতাড়ি উন্নীত হইবার সম্ভাবনা ছিল। আমার উপরওয়ালারা বলিলেন, আমাকে শীঘ্রই এর পরের গ্রেডে উন্নীত হইবার জন্য যে পরীক্ষা ছিল উহা দিবার জন্য সুপারিশ করা হইবে, এমন কি সেই গ্রেডে ভালভাবে কাজ করিলে উচ্চতম গ্রেডের পক্ষেও পরীক্ষা দিতে পারিব।

এরূপ উন্নতি যে হইতে পারে তাহা কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম। চার মাস পরেই আমি অস্থায়ীভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদ পাইলাম। আমার সাহেব উপরওয়ালা আমার একটি নোট দেখিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়াছিলেন এবং আমাকে ডাকাইয়া আলাপ করিয়াছিলেন। তিনিই এই প্রমোশন দিলেন।

আর্থিক কারণ ছাড়া অন্যদিকেও কাজটা আমার প্রথমদিকে ভাল লাগিয়াছিল। সামরিক ইতিহাস ও যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে আমার বাল্যকাল হইতেই আগ্রহ ছিল। এখন কার্যত কি হয় তাহা জানিবারও সুযোগ পাইলাম। বিশেষ করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠন, যুদ্ধপ্রণালী, ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখিলাম। এই জ্ঞান পরজীবনে আমার খুব কাজে লাগিয়াছিল।

সুতরাং কোনোদিকেই আমার অসন্তুষ্ট হইবার কারণ ঘটিল না। তবুও ঠিক পাঁচ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯২৬ সনের মাঝামাঝি সরকারি চাকুরি ছাড়িয়া সারাজীবনের মত দারিদ্র্য ও জীবিকার জন্য ভাবনার পথ ধরিলাম। সাংসারিক দিক হইতে ইহাকে দুর্মতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এম-এ না দিবার অক্ষমতার পর আর একটি অক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। এই অক্ষমতা কি এবং কোথা হইতে আসিল তাহার কথা এর পর দিতেছি।

সরকারি চাকুরি ছাড়িলাম

উপার্জনহীন ও পরিবারের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার গ্লানি হইতে মুক্তি পাইয়া চাকুরিতে ঢুকিবার পর কয়েক মাস বেশ সন্তুষ্টই ছিলাম। তাহার উপর কেরানির কাজেও দক্ষতা দেখাইয়া কিছু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু মাস ছয় না কাটিতেই অনুভব করিতে পারিলাম এই কাজ আমার ধাতে সহিবে না, ইহাতে আমি সুখী হইতে পারিব না এবং সারাজীবন এই কাজ করা আমার জন্মগত প্রবৃত্তি ও শিক্ষাগত আদর্শের বিরোধী হইবে।

এই কাজ করা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা কেন দেখা দিল তাহা তখন ধরিতে পারি নাই, অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম। আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মনে জীবিকা অর্জন সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিতেছিল, এবং যে জন্মগত অনুরাগ-বিরাগ প্রবল ছিল, সেগুলি এইরূপ—অপরের কাজ করিয়া, অর্থাৎ নিজের পরিশ্রমের ফল নিজে না পাইয়া অপরকে দেওয়া এবং নিজে শুধু পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু টাকা পাইয়াই তৃপ্ত হওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল ; আমি মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিলাম, জন্মগত ধর্ম ও শিক্ষালব্ধ আদর্শের বশে আমি যে কাজ কৃত্য বলিয়া মানিলাম তাহা করিয়াই আমি সমাজের কাছ হইতে জীবিকার দাবি করিতে পারি। অবশ্য আমি মনে করি নাই যে, এই উপায়ে আমি ধনবান হইব, তবে আমার ধর্ম ও আদর্শ অনুযায়ী হইয়া আমি ভদ্রভাবে থাকিবার ও পারিবারিক কর্তব্য করিবার মত অর্থ পাইতে ও চাহিতে পারি ইহা সর্বদাই মনে করিয়াছি। যে-সমাজে ইহা পারা যায় না, উহাকে সভ্য বা উন্নত বলিতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলাম না। তখনও বুঝি নাই যে, আমাদের সমাজ এইরূপ কাজের জন্য পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত নয়।

ইহা ছাড়া, আমার মনে প্রবল বাসনা ছিল যে, আমার মানসিক শক্তি দিয়া সৃষ্টিকার্য করিব, শুধু স্থিতিকার্য করিয়াই জীবন যাপন করিব না। অবশ্য আমি কর্মযোগ অবলম্বন করিতে পারিব তাহা কখনও মনে করি নাই, কর্মবীর হইবার ক্ষমতা আমার নাই ইহা স্পষ্ট জানিতাম। তবে আমি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানবীর হইতে পারিব এই অভিমান বেশ প্রবল ছিল—বলিব এইদিকে আমার একটু অহঙ্কারই ছিল। আমাকে সরকারি চাকুরি লইয়া যে কাজ করিতে হইল তাহা যে আমার বাঞ্ছিত কাজ হইতে পারিত না তাহা বলার আবশ্যক রাখে না। অন্য বাঁধা কাজের মধ্যে হিসাবের কাজ আরও অপ্রীতিকর মনে করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাই ছয়মাস কাটিতে না কাটিতেই কাজে উদাসীনতা দেখা দিল, মনের মধ্যে শূন্যতার অনুভূতি আসিল। কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না যে, আমার প্রকৃতিদত্ত শক্তির অপচয় করিতেছি। সবদিক দিয়াই দেহে শ্রান্তি ও মনে অবসাদ আসিতে লাগিল। একটা অনিবার্য বিষাদে মন আচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ করিল।

এই মনোভাব দুই-চারিটি বই পড়িয়া আরও প্রবল হইল। উহাদের মধ্যে মাত্র একটির উল্লেখ করিব—ভালেরি রাদো প্রণীত বই পাস্তোরের জীবনী। নিজেকে বলিলাম এই তো সাধকের জীবন, আদর্শের পদতলে আত্মসর্গীকৃত জীবন, সত্যকার সুখের জীবন—আর আমি কি করিতেছি। জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম—এইভাবে কি নিজের জীবনকে অর্থপূর্ণ ও সার্থক, দুইই করিতে পারিব?

উচিত না-হইলেও এই মনোভাবের ফলে আপিসের কাজে শৈথিল্য দেখাইতে আরম্ভ করিলাম, কাজ ফেলিয়া রাখিতাম, দীর্ঘসূত্রিতা আমাকে পাইয়া বসিল। খুব উদ্যমশীল হইলে দিনের কাজ দিনগত পাপক্ষয়ের মত করিতাম। ইহাতেও মানসিক বাধার সৃষ্টি হইল এই কাজেই উন্নতি করিবার জন্য পরীক্ষা দিবার সুযোগ ও অনুমতি পাইয়া। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আপিসের উপরওয়ালা— যাঁহাদের একজন স্বজাতির বলিয়া আমাকে জামাতা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে ১৯২২ সনেই উপরের গ্রেডের জন্য পরীক্ষা দিতে বলিলেন, এবং হেড আপিসে সুপারিশ করিয়া অনুমতি পাইলেন। জুন মাসে পরীক্ষা, আমাকে দুই মাসের জন্য অধ্যয়নের ছুটি দেওয়া হইল। ইহার ফল হইল উল্টা, কারণ অবসর পাইয়া অধ্যয়ন করিলাম উল্টারকমের— সাহিত্য, বিশেষ করিয়া ইংরেজী কাব্য। এই অবসরে নিজের মনকেই যাচাই করিলাম।

সেই সময়ে আমাদের পরিবারের অন্য সকলে কিশোরগঞ্জে চলিয়া গিয়াছিলেন, আমি রহিলাম কলিকাতায় একা, মামার বাসায়— তাঁহারাও গ্রীষ্মের ছুটিতে স্বগ্রামে চলিয়া গিয়াছিলেন। অন্যান্য বই-এর মধ্যে পড়িলাম ম্যাথিউ আর্নল্ডের কবিতা। আমি তাঁহার গদ্য প্রবন্ধাবলী কলেজে থাকিতেই সখ করিয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কেন বলিতে পারি না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁহার একটা কবিতাও পড়ি নাই, যদিও সমস্ত রোমান্টিক কবিদের অনেক কবিতা পড়িয়াছিলাম।

ম্যাথিউ আর্নল্ডের কবিতা খুবই ভাল লাগিল— যেমন Forsaken Merman, Dover Beach, Sohrab and Rustum, ইত্যাদি। কিন্তু চাকুরি ছাড়িবার জন্য উদ্দাম বাসনা যাহা হইতে জাগিল সে-কবিতাটি Scholar Gypsy, উহাতে গতানুগতিক সাংসারিক জীবন যাপন না করিয়া নিজের স্বভাব অনুযায়ী অন্য পথ ধরিবার কথা আছে, যে-পথকে একধরনের সন্ন্যাস বলা যায়। কবিতাটিতে পড়িলাম,—

'Thou hast not liv'd, why should'st thou perish so?
Thou hadst one aim, one business, one desire:

* *

For early didst thou leave the world, with powers
Fresh, undiverted to the world without,
Firm to their mark, not spent on other things;
Free from the sick fatigue, the languid doubt,
Which much to have tried, in much ban baffled, brings.

O life unlike to ours !
Who fluctuate idly without term or scope,
Of whom each strives, nor knows for what he strives,
And each half lives a hundred different lives;
Who wait like thee, but not like thee, in hope.

* *

... and we,
Light half-believers of our casual creeds.
Who never deeply felt, nor clearly will'd,
Whose insight never has borne fruit in deeds,
Whose vague resolves never have been fulfilled,
For whom each year we see
Breeds new beginnings, disappointments new,
And lose tomorrow the ground we won today—'

আমার মনে হইল ম্যাথিউ আর্নল্ডের We -এর একজন যেন আমি। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম, আমিও Scholar Gypsy -র মত হইব— জীবনে একাগ্র সাধনা আনিব।

এই কবিতাটি পড়িবার প্রথম ফল হইল পরীক্ষা দিতে গেলাম না, একটা ছুতা দিলাম। চরম ফল হইল সরকারি চাকুরি ছাড়িয়া দেওয়া। ইহার অপেক্ষা সাংসারিক দিক হইতে নির্বুদ্ধিতার কাজ কি হইতে পারে ? কে একটা কবিতা পড়িয়া 'গভর্নমেন্ট সার্ভিস' ত্যাগ করিয়াছে ?— যাহার ফলে বিবাহের প্রস্তাব আসা বন্ধ হইয়া গেল।

অবশ্য স্থির করিলাম যে চাকুরি ছাড়িয়া দিব, কিন্তু তখনই উহা কার্যে পরিণত করিলাম না। তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, তাহার কলিকাতা থাকার খরচ আমিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালাইতেছিলাম। উহা পিতার উপর চাপানো সঙ্গত মনে করিলাম না। তাই মনস্থ করিলাম, সে ১৯২৬ সনে এম. বি. পরীক্ষা পাশ করিয়া বাহির হইলেই ছাড়িব। সে অত্যন্ত ভাল ছাত্র ছিল। সুতরাং সে যে ডাক্তারি পরীক্ষা পাশ করিবে ও নিজের সংস্থান করিতে পারিবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। এই ভ্রাতাই পরে কলিকাতার প্রধান শিশু-চিকিৎসক হইয়াছিল— যাহার নাম ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া ভুল বা অন্যায় করিয়াছিলাম তাহা বলা চলে না। বরঞ্চ ইহার জন্যই আমার লেখকবৃত্তি হইল। অবশ্য আপাতত যথেষ্ট নিন্দা হইল, উপস্থিত চাকুরিতে উন্নতির পথ উন্মুক্ত না করিবার জন্য। কিন্তু এও বলা চলে যে, আমার স্বভাবগত অক্ষমতার ক্ষমতা এবং সাহস দুই-ই দেখাইলাম।

যে-ভাবে এই লক্ষ্যকে কার্যকর করিলাম তাহাতে আমার চরিত্রের দুর্বলতা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তখনও চার বছর সময় ছিল। আমার উচিত ছিল এই সময়ের মধ্যে বাঞ্ছিত পথে জীবিকা অর্জন করিবার উপায় তৈরি করিয়া রাখা। ইহা যে পারিতাম না তাহা নয়। ১৯২৫-২৬ সনেই আমি দুইটি ইংরেজী লেখা প্রকাশিত করিয়াছিলাম— একটি 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় ও অপরটি 'স্টেট্‌সম্যানে'। প্রথম লেখা লিখিয়াই এই রকম পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তাহার উপর দুইটি লেখাই উচ্চাঙ্গের হইয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া আমার ইংরেজী 'স্টাইল' ভাল হইয়াছিল, বেশ কিছু পারিশ্রমিকও পাইয়াছিলাম, নিয়মিতভাবে না পারিলেও মাঝে মাঝে লেখা প্রকাশ করিয়া নাম করা উচিত ছিল। তাহা না করিয়া অলস হইয়া রহিলাম।

তাহার অপেক্ষাও উচিত ছিল, আরও চার বৎসর চাকুরি করিব তাহা যে স্থির করিলাম সেই সময়ে আপিসের কাজ নিপুণভাবে করা ও যে-সুনাম অর্জন করিয়াছিলাম তাহা অক্ষুণ্ণ রাখা। আমি চরিত্রবলের অভাবে তাহা পারিলাম না, কিছুতেই আপিসের চাকুরির প্রতি বিতৃষ্ণা দমন করিয়া উদ্যমের সহিত উহার কাজ করিতে পারিলাম না। যাহা কার্যত করিলাম তাহা অন্যায় হইল, লজ্জারও কারণ হইল। আমি আপিসের কাজে শৈথিল্য দেখাইতে আরম্ভ করিলাম, দীর্ঘসূত্রী হইয়া কাজ ফেলিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলাম। তাহা কাজে ফাঁকি হইয়া দাঁড়াইল। নানা ছুতায় ছুটি লইতে আরম্ভ করিলাম। আমার arrears সেই সব ছুটির সময়ে অন্যকে উদ্ধার করিতে হইত। তাহাতে আপিসে আমার উপরওয়ালারা আগে যেমনই প্রসন্ন ছিলেন, পরে তেমনই বিরক্ত হইলেন। যিনি একসময়ে আমাকে জামাতা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার সেক্‌শনে আমাকে রাখিতে অস্বীকার করিলেন। পরে স্থির হইল, আমাকে কলিকাতায় না রাখিয়া অন্য জায়গায় বদলি করা হইবে। তাহাতে অপমান বোধ করিয়া আমি চাকুরিতে ইস্তফাপত্র পাঠাইয়া দিলাম।

আপিসে সহকর্মীরা যাহারা একসময়ে আমাকে ঈর্ষ্যা করিয়াছিল তাহারা ঠাট্টাতামাসা করিতে লাগিল। আমি শুধু নির্বোধই নয়, অপদার্থও প্রতিপন্ন হইলাম। আমার জীবনে পরে আমি অন্য চাকুরিও ছাড়িয়াছি, কিন্তু কখনও অকর্মণ্য ও ফাঁকিবাজ বলিয়া কলঙ্ক অর্জন করি নাই। করিলাম এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার পরিচয় পরে পাইয়াছিলাম। চাকুরি ছাড়িবার কিছুদিন পরে এসপ্ল্যানেডে আমার এক পুরাতন সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হইল। দেখিলাম, সে আমার সঙ্গে কথা বলিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিতে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু প্রথমে উত্তর দিল না। পরে হাসিয়া বলিল, 'শুনলাম আপনার brain cracked হয়ে গিয়েছে।'

পরিবারের কাহাকেও জানাইলাম না যে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু সকলেই বুঝিলেন যে চাকুরি নাই। অপ্রসন্ন, এমন কি অবজ্ঞাপূর্ণ মুখ দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু ইহাতেই ব্যাপারটা শেষ হইল না। চাকুরি ছাড়িবার পর সংযত ও সঙ্কুচিত না হইয়া একেবারে ছাড়া গরুর মত হইয়া গেলাম। সেই লজ্জাকর কাহিনীও গোপন রাখিব না।

উচ্ছৃঙ্খলতা

নিয়মিত উপার্জনের কোনো সম্ভাবনাও নাই, তবু সমস্ত আর্থিক ব্যাপারে অসংযম— যাহা আমার স্বভাবগত ছিল— তাহা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া গেল। সংসার খরচের জন্য টাকা দিতে পারিব না দেখিয়া ভাবিলাম সখের খরচ করিতে আর বাধা নাই। অপব্যয় আরম্ভ হইল। 'অপব্যয়' শব্দটা ব্যবহার করা অনুচিত হইল, কারণ যাহা আরম্ভ হইল তাহা ব্যয় নহে, সখের জিনিস ধারে কেনা।

সখের জিনিসের প্রথম হইল বেশভূষা। আগে পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে কোনো ঝোঁক ছিল না, অত্যন্ত সাদাসিধা কাপড়চোপড় পরিতাম, তাও অনেক সময়েই ময়লা। এই উদাসীনতা দূর হইয়া উচ্চস্তরের 'বাবু' হইতে চেষ্টা করিলাম এবং হইতে সক্ষমও হইলাম। সেই বিলাসিতা পাকা হইয়া এখনও বজায় আছে। যাঁহারা আমার ছবি নানা পত্রিকায় দেখিয়াছেন তাঁহাদের জানাইব যে, উহার মধ্যে যে-পারিপাট্য আছে, তাহা আমার সেই অল্পবয়সের অমিতাচারের ফল, অর্থের লক্ষণ নয়।

তবে এর মধ্যে একটা 'প্রিন্সিপল্' ছিল। আমি মনে করিলাম অর্থাভাবের জন্য যদি বেশভূষায় দৈন্য দেখাই তাহা হইলে অন্যের কাছে মর্যাদা ছাড়া আত্মসম্মানও হারাইব। এই নীতি তখন হইতে আজ পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি। তাই পরিচিত সকলকেই বলি, তাঁহারা যদি আমার পোশাক-আশাকে পারিপাট্য দেখেন তাহা হইলে যেন ধরিয়া নেন যে, আমি ইংরেজীতে যাহাকে 'ব্রোক' বলে তাহাই ; আর যদি ছেঁড়া ধুতি বা পাঞ্জাবি দেখেন তাহা হইলে যেন মনে করেন আমার অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়াছে। 'চেনা বামুনের পৈতার দরকার নেই' আমি এই জনপ্রচলিত উক্তিতে বিশ্বাস করিতাম।

বস্ত্রালঙ্কারের কথা ছাড়িয়া দিয়া তখন চশমার ব্যাপারেই কি করিলাম তাহা বলি। পুরাতন চশমা দিয়া আর ভাল দেখিতে পাইতাম না, তাই নূতন চশমা করাইলাম। শুধু 'মাইওপিয়া'-গ্রস্ত হইলেও দূরে দেখিবার জন্যই দুই জোড়া চশমা করাইলাম— একটি সূক্ষ্ম রিমলেস প্যান্টোলেন্স-ওয়ালা প্যাঁসনে। সেটিকে মাটিতে পড়িয়া ভাঙিবার সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য চওড়া-কালো রেশমের ফিতা ছিল, উহা গলায় ঝুলিয়া সিল্কের পাঞ্জাবিকে অলঙ্কৃত করিত। পিতা প্রথম দেখিয়া বলিলেন, 'ফিতেটা আর একটু সরু করলেও পারতে।'

দ্বিতীয় চশমাটি আসল 'টরটিজ-শেলে'র— অর্থাৎ কচ্ছপের খোলার। ফ্রেম হইতে নানা রঙ-এর আলো বিচ্ছুরিত হইত, সেটা বেশ মোটা বলিয়া আরও বেশি। দুই চশমার জন্য আমার চোখদুটি ক্ষুদ্র হইলেও (বন্ধু বিভূতিভূষণ—ঔপন্যাসিক— বলিতেন, 'নীরদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার চোখ দুটো গুগলীর মত, আমার টানাটানা।')তবে সেই চশমার জন্য আমাকে হরিণনয়নার মত দেখাইত। কেহ কেহ বলিত পেচকের মত।

তাহার উপর কেশবিন্যাসে বেশ পারিপাট্য আনিলাম। চুল বাবরীর মত, মাঝখানে সিঁথি কাটা। জুলপি লম্বা রাখিয়া কানের নীচে নামাইলাম। অশোকবাবু (রামানন্দবাবুর পুত্র) দেখিয়া বলিলেন, 'এ কি! জুলপী যে মাটাডোরের মত নেমে এসেছে!'

সর্বসুদ্ধ চেহারা কি রকম হইল তাহা বুঝাইবার জন্য দুই বৎসর পরেকার একটা বর্ণনার উল্লেখ এখানেই করিতেছি। 'শনিবারের চিঠি' তখন 'প্রগতিশীল' লেখকদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। আমি পত্রিকার সম্পাদক। সজনীবাবু প্রগতিশীলদের ব্যঙ্গ করিবার জন্য 'লালিমা পাল (পুং)' এই নাম দিয়া একটি চিত্র ছাপিলেন। প্রগতিশীলেরা দেখিয়া জবাব দিল, 'এ তো একেবারে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়ের চেহারা!'

এ-সবের উপরেও ১৯২৬ সনেই রঙ চড়াইলাম। আমার দাদার শ্বাশুড়ি-ঠাকুরাণী আমাকে তাঁহার বিবাহের বেগুনী-রঙ-এর বেনারসী শাড়িটি দিয়াছিলেন। উহার indoor ব্যবহার করিতাম দেয়ালে টাঙাইয়া, outdoor ব্যবহার করিতাম পরিয়া— এই শাড়ি পরিয়া রাস্তায় বাহির হইতেও সঙ্কোচ করিতাম না।

সঙ সাজিবার আরও প্রয়াস করিলাম। ১৯২৫ সনে দুটি ব্রহ্মদেশীয় ছাত্রকে আমি ইংরেজী পড়াইয়াছিলাম। তাহারা আমাকে দুইটি রেশমী লুঙ্গি ও দুইটি ব্রহ্মদেশীয় রঙীন ছাতা দিয়াছিল। লুঙ্গি পরিলাম না এইজন্য যে কটিছাড়া বস্ত্র পরা সম্বন্ধে আমার প্রবল আপত্তি ছিল। এই কারণে লুঙ্গি দুইটি ভগ্নীপতিকে দিলাম, কিন্তু ছাতা মাথায় দিয়া ঘুরিতাম।

১৯২৬-এর জুলাই মাসে একদিন প্রবল বৃষ্টি হইয়াছে, সুকিয়া স্ট্রীটে জল হাঁটু পর্যন্ত উঠিয়াছে। উহার ভিতর দিয়া সেই ছাতা মাথায় দিয়া জল ভাঙ্গিয়া চলিয়াছি! এই রাস্তায় একটা মেয়েদের হস্টেল ছিল। উহার বারান্দায় দাঁড়াইয়া মেয়েরা আমাকে বিস্ফারিতচক্ষে দেখিতে লাগিল।

তারপর সুগন্ধ, এক শয্যায় শুইয়া সেই গন্ধ পাইবার কেহ না থাকিলেও ইয়ার্ডলির ল্যাভেন্ডার সাবান ব্যবহার করিলাম।

এই তো গেল বেশভূষা ও প্রসাধনের জন্য অপব্যয়। আরও বেপরোয়া হইয়া বই কিনিতে আরম্ভ করিলাম। অতিশয় দামী ইংরেজী ও ফরাসী বই অর্ডার দিলাম। কি-করিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিব তাহা বিবেচনা করিলাম না। ফরাসী বইগুলি আসিলে দামী মরক্কো চামড়া দিয়া বাঁধাইলাম।

ইহারও উপর কাজ ছাড়িয়া দিয়া যে পাওনা বেতন পাইলাম, তাহা দিয়া তখনই গিয়া মেডিচি সোসাইটির ছাপা 'মোনালিজা'র মস্ত বড় ছবি কিনিয়া আনিলাম। অনেক খরচ করিয়া ফ্রেমও করাইলাম। এখন আমার সম্বন্ধে যে-সব চিত্র 'দেশে' প্রকাশিত হয় তাহাতে অনেকে এই ছবিটি দেখিয়া থাকিবেন।

বলা বাহুল্য পরিবারের সকলে এবং আত্মীয়েরা আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তখনই আমাকে চাবুক মারিবার কথা উঠিয়াছিল।

সকলের চেয়ে ক্রুদ্ধ হইলেন আমার দাদা। তিনিই সকল বিষয়ে আমার পথপ্রদর্শক ছিলেন, এমন কি অমিতব্যয়িতায়ও। কিন্তু তিনিও মনে করিলেন, অমিতব্যয়িতার একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমা থাকা উচিত। তাঁহার সঙ্গে শিশুকাল হইতে আমার একাত্মতা ছিল, যেন আমরা মানসিক যমজ। তাই এই মনোমালিন্য আমার মনে খুবই আঘাত দিল।

সকলের অবজ্ঞাভাজন হইয়া বাড়িতে থাকা অসহ্য হইত। তাই দিনের বেলা ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িতাম। অন্য সময়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতাম। ইহার জন্য নিষ্কর্মা ভবঘুরে বলিয়া দুর্নাম হইল।

তবে এই নূতন ধরনের জীবনযাত্রা যখন আরম্ভ হইল তখন পাঁচ-ছয় দিনের জন্য উহা হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি পাইবার সুযোগ ঘটিল।

দাদার বিধবা দিদি-শাশুড়ি কাশীবাসিনী হইয়া ধর্মকর্ম করিতেন। তিনি পুত্রপরিজনকে দেখিবার জন্য স্বগ্রামে আসিয়াছিলেন। তাহা ঢাকা জেলায় নরসিংদির কাছে সাটিরপাড়া। আগস্ট মাসে তিনি কাশী ফিরিতেছিলেন। কলিকাতায় আসিবার পর কাশী লইয়া যাইবার মত পুরুষ কেহই নাই। দাদার মধ্যম সম্বন্ধী এস রায় (পরে যিনি যাদবপুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার ঠাকুরমাকে কাশী লইয়া যাইতে পারি কিনা। আমি গয়ার পশ্চিমে যাই নাই— তাহাও গিয়াছিলাম অতি বাল্যকালে। সানন্দে রাজি হইলাম। তাঁহারা আপার-ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে তুলিয়া দিলেন। লক্ষ্মীসরাই গিয়া প্রভাত হইল।

AMARBOI.COM

নূতন অভিজ্ঞতা—বারাণসী ও সারনাথে

বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ ট্রেন মোগলসরাই জংশনে পৌঁছিল। নিজে নামিয়া ঠাকুরমাকে গাড়ি হইতে নামাইলাম। আমার রক্ষকত্ব শেষ হইয়া গেল। অজানা জায়গায় বৃদ্ধাই কর্ত্রী হইলেন। তিনি টঙ্গা ঠিক করিয়া, মালপত্র তোলাইয়া কাশীতে তাঁহার বাড়ির দিকে যাত্রা করাইলেন। আমি এই প্রথম টঙ্গায় আরোহণ করিলাম। খটর-খটর করিয়া চলিল, বেশ কিছুক্ষণ চলিয়া থামিল। আমি ভাবিলাম সম্ভবত বাড়ির সম্মুখে থামিয়াছি। দেখিলাম, তাহা নয়, একটা জনাকীর্ণ চৌমাথা, কাছেই টঙ্গার আড্ডা। জায়গাটা অবশ্য গোধৌলিয়া। 'কোথায় যাব ?' জিজ্ঞাসা করিতেই বৃদ্ধা বলিলেন, 'চল, নিয়ে যাচ্ছি।' মোটবাহী-ব্যক্তি জিনিসপত্র মাথায় তুলিয়া অগ্রবর্তী হইল, আমরা তাহার পশ্চাদবর্তী হইলাম। কয়েক পা গিয়াই মুটিয়া ও তিনি ডানদিকে একটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলিতে ঢুকিয়া পড়িলেন। বুঝিলাম না যে কাশীর বাঙালীটোলার গোলকধাঁধায় প্রবেশ করিতেছি।

বহুবার ডানদিক বাঁদিক মোড় ফিরিতে ফিরিতে একটা বড় বাড়ির দরজায় পৌঁছিলাম, ও প্রবেশ করিয়া দোতলায় উঠিলাম। দোতলাতেই বেশ প্রশস্ত উঠান, চারিদিকে পায়রার খোপের মত সারি সারি ঘর। এই ঘরগুলিতে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ পুরুষ ও বিধবা বৃদ্ধারা থাকেন। ঠাকুরমারও দুটি ঘর ছিল। আমার শুইবার ব্যবস্থা হইল উঠানে। বেশ গ্রীষ্ম, বৃষ্টি নাই, অসুবিধা হইল না।

প্রথম হইতেই নূতন অভিজ্ঞতা আরম্ভ হইল। কলিকাতায় থাকিয়া আমি ভারতভূমি দেখা দূরে থাকুক, বঙ্গভূমির সহিতও পরিচয় রাখিতে পারি নাই। পরিচয় পাইয়াছিলাম ইউরোপের—বাহিরে, লন্ডনের অনুকরণে নির্মিত একটা নকল-পাশ্চাত্য শহরের ; মনে, ইউরোপীয় ভাবের। কাশীতে আসিয়া সনাতন ভারতবর্ষ ও সনাতন হিন্দুধর্মকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিলাম। প্রবেশ করিবামাত্রই বুঝিতে পারিলাম, দুই-এরই শক্তি কি।

সঙ্গে সঙ্গে দুই-এরই বিকারও দেখিলাম। পরস্পরবিরোধী দৃশ্য ও জীবনের এরূপ একত্র সমাবেশ হইতে পারে কল্পনাও করিতে পারি নাই। গঙ্গা পার হইবার জন্য যখন ট্রেন ডাফারিন ব্রীজে উঠিল (উহার নির্মাণকাহিনী কিপলিং-এর Bridgebuilders গল্পে পড়িবেন।), তখন কাশীর রূপ দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পূর্ণ বর্ষা। গঙ্গার জল সৌধমালার একতলা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। মনে হইল, যে-নগরটা হিন্দুর চরম তীর্থস্থান, উহা হিন্দুর চরম গতি পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা হইতেই উঠিয়াছে। উত্তরবাহিনী গঙ্গার উপরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রাসাদের সারি। সেই দৃশ্য মনে রাখিবার জন্য অক্স্‌ফোর্ডে বসিবার ঘরে ড্যানিয়েলের কৃত দশাশ্বমেধ ঘাটের বৃহৎ চিত্র টাঙাইয়া রাখিয়াছি। অথচ উহার পিছনেই যে মানববসতি তাহা ইট বা পাথরে গড়া হইলেও কলিকাতার খাপরার বস্তিকেই স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল, এমন কি আরও ঘিঞ্জি।

সঙ্কীর্ণ অলিগলি একশত গজও সোজা নয়, ক্রমাগত ডাইনে-বাঁয়ে ফিরিতেছে। প্রতি পদে পথ হারাইবার সম্ভাবনা। প্রথম দিকে পথ হারাইলেও বারকয়েক যাতায়াত করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে পৌঁছিবার রাস্তা চিনিয়া গেলাম। কিন্তু কেদারঘাটে যে কি করিয়া গেলাম, তাহা চিনিতে পারি নাই।

গন্ধের বিরোধিতাও চরম। সর্বত্রই পূজার ফুলের দোকান, স্তূপীকৃত ফুলের সুগন্ধে চারিদিক ভরপুর, অথচ নাকে আসিতেছে বাবা বিশ্বনাথের বৃষভদের উৎসৃষ্ট চোনা ও গোবরের গন্ধ, মাঝে মাঝে মনুষ্যবিষ্ঠার। যাত্রী গলির উপরে পড়িয়া আছে, এড়াইবার জন্য লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে হইল। তবে পথ চিনিবার সহায়তা করিল সন্তোষের রাণী জাহ্নবী চৌধুরাণীর প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র হইতে ভাত সিদ্ধ হইবার গন্ধ। ফুলে স্বর্গ, ভাতে মর্ত্য ও মলে নরকের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল।

মনুষ্যসৃষ্ট দৃশ্যেও সেই প্রভেদ। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশ হইতে তীর্থযাত্রী আসিয়াছে প্রতিটি প্রদেশের বিশিষ্ট বস্ত্রাদি পরিয়া, কিন্তু দৈন্য ও মলিনতায় এক। অথচ বস্তিতেই বেনারসী শাড়ি ও কিংখাব বোনা হইতেছে, তাহাও দেখিলাম।

তবু হিন্দুজীবন ও হিন্দুর ধর্মের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা হইল না। নদীতীরে যে দৃশ্য দেখিলাম ও পুরাণ ইত্যাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিলাম তাহাতে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা হইবার কথা নয়। অথচ কাশীতে নানা ভয়াবহ পাপ আত্মগোপন করিয়া সতত শিকারী জন্তুর মত ওৎ পাতিয়া আছে তাহাও ভুলিয়া থাকা সম্ভব নয়।

প্রথমে সৌন্দর্যের চেয়ে কুশ্রীতাই মনকে বেশি আঘাত দিয়াছিল, কারণ সৌন্দর্য ছিল প্রত্যাশিত, কুশ্রীতা অপ্রত্যাশিত। তাই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

'ঠাকুরমা, ব্যাসকাশীতে মরলে কি হয় ?'

উত্তর : 'তা আর জানিনে ? গাধা হয়।'

প্রশ্ন : 'কাশীতে মরলে কি হয় ?'

উত্তর : 'মুক্তি হয়।'

প্রত্যুত্তর : 'না, ঠাকুরমা, শূয়ার হয়।'

তিনি এই ভক্তিহীন উক্তি শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। দীর্ঘকাল কাশীবাসিনী হইয়া বৃদ্ধা বিষ্ঠার উর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। আমি তখনও উঠিতে পারি নাই। কিন্তু মাত্র চার-পাঁচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন থাকিয়াই উঠিলাম।

আমি কাশীতে দ্রষ্টব্য জিনিস সবই একে একে দেখিলাম। নৌকা করিয়া রাজঘাট হইতে প্রায় নাগোয়া পর্যন্ত গেলাম, একটির পর একটি প্রাসাদ ও ঘাট দেখিতে দেখিতে। বেণীমাধবের ধ্বজা প্রথমেই চোখে লাগিল। উহা আওরঙ্গজেব প্রতিষ্ঠিত মসজিদ। হিন্দুর ঈশ্বর, মহেশ্বর, তাঁহার মাথায় যাহাতে ইসলাম বিরাজ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব উহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দুইটি গগনস্পর্শী মিনার, একটিতে উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সিঁড়ি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার দেখিয়া নামিয়া আসিলাম। শুনিয়াছি এখন মিনার দুইটি পড়িয়া গিয়াছে। তারপর দেখিলাম মণিকর্ণিকা ঘাটে নির্বাণহীন চিতানল জ্বলিতেছে। তখন কল্পনা করি নাই যে, পিতার অন্তিম গতি সেখানেই হইবে। এইভাবে নৌকা বাহিয়া যাইতে যাইতে দশাশ্বমেধ ঘাট, কেদারঘাট ও হরিশ্চন্দ্র ঘাট দেখিলাম। যেখানে অসি নদী আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে যেখান হইতে দূরে রামনগর দেখিলাম। বিশ্বনাথের মন্দির বাহির হইতে দেখিলাম, কিন্তু বিশ্বাস হারাইবার ফলে দেবদর্শন করিলাম না, নিকটে বেদপাঠ শিক্ষা হাত নাড়িয়া করানো হইতেছে, তাহাও দেখিলাম। মানসিংহের প্রাসাদের ছাতে উঠিয়া মানমন্দির দেখিলাম, নীচের তলায় গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া গঙ্গা দেখিলাম। বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলাম না দেখিয়া ঠাকুরমা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'নীরদ, কাশী এলে, তবু বাবাকে দর্শন করতে গেলে না!' আমি বাল্যবয়সে দুর্গাপূজার সময় প্রতি বৎসরই গাহিতাম,—

'আমি এ রাজ্যেশ্বরী অভিলাষী
হব যেয়ে কাশীবাসী,
কাশী বসি দিবানিশি
করব কাশীনাথের সাধনা।'

এইভাবে না করিলেও কাশীনাথের সাধনায় অন্যভাবে দীক্ষিত হইলাম। উহার কথা বলিবার আগে সারনাথের কথা বলি।

বাল্যকালেই সারনাথের কথা পড়িয়াছিলাম, ধামেক (ধর্মরাজীক স্তূপের ছবিও দেখিয়াছিলাম)। বুদ্ধ সেইখানে প্রথম ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানটির প্রতি হৃদয়ে ভক্তি ছিল। তাই 'ধর্ম্মচক্রপ্রবর্তনক্ষেত্র' দেখিতে গিয়াছিলাম।

প্রথম দিন গেলাম টঙ্গায়। সেদিন সারনাথে কি একটা মেলা ছিল। তাহার হুল্লোড় রাস্তা হইতেই দেখিতে শুরু করিলাম। অগণিত লোক চলিয়াছে, এক্কার 'রেস' হইতেছে, খেলনার দোকান হইতে ভেঁপু বাঁশীর ও ঝুমঝুমির আওয়াজ আসিতেছে। সারনাথে পৌঁছিয়াও দেখিলাম সেই অবস্থা। মেলা বসিয়াছে, লোকের ভিড় ও গোলমাল। যা কিছু দেখিবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম বটে, কিন্তু মনে ঠিক সুরটি বাজিল না। বিশেষ করিয়া দুঃখ হইল মিউজিয়মটি বন্ধ ছিল, সারনাথের বিখ্যাত সিংহমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য অপরূপ ভাস্কর্য দেখিতে পাইলাম না। স্থির করিলাম, পরদিনই আবার আসিব; যে-টঙ্গাতে আসিয়াছিলাম সেই টঙ্গাতেই ফিরিয়া গেলাম।

কিন্তু পরদিন রওয়ানা হইবার আগে মনে হইল, যে-তীর্থস্থানে চীন হইতে ভক্ত বৌদ্ধ পদব্রজে আসিয়াছে, সেখানে টঙ্গায় যাওয়া অশ্রদ্ধার কাজ হইবে। তাই প্রচণ্ড রোদ এবং গরম সত্ত্বেও পায়ে হাঁটিয়া আট মাইল পথ চলিলাম। দেহে কলিকাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজসজ্জা—চোখে রিমলেস প্যাঁসনে, চওড়া ফিতাটা কানে ঝুলিতেছে, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, পরনে তাঁতিয়ানী ধুতি ও পায়ে লাল সেলিম।

আবৃত্তি করিতে করিতে হাঁটিতে লাগিলাম—'মহাচীন হতে এসেছে পথিক মৃগদাব সারনাথে।' মনে পড়িল, বোধিসত্ত্ব-অশ্বত্থমৃগ এখানেই আত্মবলিদান করিয়াছিল।

সারনাথ পৌঁছিয়া দেখি, একেবারে নির্জন, দুই-একটি ছাড়া মানুষ দেখা যাইতেছে না। তখন কেন জানি না, বুদ্ধসংক্রান্ত কবিতা ও কাহিনী ভুলিয়া গিয়া একটি নূতন শেখা গান গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিলাম,—

'এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পর দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজলনয়নে, যুথীমালা গলে,
এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে'—ইত্যাদি।

এখনও এই গানটা শুনিলে সারনাথের আম্রবন মনে পড়ে।

বুদ্ধের দর্শন পাইবার জন্য মৃগদাবে আসিয়া আমার উপর মারের আক্রমণ কেন হইল? বোধ হয়, পাছে আমার মনে বৌদ্ধধর্মের বৈরাগ্য জাগিয়া আমাকে স্বধর্মভ্রষ্ট করে, এই আঘাতের শঙ্কায় ইউরোপীয় রোমান্টিসিজম বাঙালীর নূতন রোমান্টিসিজমের ভিতর দিয়া আমাকে তাহার কাছে টানিয়া লইল। উহা বুঝিতেও বিলম্ব হইল না।

মিউজিয়মে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মাথা ভক্তিভরে নুইয়া আসিল। মানবের দৈহিক রূপের মাহাত্ম্য দৃষ্টিতে অপূর্ব হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। আগের বৎসর পুরী ও ভুবনেশ্বরে যে-ভাস্কর্য দেখিয়াছিলাম তাহার সহিত সারনাথের ভাস্কর্যের সম্পূর্ণ প্রভেদ উপলব্ধি করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মোহিতবাবুকে বলিলাম—উড়িষ্যায় দেখিয়াছিলাম দেহের জৈব আকর্ষণ, সারনাথে দেখিলাম আত্মার মহিমা। তিনি শুনিয়া খুবই মুগ্ধ হইলেন। অথচ সারনাথে দেহের সৌন্দর্য যে ছিল না তাহা নয়। বরঞ্চ বলিব, সারনাথের ভাস্কর্যে দেহের সৌন্দর্য কামগন্ধহীন হইয়া প্রস্তরে মূর্ত হইয়াছিল।

এই সব দেখিয়া ভগ্ন চৌখণ্ডী স্তূপে গিয়া উঠিলাম। উহার মাথায় মুসলমানী স্থাপত্যে নির্মিত একটি অভগ্ন বুরুজ ছিল। সেটি আকবর নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার পিতা হুমায়ুনের জীবনের একটি দুঃখপূর্ণ ঘটনার স্মারক হিসাবে। হুমায়ুন শের শাহের হাতে পরাজিত হইয়া দিল্লী পলায়ন করিবার সময়ে লুকাইয়া থাকিবার জন্য চৌখণ্ডী স্তূপে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি সেই বুরুজে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চারিদিক দেখিবার জন্য দাঁড়াইলাম। তখন সূর্য অস্তপ্রায়। দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখিলাম বেণীমাধবের ধ্বজার মিনার দুইটি নীল আকাশে অঙ্কিত। ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া ফিরিবার পথ ধরিলাম।

কিন্তু এবারেও একটা খেয়াল চাপিল। ভাবিলাম, যে-বড় রাস্তা দিয়া আসিয়াছি, তাহা দিয়া ফিরিব না, সারনাথ হইতে কাশী পর্যন্ত যে ছোট রেলের লাইন গিয়াছে তাহা ধরিয়া ফিরিব, হয়ত সোজা পথ হইবে।

এই পথে কিছু দূর গিয়াছি, সন্ধ্যা আসন্ন, হঠাৎ শুনিলাম পিছন হইতে কে একজন জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবুজী, আপ্ কহাঁ যা রহেঁ হেঁ?' আমি উত্তর করিলাম, 'কাশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছি।' সে বলিল, 'তবে এই পথে কেন?' 'হয়ত সোজা রাস্তা হবে।' 'না, আপনি বরুণার পুল পার হতে পারবেন না। আমার সঙ্গে আসুন, আমি সোজা পথে নিয়ে কাশী পৌঁছে দেব।'

লোকটি বলিষ্ঠ, দীর্ঘাকৃতি, পুরবিয়া হিন্দুস্থানী—যাহারা সিপাহী যুদ্ধের আগে ভারতীয় বাহিনীতে সৈন্য হইত—হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি। সে যে-পথে নামিল, তাহার দু'ধারে লম্বা কাশের বন। তাহার মধ্যে আমাকে মারিয়া ফেলিলেও কেহ টের পাইত না। কিন্তু আমার মনে কোনো ভয় হইল না। কিছুদূর গিয়া বরুণা নদী পাইলাম, সামনেই খেয়া ঘাট, খেয়া নৌকা অপেক্ষা করিতেছে। উহাতে উঠিয়া নদী পার হইয়া আবার বনের ভিতর দিয়া গিয়া একটা বড় রাস্তায় উঠিলাম, উহাতে আলো জ্বলিতেছিল—বহু দূর পর্যন্ত সেই আলোর সারি দেখা যাইতেছিল। লোকটি বলিল, 'এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান, দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছে যাবেন। কোনো আশঙ্কা করবেন না। আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে।' বুঝিলাম, পুরাতন আর্যাবর্তীয় এখনও বাঁচিয়া আছে।

বাড়ি ফিরিয়া দেখি, বৃদ্ধা ও অন্যেরা এত রাত্রি পর্যন্ত সারনাথ হইতে ফিরিলাম না দেখিয়া মহা চিন্তিত। আমার হাঁটিয়া যাওয়া ও হাঁটিয়া ফিরিবার কথা শুনিয়া সকলেই খুব ভর্ৎসনা করিলেন। তবু তো একটা মুগ্ধ হইবার মত আচরণ দেখিলাম।

ইহার পরই কলিকাতা ফিরিবার কথা। ফিরিবার মুখে যে-ব্যাপার ঘটিল তাহা আগে আমার জীবনে কখনও ঘটে নাই। কাশীর দৃশ্য ও কাশীর জীবনের মতই এই ঘটনাটাও আমার সে-সময়ের অপমানিত ও অর্থহীন জীবনে একটু সুখ আনিয়াছিল। কেন এবং কি-ভাবে তাহার কথা বলি—তবে উহাও আমার নির্বুদ্ধিতারই কথা।

যে বাড়িতে ছিলাম উহার বারান্দায় বসিয়া আমি সামনের বাড়ির বারান্দায় একটি হিন্দুস্থানী তরুণীকে মাঝে মাঝে আসিতে দেখিতাম। গলি এত সঙ্কীর্ণ যে দুই বাড়ির মধ্যে খুব বেশি হইলে ১০/১২ ফুট দূরত্ব। মেয়েটির সুঠাম দেহ ও মুখের শ্রী আমার খুবই ভাল লাগিত। হঠাৎ বুঝিতে পারিলাম, সারনাথে যে-সব মূর্তি দেখিয়াছি যেন এই দেহ ও মুখ তাহারই মত। ধারণাটা কল্পিত নয়।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন যাহা আমাদের প্রাচীন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ইউরোপীয় কলাবিদরাও ভুলিয়া যান ও তাঁহাদের দেখাদেখি আমাদের কলাবিদরাও ভুল কথা কপচান। সেটা এই যে, ভারতীয় চিত্রকর বা ভাস্কর মানুষের বাস্তব রূপ দেখাইতে কখনও চাহে নাই, তারা একটা মানসিক অধ্যাত্মরূপ দৃষ্টিগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

ইহার মত ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা অসম্ভব। প্রথম হইতেই, ইউরোপের, বিশেষ করিয়া ইতালির চিত্রকর ও ভাস্কর যেমন পুরুষ ও নারীর জীবন্ত রূপ দেখাইতে চাহিয়াছে, প্রাচীন ভারতের চিত্রকর এবং ভাস্করও তাহারই চেষ্টা করিয়াছে, তবে তাহাদের পদ্ধতি নিজস্ব।

আমাদের ভাস্কররেরা যে কখনও বাস্তবকে তুচ্ছ করে নাই তাহা ভারতবর্ষের যে-কোনো অঞ্চলের ভাস্কর্য দেখিলেই বোঝা যায়। উড়িষ্যার মন্দিরে মন্দিরে মানুষের মূর্তি দেখিয়া প্রথম হইতেই আমার মনে হইয়াছিল সেগুলি একেবারে জীবন্ত উড়িষ্যাবাসীর মত। তফাত শুধু একটা লক্ষণে, যাহা সব কলাশিল্পেই থাকে। বাস্তব জগতে যে-সৌন্দর্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ দেখা যায়, কলাশিল্পে তাহাকেই আরও নিখুঁত ও সম্পূর্ণ করিয়া দেখান হয়। তাই মথুরার ভাস্কর্যে সেই অঞ্চলের মুখ ও দেহ দেখা যায়, দক্ষিণ ভারতের মূর্তিতেও তাহাই। নটরাজ শিবের যে-মুখ আমরা মূর্তিতে দেখি তাহা তামিলদের মুখ, বিশেষত উচ্চবর্ণের তামিলের। তেমনই সারনাথের ভাস্কর্যের মুখ এবং দেহও অযোধ্যা অঞ্চলের। সারনাথে গিয়া উহা বুঝিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

মেয়েটির মুখে ও দেহে আমি সারনাথের মূর্তিরই প্রতিচ্ছায়া দেখিলাম। আবার সারনাথ মিউজিয়মের মূর্তির মধ্যে মেয়েটির মুখ ও দেহেরই প্রতিচ্ছায়া দেখিলাম। দুই দিন পরে ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম, কোনটি মেয়ে, কোনটি মূর্তি। কাশী ছাড়িয়া না আসা পর্যন্ত মেয়েটির সম্বন্ধে আমার মনে অন্য কোনো ভাব জাগে নাই।

কিন্তু বিকালে কাশী স্টেশন হইতে যেই ট্রেন ছাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আবেগ মনকে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিল। ট্রেন গর্জন করিয়া ডাফারিন ব্রীজ পার হইয়া গেল। বারাণসীর সৌধমালাও অদৃশ্য হইল।

তখন আমার বুকের ভিতর যেন একটা তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল। একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। দুঃখের উত্তাল তরঙ্গ উঠিল, মনে হইল যেন জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়াকে ছাড়িয়া যাইতেছি। এই সন্তাপ এমনই প্রবল হইল যে, আমি বেঞ্চের উপর শুইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কামরায় আর কেউ ছিল না। কান্না কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বাঁকীপুর স্টেশনে পৌঁছা পর্যন্ত চলিল। রাত নয়টা নাগাদ যখন সেই স্টেশনে গাড়ি থামিল তখন একটি বাঙালী ভদ্র যুবক আমার কামরা খালি দেখিয়া উঠিলেন। সংবৃত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। যুবকটি দেখিলাম, বিদ্বান ও সদালাপী। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলাম। রাত্রি বেশি হইলে দুজনেই ঘুমাইলাম। সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিয়া গেলাম। আপার-ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসে যাওয়া-আসা করিয়াছিলাম, তাই শিয়ালদহে। তখন বয়স উনত্রিশ হইয়া গিয়াছে। সেই বয়সে কেন এইরূপ নির্বোধ ছিলাম তাহার বিস্তারিত আলোচনা পরে করিব, কারণ আমার নির্বুদ্ধিতার চরম দৃষ্টান্ত দিতে বাকী আছে। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি যে, এই আচরণ শুধু নিজের স্বভাব হইতেই হয় নাই, হইয়াছিল যুগধর্মেরও ফলে— যাহাকে সেদিনের কোনো বাঙালী যুবক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইলে এড়াইতে পারে নাই। সুতরাং আমিও পারি নাই। নারী সম্বন্ধে একটা মোহ তখন আমাদের জীবনের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের মত ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ এই নাম দিয়া একটি গল্পও লিখিয়াছিলেন।

শাস্তি, দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা

চাকুরি ছাড়িলে আমার কি শাস্তি হইতে পারে— তাহার আভাস কাশী যাইবার আগেই পাইয়াছিলাম। ফিরিয়া সেই শাস্তি ভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম। ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯২৮ সনের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ; এর মধ্যে দুইবার অল্প একটু সাস্ত্বনা সাময়িকভাবে পাইয়া, বাকী সবটুকু সময় অত্যন্ত দারিদ্র্য ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, মাঝে মাঝে অসহ্য হইয়া উঠিত অপমান ও লাঞ্ছনা। আসলে বাহ্যিক কষ্ট হইতে মানসিক ক্লেশ বেশি হইয়াছিল। ইহার জন্য এই সময়টাই আমার জীবনে চরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কষ্টভোগ করিবার কাল। ইহার পরও দারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা, ও অভাব হইয়াছে, কিন্তু কখনও এ-রকম মানসিক গ্লানি বোধ করি নাই।

তবে একটা কথা আগেই বলিয়া রাখি। যাঁহারা আমাকে ইহার জন্য হতভাগ্য মনে করিয়া করুণাপরবশ হইবেন, তাঁহাদের বলি, আমি সর্বদাই দুর্দশা হইতে উঠিয়াছি, এবং শুধু যে দুর্দশার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছি তাহাই নয়, উহার উপরে উঠিয়াছি। আমাকে সেজন্য কেবল ইহাই উপলব্ধি করিতে হয় নাই যে, চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ, আমার প্রত্যেক দুঃখের চক্র হইতে পরেকার সুখের চক্র বৃহত্তর হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমি যখন প্রথম সরকারি চাকুরি ছাড়ি তখন আমার মাসিক বেতন ছিল ১১০৲ টাকা। আমার দ্বিতীয় সরকারি চাকুরি যখন ছাড়ি ১৯৫২ সনে, তখন আমার মাহিনা ছিল ১১০০৲ টাকা। সুতরাং ২৬ বছরে আমার মাহিনাই বাড়িয়াছিল দশগুণ। অন্য উপার্জনও ছিল।

আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। চাকুরি ছাড়িবার পর আমাকে যে-কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তাহার জন্য আমিও আংশিকভাবে দায়ী। যে-কষ্ট অনিবার্য ছিল আমার অবিবেচনা ও উদ্যমহীনতার জন্য তাহা বাড়িয়া গিয়াছিল। সেজন্য আমার কষ্টের জন্য অন্যকে সর্বতোভাবে দায়ী করিতে পারি না। এইটুকু শুধু বলিব, আমাকে এত অপমান না করিলেও তাঁহারা পারিতেন। তাঁহাদের কেহই বোঝেন নাই যে, আমার অবিবেচনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আমার প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাওয়ার জন্য এবং প্রতিভা প্রতিহত হওয়ার জন্য হইতেছে। প্রতিভা যে আমার কোনোদিকে আছে তাহা কেহই দেখে নাই— আমার দুই একজন আত্মীয় বন্ধু ছাড়া। আমি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত খাঁচার শলাকায় পড়িতেছিলাম, ইহাতেই আহত হইতেছিলাম। যাহাই হউক, এখন কি শাস্তি হইল তাহার কথাই বলি।

কাশী যাইবার আগে আমার অন্য উচ্ছৃঙ্খলতার উপরে একটি যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইয়াছিলাম উহার কথা এখন বলিতে হইবে। কলিকাতার সবচেয়ে বড় সাহেবী বই-এর দোকানে, থ্যাকার-স্পিংক অ্যান্ড কোম্পানিতে, বহু মূল্যবান কতকগুলি বই-এর অর্ডার দিয়া গিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটি ছিল প্যাস্কালের তের খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী, অবশ্য ফরাসী ভাষায়। ফিরিবার পর উহা আসিল, থ্যাকার-স্পিংক তৎক্ষণাৎ বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া বিল পাঠাইল। ইহাও বলিয়া রাখি, আমার ধারে জিনিস কিনিবার ক্ষমতা অল্পবয়স হইতেই হইয়াছিল, কেহই আমাকে ধারে বেশি দামের জিনিস দিতে আপত্তি করিত না। এইবার কিন্তু প্রশ্ন উঠিল, এই গ্রন্থাবলীর দাম কি করিয়া দিব ? দামটা ১৩০ টাকা।

এই সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় একদিন একটা কথা শুনিলাম। তাহাতে আমার মনে হইল আমার ধারে বই কিনিবার পথে বাধা জন্মিতেছে। এই দোকানেই কতকগুলি অল্পদামের বই-এর অর্ডার ছিল। সেগুলি আসিল না দেখিয়া খোঁজ করিতে গেলাম। একটি মেমসাহেবের উপর এই বই পাঠাইবার ভার ছিল, তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলাম— 'তোমার কোন বয়স্ক-আত্মীয় আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন, তোমার টাকা নাই, তুমি বই-এর দাম দিতে পারিবে না, সুতরাং তোমাকে যেন আমরা বই আর ধারে না দিই।' আমি তো শুনিয়া হতভম্ব। এরূপ কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনা ঘটিতে পারে কল্পনাও করিতে পারি নাই। কিন্তু এক গুরুজন যে আসিয়া সত্যই বলিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাইলাম। আমি গিয়া ম্যানেজারের কাছে বলাতে তিনি লজ্জিত হইয়া মাপ চাহিলেন।

আমার প্রতি তাঁহার এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমার উচিত ছিল প্যাস্কালের গ্রন্থাবলীর প্রাপ্য দামটা তখনই পরিশোধ করা। কিন্তু টাকা কিছুতেই জোগাড় হইতেছে না। বিপন্ন হইয়া এক অত্যন্ত ধনী নিকট আত্মীয়ের কাছে টাকাটা ধার চাহিলাম। তিনি প্রথমে রাজি হইলেন না। অত্যন্ত কাকুতিমিনতি করাতে শেষে দিলেন। আমি আগে বা পরে কখনও অর্থভিক্ষা করি নাই, করিতে হইল।

থ্যাকার-স্পিংক-এর কাছে মান রাখিলাম বটে, কিন্তু আত্মীয়ের কাছে রাখিতে পারিলাম না। তিনি ক্রমাগত অপমানসূচক চিঠি দিতে লাগিলেন। আমি তাহার উত্তর দিই না। হঠাৎ চিঠি থামিয়া গেল। কেহ কিছু আমাকে বলিল না। কিন্তু আমি বুঝিলাম তিনি আমার পিতার কাছে লিখিয়াছিলেন, পিতা পরিবারকে এইভাবে অপদস্থ হইতে দিলেন না, টাকাটা শোধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি কখনও আমাকে এ-বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই।

শুধু এর জন্যই নয় সকল দিকে দৈন্য ও অক্ষমতা দেখাইয়া ভাইদের সঙ্গে থাকিতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। ইহার পূর্বেই পরিবারে আমিই একমাত্র উপার্জনশীল ছিলাম, এবং সংসার খরচের বেশির ভাগ আমিই দিতাম। এখন গলগ্রহ হইয়া বাস করিতে হইতেছে। ইহাতে গ্লানি বোধ করিয়া পিতার কাছে একটি প্রস্তাব করিলাম। সেটা এই— আমি সামনের বৎসর, অর্থাৎ ১৯২৭ সনে, আবার এম.এ পরীক্ষা দিব, ও ইতিমধ্যে অল্পখরচে কোথাও স্বতন্ত্রভাবে থাকিব। তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম তিনি যদি বাড়িভাড়ার জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা দেন, ও এম-এ পরীক্ষার ফি হিসাবে ৮০ টাকা দেন, তাহা হইলে অতিরিক্ত যাহা প্রয়োজন হইবে তাহা আমি কিছু লিখিয়া উপার্জন করিব। তিনি সম্মত হইলেন।

বেলিয়াঘাটার কাছে সুঁড়ো বলিয়া একটা পাড়া ছিল, একজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিতে সেখানে যাইতাম। তিনি তাঁহার বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আমি গিয়া উহা ভাড়া লইলাম। মাসিক ভাড়া পঁচিশ টাকা, দুইটি ঘর ভালই, ও সামনের ছাতে একটা চালাতে রান্নার ব্যবস্থা। একটি ঝি নিযুক্ত করিয়া দুই ছোট ভাইকে লইয়া সেখানে গেলাম। তখন ১৯২৭-এর জানুয়ারি মাস। আমার বইগুলি সেই বাড়ির রকের উপর স্তূপাকৃতি করিয়া নামানো, পরে দোতলায় আমার ঘরে লইয়া যাইব। সেই পাড়ার একটি বৃদ্ধ বইগুলির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'বই-এর যে ছেরাদ্দ লেগে গেছে।' ঐ পাড়ায় পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন অন্য বই যে আছে তাহার ধারণাও ছিল না। ইহা হইতেই বোঝা যাইবে পাড়াটি কি ধরনের।

কলিকাতায় যে, ১৯২৭ সনেও এরকম পাড়া থাকিতে পারে তাহা আমার কল্পনাতেও আসিত না, না দেখিলে বিশ্বাসও করিতাম না। আবার যেমন পাড়া তেমনই বাসিন্দারাও। দেখিয়া যেমন আশ্চর্য হইলাম, তেমনই মজাও অনুভব করিলাম। আমার বাড়ি পৌঁছিবার গলি এত সঙ্কীর্ণ যে গাড়ি আসিতে পারে না। একশো গজ মত দূরে বড় রাস্তা, সেই মোড়ে নামিয়া হাঁটিয়া আসিতে হইত। মাটির নীচে ময়লা সরাইবার সুড়ঙ্গ নাই। খাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাইখানা, রোজ সকালে মেথরানী আসিয়া টিন বাহির করিয়া ময়লার গাড়িতে ঢালিত। নর্দমা খোলা, উহা ডিঙ্গাইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিতে হইত।

আধবাসীদের অনেকেই দরিদ্র গৃহস্থ। তবে সম্পন্ন পরিবারও ছিল, তাহারা বড় দোতলা বাড়িতে বাস করিত। কিন্তু ধরনধারণ, জীবনযাত্রা অত্যন্ত গ্রাম্য। এই পাড়ায় আসিয়াই প্রথম ওলাইচণ্ডী ও ঘেঁটুর অর্থাৎ খোস-পাঁচড়ার দেবতার পূজা দেখিলাম। ঘেঁটু পূজার চাঁদার জন্য ছোট ছোট বালক আসিত। তাহারা সুর করিয়া আরম্ভ করিত—

'চুরে মুরে ভাই
ফুল তুলিতে চল যাই...'

—ইত্যাদি

তারপর ভিক্ষা চাহিত এই ছড়া আবৃত্তি করিয়া—

'যে দেবে পাথর পাথর।
তার হবে ধুমসো গতর!
যে দেবে থালা থালা।
তার হবে সোনার বালা!'

'স'-এর উচ্চারণ অবশ্য সংস্কৃতর মত অর্থাৎ ইংরেজী এস-এর মত।

তারপর একদিন শুনিলাম, একটি বাড়ির সামনে দশ-এগারো বছরের একটি বালক ডাকিতেছে, 'পঞ্চানন কুণ্ডু, ও পঞ্চানন কুণ্ডু, বাড়ি আছো?' পঞ্চানন কুণ্ডু বাহির হইয়া আসিল—একটি পাঁচবছর মত বয়সের বালক। আমি তো বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই কুণ্ডু-মহাশয়কে দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম।

আবার উচ্চরবে পাড়া মাতাইয়া বালকেরা ইংরেজী শিখিতেছে। কাছেই একটা একতলা বাড়ির সামনের ঘরে গৃহস্থ পিতা স্বয়ং পুত্রকে ইংরেজী লিঙ্গপ্রকরণ শিখাইতেছেন।

'বল্—

টাইগার, বাঘ, টাইগ্রেস, বাঘিনী—।
মাস্টার, মুনিব, মিসট্রেস, মুনিব পত্নী—।
অ্যাডাল্টারার, ব্যভিচারী, অ্যাডাল্টেরেস, ব্যভিচারিণী' —ইত্যাদি

ব্যাকরণ শিক্ষার পর ইংরেজী কবিতা শিক্ষার পালা। বালক একটি কবিতা ইংরেজীতে পড়িয়া বাংলা অনুবাদ বারবার মুখস্থ করিতে লাগিল,—

'বালকটি প্রজ্জ্বলিত পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া—
যেখান হইতে সে ব্যতীত আর সকলেই পলায়ন করিয়াছে।'

অর্থাৎ মিসেস হিম্যান্‌সের—

'The boy stood on the burning deck,
Whence all but he had fled.'

Casabianca কবিতাটি।

তারপর অষ্টপ্রহর কীর্তন শুনিলাম, পুরাতন ধরনের, তবে হাস্যকর নয়, বরঞ্চ করুণ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দয়াল এত নিদয় কেন,
তাই ভাবি মোরা মনে মনে।'

এই পাড়ায় আমার ও আমার ভাইদের মত ব্যক্তিদের বাস কি-রকম অসঙ্গত তাহা বলিতে হইবে না। আমি একদিন সঙ্গীসহ উইনচেস্টার রিপিটিং বন্দুক ঘাড়ে করিয়া মারা পাখিসুদ্ধ বাড়িতে ঢুকিলাম। মাঝে মাঝে বৌদিদি ও বোন উজ্জ্বল রেশমী শাড়ি পরিয়া, ব্রহ্মদেশীয় স্যান্ডাল পায়ে দিয়া, মাথায় ব্রহ্মদেশীয় ছাতা ধরিয়া বড় রাস্তা হইতে গলি দিয়া আসিতেন। বৌদিদি আমাকে কিছু ভাল খাওয়াইবার জন্য নিজে গিয়া ওই চালাঘরে রাঁধিতেন। প্রতিবেশিনীরা উঁকি মারিয়া দেখিত, এবং পরে নিন্দা রটনা করিত, 'এ কি! জুতো পরে ডালে কাটি দিচ্ছে!'

আরও অনেক হাস্যকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে-সবের কথা এখানে বলা অবান্তর, শুধু আমার দুর্বুদ্ধির কথাই বলি। এম-এ পরীক্ষার জন্য না পড়িয়া শিষ্যসামন্ত জুটাইয়া আড্ডা দিতে আরম্ভ করিলাম। বাবার পাঠানো পরীক্ষার ফি খরচ করিতে লাগিলাম। বাড়িভাড়া তাঁহার টাকায় দিতাম। নিজে কিছুই উপার্জন করিতে পারিলাম না, কিছুদিন পরে অর্থাভাব দেখিয়া দুই ভাই চলিয়া গেল, আমি একা রহিলাম। তাহার খরচও চালাইতে পারি না। বাড়িভাড়া না দিয়া সেই টাকা হইতে খাইবার খরচ চালাইতে আরম্ভ করিলাম। তাহাও চলে না দেখিয়া একবেলা খাইতে লাগিলাম। শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল।

কিন্তু এই দুর্দশাই একমাত্র দুর্দশা হইল না। বই-এর দোকানে তখনও অনেক বাকি ছিল। তাহাদের পেয়াদা আমার নূতন ঠিকানা বাহির করিয়া সেই গলিতে আসিতে লাগিল। প্রথম দিকে বাহির হইয়া তাহাদের এড়াইতাম, পরে দুর্বলতার জন্য আর হাঁটিতে পারি না, তাই ঘরে ঢুকিয়া বাহিরের কড়ায় তালা দিয়া ঘুপটি মারিয়া ঘরে শুইয়া থাকিতাম। বাড়িওয়ালা পেয়াদাদের বলিত, 'বাড়ি নেই।'

কিন্তু এই লুকাচুরিই বা কতদিন চলিবে? ধার শোধ করিতেই হইবে। যাহা করিব কখনও ভাবিতে পারি নাই, যাহা জীবনে আর কখনও করি নাই, তাহাই করিব স্থির করিলাম। কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বই বিক্রি করিবার জন্য কয়েকজন ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে গেলাম—তাঁহারা বই কেনেন জানিতাম। তাঁহারা অপমান করিয়া বিদায় করিলেন। অগত্যা কলেজ স্ট্রীটের একটি মুসলমান পুস্তকবিক্রেতার শরণাপন্ন হইলাম। সে আসিয়া বই দেখিয়া প্রায় হাজার টাকার বই-এর জন্য দেড়শত টাকা দিতে রাজি হইল। তাহার মধ্যে একটি বই ছিল স্যর অরেল স্টাইনের 'Caves of the Thousand Buddhas', আর একটি ছিল অজন্তার চিত্র সম্বন্ধে একটি ফরাসী ভাষায় লিখিত বই। সেই টাকায় বেচিতে হইল, ও কিছু ঋণ শোধ করিলাম।

কিন্তু এক দায় হইতে মুক্তি পাইলেও পেটের দায় হইতে মুক্তি পাইলাম না। ঝির মাহিনা বাকি, বাড়িভাড়া বাকি, চালডাল কিনিবার পয়সাও নাই। একদিন ঘরে তালা দিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি থাকিতে খাইতে দিলেন।

ওদিকে ঝি ও বাড়িওয়ালা আমার ডাক্তার ভাই-এর ঠিকানা বাহির করিয়া তাহার কাছ হইতে পাওনা আদায় করিল। সে গিয়া আমার বই ও জিনিসপত্র দাদার বাড়িতে আমার কাছে পৌঁছাইয়া দিল।

তখন লজ্জায় বাড়িতে থাকিতে পারি না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াই। ইহাতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপমান এবং গ্লানি একদিন চরমে পৌঁছিল। হ্যারিসন রোডে একটি হোটেলে আমার ভগ্নীপতি ও বোন থাকিত, একদিন তাহাদের কাছে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার ডাক্তার ভাই সেখানে আসিল। আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত অপমানজনক কয়েকটা কথা বলিল। ছোট ভাই-এর মুখ হইতে এ-রকম অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া আমি তাহাকে এক চড় মারিলাম। সে রাগী মানুষ ছিল, আমাকে প্রহার করিতে আসিল। তাহার মার খাইলে হয়ত আমার শারীরিক অনিষ্ট হইত। কিন্তু আমার ভগ্নীপতি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজে মারটা নিল। কিছুক্ষণ পরে ভাই শান্ত হইয়া চলিয়া গেল।

এইরূপ একটা ব্যাপারের পর দাদার বাড়িতে ফিরিয়া যাইতেও ইচ্ছা হইল না, মনে হইল যে-বাড়িতে নিরন্তর নীরব অবমাননা সহ্য করিতেছিলাম, সেখানেও মুখ দেখাইতে পারিব না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে লাগিলাম। রাত্রি নয়টার সময়ে আর হাঁটিতে পারি না দেখিয়া শিয়ালদহ মেন স্টেশনের যে বড় ওয়েটিং-রুম খোলা তাহাতে গিয়া একটা বেঞ্চির উপর শুইয়া রহিলাম। রাত দশটা নাগাদ একটি রেলের লোক আসিয়া বলিল, ওয়েটিং-রুমে রাত্রিতে থাকিবার হুকুম নাই, বাহির হইয়া যাইতে হইবে।

আমি উঠিয়া সিঁড়ির নীচে গিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম লোকটি চলিয়া গিয়াছে, অন্য কেহ নাই, প্ল্যাটফর্মেরও ফটক খোলা। সোজা চলিয়া গিয়া প্ল্যাটফর্মে যে ট্রেনটা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে উঠিয়া বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম। রেলগাড়ির মিস্ত্রিরা গাড়ি পরীক্ষা করিতে করিতে লাইনের পাশ দিয়া ঘুরিতেছে। আমি তাহাদের কথা ও পায়ের শব্দ শুনিলেই বেঞ্চের নীচে লুকাইতাম। এইভাবে রাত্রি প্রায় কাটিল।

শেষ রাত্রিতে হঠাৎ ট্রেনটা চলিতে আরম্ভ করিল। আমি বুঝিলাম দূরের কোনো সাইডিং-এ যাইতেছে। ধীরে ধীরে নারকেলডাঙ্গা ব্রীজ পার হইয়া, আমার পুরানো পাড়াও ছাড়াইয়া প্রায় উল্টাডিঙি স্টেশনের কাছে গিয়া একটা সাইডিং-এ থামিল।

আমি নামিয়া লাইন ধরিয়া দমদমের দিকে চলিলাম। বেলগাছিয়া পুল পার হইয়া দেখি আর চলিতে পারি না। ভাবিলাম, বেলগাছিয়া রোডে নামিয়া বাড়ি চলিয়া যাইব। রেলের লাইন রাস্তার প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে। খাড়া পাড়। নামিতে গিয়া পা পিছলাইয়া একেবারে নীচে গিয়া পড়িলাম, কিন্তু মাটিতে নয়, একটা টেলিগ্রাফের থাম ছিল, তাহাতে যে শক্ত তারের দড়ি থাকে তাহার উপর। বুকে গুরুতর আঘাত পাইলাম। তখন বুঝি নাই, পরে মনে হইত কিছুকাল গেলে যখন থাকিয়া থাকিয়া আমার হৃদ্‌রোগের লক্ষণ দেখা দিত তাহা আংশিকভাবে সেই চোটের ফলে। ১৯৪৯ সনে কার্ডিয়োগ্রাম নেওয়া হইলে আমার হৃদ্‌পিণ্ডের উপর একটা কালো দাগ দেখা গিয়াছিল।

টলিতে টলিতে মানিকতলা স্ট্রীটে (হেদুয়ার কাছে) দাদার বাড়িতে ঢুকিয়া একতলার ঘরে—যেখানে আমার স্থান হইয়াছিল শুইয়া পড়িলাম। কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ১৯৯০ সনে আমার ইংরেজী আত্মজীবনীতে এই ঘটনার বিবরণ দিবার আগে, আমি এই রাত্রি কোথায়, কি-ভাবে যাপন করিয়াছিলাম কেহ জানে নাই। বাড়ি ফিরিবার পর আমার জ্বর হইল। তখন অসংলগ্ন প্রলাপে আমি মনের বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম।

এই সব খবর পাইয়া পিতা আমাকে কিশোরগঞ্জে তাঁহার কাছে থাকিবার জন্য লইতে আসিলেন। তাহাই স্থির হইল। কিন্তু নিজের কাছেও আমার আত্মসম্মান বা আত্মপ্রত্যয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেশও রহিল না। তবু যাইবার অব্যবহিত আগেই একটা আশার রশ্মি আমার মনের উপর পড়িল।

হঠাৎ শুনিলাম, অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস ও সজনীবাবু পুরাতন সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'-কে মাসিক করিয়া আবার চালাইতে মনস্থ করিয়াছেন। আমাকে একটা লেখা দিতে অনুরোধ করিলেন। নূতন পর্যায় 'শনিবারের চিঠি' আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইবে। আমি সম্মত হইলাম, এবং একটা প্রবন্ধ লিখিলাম।

এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা জানাই। আমার ব্যক্তিগত অবস্থা যাহাই হউক না কেন, আমার লেখা পড়িয়া কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, উহা কি দুর্দশার মধ্যে লেখা হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৫৮ সনে আমার দ্বিতীয় ইংরেজী বই— A Passage to England—যখন লিখিতেছি, তখন আমার অত্যন্ত আর্থিক অভাব ও দুশ্চিন্তা চলিতেছে। কিন্তু বইটিতে নিরুৎসাহের চিহ্নমাত্র নাই। অথচ লিখিবার সময়ে একদিন চাহিয়া দেখিলাম পত্নীর পরনের শাড়ি ছিন্ন। তখন তাঁহার নিত্যব্যবহার্য শাড়ি দুইটি কি তিনটিতে দাঁড়াইয়াছে। আমি বলিলাম, 'এ আমি দেখতে পারিনে, বই লেখা ছেড়ে আমি আর্টিকেল লিখে কিছু উপার্জন করব।' পত্নী বলিলেন, 'না, আমি তা হতে দেবো না। তুমি আগে বই শেষ করো, তারপর আর্টিকেল লিখো।' অথচ বইটার যাঁহারা রিভিউ করিয়াছিলেন—ইংলন্ডের বড় বড় পত্রিকায়—তাঁহারা লিখিয়াছিলেন বইটার লেখা যেন স্রোতস্বিনীর মত, পাথরের উপর দিয়া তরতর করিয়া চলিয়াছে, আর বইটা সুখের উৎস।

'শনিবারের চিঠি'-র জন্য লেখাটাই খুবই সতেজ ও ভদ্রব্যঙ্গাত্মক হইয়াছিল। এমন কি উহা আরম্ভ করিয়াছিলাম প্যাস্কালের বিখ্যাত Provincial Letters-এর প্রথমটির প্রথম ছত্রের বাংলা অনুবাদ দিয়া। লেখাটা সজনীবাবুকে দিয়া আসিবার পর কোনোও খবর পাই না। একটু নিরুৎসাহ বোধ করিতেছি। এমন সময়ে এক বিকালে রাস্তায় সজনীবাবু ও যোগানন্দবাবুর সহিত দেখা হইল। যোগানন্দবাবু আমাকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'চমৎকার লেখা! Intellectual চাবুক!' আমি খুবই আনন্দিত হইলাম। পরদিন কিশোরগঞ্জ যাত্রা করিলাম।

প্রবন্ধ ছাপার অক্ষরে কিশোরগঞ্জেই দেখিলাম। সজনীবাবুরা 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই আমার প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। এর আগে দুয়েকটা পুস্তক সমালোচনা 'প্রবাসী'তে করিয়া থাকিলেও প্রবন্ধ লিখি নাই। আমি 'বলাহক নন্দী' এই নামে লিখিব স্থির করিলাম। বলাহক = মেঘ = নীরদ। নন্দী আমাদের কুলোপাধি।

প্রবন্ধটা কিশোরগঞ্জের বন্ধুদের দেখাইলাম। তাঁহারা বন্ধুস্থানীয় একজন লেখক হইতে চলিয়াছে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইয়া উৎসাহ দিলেন। ইহার পর আমি কলিকাতা ফিরিলাম। অর্থোপার্জন করিতে পারি আর না পারি, লেখকবৃত্তি চালাইবার জন্য কলিকাতা থাকা দরকার তাই পিতা আপত্তি করিলেন না।

'শনিবারের চিঠি' : অভিযান ও পরাজয়

আমি ১৯২৭ সনের ২৭শে নভেম্বর কিশোরগঞ্জ হইতে কলিকাতা ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলাম। আর জন্মস্থানে, পৈতৃক গ্রামে বা পূর্ববঙ্গের অন্য কোথাও যাওয়া হয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলিকাতায় ফিরিয়া 'শনিবারের চিঠি'র পরিচালক বন্ধুবর্গের সহিত দেখা হইল, তাঁহারা খুবই অভ্যর্থনা করিলেন। আমিও মহোৎসাহে 'প্রসঙ্গকথা' লিখিতে লাগিয়া গেলাম। বলাহক নন্দীর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। একদিন এক সাহিত্যিক পার্টিতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে বলিলেন, 'মশায়, আপনি ভাল লেখেন।' নূতন লেখকের ভাগ্যে তখনকার দিনে উচ্চতর প্রশংসা কি জুটিত? একদিন 'প্রবাসী' আপিসে কার্যবশে যোগেশচন্দ্র রায় আসিয়াছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেওয়াতে তিনি বলিলেন, 'বলাহকই বটেন!' অবশ্য আমার লঘু দেহ দেখিয়া। আশা করি আজিকার বাঙালী পাঠকেরা ইঙ্গিতটা বুঝিবেন।

কিন্তু খ্যাতি বা প্রশংসার চেয়ে যেটা আমাকে বেশি প্রেরণা দিল সেটা এই ধারণা যে, আমরা 'ধর্মযুদ্ধ' চালাইতেছি, বাংলাসাহিত্যের উপর 'অধর্মে'র আক্রমণের বিরুদ্ধে। 'শনিবারের চিঠি'র এই কৃত্য সম্বন্ধেই প্রকৃত ধারণা নাই। আমরা যে একটা সাহিত্যিক অভিযান শুরু করিয়াছিলাম তাহা সাহিত্যিক দলাদলি হইতে নয়। নতুন লেখকেরা যাঁহাদের এক দল নিজেদের 'কল্লোল'যুগের লেখক বলিয়া পরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই ধারণাটাই প্রচার করিয়াছেন। আমি 'দেবী চৌধুরাণী'র রঙ্গরাজের মত বলিব, 'দলাদলি আবার কি? আমরা রাণীজীর কারপরদাজ।' কিন্তু তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে, এই 'ধর্মযুদ্ধে' আমাদের পরাজয় হইবে, অথচ পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী তাহা আমাদের প্রথম হইতেই বোঝা উচিত ছিল। ইহাতেও আমি নির্বুদ্ধিতা দেখাইয়াছিলাম। কিন্তু নয় মাসের মধ্যেই ধরিতে পারিয়াছিলাম। এই কাহিনীটা এই প্রবন্ধে বলা প্রয়োজন।

আমি কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার পর বাংলাসাহিত্যের বিশেষ খবর রাখি নাই। ১৯২৫ সনের প্রথম দিকে মোহিতবাবু আমাকে এ বিষয়ে কিছু কিছু বলিলেন। তিনি একটা কবিতাতে লিখিয়াছিলেন, 'চারিদিকে শিবাদের অশিব চীৎকার।' আমি তখনকার লেখার দুই চারিটা দৃষ্টান্ত যা দেখিলাম তাহাতে আমারও মনে হইল বাংলাভাষা ও সাহিত্য অবনতির পথে চলিয়াছে। ১৯২৭ সনে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হওয়াতেই আমি 'শনিবারের চিঠি'তে যোগ দিলাম।

আসলে 'কল্লোল' 'প্রগতি' 'পূর্বাশা' ইত্যাদি পত্রিকায় যে সাহিত্যিক অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল উহা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর পূর্ববঙ্গের আক্রমণ। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিতেছিল। ইহার কথা কেহই আলোচনা করে নাই। ব্যাপারটা এই—নূতন বাংলাসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা পূর্ববঙ্গে অগণিত হইলেও, পূর্ববঙ্গ হইতে উচ্চস্তরের কোনো লেখক দেখা যায় নাই, সকলেই পশ্চিমবঙ্গের, এক নবীনচন্দ্র সেন ছাড়া। তাঁহার ক্ষেত্রেও বলিব যে, এক 'পলাশীর যুদ্ধ' ছাড়া তাঁহার কোন কাব্য উচ্চাঙ্গের নয়। ১৯২৫ সনের পর হইতে পূর্ববঙ্গের অর্বাচীন যুবকেরা বাংলাসাহিত্যে পূর্ববঙ্গের দাবি আছে মনে করিয়া তাঁহাদের রুচি ও ভাষা অনুযায়ী লেখা শুরু করিলেন। এই সব লেখাতে সেইসময় পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যের যে-সব ধারা প্রচলিত ছিল, তাহার সবই প্রায় নূতন লেখকেরা বর্জন করিলেন।

মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় কিন্তু এই সব লেখার ভঙ্গী দেখিয়া অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিলেন। তিনি ১৯২৮ সনের আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাসাহিত্যের অধ্যাপকত্ব পাইয়া কলিকাতার স্কুল মাস্টারি ছাড়িয়া ঢাকা গিয়াছিলেন। তাঁহার বৈষয়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্নতি ঢাকায় হইলেও তিনি ঢাকাই সাহিত্যকে ঢাকাই পরোটার মত গ্রাহ্য মনে করিলেন না। উল্টা ক্ষেপিয়া গেলেন।

পরবর্তী ছুটির সময়ে কলিকাতায় আসিয়া তিনি আমাকে একটি কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন যাহা ঢাকার সাহিত্যিকদের উপর উগ্র আক্রমণ। এই কবিতাটির প্রথম দুইটি লাইন এইরূপ ছিল—

'শুনরে পুঙ্গীর পুত,
কোন পদ্মার পার হতে এলে
বুড়ীগঙ্গার ভূত।'

ঢাকার ভাষা সম্বন্ধে নিজের ছেলেদের মুখে বাংলা ব্যবহার শুনিয়া আমাকে বলেন—

'নীরদ! ছেলেগুলোর হল কি? জানো, দুর্গাপূজা দেখে এসে বললে, মায়ের সিংহ।'

কারণ পশ্চিমবঙ্গে সিংহ জন্তুই হউক, কি উপাধিই হউক দুইকেই উচ্চারণ করা হইত সিঙ্গি। 'সিঙ্গিবাবুদের বাড়ির পূজো', অথবা 'সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস'। 'সিংহ' শব্দের প্রচলিত পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষার ফলে একটা বিখ্যাত উপন্যাসেও ভুল হইয়াছে। 'ইন্দিরা' উপন্যাসে ইন্দিরা তাহার স্বামী উপেন্দ্রকে তাহাদের বাড়ির প্রবেশপথ সদর দরজা সম্বন্ধে বলিল, 'দক্ষিণ মুখ একটা বড় ফটকে দুই পাশে দুইটা সিঙ্গি।' আমার বন্ধু যোগেশচন্দ্র বাগল বরিশালের লোক, তিনি মনে করিলেন এটা ছাপার ভুল, তাই তাঁহার সম্পাদিত বঙ্কিমগ্রন্থাবলীতে ছাপাইলেন—'দুইটা সিংহী।' তিনি ভুলিয়া গেলেন, সিংহের মূর্তি রাখিতে হইলে কেহ সিংহী বসায় না, কেশরওয়ালা সিংহ বসায়। কলিকাতা গভর্নমেন্ট হাউসের সিংহদ্বারগুলির উপরে সিংহের মূর্তি দেখিতে কলিকাতাবাসী পাঠককে অনুরোধ করিব।

ভাষার পূর্ববঙ্গীয় প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিই। 'চিপা গলি', 'চিকন সুতো,' সরু সুতো অর্থে; তারপর 'ভাত বসিয়েছে', ভাত চড়িয়েছে না লিখিয়া—ইত্যাদি। একটা গুরুতর ঝগড়ার সম্ভাবনা আর একটা অপপ্রয়োগে ঘটিত। ঢাকানিবাসিনী গৃহিণী নবাগতা কলিকাতাবাসিনীর ছেলেকে দেখিয়া বলিতেন, 'আপনার ছেলে এত হ্যাংলা কেন?' শিশুপুত্রের এইরূপ নিন্দা শুনিয়া কলিকাতাবাসিনীর রাগ হইবারই কথা, কারণ অতিথিদের জলযোগ করিতে দিয়া এই প্রশ্ন ঢাকাবাসিনী করিয়াছেন। আসলে ঢাকাবাসিনী বলিতে চাহিয়াছেন, 'আপনার ছেলে এত রোগা কেন?' ঢাকা অঞ্চলে শীর্ণকায়কে হ্যাংলা বলে।

মোহিতবাবু একদিন 'প্রগতি' পত্রিকায় একটা গল্প পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে, নীরদ, এটা কি লিখেছে বল তো?' একটি শিশুকে কোলে তুলিয়া এক যুবতী বলিতেছে, 'একে আলগাতেও সুখ!" মোহিতবাবু বলিলেন, 'এ কি 'আগলাতে'র ছাপার ভুল?' আমি বাঙ্গাল, বুঝিলাম, উত্তর দিলাম, 'না মাস্টারমশায়, আমরা তোলাকে আলগানো বলি, যেমন 'এই বাক্সটা এত ভারী যে, আমি আলগাতে পারি না।"

'প্রগতিশীল' সাহিত্যে চরিত্রচিত্রণ ও নায়কের আচার ব্যবহার দেখিয়া মোহিতবাবু 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত একটি কবিতায় লিখিলেন,—

'যক্ষা কাশেরে বড় যে ডরাই, বাঁচিতে চাই,
মদ খেয়ে খেয়ে কেনই খামোখা
অক্কা পাই!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সব কারণে আমরা এই সব তরুণ লেখকদের সাহিত্যিক অভিযানকে সভ্য দেশের উপর অসভ্য জাতির আক্রমণ বলিয়া মনে করিলাম। মোহিতবাবু উহাদের একজনের বিষয়ে লিখিলেন,—

'আহা, আহা, ওকে মেরো না মেরো না,
খেদাইয়া দাও দূরে,
ঠাকুর ঘরের আনাচে-কানাচে
যেন-না বেড়ায় ঘুরে।
আছে ত অনেক চাটের দোকান,
আছে ত কসাইখানা,
সেইখানে ওরে আদরে পুষিবে,
ঘাড় ধরে নিয়ে যানা।'

আমি পশ্চিমবঙ্গীয়দের দলে জুটিয়া গিয়া বিভীষণের মত বলিলাম,—

'বৃথা এ সাধনা,
ধীমান! রাঘবের দাস আমি, কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, বলিতে
অনুরোধ!'

উহারা আমাকে 'ঘরভেদী' ভাবিয়া গালিগালাজ করিতে আরম্ভ করিল। সজনীবাবুই তাহাদের বেশি আক্রমণ করিতেন, কিন্তু তাহারা সজনীবাবুকে গালি দিতে ভরসা পাইত না, কারণ তাঁহার এ-রকম পাকা খিস্তি আয়ত্ত ছিল যে, সেই অবাচীন বালকদের সাধ্যও ছিল না যে তাঁহার সঙ্গে খেউড়ে টেক্কা দেয়।

আমি অতিশয় শালীনতার সহিত লিখিতাম, সেজন্য আমার সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিয়াছিল—খ্যাতি কি অখ্যাতি বলিতে পারি না—যে আমি 'ফরাসী বৈদগ্ধ্য' দেখাই। এই ধারণাটা বাঙালী সাহিত্যিক সমাজে জন্মিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্' এই কবিতা হইতে— উহাতে এইরূপ উক্তি ছিল,

'ফরাসী পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বল মুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা হস্ত রাখি বুকে।'

এমন কি আমার লেখাতে সূক্ষ্মতার সামান্য একটু অভাব হইলেও মোহিতবাবু আমাকে বলিতেন, 'তুমি যেন তোমার ফরাসী বৈদগ্ধ্য রাখতে পারোনি।' লাভ ইহাতে হইল এই যে, হনুবংশীয় লেখকেরা দেখিল, উহারা যেমন দাঁত দেখাইতে পারে, মনুবংশীয় লেখকেরা তাহা কখনই পারিবে না। সুতরাং তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া আমাকেই দাঁত খিঁচাইত।

কিন্তু আমি কয়েকমাস পরেই বুঝিলাম যে, আমাদের শত্রুপক্ষই জয়ী হইবে, আমরা পরাজিত হইব। কেন এই ধারণা করিলাম তাহা আমার সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইবার ফলে হইয়াছিল। বহু সাহিত্যের, পাশ্চাত্য জগতে গ্রীক ও ল্যাটিন হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজী-ফরাসী পর্যন্ত, ও আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য পড়িয়া জানিলাম যে, সকল সাহিত্যেরই জন্ম, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যু আছে—ইহার ব্যতিক্রম কখনও হয় নাই। তাই আমার ধারণা জন্মিল, বাংলাসাহিত্যের অকাল জরা আরম্ভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইয়াছে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এই অনুভূতির বশে নিরুৎসাহ হইয়া অবশেষে ১৯২২ সনের জুন মাসে আমি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকত্ব ছাড়িয়া দিলাম।

ইহার বৎসরখানেক পর 'শনিবারের চিঠি' সম্বন্ধে আমি মোহিতবাবুকে একটা চিঠি লিখি। উহাতে আমি সজনীবাবুর লেখা ও পরিচালনানীতির সমালোচনা করিয়াছিলাম। মোহিতবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে লিখিলেন,—

'তুমি যে লেখাপড়া শিখে এত বড় বাঁদর হয়েছ তা আমার জানা ছিল না। যতদিন তুমি "শনিবারের চিঠিতে" ছিলে, ততদিনই তোমার প্রাণ আছে দেখা গিয়েছিল। এখন তুমি মরে ভূত হয়ে গিয়েছ। আমি তোমার বাবার কাছে লিখব।'

আমি উত্তর দিয়াছিলাম, 'মাস্টারমশায়, আপনি এখনো আমাকে ইচ্ছে হলে বেত মারতে পারেন, কিন্তু আমার ত্রিশ বছর পার হয়ে গিয়েছে, এখন কি বাবার কাছে বলে মার খাওয়াবার বয়স আছে?'

তিনি রাগিয়া বহু বৎসর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নাই। কিন্তু জীবনের শেষে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারই ভুল হইয়াছিল। সেই পত্রের কথা আমি অন্যত্র লিখিয়াছি। তাঁহার মনোভাব তখন আমাকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়াছিল। অথচ তিনি নিজের উপর এই দুঃখ নিজেই টানিয়া আনিয়াছিলেন।

AMARBOI.COM

আরও দুর্দশা ও একটি সান্ত্বনা

আমাদের উদ্দেশ্য ও তাহার বিফলতার কথা বিবেচনা করিলে আমার 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদকত্ব ছাড়া যতই সঙ্গত মনে হউক, সাংসারিক দিক হইতে উহা নূতন দুর্দশার কারণ হইল। এই পত্রিকার সম্পাদকত্বের সময়ে উপার্জনহীন হইলেও সাহিত্যিক কৃতিত্বের জন্য অক্ষমতাটা সাময়িকভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সম্পাদকত্ব ছাড়াতে সেই অবলম্বন আর রহিল না। আবার ভাইদের গলগ্রহ হইলাম। তাহারা কিছু না বলিলেও নিজের মানসিক গ্লানি কাটাইয়া উঠা অসম্ভব হইল।

আমি তখনও আমার উকিল বড় ভাই-এর বাসায় থাকি। সে-বাসা মানিকতলা স্ট্রীটে, হেদুয়ার খুবই কাছে ছিল। আমার ডাক্তার ভাই পসার হইতেছে দেখিয়া হ্যারিসন রোডে একটা তিনতলা বড় বাড়ি ভাড়া লইয়াছিল। তাহার বাড়িতেই কিছুদিনের জন্য আমার পিতা, এক ভগিনী ও তাহার স্বামী ছিলেন।

এক রাত্রিতে মানিকতলার বাড়ির ছাতে আমি অভ্যাস মত মাদুর পাতিয়া ও বালিশে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া আছি। অনেক রাত্রি, হঠাৎ জাগিয়া দেখিলাম, পিতা আমার কাছে কোঁচার খুঁট গায়ে ও শুধু পায়ে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবা, কি হয়েছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কিছু নয়।' এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সেই ছাতে উঠিবার সিঁড়ি ছিল না, একটা নটখটে বাঁশের মই বাহিয়া উহাতে উঠিতে হইত। এইভাবে বাবা কেন আমাকে দেখিতে আসিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পরদিন হ্যারিসন রোডে গিয়া ভগ্নীপতির মুখে কারণ শুনিলাম।

সে বলিল, 'আমি এর জন্য দায়ী। শ্বশুরমশায় বসে আমাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, "নীরদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, শোবার বিছানাও পায় না, ছাতের শানের ওপর শোয়।" এই কথা শোনামাত্র তিনি বেরিয়ে গেলেন, ও দেখলাম তিনি বাড়িতেও নেই। নিশ্চয় আমার কথা শুনে তুমি কি-ভাবে শোও দেখতে গিয়েছিলেন।'

এই পিতাই আমাকে তখন বলিয়াছিলেন, 'নিরু, পুরুষের পক্ষে উপার্জনহীন হয়ে থাকার মত লজ্জার বিষয় আর কিছু নেই। তুমি লিখে যা পারো উপার্জন করে সেই টাকা তোমার দাদাকে দিও।'

আমার ডাক্তার ভাই-এর বাড়ি খুব বড় ছিল। ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য স্থির হইল মানিকতলায় স্বতন্ত্র বাসা আর না রাখিয়া সকলেই হ্যারিসন রোডের বাসায় থাকিব। তাহাই করা হইল। তখন ডাক্তার ভাই মোটরকারও কিনিয়াছে। আমিও কয়েকবার উহাতে চড়িয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। তখনকার দিনে সকলেরই 'শোফার' থাকিত, সে অবকাশ পাইলে আমাকেও বেড়াইতে লইয়া যাইত।

নূতন বাড়িতে ঘর অনেকগুলি থাকিলেও শোবার মত ঘর বেশি ছিল না। ডাক্তার ভাই-এর ডাক্তারখানা ও উকিল ভাই-এর আপিস ঘর দোতলার দুটি বড় এবং ভাল ঘরে হইল। তিনতলার একটি বড় ঘরে আমার বইপত্র রাখিবার ও ছবি ইত্যাদি টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু সেই ঘরে আমি শুইতে পাইতাম না। উহাতে আমার দুই ছোট ভাই শুইত। আমি অন্যের সঙ্গে এক ঘরে শুইতে চাহিতাম না। কিন্তু আমার শোবার জন্য কোনো ঘরের ব্যবস্থা করার কথা কেহই ভাবিল না। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া দোতলা হইতে তেতলায় উঠিবার সিঁড়ির মাঝের ল্যান্ডিং-এ শানের উপর মাদুর পাতিয়া শুইতাম ও সকালে মাদুর গুটাইয়া কোথাও তুলিয়া রাখিতাম। কেহ এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিত না, তবে দুবেলা দুটি খাইতে পাইতাম।

এই অবস্থায় আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভয় কোনটাই রাখিতে পারিতাম না, ফলে বোধ হয় 'শনিবারের চিঠি'তে যোগ দিবার আগে আমার যে মানসিক অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতেই ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু চরিত্রগত নির্বুদ্ধিতার জন্য একটা ক্ষীণ প্রাণের ধারা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ইহাকে আধুনিক ডাক্তারির ভাষা একটু পরিবর্তন করিয়া Psychological blood transfusion বলা চলে। তবে এটাও আমি জানি যে, এই চিকিৎসার বিবরণ দিয়া কাহারও করুণা বা সহানুভূতি আমি পাইব না, পক্ষান্তরে সকলের কাছেই উপহাসাস্পদ হইব।

ধাঁধা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস না করিয়া ব্যাপারটা কি বলি। আমি তিনতলার ঘরে দিনের বেলা থাকিতাম। সামনে হ্যারিসন রোডের অপর পারে একটা খুব বড় দোতলা বাড়ি ছিল। উহার বাসিন্দারা সম্পন্ন বাঙালী পরিবার বলিয়াই মনে হইত। আমি আমাদের বাড়ির তিনতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাস্তায় কি হইতেছে দেখিবার সময়ে সেই বাড়ির সম্মুখের দিকে দোতলার একটা ঘরে দুইটি তরুণীকে পড়িতে দেখিতাম। বয়স ষোল-সতেরো মনে হইত। তাহারা সকালে ছাতে শাড়ি শুকাইতে দিতে উঠিত, বিকালে তুলিয়া লইতে আসিত। কখনও বা দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বড় বড় চোখ দিয়া রাস্তার দৃশ্য দেখিত। আমি বুঝিতাম যে, উহারা দুটি বোন, ও কোনও মেয়ে-স্কুলের ছাত্রী। কিন্তু কোনটি বয়সে বড়, কোনটি ছোট তাহা বুঝিতে পারিতাম না। যেটি মাথায় কিছু ঢেঙ্গা এবং দেহের গঠনে কিছু বেশি ছিপছিপে সেটিকে ছোট বোন বলিয়া স্থির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিলাম। সে সুন্দরী না হইলেও কমনীয় ছিল।

অপরটির, যাহাকে আমি বড় বোন মনে করিলাম তাহার, মুখের শ্রী, দেহের গঠন, চলাফেরার ছন্দ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য রকমের ছিল। সে ছোটবোনের তুলনায় সামান্য শ্যামবর্ণ ছিল, কিছু খাটোও ছিল। কিন্তু তাহার মুখের শ্রীতে যেমন শোভা ছিল, দেহের গঠনেও তেমনই শোভা ছিল, তবে কোনোটাই স্থির শোভা নয়, সতত চঞ্চল। অথচ সেটা চরিত্রের চঞ্চলতা নয়, কোনো দিন তাহার মুখের ভাবে বা চলার ভঙ্গীতে আমি চরিত্রগত চপলতার আভাসও পাই নাই।

তবে চোখে যাহা দেখিতাম, তাহা কখনও আগে দেখি নাই। তাহার নাম কি জানিতে পারি নাই, ঊর্মিলা হইলে সঙ্গত হইত। তাহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া 'মেঘদূতে'র এই কথাগুলি প্রয়োগ করিলে অসঙ্গত হইত না—'তাহার ভ্রূভঙ্গীযুক্ত মুখখানি ও উচ্ছলিত দেহ চলোর্মি বেত্রবতী নদীর মত ছিল।'

তাহার মুখের শ্রীতে এতটুকুও দোষ ছিল না, কিন্তু সে-মুখের রূপ মাপজোকের ব্যাপার ছিল না। সে যখন ছাতে দাঁড়াইয়া ভ্রূ'দুটিকে যুগল করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ডাইনে-বাঁয়ে মুখ ফিরাইত, তখন মনে হইত যেন দুইটি বিদ্যুৎপ্রভ রশ্মি তীরবেগে নীলাম্বরে গিয়া পৌঁছিতেছে।

সে চলিলে মনে হইত স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য দেখিতেছি। অগ্নিমিত্র মালবিকার নৃত্য দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহার দেহ সম্বন্ধে উহাই বলিতে পারিতাম—'এই নৃত্যে যেন নৃত্যস্রষ্টা গুরুর মানসছন্দ দেহে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে।'

এই চলাফেরার একটা ধ্বনিও যেন শুনিতে পাইতাম, সেটা নূপুরশিঞ্জিতের মত, মনে হইত কোথাও সোনার নূপুর বাজিতেছে।

কোনদিকে অভদ্রতা বা অশালীনতা প্রকাশ না করিয়া আমি অপলকচক্ষে তাহাকে দেখিতাম। আমার হৃদয় তাহার প্রতি ভালবাসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। আমার সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য আমি তাহাকে দেখিয়া ভুলিয়া যাইতাম।

কিন্তু সে কে তাহা জানিবার কোনো প্রয়াস আমি করি নাই, সেই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইবারও চেষ্টা করি নাই। দুই-এক দিন শুধু দেখিয়াছি যে, ছাত হইতে নামিবার আগে সে মুখ ফিরাইয়া আমার উপর দুইটি কালো চোখের স্থির দৃষ্টি মিনিটখানেকের জন্য ফেলিয়াছে। সে কি বুঝিয়াছিল যে, আমার সমস্ত সত্তা তাহার দেহের মধ্যে নিমজ্জিত? জানি না।

মাস দুই পরে আমার ডাক্তার ভাই বিলাত চলিয়া গেল। আমরা সেই বাসা তুলিয়া মানিকতলার আগের বাড়ির কাছে একটা বাড়িতে গেলাম। কখনও আর মেয়েটির বাড়ির দিকে ফিরি নাই, তাহাকে চোখে দেখিবার চেষ্টাও করি নাই। তবে এক বছর মত তাহার প্রেমে আবিষ্ট ছিলাম। মনে করিতাম, সে এই হৃদয়হীন পাষাণকারা কলিকাতা শহরবাসিনী নয়, তাহাকে কলিকাতার কাছে একটা ভাঙ্গা রাজপুরীতে লইয়া গেলাম। সেটি শ্রীপুর, রবীন্দ্রনাথের 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে' উদয়াদিত্যের পত্নী সুরমার পিত্রালয়। আমাদের সময়ে অবশ্য সেটা ভগ্নস্তূপ হইয়া গিয়াছিল। আমি রাত্রিতে শুইয়া কল্পনা করিতাম, আমার রাজকন্যাকে দেখিবার জন্য সেই ভগ্ন রাজবাড়িতে গিয়াছি। কিন্তু প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্রই একটা অজগর আমার দেহ বেষ্টন করিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজকন্যা দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিয়া আমার মরণোন্মুখ চেহারা দেখিল। ইহার পর একদিন ধারণা হইয়াছিল আমি সত্যই সেই ভাঙ্গা রাজপুরীতে গিয়া প্রাণ হারাইতেছি। তাহার পর ধীরে ধীরে সেই মেয়েটির প্রতি আমার ভালবাসা মিলাইয়া গেল। সেই গল্পটাও বলার প্রয়োজন আছে, তবে অনেকেই হাস্যকর মনে করিবেন।

ইহারও আগে আরেকটা গল্প বলিব—এই মেয়েটিকে ভালবাসিবার (অথবা দৃষ্টিক্ষুধা মিটাইবার) মোহে আমার মত অক্ষমেরও একটা যে ক্ষমতা হইয়াছিল তাহার কাহিনী। তখন আমি প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগে বাঙালীর সামাজিক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিগত ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা বই লিখিব স্থির করিয়াছিলাম ও গবেষণা করিতেছিলাম। এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক অধ্যাপক টয়েনবীর পত্রালাপ হইয়াছিল, তিনি আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গবেষণার ফলে বাঙালীর আগেকার অবস্থা সম্বন্ধে আমার মনে একটা চিত্র জাগিত। এই মেয়েটির রূপের সঙ্গে সেই চিত্রকে জড়িত করিয়া বইখানা আমি এই তরুণীকেই উৎসর্গ করিব স্থির করিলাম। সেই বই আর লেখা হয় নাই, কিন্তু আবেগের বশে উৎসর্গপত্রটা তখনই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। ইহাতে যেটা আশ্চর্যের বিষয় হইল তাহা এই, আমি ফরাসী ভাষা পড়িতে পারিলেও লিখিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করি নাই, তবু উৎসর্গপত্রটা বিনা-প্রয়াসে ফরাসী ভাষায় মন হইতে বাহির হইল। উহা আমি আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রকাশকদের বলিয়াছিলাম, যদি ফরাসী ভাষায় উৎসর্গপত্রটা বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষা না হয়, যেন তাঁহারা ছাপেন না, তবু ছাপিয়াছিলেন, তাই ধরিয়া লইতেছি আমার ফরাসী লেখা উৎরাইয়াছিল। উৎসর্গটা এইরূপ—

AMARBOI.COM

À
L'Inconnue
dont la figure belle mais d'une tristesse infinie
me rappelant la face douloureuse et dejà obsscurçie de notre passe'
suggera les pages qui suivent et les hante comme une ombre gracieuse.

ইহার বাংলা অনুবাদ করা কঠিন, করিলেও আড়ষ্ট হইবে, তাই ইংরাজীতে দিতেছি—
To the unknown Maiden, whose beautiful face, tinged as it was with an infinite sadness, recalled to me the sorrowful and already dim face of our past, and thereby suggested the pages which follow, and haunts them like a gracious shadow.

ল্যাটিনে একটা কথা আছে যে, প্রেম সব বাধা জয় করিতে পারে। ভাষার অজ্ঞতা হইতে যে-বাধা জন্মে তাহাকেও প্রেম জয় করিতে পারে, তাহা এই দেখিলাম।

এখন এই নির্বুদ্ধিতাও আরও পূর্ণরূপে দেখা দিবার কথা বলি। ১৯২৯ সনের জুন কি জুলাই মাসে বন্ধু বিভূতিবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'ওহে নীরদ, একটা গাড়ি পাওয়া গেছে। আমরা সবাই ঠিক করেছি, প্রথমে বনগাঁয়ে গিয়ে, তারপর নৌকো করে আমার গাঁ পেরিয়ে একটা ভাঙ্গা পুরোনো নীলকুঠিতে যাবো, সেখানে পিকনিক করে রাত্তিরে গাড়ি করে ফিরে আসব।' সেই গাড়িতে চাপিবেন সাতজনের নাম তিনি দিলেন। আমি রাজি হইলাম। এক শনিবার গাদাগাদি হইয়া সেই গাড়ি বোঝাই করিয়া বনগাঁয়ে ইছামতী তীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছিলাম। নৌকা ঠিক হইল, নীলকুঠিতেও গেলাম, খাওয়া-দাওয়াও হইল। পরে সেই কুঠি হইতেই মোটরকারে কলিকাতা ফিরিবার জন্য রওয়ানা হইলাম।

যশোর রোড ধরিয়া গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমি চালক ভদ্রলোকের পাশে কোনক্রমে বসিয়া আছি। দুই পাশেই স্থূল বাঙালী দেহের চাপ। যশোর রোডের দুইদিকেই প্রকাণ্ড বিদেশী 'রেনট্রি', শাখা বিস্তার করিয়া রাস্তাকে ঢাকিয়া দিয়াছে, দেখিতে খ্রীষ্টীয় ক্যাথিড্রালের 'নেইভে'র মত হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেখি বৃক্ষকাণ্ডের পাশে পাশে সবুজ আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে। কাছে যাইতেই বুঝিলাম, উহা ভীত শৃগালের চক্ষু হইতে গাড়ির 'হেডলাইট'-এর প্রতিফলিত দীপ্তি।

গাড়ি চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা খাতে নামিল। চিনিলাম, ওটা চব্বিশ-পরগনার যমুনা-নদীর শুক্‌না খাত। মনে পড়িল, উহার কাছেই শ্রীপুরের ভাঙ্গা রাজবাড়ি। আমি কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া গাড়ি হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলাম ও অল্পদূর হাঁটিয়া ভাঙ্গা রাজবাড়িতে ঢুকিলাম। সম্মুখের ঘরে ঢুকিতেই একটা বিশাল অজগর আমাকে জড়াইয়া ধরিল। মরিতেছি, তখন আমার রাজকন্যা ছুটিয়া আসিয়া আমার সেই অবস্থা দেখিল। আমি চীৎকার করিয়া জ্ঞান পাইলাম, বুঝিলাম গাড়িতে বসিয়াই স্বপ্ন দেখিয়াছি, গাড়ি বেলগাছিয়া রোড দিয়া চলিয়াছে।

মানিকতলার বাসার দরজায় আমাকে নামাইয়া দিয়া গাড়ি চলিয়া গেল। আমি কাপড়চোপড় না ছাড়িয়াই আমার মাদুর ও বালিশ লইয়া ছাতে গিয়া শুইলাম। তন্দ্রার মধ্যে মনে হইতে লাগিল আমার তরুণী-প্রণয়িনী পাশে বসিয়া আছে। আলো হইলে চোখ মেলিয়া দেখি, আকাশ ঊষর প্রান্তরের মত, দিনের আলো পাণ্ডুর। ইহার পর মাসকয়েকের মধ্যে তরুণীর রূপ আমার মন হইতে বিলীন হইয়া গেল।

কোনো ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতার প্রকাশ ইহার পরেও কি আরও চরমে পৌঁছিতে পারে? উহাও আবার দেখাইলাম অপরিণত বয়সে নয়, যখন বয়স বত্রিশ চলিতেছে তখন। তবু বলিব, এই নির্বুদ্ধিতার জন্যই আমার সেই চূড়ান্ত দুর্দশা ও অবমাননার দিনে আমি জীবনে আস্থা রাখিতে পারিয়াছিলাম।

আমার তরুণী পাঠিকারা— কেহ নাই এরূপ দুর্ভাগ্য কি আমার হইয়াছে— নিশ্চয়ই এই কাহিনী পড়িয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছেন। তবু আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিব— এই ধরনের মোহপ্রসূত পূজাও কি তাঁহারা কাম্য মনে করেন না? যদি বলেন 'না', তাহা হইলে আমি বুঝিব আজ বাঙালী তরুণীর হৃদয়ও পাষাণ হইয়া গিয়াছে। আমার একটা ভয় সত্যই আছে যে, বাঙালী বাহিরে বাড়িয়া অন্তরে শুকাইয়া যাইতেছে। অল্পবয়সের জৈব উত্তেজনা যে মানবজীবনের সরসতা নয়, তাহা বিলাতে বাস করিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরাও কি সেই বিপথ ধরিব?

নির্বুদ্ধিতার কৈফিয়ত : প্রথম, যুগধর্মগত

সে যাহাই হউক, কৈফিয়ত দিতেই হইবে। তরুণ-তরুণীরা না চাহিলেও প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্কারা কৈফিয়ত নিশ্চয়ই তলব করিবেন। এই তলব আসিবে শুধু অল্পবয়সের নির্বুদ্ধিতার জন্যই নয়, ষষ্ঠ-নবতিতম বৎসর বয়সে সেই কাঁচা নির্বুদ্ধিতার ঢাক পিটিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-নির্লজ্জতা দেখাইলাম তাহার জন্যও বটে।

তবে যে-কৈফিয়ত দিব তাহাতে নিজের অপরাধ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিব। আমি দোষ চাপাইব— যদি সত্য-সত্যই দোষই করিয়া থাকি— প্রথমে যুগধর্মের উপর, পরে মানবমনের উপর। হয়ত বাঙালী যুগধর্ম ও মানবধর্ম যেভাবে আমার আচরণে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে আতিশয্য সাধারণতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এ দুটির সহিত অসঙ্গত হয় নাই। প্রেমের ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতা দেখানোই মানবমনের বিশিষ্টতা, শুধু বিশ্লিষ্টতাই বলি কেন, গৌরব। সাহিত্য সম্বন্ধে ভর্তৃহরি লিখিয়াছিলেন,—

'সাহিত্যসঙ্গীতকলাবিহীনঃ সাক্ষাৎপশু পুচ্ছবিষাণহীনঃ।'

(যাহার সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলার জ্ঞান ও উপলব্ধি নাই, সে সাক্ষাৎ পশু, কেবল তাহার পুচ্ছ ও শৃঙ্গ নাই।)

প্রেম সম্বন্ধেও আমি বলিব যে-ব্যক্তির আমার অনুভূতির মত অনুভূতি নাই— তাহা কমই হউক কিংবা বেশিই হউক— সেও পুচ্ছ-শৃঙ্গবিহীন চতুষ্পদ।

আমার উপর যুগধর্মের প্রভাবের কথা বলিয়াই কৈফিয়ত আরম্ভ করি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙালী যুবক নারী সম্বন্ধে যে-মনোভাব পোষণ করিত, তাহার প্রেরণায় যে-আচরণ করিত এই দুইটিই বাঙালী জাতির নবজীবনের— যাহাকে ইংরেজীতে Bengali Renaissance বলা হয় তাহার নানাদিকের একটি মুখ্য দিক। উহাকে বাদ দিয়া কেহই আধুনিক বাঙালীর মানসিক জীবনের ইতিহাস লিখিতে পারে না। এই বিষয়ে আলোচনা, আমি আমার প্রথম বাংলা বই, 'বাঙালী জীবনে রমণী'তে করিয়াছি, পরে প্রকাশিত দুইটি বাংলা পুস্তকেও অল্পবিস্তর করিয়াছি, কিন্তু যে কথাটা মূলগত তাহা এখনও বলা হয় নাই। আমার নির্বুদ্ধিতার প্রসঙ্গে উহা বলা প্রয়োজন, তবে উহার প্রকাশ আমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, আমি বহুর মধ্যে একজন মাত্র ছিলাম।

এই মানসিক ধর্ম কখন দেখা দিল? কোনো মনোবৃত্তির উদ্ভব কখন হইল তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখ দেওয়া যায় না। উহার পূর্ণ বিকাশ, উন্মেষ হইতে ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু বাঙালী জীবনে ইউরোপীয় 'রোমান্টিক' প্রেমের পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাব একটি বিশিষ্ট বৎসরেই হইয়াছিল, সেই বৎসর ইংরেজী ১৮৬৫ সন। আশা করি বলিয়া দিতে হইবে না যে, উহা সাতাশ বৎসর বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার তারিখ।

এই উপন্যাস হইতে নরনারীর প্রেমের যে-অনুভূতি আসিল, উহা হিন্দুজীবনে আগে কখনও ছিল না। প্রাচীন হিন্দুরও অবশ্য প্রেম সম্বন্ধে একটা 'রোমান্টিক' ভাব ছিল। কিন্তু উহা প্রথমত ছিল শুধু দেহগত ও দ্বিতীয়ত, বিবাহের বাহিরে। বাঙালীর বৈষ্ণব কাব্যেও তাহাই। বাঙালীর নূতন 'রোমান্টিক' প্রেমের মধ্যে, প্রথমত দেহের সহিত মনকে যুক্ত দেখা গেল, তাহার পর উহাকে বিবাহের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত করা হইল। প্রেমের এই দুইটি ধর্মই ইউরোপের রোমান্টিক ধারা হইতে আসিয়াছিল, মুখ্যত ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া, তাহার অতিরিক্ত ইংরেজী ভাষায় অনূদিত ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে। এই সাহিত্য পড়ার ফলে বাঙালী জীবনের মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল একটি বাঙালী যুবতীর মুখে যে-গানটি দিয়াছিলেন, তাহা বাঙালীমাত্রেরই বিভ্রান্তিস্বীকার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—

'হৃদয় আমার গোপন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তো লো সই রইতে নারি।
ভরা গাঙ্গে ঝড় উঠেছে
থরথর কাঁপছে বারি,
হৃদয় আমার... ইত্যাদি
ঢেউ-এ ঢেউ-এ নৃত্য তুলে
ছাপি ওঠে কুলে কুলে
বাঁধি' এ মত্ত তুফান
আর কি ধরে রাখতে পারি ?
হৃদয় আমার...' ইত্যাদি

গানটি ছায়ানটে গাওয়া। আমাদের রাগ-রাগিণীর সহিত প্রথম পরিচয় আমার হয় ছায়ানট হারমোনিয়ামে বাজাইয়া— সুতরাং ছায়ানটের সুর শুনিলেই আমার বালকমনের উদ্বেল মনোভাব ফিরিয়া আসে।

ইহা ছাড়া বাঙালীর প্রেমপ্লাবিত মনের পরিচয় শাস্ত্র হইতেও দিতে পারি। গীতায় আছে—

'যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।'
(২য় অধ্যায়, ৪৬)

(অর্থ— সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ের যেমন প্রয়োজন, জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদের ততটুকু প্রয়োজন।)

আমি এই শ্লোকের নূতন ধরনের অন্বয় করিয়া বলিব, নূতন রোমান্টিক প্রেমে বাঙালী জীবন প্লাবিত হইবার পর, সেই জীবনে রসের যে ক্ষীণ ধারা পূর্বে ছিল তাহার আর কোনো প্রয়োজন রহিল না।

সেই নূতন জলধারা শুধু প্লাবন নয়, প্রচণ্ড জলপ্রপাত, হিমালয় হইতে গঙ্গাবতরণের মত। উহাতে ঐরাবতই ভাসিয়া গিয়াছিল, ক্ষুদ্রশক্তি বাঙালীর উপরে সাক্ষাৎভাবে সেই প্রপাত পড়িলে সে তৃণের মত বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাই এক শক্তিমান বাঙালী শিব হইয়া তাঁহার জটাজুটধারী মস্তকে উহাকে ধারণ করিলেন, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তাঁহার পরও আরও দুই শিবের প্রয়োজন হইল— তাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। এই তিনজন ব্যতীত বাঙালীর নূতন জীবনে নূতন প্রেমের প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের দৃশ্য দেখা যাইত না।

তবে বাঙালী-জীবনে প্রেম ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছিল— প্রথম দিকে শুধু প্রেমের পিপাসায়, উহাকে হরিণের মরীচিকার দিকে ছুটিয়া যাইবার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে ; দ্বিতীয় পর্যায়ে— প্রেমের পাত্র পাইলেও তাহার কাছ হইতে প্রতিদান পাইবার আশা বা ইচ্ছা না রাখিয়া। এই সুরও বাঙালীর জীবনে রোমান্টিক প্রেমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাজিয়াছিল।

'দুর্গেশনন্দিনী'-তেই আয়েষা লিখিল—

'রাজকুমার !... আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নহি।

আমার যাহা দিবার দিয়াছি। তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে, তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী।'

ইহার পর রবীন্দ্রনাথও একটি প্রেমিকার মুখে এই কথাগুলি দিলেন—

'তুমি যদি সুখ নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো!
যদি আর-কারে ভালবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো।'

এমন কি, দ্বিজেন্দ্রলালও একটি নায়িকার মুখে এই উক্তি দিলেন—

'সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই গো,
তুমি হও সব সুখের ভাগী!'

আমার যৌবনকাল পর্যন্তও এই সব ভাব ছিল। তাই আমিও যদি প্রতিদানের প্রত্যাশামাত্র না করিয়া ভালবাসিয়া থাকি তাহা বাঙালী মনের একটা অবস্থার বশে।

কিন্তু প্রেমের বশ হইয়া এই ভাবে আত্মবলিদানের ধারণা বাঙালীর মনে আসিল কেন? বাঙালী সমাজের রূপ যাহা ছিল তাহার জন্য। উহাতে যে-অবস্থায় 'রোমান্টিক' প্রেমের আবির্ভাব সম্ভব তাহার অস্তিত্বই ছিল না, অর্থাৎ পূর্বরাগ ঘটিবার উপায় ছিল না। প্রাচীন ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে উহা ছিল, কিন্তু প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগে উহা লোপ পাইয়াছিল।

ইংরেজ-শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে, এমন কি উহার পরও প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিই— বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রথম বিবাহ হইয়াছিল ১৮৪৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার নিজের এগারো বৎসর বয়সে পাঁচবছরের একটি শিশুর সঙ্গে। এইরূপ বিবাহে পূর্বরাগ দূরে থাকুক, প্রেমও জাগিতে পারে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ বিবাহ হইতেই পারিত না, তাহারা এইরূপ বিবাহকে প্রকৃতিবিরোধী মনে করিত, কারণ তাহারা জীবন্ত প্রাণবান মানুষ ছিল। ইহার দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। যাঁহাকে হিন্দু সতীর আদর্শ বলিয়া হিন্দুর সমগ্র ইতিহাসে প্রচার করা হইয়াছে, সেই সাবিত্রীর বিবাহ কি বয়সে হইয়াছিল?

মনে রাখিতে হইবে, পিতা তাঁহাকে সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দেন নাই। তাঁহাকে নিজের স্বামী নিজেকে বাছিয়া লইতে বলিয়াছিলেন, কেননা, 'কালেন চাপি সা যৌবনস্থা বভুব হ' অর্থাৎ কালধর্মে তিনি যৌবনে পৌঁছিলেন বলিয়া। তখন সাবিত্রীর দৈহিক রূপ কি প্রকার? মহাভারতের বর্ণনা এই—

'তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব।
প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যেতি দৃষ্টা সম্মেনিরে জনাঃ।'

—মহাভারত, বনপর্ব—২৯৩ অধ্যায়, ২৪-২৫ শ্লোক

(তাঁহাকে সুন্দরকটিযুক্তা, বিপুলনিতম্বা, সুবর্ণপ্রতিমার মত দেখিয়া, ইনি দেবকন্যা, তাঁহাকে পাইয়াছি মনে করিয়া লোকে সম্মান করিল।)

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারি,—দেবযানীর, শকুন্তলার, দময়ন্তীর, কিন্তু প্রয়োজন নাই। প্রাচীন ভারতে পূর্বরাগ সম্ভব ছিল এই কারণে যে, উহার পাত্রপাত্রী সহজেই মিলিত। তবে এই প্রথা লোপ পাইল কেন? লোপ যে পাইয়াছিল তাহার প্রমাণ দিই। কালিদাসের উমা শিবের ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য মদনকে সহায় করিয়া তাঁহার নিকটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেন। উমার দেহ ও সাজসজ্জা তখন কিরূপ ছিল ? কালিদাসের বর্ণনা—

(১) 'অবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং।' (দুইটি স্তনের জন্য আরও কিছু চিত্তাকর্ষক হইয়া)

(২) 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।' (ইহার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন।)

(৩) 'স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা
পুনঃপুনঃ কেসরপুষ্পকাঞ্চীম্।
মৌর্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্মুকস্য॥

(জানু পাতিয়া বসার জন্য যাঁহার নিতম্বে ঝুলানো বকুল ফুলের কাঞ্চী বার বার খসিয়া পড়িতেছিল, এবং যাঁহাকে মদনের ধনুর দ্বিতীয় গুণের মত দেখা যাইতেছিল।)

সকলেরই জানা যে, উমা রূপযৌবন ও সাজসজ্জা দিয়া শিবকে মুগ্ধ করিবার প্রয়াসকে লজ্জার কারণ মনে করিয়া তপস্বিনী হইলেন। ইহাতে শিবও ছদ্মবেশে তাঁহার কাছে গিয়া বলিলেন, 'তুমি যৌবনে নানা আভরণ ত্যাগ করিয়া কেন বার্ধক্যে যাহা শোভা পায় সেই বল্কল ধারণ করিয়াছ ?' ইহার পরও উমার ভরা যৌবনের যথেষ্ট প্রমাণ কালিদাসে আছে।

এখন দেখা যাক প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগের (১৭৫০ খ্রীঃ অঃ নাগাদ), অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের উমা কিরূপ ? নারদ বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া গিরিরাজের বাড়ির বাড়িতে আসিলেন। হিমালয়ে হইলেও, বাড়ি একেবারে বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ির মত— দুইটি মহল। নারদ দেখিলেন উমা বাহিরের বাড়িতে— উমার তখনও ভিতরের বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকিবার বয়স হয় নাই— সখীদের লইয়া পুতুল খেলা খেলিতেছেন। নারদ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রণাম করিলে ইহাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া উমা নারদকে খুব ভর্ৎসনা করিলেন, পরে ভিতরের বাড়িতে গিয়া মায়ের কোলে বসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—

'কোথা হৈতে বুড়া এক ডেকরা বামন।
প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তাঁরে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥'

এই হইল অষ্টমবর্ষে গৌরীদানের গল্প। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই গৌরীদান থাকিলে কালিদাস কুমারসম্ভবের ৭ম ও ৮ম সর্গ লিখিতে পারিতেন না। এই যে দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহা হইতে প্রাচীন ভারতের জীবনের সঙ্গে প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগে বাঙালী জীবনের পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যাইবে। একটির বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে অপরটির গ্রাম্যতার তুলনা করুন। কিন্তু এই ঘোর বিপর্যয় হইল কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, তবে নিশ্চয় করিয়া উত্তর দিবার উপায় নাই। আমি যাহা বলিব তাহা অনুমানমাত্র, উহা যুক্তিযুক্ত কিনা পাঠক-পাঠিকা বিবেচনা করিবেন।

পূর্বরাগে দৈহিক ও মানসিক দুই দিকেই যে-ধরনের আকর্ষণ জন্মে— যাহা প্রেম জন্মিবার অবশ্যম্ভাবী ফল—উহা হয় বিবাহ দ্বারা দৈহিক মিলন সমাজের কাছে গ্রাহ্য হইবার আগেই। অথচ উহার পথ পিচ্ছল, অত্যন্ত সংযমী না হইলে উহাতে সমাজ যাহাকে পদস্খলন বলে তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকে। কেন বলি।

নরনারীর প্রেমে দৈহিক এবং মানসিক আকর্ষণ দুইই থাকে, কিন্তু মানসিক আকর্ষণও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক বস্তুর উপলব্ধি হইতেই হয়—অবশ্য পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক এই তিনটির উপর নির্ভর করে, আর দুইটিকে বাদ দেওয়া চলে। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনটি সক্রিয় হয়, তবে একটি সক্রিয় হওয়া পূর্বরাগে, অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে, সমাজ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে না।

জ্ঞানেন্দ্রিয়গত উপলব্ধির মধ্যে, প্রেমে চক্ষুই প্রথম ও প্রধান। কেহ না দেখিয়া ভালবাসিতে পারে না, ইহার পরিচয় আমার ক্ষেত্রে দিয়াছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না। যে ভালবাসিয়াছে, তাহার কাছে প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে দেখিবার ইচ্ছা অদম্য হয়, না-দেখিতে পাইলে মনপ্রাণ অশান্ত হইয়া উঠে। এই মনোভাবের শক্তি রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে ললিতার উদ্বেগের কথা বলিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন,

> 'এ কয়দিন প্রত্যহ সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই প্রথম কথা ললিতার মনে এই জাগিয়াছে যে, আজ বিনয়বাবু আসিবেন না। অথচ সমস্ত দিনই তাহার মন এক মুহূর্তের জন্যও বিনয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণে ক্ষণে সে কেবলই মনে করিয়াছে বিনয় হয়তো আসিয়াছে, হয়তো সে উপরে না আসিয়া নীচের ঘরে পরেশবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এই জন্য দিনের মধ্যে কতবার সে অকারণে এ ঘরে ও ঘরে ঘুরিয়াছে তাহার ঠিক নাই, অবশেষে দিন যখন অবসান হয়, রাত্রে যখন বিছানায় শুইতে যায়, তখন নিজের মনখানা লইয়া কী সে করিবে ভাবিয়া পায় না। বুক ফাটিয়া কান্না আসে, সঙ্গে সঙ্গে রাগ হইতে থাকে, কাহার উপরে রাগ বুঝিয়া উঠাই শক্ত। রাগ বুঝি নিজের উপরেই। কেবলই মনে হয় আমি বাঁচিব কি করিয়া, কোনো দিকে তাকাইয়া সে পথ দেখিতে পায় না, এমন করিয়া কতদিন চলিবে!'

এক সকালে তাহার ধৈর্য আর বাধ মানিল না। তাহার মনে হইল বিনয় না আসাতেই তাহার প্রাণের ভিতরটা কেবলই অশান্ত হইয়া উঠিতেছে, একবার দেখা হইলেই এই অস্থিরতা কাটিয়া যাইবে। তাই সে একটা ছুতা করিয়া যাহাতে বিনয়ের সঙ্গে দেখা হয় তাহার ব্যবস্থা করিল। প্রেম জাগিবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু চোখে দেখিবার জন্যও যে আকুলতা হয়, তাহার বিবরণ ইহার চেয়ে স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যাইত না।

পূর্বরাগে দ্বিতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে যে-উপলব্ধি হয় তাহা সরল নয়, অর্থাৎ দেখা যত সহজে হয়, কথা বলা তত সহজে কিছুতেই হয় না। ইহাও রবীন্দ্রনাথ ললিতার আচরণেই দেখাইয়াছেন। সে তখন বিনয়ের উপস্থিতিতে সহজভাবে কথাবার্তা চালাইতে পারিত না। হারাণবাবুর তাহা অগোচর রহিল না। 'যে-ললিতা তাঁহার সম্বন্ধে আজকাল প্রখরভাবে প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছে সে আজ বিনয়ের কাছে এমন সঙ্কুচিত, ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন।'

এমন কি বালজাক্ পর্যন্ত এই সঙ্কোচের কথা লিখিয়াছেন— তাঁহাকে নরনারীর বিশিষ্ট সম্পর্ক সম্বন্ধে সংযমী বলা চলে না। তবু তাঁহার একটি গল্পে, অত্যন্ত প্রগল্‌ভা একটি তরুণী প্রেমের পাত্রের সহিত প্রথম সাক্ষাতে অত্যন্ত নীরব হইয়া রহিল। এই বিষয়ে বালজাক লিখিলেন,—

> 'The family was quite surprised at the silence in which she had shut herself up....Whether she had seriously fallen in love or not, there

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

was a change in her manners and she had lost all her affectations, and becoming simple and natural, she was bound to appear more attractive.' (আমার অনুবাদ)

হিন্দু দার্শনিক জ্ঞানেন্দ্রিয়গত উপলব্ধিকে তন্মাত্র বলিয়াছেন— এখন পঞ্চ তন্মাত্রের তৃতীয়টির কথা অর্থাৎ স্পর্শের কথা বলি। স্পর্শসুখেই প্রেমের চরম পরিণতি হয় ইহা বলার আবশ্যক রাখে না। তবে উহার বিস্তার সঙ্গীতে স্বরগ্রামের মত খাদ বা মৃদু হইতে চড়া বা তীব্র কতদূর হইতে পারে, তাহার নির্দিষ্ট সীমা নাই। এই সুখের একাট বর্ণনা ভবভূতির উত্তররামচরিতে পাই। চিত্রদর্শনের পর রাম বলিলেন,—

রাম। 'প্রিয়ে, চল কিছুক্ষণ এই জানালার কাছে বসি।'

সীতা। 'তাই হোক্। আমি ক্লান্ত হয়েছি, তাই ঘুম পেয়েছে।'

রাম। 'তবে তুমি দুই বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন হয়ে থাক।'

সীতা এইভাবে বসিলে রাম বলিলেন,—

'বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্প কিমু মদঃ.....' ইত্যাদি

শ্লোকটির পুরাপুরি অনুবাদ দিতেছি—

'এ সুখ না দুঃখ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এ কি মূর্ছা না নিদ্রা, বিষের আচ্ছন্নতা না আনন্দ? তোমার স্পর্শে স্পর্শে আমার ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তোমার স্পর্শ আমাকে একবার বিকলচৈতন্য করিয়া ভ্রান্ত আর একবার অবশ করিয়া ফেলে।'

(সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র ভবভূতির মধ্যেই ইউরোপীয় 'রোমান্টিক' প্রেমের মত প্রেমের দৃষ্টান্ত পাই।)

এই স্পর্শসুখ বিবাহিত জীবনে যেমন হইতে পারে, পূর্বরাগে তেমনই হইতে পারে, তবে বিবাহিত জীবনে ইহা হইতে কোনো বিপদের আশঙ্কা নাই, পূর্বরাগে আছে। ইহার পরিচয় একটি ফরাসী ভাষায় লিখিত উপন্যাস হইতে দিব, ১৮০৭ সনে রোমান্টিক যুগের প্রারম্ভে লিখিত।

যুবতী একটি যুবককে ভালবাসিয়াছে, যুবক কে তাহা সে জানে, কিন্তু যুবক যুবতীর বংশগত পরিচয় জানে না। যুবতীর মনে আশঙ্কা আছে, প্রণয়ী তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইলে বিবাহ না হইতে পারে। তবু সে নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। সে রোমবাসিনী, একদিন তাহারা ঠিক করিল দুইজনে নেপল্‌স্ যাইবে।

ইহা শুনিয়া তাহার এক পুরুষ বন্ধু বলিল, 'তুমি এটা কি স্থির করেছ! তিনি তোমার স্বামী নন; এমন কি তোমাকে বিবাহ করবেন প্রতিশ্রুতিও দেননি। এর পরে তিনি যদি তোমাকে ত্যাগ করে যান, তখন তোমার কি হবে?' যুবতী উত্তর করিল, 'তিনি যদি আমাকে আর না ভালবাসেন, তাহলে জীবনের সব অবস্থাতেই আমার যা হতো, এখনও তাই হবে— আমি সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে হতভাগিনী নারী হয়ে থাকবো।'

বন্ধু বলিল, 'কিন্তু তুমি যদি তাঁর সঙ্গে এভাবে জড়িয়ে না পড়ো তা হলে তোমার দুর্নাম হবে না।'

যুবতী উত্তর করিল, 'সেই সুনাম নিয়ে আমি কি করবো? এমন দিন যদি আসে যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর ভালবাসাই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হবে না, আমি যদি এটা কল্পনাও করতে পারি, তাহলে আমার ভালবাসার অবসানও তার আগেই হতে হবে। যদি আগে থেকেই হিসেব করা হয় পরে কি হবে, তাহলে ভালবাসা কি ? ভালবাসার মধ্যে যদি ধর্মের তুল্য কিছু থাকে তা এই— ভালবাসাতে অন্য স্বার্থের চিন্তা লোপ পায়, এমন ভক্তি থাকে যার বশে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ করা যায়।'

(মনে রাখিবেন, ইহা ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত।)

তাই যুবতী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া যুবকের সঙ্গে রোম হইতে নেপল্‌স্ যাত্রা করিল। পরে কি হইল তাহা বলিবার আগে একটা কথা বলিয়া রাখার প্রয়োজন আছে। পূর্বরাগ যে-দেশে বা যে-কালেই থাকুক, আচরণের বেলাতে উহার মধ্যে স্পর্শানুভূতি স্পর্শের চরম পরিণতিতে সময়ে সময়ে পৌঁছিয়া যাইত। কত বেশি বা কত কম বলা অসম্ভব। তবে ইহাও সত্য যে, ইউরোপীয় সমাজে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও উহা সঙ্গত বলিয়া মানা হইত না। কার্যক্ষেত্রে যাহাই হউক—বিচারবুদ্ধিতে পূর্বরাগের নৈতিক সীমা সম্বন্ধে ইউরোপে কোনো মতদ্বৈধ ছিল না। এখন এই দুইটি যুবক-যুবতীর ক্ষেত্রে কি ঘটিল তাহার কথা বলি।

তাহারা দিনকয়েক পরে নেপল্‌স্ হইতে কিছু দূরে সমুদ্র তীরের একটি শহরে পৌঁছিল। সেখানেই ইতালির বিখ্যাত 'কাম্পানিয়া' আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষে মলয়ানিল সম্বন্ধে যাহা বলা হইত, সেখানকার অনিল সম্বন্ধেও সেই ধারণাই ছিল। সন্ধ্যায় যুবক-যুবতী জনহীন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতেছিল। মাঝে মাঝে যুবক আবেগের বশে যুবতীকে বক্ষে টানিয়া লইতেছিল। কিন্তু প্রতিবারেই আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছিল। উহার কারণ, যে-যুবতী তাহার জীবনের চিরসঙ্গিনী হইবে সেই যুবতীর প্রতি শ্রদ্ধা।

AMARBOI.COM

যুবতী কিন্তু ইহাতে কোনো আশঙ্কার কারণ দেখিল না। বরঞ্চ সে মনে করিল, প্রণয়ী যদি তাহাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথাও বলে, তাহা হইলে সে এই অনুরোধকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু প্রণয়ী যে আত্মসংযম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে ইহা দেখিয়া সে স্বস্তি বোধ করিল। এই সংযমের জন্য প্রণয়ীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা বাড়িল।

কিন্তু ইহার পরও প্রণয়ী একবার প্রবল উচ্ছ্বাসের বশে নিজে নতজানু হইয়া যুবতীর জানু দুটি চুম্বন করিল। যুবতী নিজের উপর প্রণয়ীর অবাধ শক্তি স্বীকার করিয়া, এই শক্তির অপব্যবহার না করিবার জন্য এমন করুণদৃষ্টিতে চাহিল যে, আত্মরক্ষার এই ক্ষীণ প্রচেষ্টাও প্রণয়ীর মনে অন্য কোনো বাধার অপেক্ষা অনেক বেশি সম্ভ্রম জাগাইল। সে আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই উপন্যাসটির লেখিকা সে-যুগের ইউরোপে বিখ্যাত মহিলা, তাঁহার প্রতিষ্ঠা নেপোলিয়নও মানিয়া লইয়াছিলেন, অথচ ব্যভিচারিণী বলিয়া তিনি সর্ববিদিত ছিলেন। তবু তিনিও প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মধ্যে কোন আচরণ ধর্মসঙ্গত, কোন আচরণ ধর্মসঙ্গত নয়, তাহা ভুলেন নাই।

ইউরোপীয় পূর্বরাগে যে বিবাহের প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হয় তাহার অন্য প্রমাণও দিতেছি। জুলিয়েট বাতায়নে দাঁড়াইয়া নীচের উদ্যানে রোমিওকে উদ্দেশ্য করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিল,—

> 'My bounty is as boundless as the sea,
> My love as deep; the more I give to thee,
> The more I have, for both are infinite.'

মনে রাখিতে হইবে, এই সাক্ষাৎকার গোপনে হইতেছে, এবং জুলিয়েট চতুর্দশবর্ষের। তবু জুলিয়েট পরমুহূর্তেই বলিল,—

> 'If that thy bent of love is honourable,
> Thy purpose marriage, send me word tomorrow
> By one that I'll procure to come to thee,
> Where, and what time, thou will perform the rite
> And all my fortune at thy foot I'll lay,
> And follow thee my lord throughout the world.'

এটা ইউরোপীয় কুমারীর কথা।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে এই বাধা প্রবল ছিল না, ছিলই কিনা তাহাই সন্দেহ করা চলে। গান্ধর্ব বিবাহকে ইহার সমর্থক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গান্ধর্ব বিবাহ ক্ষত্রিয়ের ধর্মসঙ্গত বিবাহ বলিয়া ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু উহাকে সমাজবদ্ধ বিবাহ বলা চলে না, কারণ উহা ঘটিত সম্পূর্ণ প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর ইচ্ছা হইতে। শকুন্তলা এইরূপ বিবাহে (যদি কোন অনুষ্ঠান নাও হইয়া থাকে) অন্তঃসত্ত্বা হইলেন, তাহা না কণ্বমুনি, না অন্য কেহ ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিলেন। পঞ্চমাঙ্কের শেষে যখন দুষ্মন্ত ভরতের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ঋষিকন্যা উত্তর দিলেন, 'কে সেই ধর্মপত্নী পরিত্যাগীর নাম উচ্চারণ করিবে?'

AMARBOI.COM

এই মনোভাব স্থায়ী হয় নাই। এইরূপ বিবাহ বিদ্যারও হইয়াছিল, বিদ্যাও গর্ভবতী হইল। মাতা জানিতে পারিয়া বলিলেন,—

'না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে একাজ
করিলি খাইয়া মোরে ॥

রাজা মহারাজ তাঁরে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে ॥'

সুন্দরকেও মশানে পাঠানো হইল। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধারার সহিত পরবর্তী যুগের ধারার সম্পূর্ণ প্রভেদ দেখা গেল।

উহার উপরেও কথা আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের যুবতীরা দৈহিক মিলনকে বিবাহিত জীবনের বাধ্যবাধকতার ব্যাপার না করিয়া পূর্বরাগে স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ মনে করিয়া তাহাকেই বেশি সুখের বলিয়া মনে করিত। এই মনোভাব সম্বন্ধে একটি কবিতা, নারী কবির রচিত, বিখ্যাত—বিখ্যাত হইবার যোগ্যও বটে! এক বিবাহিতা যুবতী বলিতেছে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইয়ঃ কৌমারহরঃ, স এব হি বর—
স্তা এব চৈত্রক্ষপা—
স্তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ;
সা চৈবাস্মি, তথাপি তত্র
সুরত-ব্যাপার-লীলা বিধৌ,
রেবা রোধসি, বেতসী-তরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।'

একটু চাপা রাখিয়া বাংলা অনুবাদ দিতেছি।—'যে আমার কৌমার্য হরণ করিয়াছিল, সেই এখন বর। সেই চৈত্রের রাত্রি, সেই চৈত্রের রাত্রিই রহিয়াছে। উন্মীলিত মালতীর সুগন্ধে সৌরভিত, মন্থর কদম্বানিল, সেই অনিলই আছে, আমিও সেই আমি—তবু, শিলারুদ্ধ রেবানদীর তীরে বেতসী তরুতলে যে লীলাখেলা হইয়াছিল, তাহার জন্য চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে।'

এই কবিতাটিতে প্রাচীন ভারতের দেহবদ্ধ প্রেমের রোমান্টিক রূপ দেখা গিয়াছিল। উহারও মাধুর্য এমনই ছিল যে, তাহার প্রভাব বর্তমান যুগেও ভাবুক বাঙালী কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বাঙালীর জীবনে ইউরোপীয় রোমান্টিক প্রেমের প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত এই প্রাচীনা হিন্দু নারীকবি যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিল সেই ভাবকে বিবাহিত প্রেমের মধ্যেও আনিতে চাহিলেন। এই ভাবের বশেই তিনি ইন্দিরার মুখে এই উক্তি দিলেন—

'স্বামীর সঙ্গে যাইতেছি, সে একটা সুখ বটে ; কিন্তু সে বার যে যাইতেছিলাম, সে আর এক প্রকারের সুখ। যাহা কখনও পাই নাই, তাই পাইবার আশায় যাইতেছিলাম ; এখন, যাহা পাইয়াছিলাম তাই আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। একটা কবির কাব্য, অপরটা ধনীর ধন। ধনীর ধন কবির কাব্যের সমান কি ? যাহারা ধনোপার্জন করিয়া বুড়া হইয়াছে, কাব্য হারাইয়াছে, তাহারাও এই কথা বলে না। তাহারা বলে, ফুল যতক্ষণ গাছে ফুটে ততক্ষণই সুন্দর ; তুলিলে আর তেমন সুন্দর থাকে না। স্বপ্ন যেমন সুখের, স্বপ্নের সফলতা কি তত সুখের হয় ? কাব্যই সুখ। কেন না কাব্য আশা, ধন ভোগমাত্র।'

রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন হিন্দুর মনোভাবকে বর্জন করিতে পারেন নাই, তাই বৃদ্ধ বয়সে লিখিত চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যেও চিত্রাঙ্গদার মুখে, অন্যা চিত্রাঙ্গদার মুখে, এই উক্তি দিলেন—

'জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।
অস্ফুটমঞ্জরী কুঞ্জবনে,
সঙ্গীতশূন্য বিষণ্ণ মনে
সঙ্গীরিক্ত চিরদুঃখরাতি
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি।'

তিনি কি করিলেন রবীন্দ্রনাথের অবশ্য সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, সেজন্য 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের মর্মকথা—আসল তত্ত্ব তিনি যাহা মনে করেন, এইভাবে দিলেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলঙ্কৃত মহিমায়।'

আমার কিন্তু মনে হয় না যে, কোনো তরুণী মোহাবেশ ছাড়িয়া সহজ সত্যকে চাহিবে। মনকে চোখ ঠারার মত বিফল প্রয়াস মনুষ্যজীবনে আর কিছু নাই।

সে যাহাই হউক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, প্রাচীন হিন্দু ধারাতে পূর্বরাগের মধ্যে আচরণের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল, এবং তাহার জন্য সামাজিক নিয়মের বিরোধী ফল ঘটিতে পারিত। আমার মনে হয়, এইরূপ ফল যাহাতে না ঘটিতে পারে সেজন্যই বাল্যবিবাহকে অবশ্যকর্তব্য করিয়া পূর্বরাগকে নরনারীর সম্বন্ধ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। যখন এই ব্যাপার ঘটিল, তখন হিন্দুসমাজের জীবনীশক্তি কমিয়া গিয়াছিল, সুতরাং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিবার শক্তি বা ইচ্ছাও ছিল না।

কারণ যাহাই হউক, বাল্যবিবাহ যে প্রেমের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই অবস্থা যখন বর্তমান তখন বাঙালী মনের সহিত বাঙালী সমাজের সংঘাত দেখা দিল। এই সংঘাত হইতেই নরনারী সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট যুগধর্মও দেখা দিয়াছিল। উহা আচার-ব্যবহারে কি-ভাবে দেখা গেল তাহা বলিতে হইবে।

প্রথম কৈফিয়তের শেষ

বাঙালীর মনে রোমান্টিক প্রেমের অবতারণা ইংরেজী সাহিত্য পাঠের ও ইংরাজীতে শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছিল, অর্থাৎ হিন্দু কলেজে ডি-রোজিও ও ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের কাছে শিক্ষা পাইবার পর। ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যে সেকসপীয়ারই বাঙালীকে বেশি মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙালীর সেকসপীয়ার-ভক্তি বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র কমে নাই। ১৮৭৬ সনেও বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, 'উদ্যান মধ্যে রোমিও-জুলিয়েটের প্রণয় সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত ও পূর্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ।' গেটে শকুন্তলার সংবাদ অত্যন্ত জলো ইংরেজী অনুবাদ হইতে পাইয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া একটা কবিতা লিখিয়াছিলেন।

বাঙালীর মধ্যে ঘটিল ইহার উল্টা। জুলিয়েট, ডেসডিমোনা ও মিরাণ্ডার সহিত তুলনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন, 'তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিয়া মনে হয়।' ইহাও লিখিলেন, 'দেসদিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেসদিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না।' ইহা হইতে বোঝা যাইবে, প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ প্রণয়িনীর রূপ বাঙালীর মনে ইংরেজী শিক্ষার ফলে কতটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষে শকুন্তলা স্বাধীন প্রণয়ের এমনই দৃষ্টান্তভূতা হইয়াছিলেন যে, বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্রে এবং যশোধরকৃত তাহার ব্যাখ্যায় পর্যন্ত তাঁহার উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন লিখিলেন, 'শকুন্তলাদ্যাঃ স্ববুদ্ধ্যা ভর্তারং প্রাপ্য সংপ্রযুক্তা মোদন্তেস্ম।' যশোধর লিখিলেন, 'শকুন্তলা কালেন প্রাপ্তযৌবনা মৃগয়াপ্রসঙ্গাদাগতং দুষ্মন্তং রাজানম্ দৃষ্টা স্ববুদ্ধ্যা পাণিং গ্রাহিতবতী।' (ইহার অর্থ এত সহজ যে, অনুবাদের প্রয়োজন আছে মনে করিলাম না।) সুতরাং বুঝিতে হইবে ইংরেজী শিক্ষার ফলে প্রেমের সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা ধারণা দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিল।

এখন জিজ্ঞাস্য ইংরেজী পুস্তক-লব্ধ এই অনুভূতি বাঙালী কি-ভাবে নিজের জীবনে আনিতে চেষ্টা করিল। প্রথমেই কিন্তু উহাকে বিবাহিত জীবনে অথবা পূর্বরাগে প্রত্যক্ষভাবে আনা সম্ভব হইল না, শুধু পড়ার ভিতর দিয়া মানসিক উপভোগ (vicarious enjoyment) হইয়া রহিল—ইহা মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

পূর্বরাগ তো সে-সময়ে অসম্ভবই ছিল। বিবাহিত জীবনেও 'রোমান্টিক' প্রেম আনা দুরূহ ছিল, পত্নীর যখন এইরূপ প্রেমের পিপাসা জন্মিতে পারে, তখন বাল্যবিবাহের ফলে সে হয়ত তিন ছেলের মা, তাহার কাছে দাম্পত্য প্রেম প্রতিদিন খাওয়া ডালভাত, খুব রুচিকর হইলে মাছের ঝোলের মত। তাহার নিকট রোমিওগিরি করিতে গেলে হয়ত উত্তর শুনিতে হইত, 'যাও যাও আর আদিখ্যেতা করতে হবে না,' নয় সুর আরো চড়াইয়া উক্তি হইত—'কত ঢং দেখালি পদী, অম্বলে দিলি আদা!'

বিবাহিত জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে 'রোমান্টিক' প্রেম আনা সম্ভব হইল একমাত্র তখন (১) মেয়েদের বিবাহের বয়স যখন ৮ হইতে ১৩/১৪তে পৌঁছিল এবং (২) যখন তাহারা বাংলা উপন্যাস হইতে 'রোমান্টিক' প্রেমের ধারণা আয়ত্ত করিল। একটি উপন্যাস হইতেই বলা যায় উহার পিপাসা বাঙালী মেয়ের মনে আসিল—উহা অবশ্য বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'। এই উপন্যাসটির অভিঘাতের কথা শিবনাথ শাস্ত্রী এইভাবে লিখিয়াছেন,—

> 'আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। "দুর্গেশনন্দিনী" বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ আগে দেখে নাই।...এরূপ ভাষাতে চিত্রণশক্তি অগ্রে কেহ দেখে নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনত্ব, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।'

যে-নবীনতা অন্য সকল নবীনতাকে ছাপাইয়া বাঙালীকে আঘাত করিয়াছিল, উহা ভাবের, প্রেমের, নারীচরিত্রের নবীনতা। শিবনাথ শুধু 'প্রবৃত্তি' শব্দটা ব্যবহার করিয়া উহার পূর্ণ পরিচয় দিবার সঙ্কোচকে এড়াইলেন। সঙ্কোচটা আসিয়াছিল একটা নতুন নৈতিক শুচিবাই, puritanism, ইংরেজী শিক্ষারই ফলে বাঙালী-জীবনে দেখা দিল বলিয়া। ইহার জন্য নারী ও প্রেমের কথা সরলভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি লোপ পাইল।

আসল কথাটার সম্যক আলোচনা হইল না আর একটা কারণেও। নূতন প্রেমের আবির্ভাবে ভীত হইয়া একদল রক্ষণশীল বাঙালী বলিতে আরম্ভ করিল, বঙ্কিমচন্দ্র যুবকগণকে (মুখ ফুটিয়া কেহ বলিতে পারিল না, যুবতীগণকেও) 'উন্মার্গগামী' করিতেছেন। এই রক্ষণশীল 'পিউরিট্যান'দের অভিমত হইল যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের কথা না লিখিয়া সমাজসংস্কার সম্বন্ধে নীতি প্রচার করিলে ভাল কাজ করিতেন। এই ধরনের মত যাঁহারা পোষণ করিতেন, তাঁহাদের একজনকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একটি গল্পে অতিশয় রসিকতার সহিত বর্ণনা করিলেন।—

> 'রায়বাহাদুর বলিলেন, 'হ্যাঁ, বঙ্কিম একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার বটে। সে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেবেলাকার বন্ধু কি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে আইন পড়তুম। তাই বঙ্কিমকে বলছিলাম সেদিন..."ওহে, তোমার যে রকম নাম হয়েছে, তুমি এখন ঐ সব লভ আর লড়াই ছেড়ে খানকতক উপন্যাস লেখ যাতে দেশের উপকার হয়। ...এই যে বরপণ প্রথাটি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ক্রমে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ...আর একখানা লেখ যৌথ কারবার সম্বন্ধে...তা নয়, খালি লভ আর লড়াই ! ও সব লিখে দেশের কি উপকার হবে বল দেখি ?'

কিন্তু 'লভ আর লড়াই'-ই বাঙালী যুবকদের মনের একমাত্র উপজীব্য হইল। ইহার ফলেই আমি সামরিক বিষয়ের লেখক হইয়াছি এবং নারী সম্বন্ধেও নির্বুদ্ধিতা দেখাইয়াছি। 'লভ ও লড়াই'-এর গল্পই বাঙালীর কাছে আদর্শ উপন্যাস হইয়া দাঁড়াইল। জনপ্রিয় হইবার জন্য, তাহার উপর টাকাও করিবার জন্য অন্যেরা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে লভ ও লড়াই-এর উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপরেও এমন রং চড়াইল যে, লভ এবং লড়াই সাহিত্যে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে হাস্যকর মনে হইল। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় উপন্যাসে লভ ও লড়াইয়ের বাহুল্য দেখিয়া একটি ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখিলেন ১৮৯২ সনে, 'রীতিমতো উপন্যাস' নাম দিয়া। গল্পটির আরম্ভ একেবারে সেই জাতীয় উপন্যাসের, এইরূপ—

'"আল্লা হো আকবর" শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবন সেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্য সৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থ বৃক্ষের মত হিন্দু বীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার ভাঙিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরব-সূর্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইবে।

'হর-হর ব্যোম্-ব্যোম্। পাঠক বলিতে পারো, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জন মাত্র অনুচর লইয়া অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় এই শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল...বলিতে পারো সেদিনকার আর্য্যস্থানের সূর্যদেব সহস্ররক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ত তরবারিকে আশীর্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন। বলিতে পারো কি পাঠক।

'ইনিই সেই ললিত সিংহ কাঞ্চী সেনাপতি। ভারত ইতিহাসের ধ্রুব নক্ষত্র।'

এই 'প্যারডি' আরও চলিল। কিন্তু গল্পটি শেষ করিবার আগে রবীন্দ্রনাথও 'লভ ও লড়াই'-এর মোহে এমনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, আর ব্যঙ্গের সুর বজায় রাখিতে পারিলেন না, ললিত সিংহের তরুণী প্রণয়িনী কাঞ্চীর রাজকুমারী বিদ্যুন্মালার এই রূপবর্ণনা দিলেন—

'রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন। গাঁথিতে গাঁথিতে এক একবার অঙ্গুলি আপনার সুকুমার কার্যে শৈথিল্য করিতেছে, উদাসীন দৃষ্টি কোন এক অতি দূরবর্তী চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কি ভাবিতেছেন।'

'কিন্তু হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না' এইরূপ লিখিয়া ব্যঙ্গের সুর আবার টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ব্যঙ্গ আসিল না। রবীন্দ্রনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখিলেন, 'কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কোন্ মর্ত্য দেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কৌতূহল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ঐ দেখ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পূজার সুগন্ধি-ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশিয়া গেল এবং দুই ফোঁটা অশ্রুজল দুইটি সুকোমল কুসুম কোরকের মত অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।'

তখন রাজকুমারীর প্রণয়ী, তাঁহার দেবতা হইলেও, চরণচুম্বন করিতেও সাহস পাইত না, সেই চরণে প্রণমিত হইত। সে-যুগে লভ ও লড়াইয়ের গল্পের অন্তর্নিহিত মহিমা এমনই হইয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথেরও সাধ্য ছিল না, উহার শক্তিকে অবজ্ঞা করেন। এই গল্পটির শেষ অশ্রুজল না ফেলিয়া পড়া যায় না। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তি।

প্রথমে বাঙালী এই নারীপূজা মনে মনেই করিল, জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইল না। কিন্তু বাঙালী সমাজে মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া তেরো-চৌদ্দতে উঠিবার পর একটা রূপান্তরিত পূর্বরাগ সৃষ্টি করিয়া বাঙালী যুবক তরুণীপূজা জীবনেও আনিল। উহাকে 'উত্তররাগ' বলা চলে। উহা এইরূপ।

তখন বধূ কিশোরী হওয়ার জন্য দৈহিক মিলন শুধু দৈহিক প্রবৃত্তি হইতে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই হইতে পারিত। তবুও শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি যুবকেরা অনেকক্ষেত্রেই তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিত, ও পত্নীর ভালবাসা সক্রিয় না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম স্থগিত রাখিয়া, ইংরাজীতে যাহাকে 'কোর্টশিপ' বলে তাহা চালাইত। ইহার প্রমাণ হিসাবে দুইটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। আমার পিতার বিবাহ হয় ১৮৮৭ সনে, তখন আমার মাতার বয়স তেরো-চৌদ্দ। কিন্তু তাঁহার প্রথম সন্তান হয় পাঁচ বৎসর পরে। আমার শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর বিবাহ হয় ১৮৯৭ সনে তেরো বৎসর মত বয়সে। তাঁহারও প্রথম সন্তান হয় চারি বৎসর পরে। আমি ইহার আলোচনা প্রথম করিবার পর কোনো কোনো বৃদ্ধেরা আমাকে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। এখন সম্বন্ধ করিয়া বিবাহও অধিকবয়স্কা কন্যার সহিত হয়, সুতরাং তাহাদের বেলাতে এই 'উত্তররাগ' আনা সম্ভব নয়, হয়ত বা সুখের ব্যাপারও নয়। তবে কি বাঙালীর বিবাহিত জীবনে 'রোমান্টিক' প্রেমের আর স্থান নাই?

আমি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াই পরের কথা এবং যুগধর্মের কথা সাঙ্গ করিব, ইহার পর নিজের কথাই বলিব। তরুণ ও যুবাবয়সে আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষা কিরূপ ছিল?

আমি চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই বাংলাতে এবং ইংরেজীতে অগণিত উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করি, এগুলিকে সন্দেশ-রসগোল্লার মত গিলিতাম। আমাদের যুগে তরুণদের ইহাই vicarious love-making ছিল। তাহার পর অনেক বৎসর ধরিয়া ঘুমাইবার আগে ও ঘুম হইতে উঠিবার আগে নিজেকে উপন্যাসের নায়ক কল্পনা করিয়া মনে মনে প্রেমালাপ চালাইতাম। ইহারও পরে অবিবাহিত থাকার জন্য প্রেমাকাঙ্ক্ষা দৃষ্টি দ্বারাই তৃপ্ত করিতে হইতে। ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছি। একটা প্রাচীন কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমার মানসিক অবস্থার পরিচয় দিব। আমার হইল—

'উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী,
কিশোরী করেছি সার।
আমার কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হার॥'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা করি প্রেম সম্বন্ধে আমার নির্বুদ্ধিতার এই জবাবদিহি গ্রাহ্য হইবে।

কিন্তু আমার পরিচিত যুবকেরা কেহই আমার এ মানসিক অবস্থা ধরিতে পারে নাই। বাল্যশিক্ষা হইতে আত্মসংযম অভ্যাস করা সম্বন্ধে আগে যাহা বলিয়াছি, এক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া আমার চেহারা এবং দেহ এমনই শুষ্ক কাষ্ঠের মত ছিল যে, কেহই আমার মধ্যে কোনো রস আছে তাহা অনুমান করিতে পারিত না। আমার সময়কার যুবকদের ধারণা ছিল, প্রেমচর্চার জন্য হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন। আমার যুবাবয়সে বলবান হইবার জন্য অনেকেই স্যানাটোজেন খাইত। সেজন্য ১৯২৬/২৭ সনে স্যানাটোজেন কোম্পানি বাংলা পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন দিয়াছিল—

'স্যানাটোজেন খাইলে দেহ তরুণ ষাঁড়ের মত বলবান হয়।'

আমিও তখন স্যানাটোজেন খাইতাম কিন্তু আমার দেহ তরুণ ষাঁড়ের মত হওয়া দূরে থাকুক, কচি পাঁঠার মতও হয় নাই।

আমার মনের ভিতর যে ঝড় উঠিত তাহা বাত্যার ঝড়ের মত হইত না, 'ম্যাগ্নেটিক স্টর্ম'-এর মত হইত, তাহা কাহারও চক্ষে পড়িত না। আমার মনের কথা মনেই থাকিত, এই ভাবে—

'হেলাফেলা সারা বেলা এ কি খেলা আপন-সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে॥
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি, কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন সলিল রেখে যায় এই নয়নকোণে॥'

AMARBOI.COM

নির্বুদ্ধিতা—মানবমনের ধর্ম হইতে

প্রেমের ব্যাপারে বিগত শতাব্দীতে বাঙালীর মধ্যে যে যুগধর্ম দেখা দিয়াছিল, তাহা অবশ্য ইউরোপীয় রোমান্টিক প্রেমের বাঙালীকৃত রূপ। তবে প্রেম তো শুধু রোমান্টিক প্রেমই নয়, উহা প্রেমের একটা বিশিষ্ট রূপ— দেশ ও কালের মধ্যে আবদ্ধ। প্রেমের দেশকাল-নিরপেক্ষ একটা চিরন্তন রূপও আছে। উহা মানবমনের মানবতা হইতেও জন্মে। তাহার কথাই এখন বলিব, কারণ আমার নির্বুদ্ধিতা মূলত সেই মানববৃত্তি হইতেই আসিয়াছিল।

মানবমনের একটি প্রধান বৃত্তি সৌন্দর্যবোধ। নরনারীর প্রেম প্রথমে এই সৌন্দর্যবোধ হইতেই জন্মে। যদিও এই প্রেমেরও মূলে জৈবধর্ম আছে, যদিও নরনারীর প্রেমকে কখনও জৈবধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তবু গোড়াতে তরুণ-তরুণীর মনে প্রেমের উন্মেষের সময়ে জৈবধর্মের প্রভাব থাকিলেও উহা উহ্য থাকে, অর্থাৎ উহার জৈব প্রেরণা অজ্ঞাত থাকে।

ফুল বা ফল যেমন গাছের শিকড় মাটির নীচে না থাকিলে জন্মিতে পারে না, তেমনই ভালবাসার শিকড়ও জৈবধর্মে পোঁতা না থাকিলে ভালবাসা জন্মে না। কিন্তু ফুল বা ফল দেখিয়া কেহই যেমন মাটি বা শিকড় দেখিলাম মনে করে না, তেমনই প্রেমের অনুভূতির সময়ে, যে-জৈবধর্ম কাম উহাকে উপলব্ধি করে না।

আমি এই কথা বলিব না যে, তরুণ-তরুণীর মনে জৈবধর্ম বা কাম প্রেমের অনুভূতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়সেই জাগ্রত হয় না। কিন্তু দুইটা স্বতন্ত্র খাতে বহে। তরুণ-তরুণীর প্রেমের স্বপ্নের সহিত দৈহিক উত্তেজনার তাড়না কখনই একত্র হয় না। যখন দুইটাই একই বয়সে সক্রিয় হয়, তখনও দুইটা স্বতন্ত্র থাকে— একটা মনে ও আর একটা দেহে। অনেকে অবশ্য শুধু জৈবধর্মের তাড়নাই অনুভব করে, তাহাকেই তৃপ্ত করে, সাধারণত এই ধরনের ব্যক্তির প্রেমের অনুভূতি পরেও জন্মে না, তাহারা কাম তৃপ্ত করিয়া মনে করে উহা ভালবাসা। তবে যাহাদের মনে প্রেমের তীব্র অনুভূতিও আছে, তাহারাও জৈবধর্মের তাড়না অনুভব করিতে পারে, উহাকে তৃপ্ত হয়ত করে। তবু তাহাদের মনে প্রেমের নিজস্ব রূপ ও এই রূপের অনুভূতিতে ব্যাঘাত জন্মে না। আমি ইহাও জিজ্ঞাসা করিব— কয়জন ব্যক্তির সত্যকার প্রেম অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে? প্রেম আত্মবলিদান, এই জন্যই কথাটা বলিতেছি।

সে যাহাই হউক, এই তর্ক ছাড়িয়া আসল কথাটা, অর্থাৎ প্রেমের, সত্যকার প্রেমের অনুভূতির কথাই বলি। উহার সূত্রপাত হয় সৌন্দর্যবোধ হইতে। তবে সৌন্দর্যবোধ কি, সৌন্দর্যই বা কি? কেহ উহার বুদ্ধিগত সংজ্ঞা দিতে পারে না। আলো কি, বর্ণ কি, ধ্বনি কি, তাহা যেমন কোনো সংজ্ঞা হইতে উপলব্ধ হয় না, তেমনই সৌন্দর্যও সংজ্ঞা দিয়া বোঝানো যায় না, একমাত্র মানসিক উপলব্ধি দিয়া সৌন্দর্য চিনিতে পারা যায়।

তবে এই সবগুলি সংজ্ঞাতীত phenomenon এরই (বাংলা বা সংস্কৃত কোনো শব্দ নাই বলিয়া গ্রীক ভাষা হইতে লব্ধ ইংরেজী শব্দটা ব্যবহার করিলাম) গণিতবদ্ধ সূত্র (Formula) আছে। আমি মনে করি, প্রেমেরও সেইরূপ একটা গণিতসম্মত সূত্র দেওয়া যায়। বহু বৎসর আগে আমি দেশের একটি বড় পত্রিকায় 'Geometrical Basis of Love' এই নাম দিয়া একটা ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। উহা পড়িয়া কোনো কোনো অতি-চালাক বাঙালী ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছিল। তবে 'অতি-চালাকের গলায় দড়ি' বলিয়া যে একটা পুরাতন প্রবাদ বাংলাতে আছে, সেটা তাহাদের ক্ষেত্রেও খাটে। জীবনের বহু ক্ষেত্রেই বাঙালী অতি-চালাকির জন্য গলায় দড়ি নিজেরাই দিয়াছে ও দিতেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রেমের বেলাতেও তাহাই।

আমি মনে করি প্রেমের উদ্ভব হয় দেহের চাক্ষুষ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া। মানবদেহের জ্যামিতিক রূপ আছে, অর্থাৎ মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সমস্ত দেহের গঠনও, অন্য সমস্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুর রূপ যেভাবে গণিতে জ্যামিতিতে সংজ্ঞাবদ্ধ হয়, সেইভাবে সংজ্ঞার অধীন হইতে পারে।

এই পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত করিবার আগে, একটা উত্তরপক্ষ সম্বন্ধে অনুরোধ করিব, সেটাকে যেন হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হয়। পুরুষের দেহের জ্যামিতিক ধর্ম দেখিয়া নারীর মনে কি-ভাবে প্রেম জন্মিতে পারে সে-বিষয়ে আমি কিছুই বলিতে পারিব না, কারণ আমি পুরুষ, পুরুষের মনই জানি। তাই পুরুষ সম্বন্ধে এই কথাটা বলিব— নারীদেহের সৌন্দর্য দেখিবার পর সেই উপলব্ধি হইতে প্রেমের উদ্ভব কয়েকটা গণিতলব্ধ 'ইকুয়েশনের' (equation-এর) বশবর্তী। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে সরল ইকুয়েশনটা এইরূপ,—

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ etc.}$$

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই 'ইকুয়েশনের' দ্বারা যে জ্যামিতিক রূপ গণিতের অধীন করা যায় উহার বহু সূক্ষ্ম বিভিন্নতা আছে। সুতরাং নারীদেহের আকারে উহার প্রয়োগ করিলে উহা তন্বীর বেলাতেও খাটিতে পারে, আবার স্থূলাঙ্গিনীর বেলাতেও পারে। উহার বহু দৃষ্টান্ত চিত্রকলা হইতে দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা এই প্রবন্ধে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সুতরাং মূল কথাটাই বলি।

'ইকুয়েশন'টা জ্যামিতি ও গণিতে যাহাকে ellipse বলে তাহার সম্বন্ধে। এই সূত্র অনুযায়ী 'এলিপ্‌সের' প্রসার কমবেশি হইতে পারে, অর্থাৎ বেশ কিছু সঙ্কীর্ণতা হইতে বর্তুলতার দিকে যাইতে পারে। নারীদেহ elliptical বলিয়া সূত্রটা সেই দেহের উপরও প্রযোজ্য। তবে নারীর দেহে একটিমাত্র বিশুদ্ধ 'এলিপ্‌স্' থাকে না, বহু 'এলিপ্‌সের' সমন্বয়ে নারীদেহ গঠিত হয়। কিন্তু সবগুলি সুসমঞ্জস হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে সবগুলির সমন্বয়ে একটা পূর্ণ সম্বাদী রূপ গড়িয়া উঠে। বিসম্বাদিতা আসিলেই নারীদেহের সৌন্দর্যে দোষ দেখা দেয়।

নারীদেহের elliptical গঠনের মধ্যে এই যে বৈষম্য ও বিচিত্রতা রহিয়াছে, তাহার সহিত প্রেমের একটা জটিল এবং সূক্ষ্ম সম্পর্ক আছে। তবে উহার গণিতসম্মত ব্যাখ্যা দিবার আগে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ফলেই যাহা ঘটে তাহার কথা বলিয়া আমার বক্তব্যটাকে সহজ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম কথাই এই যে, নারীর রূপের মত রহস্যময় দৃশ্য বস্তু আর নাই। তাহাদের রূপের বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ নয়, ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়, অনুষ্ঠিতেও একটা মাত্র নিয়মের অধীন নয়। এক পুরুষের চোখে যে নারী রূপসী আর একজনের কাছে তাহার কোনও আকর্ষণ না থাকিতে পারে।

এই ব্যাপারটা সদাসর্বদাই দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, একদিন বিভূতিবাবু ও আমি কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটা খোলা মোটর গাড়িতে একটি বাঙালী যুবতী চলিয়া গেলেন। বিভূতিবাবু নিজের বুকে চাপড় মারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'মেরে দিয়ে গেল!' আমি প্রথমে বলিলাম, 'বিভূতিবাবু, আমি আপনার সঙ্গে থেকে অসভ্যতার জন্য রাস্তার ভদ্রলোকের হাতে মার খেতে প্রস্তুত নই।' কিন্তু এই যুবতীর চেহারাতে আমি কোনো সৌন্দর্যই দেখি নাই। এটি কলিকাতার মামুলী সুন্দরী, স্থূলাঙ্গিনী, তাহার গোলমুখ, ও দুধে-আলতার বর্ণ। বিভূতিবাবু বলিলেন, 'আমার, ভাই, চাঁদপানা মুখ ভাল লাগে, বেশ গোল মতন হবে।' এই বলিয়া হাত দিয়া একটি বৃত্ত রচনা করিলেন। ঠিক এই মুখই আমি দেখিতে পারিতাম না। আমার কাছে রূপসী বলিয়া স্বীকৃত হইতে হইলে বাঙালী মেয়ের মুখ প্রতিমার মুখের মত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, আর বর্ণও দুধে-আলতার না হইয়া তপ্তকাঞ্চন অথবা চম্পকদাম গৌরবর্ণ হওয়া উচিত ছিল। এই হাস্যকর ঘটনার মধ্যেও আমার তত্ত্ব কপচানোর কারণ পাওয়া যাইবে।

নারীদেহে বহু 'এলিপ্‌সে'র সমন্বয় হয় তাহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু সব মিলিয়াও যে elliptical রূপ হয় তাহা সকলের ক্ষেত্রে এক হয় না, যেমন যে-সব 'এলিপ্‌স'কে বিশুদ্ধ এলিপ্‌স্ বলা চলে সেগুলিও এক হয় না। ইহাতেই পুরুষের মনে প্রেম জন্মিবার উপায় হয় বা বাধা জন্মে। সকল পুরুষ একই আকৃতিতে আকৃষ্ট হয় না। কোন্ আকৃতিতে তাহার মন সজাগ বা সক্রিয় হইয়া উঠিবে তাহা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য রেডিওর দৃষ্টান্তে দিই। রেডিও নানা ওয়েভ-লেংথে 'ব্রডকাস্ট' করে, প্রত্যেকটি রেডিও-রিসিভারেই নানা ওয়েভ-লেংথ ধরিবার ব্যবস্থা থাকে। পুরুষের মন রেডিও-রিসিভারের মত নয়, উহা শুধু একটিমাত্র ওয়েভ-লেংথে বাঁধা। উপলব্ধির এই সীমাটাকে রূপ দেখিবার ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া বলিব, প্রত্যেক পুরুষের মনে এলিপ্‌সের একটি মাত্র আকার থাকে যাহার দ্বারা প্রেম জাগে। সুতরাং নারীর দেহের elliptical রূপের সহিত তাহার মনে যে-এলিপ্‌স্ জাগ্রত তাহার সামঞ্জস্য না হইলে সে প্রেম অনুভব করে না। আমার মনে এলিপ্‌সের যে রূপটি ছিল, তাহার সঙ্গে দুইটি তরুণীর দেহের এলিপ্‌সের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হওয়াতেই আমি প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলাম।

নারীদেহের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে যে জ্যামিতির একটা যোগ আছে, তাহার জ্ঞান আমার মনে ১৯২৪ সনের একটি ঘটনা হইতে আসে। আমরা তখন ডাফ স্ট্রীটের মোড়ের উল্টাদিকে মানিকতলা স্ট্রীটের একটা বাড়িতে থাকি। আমাদের বাড়ির সামনেই একটা ছোট গির্জা ছিল। তাহার কাছে পাদ্রীসাহেবের বাড়িও ছিল, আর একটা বড় মাঠ যাহাকে ইংরেজীতে 'লন্' বলে, তাহাও ছিল।

একদিন বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সেই 'লনে'র উপর লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া একটি তন্বী আমার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দৈহিক গঠনের শোভা দেখিয়া আমার মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমি Love at first sight-এ বিশ্বাস করি— সেই First sight সম্মুখের না হইয়া পশ্চাৎ দিকের হইলেও। সুতরাং দৃশ্যটা দেখিয়া ভালবাসায় আমার হৃদয় আপ্লুত হইয়া গেল।

কিন্তু একটু লক্ষ্য করিবার পরই দেখিলাম, এটি মোটেই জীবন্ত নারী নয়, একটা শাড়ি শুকাইবার জন্য দড়িতে ঝুলানো ছিল, উহাই বাতাসে ফুলিয়া তন্বীর মূর্তি হইয়াছিল। আমি বোকা বনিয়া গেলাম। নির্বুদ্ধিতার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? কিন্তু একটা গভীর সত্যেরও সন্ধান পাইলাম।

এই সত্যই কাশীর তরুণী ও কলিকাতার তরুণী সম্বন্ধে আমার মনের ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

প্রেমের সহিত জ্যামিতির যোগ সম্বন্ধে আমার ধারণাকে বাঙালী পণ্ডিতেরা মূর্খতা বলিয়া নিশ্চয়ই উড়াইয়া দিবেন, অন্যরাও হয়ত আত্মপ্রবঞ্চনা বলিবেন। সেজন্য উহার প্রমাণ হিসাবে একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারের উল্লেখ করিব। আশা করি বাঙালী শিক্ষিত সমাজ এমা, লেডী হ্যামিল্টনের নাম শুনিয়াছেন (যিনি পরে নেলসনের উপপত্নী হন)। তিনি সে-যুগের বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। তিনি কামারের কন্যা, শিশুকালেই পিতৃহীন হইয়া ভিখারিনী মাতার দ্বারা পালিত হন। লেখাপড়া তাঁহার কিছুই হয় নাই, আচরণও মার্জিত হয় নাই। তবু শুধু রূপের জন্যই চৌদ্দ বৎসর হইতেই তাঁহার উপপতি জুটিতে থাকে; পনের বৎসর বয়সে একটি সন্তান হয় বলিয়াও জনশ্রুতি আছে।

১৭৮১ সনে ষোল বৎসর বয়সে তিনি অভিজাতবংশীয় চার্লস গ্রেভিলের উপপত্নী হন, এবং গ্রেভিল-ই তাঁহার লেখাপড়া, নাচ ও গান শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সূত্রেই বিখ্যাত চিত্রকর রম্‌নীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রম্‌নী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বহু প্রতিকৃতি আঁকেন। এইগুলির জন্যই তিনি বিখ্যাত হন।

১৭৮৪ সনে তিনি যখন উনিশ বৎসর বয়স্কা তখন গ্রেভিলের uncle (পিতৃকুলে বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতৃকুলে বলিতে পারিলাম না) স্যর উইলিয়াম হ্যামিল্টন তাঁহাকে দেখেন। তিনি তখন নেপল্‌সের রাজার কাছে ইংলণ্ডের রাজদূত, একষট্টি বৎসর বয়স্ক, বিদ্বান্, কলাবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক, এবং অত্যন্ত বিদগ্ধ ব্যক্তি। তিনি এমাকে দেখিয়া এমনই মুগ্ধ হন যে, nephew-এর সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিয়া বিনিময়ে এমাকে উপপত্নী করিয়া লইয়া যান। কিন্তু নেপল্‌সের রাজপরিবারের সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় উপপত্নীর সম্মান রাখিবার জন্য তাঁহাকে বিবাহ করেন।

ইহার পর এমা নেপল্‌সের রাণী ক্যারোলাইনের সখী হইয়া যান। এই সূত্রে নেলসন তাঁহাকে দেখেন ও তাঁহাকে উপপত্নী করিয়া স্যর উইলিয়াম হ্যামিল্টনের বাড়িতেই বাস করেন। এমার মোহে নেলসন অনেক অপকর্ম করেন।

এইরূপ একটি নারীর এরূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠা কি করিয়া হইল? অবশ্য রূপের জন্য, তবে সেই রূপ কি ধরনের? তাঁহার এক বন্ধু লিখিয়া গিয়াছেন—

> 'The reason given by her husband for marrying her [was] that she only of her sex exhibited *the beautiful lines he found on his Etruscan vases.*'

এই ব্যাপারে প্রেমের অবলম্বন হইয়াছিল বিশিষ্ট এলিপ্‌স্‌যুক্ত একটি নারীদেহ। এই সকল Etruscan vase আমি দেখিয়াছি। নারীদেহে উহার তুল্য রেখা ছিল, কিন্তু যে-মন ছিল তাহা একটি অতি প্রগল্‌ভা, অতি ধূর্তা ও অশিক্ষিতা পরিচারিকাতুল্যা নারীর।

বিবাহ ও বিবাহে নির্বুদ্ধিতা

এ পর্যন্ত আমার অক্ষমতা ও বুদ্ধির অভাব যাহা দেখাইয়াছি উহার ফল একমাত্র আমাকেই ভোগ করিতে হইয়াছে, আর কাহাকেও আমার দুঃখ ও অপমানের ভাগী করিতে হয় নাই। বিবাহের পরও যখন দুইই রহিল, তখন পত্নীকেও এই সব সহ্য করিতে হইল, তিনি বলিলেন না যে, তোমার পাপের ফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। পত্নীর নিকট এই অপরাধ অমার্জনীয়। কিন্তু নিজের স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া শক্তিমান ও বুদ্ধিমান হওয়া আমার অসাধ্য ছিল। সকলে আমার নিন্দা করিবেন, তবু সত্যের খাতিরে কাহিনীটা বলিতে হইবে। তবে সারা বিবাহিত জীবনের কথা বলিব না, বলিব শুধু বিবাহের ব্যাপারে ও উহার অব্যবহিত পরে বিবাহিত জীবনে যে অক্ষমতা ও নির্বুদ্ধিতা দেখাইয়াছিলাম তাহার কথা। ইহা হইতেই আমার পরেকার জীবনের Leitmotif ধ্বনিত হইবে।

(ক) বিবাহের প্রস্তাব।

আমাদের যুগে বাঙালী যুবকের বিবাহ কুড়ি হইতে পঁচিশের মধ্যে হইয়া যাইত, কোনো সময়ে পাঠ্যাবস্থায়, কোন সময়ে সংসারে প্রবেশ করিবার পরেই। আমার দাদার বিবাহ হইয়াছিল ১৯২০ সনে, তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ, তিনি সবে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতিতে যোগ দিয়াছেন।

এই নিয়মে আমার বিবাহ হওয়া উচিত ছিল ১৯২২ সনে, কারণ আমি দাদার চেয়ে দুই বৎসরের ছোট ছিলাম। সাংসারিক দিক হইতেও বাধা ছিল না। আমি সরকারি চাকুরি করি। উহাতে বেতন আপাতত উচ্চ না হইলেও উন্নতির সুযোগ ছিল। আমরা কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পণও চাহিতাম না, সুতরাং কোনো সাধারণ অবস্থার বাঙালী পিতা তাঁহার শিক্ষিতা কন্যাকেও আমার সহিত বিবাহ দিতে আপত্তি করিতেন না।

কিন্তু আমি বিবাহ করিলাম না। শেষ পর্যন্ত বিবাহ হইল দশ বৎসর দেরি করিয়া ১৯৩২ সনে, আমার চৌত্রিশ বছর পার হইবার পর। ইহার প্রথম কারণ আর্থিক। আমি আপত্তি তুলিলাম যে, আমার বেতন সামান্য, দাদার তখনও পসার হয় নাই, তাঁহার সংসার চালানোতে সাহায্য করিতে হইতেছে। তাহার উপর বিবাহ করিয়া খরচ বাড়ানো সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। আমার সংকল্প ছিল, বিবাহ করিলে পত্নীকে বেশ 'স্টাইলে' রাখিব, তিনি শীতে ভাল ওভারকোট পরিবেন, রাত্রিতে পরিবেন বিলাতি 'নাইট-ড্রেস'—তাও লেস ইত্যাদিযুক্ত। কিন্তু এই সব সখের কথা চাপা রাখিয়া পিতাকে শুধু সাংসারিক ব্যবস্থার কথাই বলিলাম। তিনি আমার কথা মানিয়া বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন না।

তবে পেটেপেটে পত্নীকে আধুনিকা বিলাসিনী করা ছাড়া আরও দুরাশা ছিল—আমি সম্ভব হইলে 'লাভ ম্যারেজ' করিব। শুধু চেহারা ও আকৃতি দেখিলে কোনো তরুণীর আমার প্রতি প্রেমসঞ্চার হইবে না তাহা স্বীকার করিবার মত বুদ্ধি আমার ছিল, কিন্তু বেশবিন্যাসে পারিপাট্যের অভাব ছিল না। উহার পরিচয় দিয়াছি। তবে প্রণয়িনী করিবার জন্য তরুণীদের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার কোনও উপায় ছিল না। তখন আমাদের সমাজে 'লাভ ম্যারেজের' জন্য যাহারা অগতির গতি ছিল—অর্থাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠা শ্যালিকা অথবা ভগিনীর তরুণী ননদ, আমার তাহাও ছিল না।

তবু আশায় আশায় রহিয়া ক্রমাগতই নিরাশও হইলাম। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন একটি অরক্ষণীয়া মেয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

'কত শঙ্খচিলে করিল প্রণাম,
তবু ঘুচিল না আইবুড়ো নাম ॥'

আমিও 'লাভ ম্যারেজের' জন্য কত মানসিক শঙ্খচিলকে প্রণাম করিলাম, তবু সেই বিবাহ ঘটিল না। অবশেষে ১৯৩১ সনের নভেম্বর মাসে পিতার চরণে পড়িয়া আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে অনুরোধ করিলাম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'Natural bachelor' —আমার তাহা হইবার ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং আমার অক্ষমতা দুমুখো হইয়া দাঁড়াইল।

এতদিন বিবাহে সম্মত হই নাই বলিয়া পিতা বিশেষ দুঃখিত ছিলেন, বিশেষত আমার আগে আমার এক ছোট ভাইকে বিবাহ দিতে হইয়াছিল বলিয়া। তাহারও উপর আমার পরেই যে ভাই, সে ইউরোপে চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়াছে, তাহার ভাল ভাল সম্বন্ধ আসিতেছে। আমাকে ডিঙ্গাইয়া তাহাকেও যদি বিবাহ দিতে হইত তাহা হইলে পিতার দুঃখের সীমা থাকিত না। আমি তখন 'প্রবাসী' আপিসে চাকুরি করি, সুতরাং আর্থিক দিক হইতে কোনো বাধা ছিল না। তবে যে একশত টাকা বেতনে আগে বিবাহ করা সঙ্গত মনে করি নাই, এখন সেই আয়েই বিবাহ করিতে উদ্যত হইলাম।

আমি যখন পিতার নিকট বিবাহের কথা তুলিলাম, দাদা পাশে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'এ তো খুব ভাল কথা। আমরা মেয়ে দেখছি। ভাল পাত্রী পেলে নীরু নিজে গিয়ে দেখে পছন্দ করলেই সব হয়ে যাবে।' আমি বলিলাম, 'তা হবে না। আমি মেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে যাবো না।' তখন এটাই ছিল প্রচলিত বিবাহপদ্ধতি। দাদা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?' আমি উত্তর দিলাম, 'একটি মেয়ে যখন জানে বিবাহের জন্যই তাকে দেখানো হচ্ছে, তখন তার চেহারা দেখে আমি বলতে পারবো না যে, রূপসী নয় বলে আমি তাকে বিয়ে করবো না। অমন নিষ্ঠুর নরপশু এখনো আমি হইনি।' দাদা এই আপত্তি না মানিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, 'তাহলে তোমাদের কিছু করতে হবে না, আমি নিজে যা পারি করবো।'

পিতা বলিলেন, 'এ-সব তর্ক থাক। নীরু ঠিকই বলছে। আমিই দেখেশুনে সম্বন্ধ করব। যদি তাতে ভুল হয় আমিই দায়িত্ব নেব।' আমি বলিলাম, 'বাবা, তোমাকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছি এই জেনে যে তুমি যা সম্ভব তা আমার পক্ষে করবে। এর পর যদি বিয়ের রাত্রেও আমি বুঝি যে এই মেয়ের সঙ্গে ঘর করা আমার সম্ভব হবে না তাহলেও কি আমার মুখ থেকে একটা কথা বেরোবে তোমার বিরুদ্ধে?'

বাবা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উত্তর দিলেন, 'সে তো খুবই ভাল কথা। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তুমি আমাকে বল তুমি বিশেষ কিছু চাও কিনা, আমি তার চেষ্টা করবো।' আমি উত্তর দিলাম, 'আমার বিশেষ কিছু নেই। সুতরাং স্ত্রীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু চাইবার অধিকার আমার নেই। শুধু দেখো পরিবারটা ভদ্র হয়, কারণ বিবাহে সুখ চরিত্রের ওপরই নির্ভর করে।' বাবা ইহাতে আশ্বস্ত হইলেন—মনে করিলেন আমি কপট বিনয় করিতেছি, এবার ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Intellectual type?' আমি দুই আঙুল কপালে ঠুকিয়া ইংরেজীতেই বলিলাম, 'Enough for two!' আমার ভয় ছিল, সত্যকার Intellectual না হইয়া যদি মেকী Intellectual হয়, তাহা হইলে সেই পত্নীকে আমি ঠোকরাইয়া মারিব। তাই এই উত্তর দিয়াছিলাম।

ইহার পর দেড় মাস বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই শুনিলাম না, শুনিতে চাহিলামও না, বলিয়াছিলাম, 'আমি কোথায় বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে, কি রকম মেয়ে, কিছুই জানতে চাইনে। শুধু আমাকে জানাবে কবে, কোথায় বিয়ে হবে, আমি গিয়ে বিয়ে করে আসব।' বিবাহ সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বেশি নির্বুদ্ধিতা কেউ কল্পনা করিতে পারে? কিন্তু জানুয়ারি মাসে বৌদিদির অসংযমের জন্য কানে আসিল, একটা বিবাহের প্রস্তাব অগ্রসর হইতেছে। ভাবী শ্বশুর শিলং-এর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত, ধনী এবং রায়সাহেব উপাধিধারী।

কন্যা সম্বন্ধে বিবাহের অল্পদিন মাত্র আগে জানিলাম তিনি কলিকাতায় ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে পড়িয়াছিলেন, পরে সিটি কলেজ ও স্কটিশচার্চ কলেজে আই-এ পড়েন, ১৯৩১ সনে আই-এ পাশ করিয়াছেন। বয়স তখন জানি নাই, পরে জানিয়াছিলাম বাইশ বৎসর বয়স্কা।

বিবাহের অল্পদিন আগে, দুইদিকেই আশীর্বাদ হইয়া যাইবার পর জানিলাম কি-ভাবে বিবাহ স্থির হইয়াছিল। বিবাহের পর বধূর মুখে বাকি তামাসাটুকুও শুনিলাম।

আমার একটি বোন, সে জমিদারের পুত্রবধূ, কিশোরগঞ্জে থাকিত। সে সেই সময়ে কলিকাতায় ভবানীপুরে তাহার ভাসুরের বাড়িতে আসিয়াছিল। সে তাহার এক প্রতিবেশিনী ভদ্রমহিলাকে বলিল, 'আমার মেজদার জন্য একটি মেয়ে দেখে দিন না।' তিনি বলিলেন, 'আর বেশি দূরে কেন, ঐ তো আপনাদের বাড়ির পাশেই আমার দাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেন, তাঁর শ্বশুর শিলং থেকে এসেছেন, তাঁর একটি মেয়ে অবিবাহিতা, সেও সঙ্গে আছে, তার সঙ্গে বিয়ে দিন না।' বিবাহের কথা চলিতে লাগিল। ইহার সম্পূর্ণ কাহিনী পত্নী তাঁহার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে দিয়াছেন।

তাঁহার কাছে বিবাহের পর দুইটি বাধার কথা শুনিয়াছিলাম। একটি আমার দৈহিক শীর্ণতা হইতে, আর একটি আমার আয়ের অল্পতা হইতে। দৈহিক আপত্তিটা এইরূপ। একদিন 'প্রবাসী' আপিসে রামানন্দবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, কেদারবাবু আমাকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গেলে দুয়েকটা তুচ্ছ কথা বলিলেন, আমি লক্ষ্য করিলাম আর একটি ভদ্রলোক আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ সেদিন অত্যন্ত বাজে ছিল। কিছুই বুঝিতে পারি নাই কেন ইহা ঘটিল। বিবাহের পর পত্নী বলিলেন, সেই ভদ্রলোক আমার বড় ভায়রা-ভাই, তিনি গোপনে আমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, কেদারবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে। তিনি আমার চেহারা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহার সে অধিকার ছিল, কারণ তিনি অতি বলিষ্ঠ দীর্ঘাকৃতি ক্যাপ্টেন উপাধিধারী আই-এম-এস-এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। তবু ভাবী শ্বশুরমহাশয় ও শাশুড়ি-ঠাকুরাণী তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না, বিশেষত ভাবী শাশুড়ি-ঠাকুরাণী। তাঁহার শিক্ষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি ভাবী জামাতা লেখেন শুনিয়া আমার পূর্ব-প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়িয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া কন্যাকেও পড়িতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার মত বজায় রহিল।

অন্য আপত্তি হইয়াছিল শ্বশুরপরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষীদের তরফ হইতে। উহাদের একজন আসিয়া বলিলেন, 'রায়সাহেব, এত অল্প বেতনের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন কেন?' তখন উদারমনা সকল পিতারা যে উত্তর দিতেন আমার ভাবী শ্বশুরও সেই উত্তর দিলেন, 'আমি ছেলে দেখে বিয়ে দিচ্ছি, আমার মেয়ের অদৃষ্টে টাকা থাকলে হবে, নইলে সে মোটা ভাত-কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকবে। আমি এই শিক্ষা দিয়েছি।' আসলে তিনি তাঁর চারটি কন্যাকেই ধনীর মতই বড় করিয়াছিলেন।

www.amarboi.com

আমি তখন শৃগালের মত ঢাক পিটিতে পারিতাম। এম-এ পরীক্ষায় অসাফল্য দেখাইয়া নাক-কাটা হইবার পর সরকারি চাকুরি পাইয়াছিলাম তাই বলিতে পারিতাম—

'নাকুয়ার বদলে নরুণ পেলাম,
টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্।'

ইহার পর সরকারি চাকুরি ছাড়িয়া 'প্রবাসী'র চাকুরি পাইয়াছিলাম, তাই বলিতে পারিতাম—

'নরুণের দলে হাঁড়ি পেলাম
টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্।'

বিবাহ ঠিক হইবার পর বলিলাম,—

'হাঁড়ির বদলে কনে পেলাম,
টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্।'

(খ) বিবাহের উদ্যোগ।

ঠিক বিয়ে পাগলা বুড়ো না হইলেও বিবাহের উদ্যোগে আমার অলস স্বভাব অতিক্রম করিয়া উদ্যম দেখাইলাম। বিবাহ সম্বন্ধে চিন্তাও করিলাম যে-ভাবে আমার কোনো প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা বই লিখিবার জন্য এত গভীর চিন্তা করি নাই। অথচ সবটাই যে নির্বুদ্ধিতা ছিল তাহা উৎসাহের বশে বুঝি নাই, বিবাহের পরে ভাল করিয়াই বুঝিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথম উদ্যম দেখাইলাম বিবাহ করিয়া থাকিবার ব্যবস্থায়। আমি ১৯৩১ সনের প্রথম দিকেই দাদার সংসার হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বাগবাজারে ভবনাথ সেন স্ট্রীটে দুইটি ঘর লইয়াছিলাম। তাহাতে রান্নার ব্যবস্থা ও স্নানের ঘর ছিল না। স্নান বাহিরের কলে করিতাম, ভোজনং যত্রতত্র। সেই সময়ে দাদার বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা খাইতাম, সেই বাড়ি 'প্রবাসী' আপিসের কাছে ছিল এবং বাবা সেখানে ছিলেন বলিয়া।

এইভাবে বিবাহের পর থাকা যাইবে না, তাই অন্য বাড়ি খুঁজিতে লাগিলাম। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র না হইলেও বিবাহের পর আমি অবশ্যই স্বতন্ত্র হইতাম, কারণ আমি বিবাহিত হইয়া একান্নবর্তী পরিবারে থাকার অত্যন্ত বিরোধী ছিলাম। তবে আগেই স্বতন্ত্র হওয়াতে নববধূর ঘরভাঙানী বৌ বলিয়া অখ্যাতি হইল না।

বাড়ি সহজেই পাইলাম। শ্যামবাজারের মোড়ে যেখানে মোহনলাল স্ট্রীট আপার-সার্কুলার রোডে পড়িয়াছে সেই কোণে বিখ্যাত ধনী যতীন্দ্র (খাঁদা) পাল ভাড়া দিবার জন্য বিশাল একটা 'ব্লক-অফ-ফ্ল্যাটস্' তুলিতেছিলেন। তাহাতে কুড়িটা ফ্ল্যাট হইল। উহার সম্মুখ দিকে দক্ষিণ খোলা চারটি ঘর যুক্ত তিনতলার একটি ফ্ল্যাট আমি ১৫ই এপ্রিল হইতে ভাড়া লইলাম। ভাড়া হইল মাসে পঞ্চাশ টাকা, আমার মাহিনার ঠিক অর্ধেক। বাকি পঞ্চাশ টাকা দিয়া সংসার কি করিয়া চলিবে তাহার চিন্তা করিলাম না। সব কাজ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে, বিবাহের দিন কয়েক পরেই আমি সেই ফ্ল্যাটে আসিতে পারিব। নববধূকে লইয়া একটা ভাড়াবাড়ির অংশে অন্য ভাড়াটের সঙ্গে থাকিব ইহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। তাহাকে দিয়া নিত্যনৈমিত্তিক রান্না করাইব তাহাও সঙ্গত মনে করি নাই। তাই রান্না ও অন্য কাজের জন্য একটি চাকরও নিযুক্ত করিলাম। থাকিবার প্রশ্ন এইভাবেই সমাধান হইল। এই বাড়িতে নববধূকে আনিতে কোনো সঙ্কোচবোধ করিব না মনে হইল। আসলেও নববধূকে যখন অসমাপ্ত অবস্থায়ই দেখাইলাম, তখন তাঁহার খুবই পছন্দ হইল। আনিবার আগে এমন করিয়া সাজাইলাম যে, চাকর বলিল, 'সাজানো তো রাজবাড়ির মত হলো, এখন ঠিক রাখতে পারলেই হয়।' বাড়ির মেজে নকল মারবেলের, তাহার উপর বসিবার ঘরে হরিণের ছাল পাতিলাম। ডিভানে ভোঁদড়ের ছাল।

ইহার পর বিবাহের জন্য ও বিবাহের পরে পরিধান করিবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের আয়োজন আরম্ভ করিলাম। আমি তখন ঘোর গান্ধীভক্ত, বিদেশী, এমন কি দেশী মিলেরও ধুতি পরি না, সবই খদ্দরের পরি। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি সবই নূতন করাইলাম। তবে সেগুলি সাধারণ খদ্দরের। মনে হইল, এই মোটা খদ্দরের উপর তরুণী বধূ তাঁহার সুকুমার কপোল রাখিলে কর্কশতায় ব্যথা অনুভব করিবেন তাই অতি সূক্ষ্ম খদ্দরের পাঞ্জাবি করাইলাম। দাম পড়িয়া গেল প্রায় আমার মুগার পাঞ্জাবির সমান, যাহা বিবাহে যাইবার জন্য করাইয়াছিলাম। উহার বোতামগুলিও সুতার হইল, কারণ ঝিনুকের বোতামে গালে আঁচড় লাগিতে পারিত। ধুতি তাঁতিয়ানী হইল বিবাহের জন্য, তবে অন্য সময়ে পরিবার ধুতি খদ্দরই রাখিলাম।

প্রসাধন দ্রব্য সম্বন্ধে যে-সমস্যা জাগিল, তাহার সমাধান হইল না। আমি গান্ধীভক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইবার আগে ইয়ার্ডলির ল্যাভেণ্ডার ও ল্যাভেণ্ডার সাবান ব্যবহার করিতাম। প্রথমে উহার ফল দেখিয়া ভগিনী বলিয়াছিল, 'মেজদা, তুমি এত ফর্সা হলে কি করে ?' সে-সব আর ব্যবহার করিব না, তাই মাইসোর স্যান্ডাল সোপ ধরিলাম, গন্ধদ্রব্য ছাড়িয়া দিলাম।

ইহাতে বিবাহের রাত্রিতে সুগন্ধের ব্যাপারে বরবধূর মধ্যে একটা বিসম্বাদিতা দেখা দিয়াছিল। পত্নী ১৯২৮ সনে খদ্দর পরিয়া কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর অভ্যস্ত বস্ত্রাদি ও প্রসাধন দ্রব্য ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ব্যবহার করিতেন 4711-এর জিনিস। বাসররাত্রিতেও তাহাই মাখিয়া আসিয়াছিলেন। তাই যখন আমরা পাশাপাশি শুইলাম, তখন দুই দিকের গন্ধের মধ্যে একটা সংঘর্ষ দেখা দিল। তাঁহার অঙ্গ হইতে যে মৃদু সুগন্ধ আসিতেছিল তাহার তুলনায় আমার গায়ের মাইসোর স্যাণ্ডাল সোপের গন্ধ তীব্র ও অমার্জিত মনে হইল। একটু অপ্রতিভ বোধ করিলাম, দেশপ্রেমও সেই ভাবটা কাটাইতে পারিল না। জানি না, তাঁহার মনে কোনো বিরূপ ভাব জাগিয়াছিল কিনা।

কিন্তু কঠিনতর সমস্যা হইল দাঁত লইয়া। ১৯২৫ সন হইতেই আমার দাঁত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল (বহু অক্ষমতার আর একটা), দুইটা সম্মুখের দাঁত ছিল কৃত্রিম। তাহার পর, দুই দিকেই আরও দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল, মুখ খুলিলেই ফোক্‌লা দেখাইত। এই মুখ লইয়া বিবাহ সভায় যাওয়া হাস্যকর হইত। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' গৌরীর শিবকে ভর্ৎসনা পড়িয়াছিলাম, 'বুড়া গরু, লড়া দাঁত, ভাঙ্গা গাছ গাড়ু' লইয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছিল, পত্নীর মুখে হয়ত পরে আমাকেও শুনিতে হইত। আর প্রেমের সম্বোধন করিতে গেলে হয়ত এমন বিকৃত ধ্বনি বাহির হইত যে, তাহার দ্বারা হাস্য ভিন্ন অন্য কোনো রসের উদ্রেক হইত না।

অথচ এতগুলি নূতন দাঁত করানো ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। অগ্রিম বাড়িভাড়া দিতে ও কাপড়-চোপড় করাইতেই সব টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল। নগদ টাকা খরচ করিয়া দাঁত করানো অসম্ভব হইল।

কি করি ! উপায়ান্তর না দেখিয়া একসময়ের সহপাঠী সুধীর মজুমদারের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমেরিকা হইতে 'ডেন্টিস্ট' হইয়া কলিকাতায় প্র্যাক্‌টিস করিতেছিলেন। তিনি আমার অবস্থা বুঝিয়া ধারে দাঁত করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। মুক্তার পাটির মত সুন্দর নূতন দাঁত হইল। কিন্তু বিবাহের পরে অত্যন্ত অর্থাভাবে পড়ায় সেই ধার শোধ করিতে পারি নাই, পরেও করি নাই। তিনি কখনও আমাকে তাগাদা করেন নাই, দরিদ্র সহপাঠীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী এখনও জীবিত, তিনি সম্ভবত আমার অক্ষমতার কথা শুনিয়াছেন। তিনি চাহেন তো ঋণটা শোধ করিয়া দিতে পারি। তবে আসলটা আজকালকার হিসাবে এত সামান্য হইবে যে, গ্রহণযোগ্য হইবে না, আর ষাট বৎসরের পুঞ্জীভূত সুদ দিবার ক্ষমতা এখনও আমার নাই।

বস্তুগত উদ্যোগের কথা বলিলাম। এখন বিবাহের জন্য মানসিক উদ্যোগের বিবরণ দিই। ইহাতেও গভীর চিন্তা ও আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন হইল। পত্নীর সহিত মত বা রুচির পার্থক্য হইলে কি আমি ত্যাগ করিব তাহা প্রথমেই ঠিক করিলাম। আবার তাঁহাকে কি ত্যাগ করিতে বলিব, সে-বিষয়েও চিন্তা করিলাম। তবে বাবাকে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার সম্বন্ধ আমাদের মত পরিবারের মেয়ের সঙ্গে করেন। সুতরাং কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুতর মত বা রুচির পার্থক্য হইবে তাহা মনে করি নাই। পরে দেখিয়াছিলাম, সত্যই হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু একটা বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া গেল। তখন আমি ইউরোপীয় সঙ্গীতের এমনই অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলাম যে তাহা প্রায় ভক্তি ও পূজার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তি যে-ভাবে প্রতিদিনের পূজা-অর্চনা করে আমিও সেইভাবে গ্রামোফোনে ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনিতাম। বিবাহের সময় মনে করিতে হইল বাঙালীর কানে ইউরোপীয় সঙ্গীত প্রায় অসহ্য। আমার দাদা দেশীয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, সঙ্গীতবিদ্‌ও ছিলেন, তিনি আমার ইউরোপীয় সঙ্গীতের রেকর্ড বাড়িতে ঢুকিতেও দিতেন না। সুতরাং ভাবিতে হইল আমার পত্নীর রুচি ও শ্রুতি যদি এই হয়, তাহা হইলে আমি কি করিব। অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম, পত্নীর উপর এই ধরনের জবরদস্তি করিবার অধিকার আমার নাই। সুতরাং বীরের মত আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলাম। মনে কষ্ট হইলেও স্থির করিলাম, পত্নীর আপত্তি হইলে ইউরোপীয় সঙ্গীত ছাড়িয়া দিব। বিবাহ যে অর্ধেক আত্মবলিদান, এবং অর্ধেক আত্মতৃপ্তি তাহা ভুলিলাম না। এই বীরত্বের কি ফল হইল পরে বলিব।

বিবাহের ঘটাও একটি ক্ষোভের কারণ। বিবাহের দিন, ৮ই বৈশাখ, ২১শে মে, বাংলা ১৩৩৯ সন, ইংরেজী ১৯৩২ সন, যতই কাছে আসিতেছে আমি ততই সীতার অগ্নিপরীক্ষার মত পরীক্ষায় যাইতেছি মনে করিতেছি। মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য ব্রতপালন করিতেছি। উহাকে মধ্যযুগে ইউরোপীয় ভদ্রবংশের যুবকের 'নাইট' হইবার জন্য ব্রতপালনের মত বলা যাইতে পারিত। তাঁহারা গির্জায় গিয়া প্রার্থনা করিত, যেন স্যর গ্যালাহাডের মত বীর ও পবিত্রচেতা হয়। আমাকে তখন দেখিয়া কেহ মনেও করিতে পারিত না যে, বিবাহ করিতে যাইতেছি, বরঞ্চ আশঙ্কিত হইত এই মনে করিয়া যে, আমি সন্ন্যাসী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া না পড়ি। ঐহিক ব্যাপারে যে চপলতা দেখাইতেছিলাম, তাহার সহিত মানসিক অবস্থার কোনও সঙ্গতি ছিল না।

বিবাহের দিন, এক বৃহস্পতিবার, আসিয়া পড়িল। স্থির করিলাম, প্রচলিত হিন্দুপ্রথায় নির্জলা উপবাস করিব। আরম্ভ করিলাম। দুই একটি বন্ধুকে নিজে গিয়া বরযাত্রী হইবার জন্য অনুরোধ করা বাকি ছিল। বহুদূর হাঁটিয়া তাহা করিয়া আসিলাম। কোনও ক্লান্তিবোধ হইল না। দুপুরের পর ভাবিলাম, একটু ঘুমাই, শুকনো মুখ যাহাতে আরও শুকনো না দেখায়, ঘুমাইবার আগে বেশ খানিকটা "কোল্ড-ক্রীম"ও মাখিলাম। বিবাহের জন্য দৈহিক সৌষ্ঠব রাখা বাঞ্ছনীয় তাহা ভুলিতে পারি নাই।

ঘুম কি আসে? তবুও ঘণ্টাদুই বিশ্রাম করিয়া চারটা নাগাদ দাদার বাসার দিকে রওয়ানা হইলাম। সেখানেই বরযাত্রীরা সমবেত হইবেন ও সেখান হইতেই বিবাহের জন্য যাত্রা হইবে। সেখানে গিয়া বিবাহের বেশভূষা করিয়া যখন নামিয়া আসিলাম, তখন কয়েকজন বরযাত্রী আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিবাবু। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বাঃ, বেশ সেজেছ।' সাজটা এইরূপ—গায়ে মুগার পাঞ্জাবি, পরনে তাঁতিয়ানী ধুতি, পায়ে সাদা চামড়া-জরির কাজ করা নাগরা জুতা। পকেটে কালো সুতা দিয়া ঝোলানো রূপার ড্রেস-ওয়াচ্। যাইবার জন্য কয়েকটা মোটরকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি সুধীর মজুমদার দিয়াছিলেন। অশোকবাবু বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রকাণ্ড 'লিমুজিন'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ি ফুল দিয়া সাজাইয়া তাহাতে বসাইয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। তিনিই আমার বিবাহের নিমন্ত্রণ চিঠি নিজের ব্যয়ে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন, উহাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য যে তিনটি ব্লক ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা একমাত্র এক দেশীয় রাজকুমারীর বিবাহে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বিকাল হইয়া গিয়াছে তবু অশোকবাবু আসিলেন না দেখিয়া বাবা অধৈর্য হইয়া পড়িলেন। আমি ভয় পাইলাম, এই বুঝি জাঁক করিয়া বিবাহযাত্রা ফস্‌কাইয়া যায়। এ দিকে অশোকবাবু ঘনঘন 'প্রবাসী' আপিসে টেলিফোন করিয়া জানাইতেছেন যে, তিনি মিউনিপ্যাল মার্কেটে গাড়ি ফুল দিয়া সাজাইবার কাজ করাইতেছেন, তিনি না-আসা পর্যন্ত যেন আমরা রওয়ানা না হই। 'প্রবাসী' আপিস হইতে লোক আসিয়া জানাইতেছিল। কিন্তু বাবা সময় সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া ছিলেন। তিনি অধৈর্য হইয়া প্রায় জোর করিয়া আমাকে সুধীরবাবুর গাড়িতে চড়াইয়া দিলেন, অন্য গাড়ির সঙ্গে আমার গাড়ির ড্রাইভারও গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমি মুখ একেবারে বিরস করিয়া বসিয়া রহিলাম।

গাড়ি ওয়েলিংটন স্ট্রীটে ভীম নাগের দোকানের কাছে পৌঁছিয়াছে, তখন দেখিলাম ডান দিক দিয়া অশোকবাবুর সুসজ্জিত গাড়ি চলিয়া গেল। সঙ্গে আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল. ভাবিলাম তাহাকে বলি গাড়ি ঘুরাইয়া অশোকবাবুর পিছন পিছন যাইতে। কিন্তু কেমন সঙ্কোচ হইল, কিছুই বলিতে পারিলাম না। অমন সাজানো গাড়িতে যাইতে পারিলাম না এই ক্ষোভে মুখ আরও গোমড়া করিয়া রহিলাম। যখন বিবাহবাড়িতে নামিয়া বরের আসনে গিয়া বসিলাম, তখন আমার মুখের ভাব দেখিয়া কাহারও খুশি হইবার উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ পরে অশোকবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন, বাবাকে বলিলাম, অপেক্ষা না-করার জন্য যেন তাঁহার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়। বাবা বলিলেন, অবশ্যই চাহিবেন।

লগ্ন উপস্থিত হইলে ক্রমে ক্রমে সম্প্রদান, সপ্তপদী, শুভদৃষ্টি, যজ্ঞ—সবই হইল। কিন্তু আমার মুখ অপ্রসন্ন। তাহা দেখিয়া বরযাত্রীর মধ্যে যাঁহারা অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারা চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'বর ঘাবড়ে গিয়েছে!'

বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইলে বিবাহের সাজসজ্জা ছাড়িয়া অন্য কাপড় পরিয়া খাইতে বসিলাম। সঙ্গে ভৃত্য লইয়া গিয়াছিলাম, সে-ই সব সাজাইয়া দিয়াছিল। খাইয়া শরীরটা একটু চাঙ্গা হইল। আমার বড় ভায়রা-ভাই আমাকে বাসরঘরে পৌঁছাইয়া দিলেন।

সেই ঘরেই দানসামগ্রী সাজানো ছিল। দেখিয়া মনের অপ্রসন্নতা কাটিয়া গেল, বধূকে ক্ষণেকের জন্য দেখিয়া যত না আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে অনেক আনন্দ বোধ করিলাম দানসামগ্রী দেখিয়া। ইহার পূর্ববর্তী কথা বলা প্রয়োজন। আশীর্বাদের দিন ভাবী শ্বশুরমহাশয় বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদের দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে কি না। বাবা উত্তর দিয়াছিলেন, 'কিছুই না। আপনি আপনার কন্যাকে যথাসাধ্য দেবেন জানি, এর বেশি আমরা কিছুই চাই না।' তবু শ্বশুরমহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, যথাসাধ্য দানসামগ্রী ছাড়া তাঁহার অন্য কন্যার বেলাতে যেমন তেমনই আমার ভাবী পত্নীর জন্যও পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া আছে। তাহা ছাড়া তিনি অপুত্রক, সেজন্য তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি সমানভাবে চার মেয়ে পাইবে। দানসামগ্রী সম্বন্ধে কিছু বলিলেন না।

কিন্তু বাসরঘরে দেখিলাম দানসামগ্রী অপর্যাপ্ত ও অতি সুন্দর। ভাল খাট বিছানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি তো আছেই, তা ছাড়া পড়িবার জন্য দেরাজযুক্ত টেবিল, বই রাখিবার রিভলভিং শেল্‌ফ চেয়ার ইত্যাদি আছে, বধূর জন্য ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব, চেয়ার ইত্যাদি আছে। এই সব আসবাব ছাড়া অনেক তৈজসপত্র—কিছু রূপার। চায়ের জন্য ভাল পোর্সেলেনের সেট, ইত্যাদি। তখন গহনার কথা শুনি নাই। দেখিও নাই, পরে দেখিলাম তিনি একশো ভরি সোনার গহনা লইয়া আসিয়াছেন, কিছু কিছু জড়োয়া, বাকি বিশুদ্ধ সোনার। কোনোদিকে অসন্তুষ্ট হইবার উপায় নাই। আমি নিজেও সোনার রিস্টওয়াচ, সোনার বোতাম, গরদের পাঞ্জাবি, সিল্কের শার্ট, সিল্কের মোজা, সিল্কের গেঞ্জি, ও পেটেন্ট চামড়ার ক্র্যারেট-রং-এর সেলিম পাইয়াছিলাম। খুবই প্রসন্নমনে বাসরঘরে বসিয়া রহিলাম।

বাসরঘরের অন্য শোভাও যথেষ্ট ছিল। ধবধবে সাদা চাদর পাতা বড় বিছানা, দুই জোড়া ঝালরযুক্ত বালিশ, পাশের বেডসাইড টেবিলে একটি রেশমী সুতার কাজ করা সাদা 'বেডস্প্রেড' ভাঁজ করা। কৃচ্ছ্রসাধন করার জন্য এইরূপ বিছানাতে আমি আগে কখনও শুই নাই।

তাহা ছাড়া ঘরে থালাতে থালাতে স্তূপাকৃতি বেল ও যুঁই-এর গোড়ে মালা, রজনীগন্ধার গুচ্ছ। বাহির হইতে কুইসকওয়ালিস ইন্ডিকা লতা হইতে ফুলের মৃদু সুগন্ধ আসিতেছিল। শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার কাছে। খোলা জানালা দিয়া ঘর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইতেছিল।

(গ) বাসররাতি।

আমি কবি করুণানিধানের মত বলিতে পারিব না, 'মনে পড়ে, সখি! আমাদের সেই বিবাহরাতি? স্পন্দিত বুকে হইনু দুজনে জীবনে সাথী।' কারণ বিবাহরাত্রিতে আমার আচরণ একেবারে হাস্যকর হইয়াছিল।

খাটে পা ঝুলাইয়া বসিয়া— খাটো পা মেঝেতে লাগে না— ভাবিতেছিলাম, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মেয়ের সঙ্গে কি করিয়া আলাপ করিব। কিছুক্ষণ পরে আমার বড় শ্যালিকা বোনকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন ও তাহাকে আগাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। নববধূ লজ্জিতস্মিত মুখে ধীরে ধীরে আসিয়া আমার পাশে বসিলেন। আমি হাবার মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম, কোনও রোমান্টিক ভাব দেখাইতে পারিলাম না, উঠিয়া অভ্যর্থনাও করিলাম না।

মনে নাই, কেহ কোনো কথা না বলিয়া বা কি করিয়া বিছানায় পাশাপাশি শুইলাম। বিছানাটি কালিদাস বর্ণিত হরগৌরীর বিছানার মত—

'তত্র হংসধবলোত্তরচ্ছদং
জাহ্নবীপুলিন চারুদর্শনম্...'

(বিছানাতে হংসধবল, জাহ্নবীপুলিনের মত সুন্দর দেখিতে উত্তরচ্ছদ, চাদর, পাতা।)

কিন্তু উহাতে আমার শিবের মত শোয়া হইল না। শিবের শুইবার বর্ণনা এইরূপ—

'অধ্যশেত শয়নং প্রিয়াসখঃ
শারদাভ্রমিব রোহিনীপতিঃ।'

(প্রিয়ার সখা হইয়া, শরৎকালের মেঘের উপর চন্দ্রের মত দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া শিব শুইলেন।) আমার বেলাতে তফাৎ হইল।

আমি তখনও 'প্রিয়াসখঃ' হই নাই, বিছানা শরৎকালের মেঘের মত হইলেও আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চন্দ্রের মত নই। তবে বিছানায় রাস্তার কালো দেশী কুকুর উঠিয়াছে এই দৃশ্যেরও সৃষ্টি করি নাই।

আমরা বিবস্ত্র হইবার কথা চিন্তা করা দূরে থাকুক, বিলাতি বা দেশী রাত্রিবাসও পরি নাই, বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার দিনের বেলার পোশাকি কাপড়চোপড় দুজনেই গায়ে রাখিয়াছিলাম। সুতরাং আমার হংসধবল সূক্ষ্ম খদ্দর বিছানার চাদরের সঙ্গে সমঞ্জস হইয়াছিল।

তখনও দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ নাই। কিছুক্ষণ পরে তিনিই আরম্ভ করিলেন। আমার সাহস হইল না। আমার একটি বাহু তুলিয়া ধরিয়া একটু হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'তুমি বড় রোগা, আমি তোমার খুব যত্ন করবো।' তখন আমার কৃতজ্ঞতায় গলিয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই বলা হইল না, কারণ আমার মাথায় তখনও ইউরোপীয় সঙ্গীত ত্যাগ করিবার প্রশ্নটা ঘুরিতেছে। বেপরোয়া হইয়া ভাবিলাম, সত্যই আত্মত্যাগের কষ্ট ভোগ করিতে হইবে কিনা এই প্রশ্নের এস্পার-ওস্পার বাসরঘরেই করিয়া লই, তারপর বিবাহিত জীবনে যাহা হইবার হইবে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব।

ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোনো ইউরোপীয় মিউজিক শুনেছ?' তিনি মাথা নাড়িয়া জানাইলেন যে, 'না।' আমি একটু দমিয়া গেলাম, তবু আর একটা প্রশ্ন করিলাম, 'তুমি বেটোফেন বলে কারো নাম শুনেছ?' এবার তিনি মাথা নাড়িয়া জানাইলেন যে, 'হ্যাঁ।' ইহাতেই আমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চুয়াড়ের মত বলিলাম, 'তাঁর নামটা বানান করতে পারো?' তখন অন্য নারী হইলে নিশ্চয় গালে চড় মারিত, কিন্তু আই-এ পাশ হইলেও তিনি বিনা আপত্তিতে বলিলেন, 'বি-ই-ই-টি-এইচ-ও-ভি-ই-এন।' আমি অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলাম।

ইহার পর অন্য কথা পাড়িয়া কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। জাগিয়া দেখি, তিনি পূর্বেই পলায়ন করিয়াছেন, 'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন' এই অভিযোগ না করিয়া। আমি হাতমুখ ধুইয়া বাহিরে গেলে বড় ভায়রা-ভাই হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল?' আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তাহাতে তিনি কি ধরিয়া লইলেন বলিতে পারি না।

বিবাহের পরে অক্ষমতা

সেই অক্ষমতার পরিচয় দিবার আগে, ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আশ্বাস পাইয়াছিলাম তাহার ফল কি হইল তাহার কথা বলিব। আশ্চর্যের ব্যাপার, নিজের বাড়িতে আসিয়া পত্নী যখন গ্রামোফোনে বিলাতি বাজনা শুনিলেন, তাঁহার তখনই ভাল লাগিল। এতখানি ভরসা রাখি নাই। কিন্তু যাহা ভাল লাগিল সেটাও কম আশ্চর্যের কথা নয়—একেবারে অতি উচ্চ অঙ্গের ক্ল্যাসিকাল ইউরোপীয় সঙ্গীত। দুইটিই বিশেষ করিয়া তাঁহার মনে সাড়া দিয়াছিল, উহার একটি মোৎসার্টের ৩৯নং সিম্‌ফনির প্রথম 'মুভমেন্ট' অপেক্ষাকৃত দ্রুত চালে বাজানো ও আর একটি বেটোফেনের দ্বিতীয় সিমফনির দ্বিতীয় 'মুভমেন্ট' বেশ মন্থরভাবে বাজানো। একটি যেন প্রভাত, অপরটি যেন সন্ধ্যা। আমি যখন এই গল্প অন্যকে বলিয়াছি, তখন দু-চার জন অতি-চালাক বাঙালী একটা কথা বলিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্নীর রুচির সূক্ষ্মতা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, বলিয়াছেন, স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি ভান করিয়াছিলেন। এই হীন অবিশ্বাসের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করি নাই। তবে পত্নীর চরিত্রের পরিচয় দিবার জন্য সহৃদয় পাঠকদের, বিশেষ করিয়া সহৃদয়া পাঠিকাদের বলিব, স্বামীই হউন, কিম্বা গুরুজনই হউন, আমার স্ত্রী কাহারো সহিত কপটতা করিতে একেবারে অক্ষম ছিলেন। ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধেই বলি, তিনি 'লোহেনগ্রিনের' গান ও স্মেতানার কোয়ার্টেট্ একেবারেই অসহনীয় মনে করিলেন। তাই তাঁহার রুচি ও চরিত্র সম্বন্ধে বলিব—Honi soit qui mal y pense.

যে দুটি সঙ্গীত রচনার কথা বলিলাম, সেগুলি আমাদের বিবাহের প্রথম দিনগুলির সহিত স্মৃতিতে জড়াইয়া রহিয়াছে। শুনিলে আমরা সে সময়ের মনোভাব ফিরিয়া পাই। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমরা অক্স্ফোর্ডে, আমার বয়স আশি, তাঁহার আটষট্টি, আমি বসিবার ঘরে, তিনি পাশের রান্নাঘরে ; হঠাৎ রেডিও হইতে মোৎসার্টের সেই সিমফনির সুর আসিল। তিনি আমার কাছে আসিয়া আমার দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া বলিলেন, 'বাড়ির কথা মনে পড়ছে !'

অথচ বিবাহের পরে কি বাড়িতেই না তাঁহাকে আনিয়াছিলাম ; দুই বৎসর অভাব-অনাটন,ও তাহার পরে তিন বৎসর প্রায় অন্নাভাব অনুভব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গীতের শক্তির জন্য তাঁহার স্মৃতিতে সেই অপরিসীম দুঃখও চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, শুধু সুখের অনুভূতিই ছিল। একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় ভাগ 'রিভিউ' করিবার সময়ে ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন— 'What a tribute to Mozart!'

এখন দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রারম্ভের কথা বলি। তাহা হইতেই আমার অক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ১৯৩২ সনের ৩০এপ্রিল তিনি নূতন বাড়িতে আসিলেন। পরদিন হইতে নূতন মাসে সংসারযাত্রা আরম্ভ হইবে। চাকর বাজার খরচের জন্য আর আমার কাছে না আসিয়া নবাগতা গৃহকর্ত্রীর কাছেই যাইবে। কিন্তু আমি এপ্রিল মাসেই বাড়িভাড়া অগ্রিম দিবার জন্য ও কাপড়চোপড় কিনিবার জন্য মে মাসের মাহিনা অগ্রিম লইয়াছিলাম। সে মাসের মাহিনা আর পাইব না, আশীবাদী টাকাও যাহা কিছু পাইয়াছিলাম তাহা বিবাহের পরে নানাভাবে খরচ করিয়া ফেলিয়াছি, আমার হাতে একটিও পয়সা নাই।

বেগতিক দেখিয়া চাকর বাজারে যাইবার আগেই চম্পট দিতে লাগিলাম। আপিসের সময় হইলে ফিরিয়া দেখি, সব প্রস্তুত, খাইয়া-দাইয়া আপিস করিতে লাগিলাম। তিনি বলেন না কি করিয়া বাজার চলিতেছে, আমিও জিজ্ঞাসা করি না, নির্লজ্জের মত খাইতে লাগিলাম। বিবাহের পরই এই আচরণের পর স্বামীর অক্ষমতার আর কি পরিচয় হইতে পারে ? অন্য কেহ হইলে তো কোনো ছুতা করিয়া বাপের বাড়ি গিয়া আমাকে কিছুদিনের মত probation-এ রাখিত।

কিন্তু ইহার পরও আরও লজ্জাকর অক্ষমতা দেখাইলাম। একজন কাশ্মিরী শালওয়ালা কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার কাছে পশমী কাপড় বিক্রয় করিত। সে অক্টোবর মাসে কলিকাতা আসিয়া যাহা কিছু চাহিতাম ধারে দিত, ও কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা আদায় করিয়া শেষ কিস্তি মে মাসে লইয়া অমৃতসর ফিরিয়া যাইত।

১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে আমার বিবাহের কোনো কথা উঠে নাই। তখন ভাইদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য বেশ কিছু পশমী কাপড় কিনিয়াছিলাম। পরে কিস্তি বেশি শোধ করিতে পারি নাই। মে মাসে বেশ পাওনা হইল। কিন্তু কি করিয়া তাহা শোধ করিব ? বাসা খরচেরই টাকা নাই, শালওয়ালা চার-পাঁচ দিন আসিয়া প্রতিশ্রুতি লইয়াছে, প্রতিবারই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল। সে আর অপেক্ষা করিবে না, টাকা আদায় করিবেই, মে মাসের মাঝামাঝি শেষ দিন।

আমি সেদিন সকালে টাকার খোঁজে বাহির হইয়া গেলাম, যদি বা কাহারও কাছ হইতে ধার লইতে পারি। অবশ্য কোনো আশাই ছিল না, তবু গেলাম। সেদিন আবার আমার বাড়িতে শ্বশুরবাড়ির দু-চার জন, দাদার বাড়ির লোক ও অন্য কয়েকজন আত্মীয়ের খাইবার কথা। উহাদের মধ্যে মিলিটারি অ্যাকাউন্টসে আমার যে ভাগিনেয় কাজ করিত সেও ছিল। আমি বেলা দশটা নাগাদ ফিরিয়া ভয়ে ভয়ে দরজাতে বেল বাজাইলাম। আমার ভাগিনেয় আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শালওয়ালা এসেছিল ? সে বলিল, হাঁ, এসেছিল, মামীমা তার পয়সা চুকিয়ে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া থাকাতে সে বলিল, মামীমা আমাকে কয়টা মোহর দিয়ে বললেন, তুমি এগুলো বেচে টাকা নিয়ে এসো। আমি টাকা এনে তাঁকে দিয়েছিলাম। আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিন্তু দেখা না করিয়া উপায় নাই। তিনি নিশ্চয়ই দরজাতে ভাগ্নের সঙ্গে কথাবার্তা শুনিতে পাইয়াছেন। কোনক্রমে প্যাসেজে ঢুকিয়া বৈঠকখানা ঘরের দিকে যাইতে লাগিলাম। তাহার আগে খাইবার ঘর, দরজা খোলা। দেখিলাম সেই ঘরে তিনি একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন।

চোখাচোখি হইবামাত্র আমি দ্রুতপদে তাঁহার কাছে গেলাম, তাঁহার পায়ে জানু পাতিয়া বসিয়া, কোলে মুখ লুকাইয়া বলিলাম, আমাকে মাপ করো। তিনি কোনো কথা না বলিয়া শুধু আমার মাথার চুলে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বৌদিদি তখন দরজা পার হইয়া যাইতেছিলেন, আমাকে এই অবস্থায় দেখিলেন। পরে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মেজ ঠাকুরপো যে অমন "রোমান্টিক" তা তো কখনো বুঝতে পারিনি।' রোমান্টিকই বটে ! তিনি কি করিয়া জানিবেন যে, বিবাহের পর এক মাসও না যাইতে-যাইতেই নববধূর কাছে আমি কি অক্ষমতা দেখাইলাম। সেই গ্লানি আমি জীবনে ভুলি নাই। আমরা পরে আমাদের জীবনের সব ঘটনার কথাই আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এই ঘটনার উল্লেখ কখনও করিতে পারি নাই, তিনিও কখনও উত্থাপন করেন নাই, আজ পর্যন্ত। সেইদিনের পর ষাট বছর কাটিয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকালেও অনেক অক্ষমতা ও নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াছি। কিছু পরিচয় দিব। দশ-বারো বৎসরে যাহা দেখাইয়াছিলাম তাহাই আজকালকার রেওয়াজ মত পত্নীকর্তৃক ডিভোর্সের দ্বারা শেষ হইত। তবু হয় নাই। ইহা ব্যতীত এমন অক্ষম ব্যক্তি, এমন নির্বোধ ব্যক্তি, জীবনে কোনো কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে কেহ স্বীকার করা দূরে থাকুক, অনুমানও করিতে পারিত না। তবু শক্তি অনুযায়ী কৃতিত্ব দেখাইয়াছি, কৃতিত্বের অনুপাতে প্রতিষ্ঠাও লাভ হইয়াছে, আর্থিক সঙ্গতিও হইয়াছে। ইহার বেশি কিছু প্রত্যাশা করিলে আমি মূঢ়তা দেখাইতাম।

কিন্তু এইটুকু কৃতিত্বও কি করিয়া দেখাইলাম, যে আর্থিক সহায়তা পাইয়াছি তাহাও কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়া জুটিল, যেটুকু প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাও কি করিয়া সম্ভব হইল ? ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিব না। আমাদের সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী অনেকে বলিবেন, এ সবই প্রাক্তনলব্ধ। আমি অদৃষ্টে বা পূর্বজন্মে অর্জিতপুণ্যে বিশ্বাসী নই। তবে কি কারণ দিব ?

একটা কারণ অবশ্য সহজেই দিতে পারি। আমি কখনও স্বধর্মভ্রষ্ট হই নাই, সহস্র কারণ এবং সহস্র প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও। আমি সর্বদাই বিশ্বাস করিয়াছি—

'শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ
পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ;
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।'

তাই উকিল হই নাই, ডাক্তার হই নাই, সরকারি কর্মচারী থাকি নাই, রাজনৈতিক নেতা হইবার চেষ্টা করি নাই। আমি লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছি, উহার পর যতটুকু ত্যাগস্বীকার করিতে হয় তাহা করিয়াছি। যতটুকু পুরস্কার পাওয়া সম্ভব তাহাও পাইয়াছি।

তবু ইহার উপরেও প্রশ্ন আছে—বহুলোক স্বধর্মে থাকে, তবু জীবনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না, সুযোগের অভাবে, সুতরাং ব্যর্থতাও লাভ করে। আমার বেলাতে তাহা হইল না কেন ? ইহার উত্তর আমি শুধু বিশ্বাসের বশে দিতে পারি, যুক্তির দ্বারা নয়। আমি মনে করি, বিশ্বে একটা অন্তর্নিহিত করুণা আছে যাহা অতি অক্ষমেরও মিলে, তাহার মনে সত্যকার ভক্তি থাকিলে। আমি কি দেখাইয়াছি ? এই প্রশ্নের উত্তর শান্তি সত্যানন্দকে যাহা দিয়াছিল, তাহাই দিব, 'কি প্রকারে বলিব, আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয়ত সে ভণ্ডামী, নয়ত আত্মপ্রতারণা।' এই সংশয় প্রকাশ করিয়াই অধ্যায়টি শেষ করিতেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালী থাকিব, না মানুষ হইব ?

আমি যে-যুগে বড় হইয়াছি তখন শিক্ষিত ও উদারনৈতিক (liberal) বাঙালীর মনে এই প্রশ্নটা সর্বদা জাগরূক থাকিত। বাঙালীত্ব ও মনুষ্যত্ব, এই দুই-এর মধ্যে এ-রকম বিরোধের ধারণা কেন জাগিল ?

প্রথম উত্তর এই যে, এই প্রশ্নে 'বাঙালী' ও 'মানুষ' এই দুইটি শব্দ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া একটা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হইত। ইহা ঘটিয়াছিল জাতীয় জীবন সম্বন্ধে বাঙালীর মনে একটা নূতন অনুভূতির ফলে। এই অনুভূতি হইতে একটা আত্ম-পরীক্ষার প্রেরণা আসিল। বাঙালী, নবজাগরণের দ্বারা প্রসূত বাঙালী নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল— বাঙালীজাতির প্রথাগত পুরাতন যে জীবন তাহার কোনো মূল্য আছে কি ?—জীবনের প্রকৃত সার্থকতার দিক হইতে। কোনো নব্য বাঙালী তাহা মনে করিতে পারিল না।

AMARBOI.COM

প্রশ্নের বিচার

রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত কেহই মনে করেন নাই যে, পুরাতন চিরাচরিত জীবন বা আচার-ব্যবহারের কোনো মূল্য আছে। তবে তাঁহারা গৌণভাবে প্রশ্নটার বিচার করিলেও সরাসরি ভাবে বিরোধিতার কথা উত্থাপন করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কথাটা রূঢ়ভাবেই শুনাইয়া দিলেন—১৩০২ সনের চৈত্র মাসে (ইং ১৮৯৬ সনের মার্চ মাসে) তিনি লিখিলেন,—

'সাত কোটি* সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে—মানুষ করনি।'

তখন আমরা বাঙালী বলিয়া গর্ব অনুভব করিলেও রবীন্দ্রনাথ কেন বঙ্গজননীকে দোষী করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের কোনও কষ্ট হইত না, কেননা আগেও বঙ্কিমচন্দ্র

*রবীন্দ্রনাথ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে বাঙালীর সংখ্যা সাত কোটি। বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তকোটি বাঙালীর কথা লিখিয়াছিলেন ইহা তখনকার সময়ের একটা ভুল ধারণা। ইংরেজের Province of Bengal শুধু বাঙালীর বাংলা নয়, সম্মিলিত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসীর Bengal. সুতরাং বাঙালী বুঝাইতে বিহারী ও ওড়িয়াকে বাদ দিতে হইবে। ১৯০১ সনে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল চার কোটির মতন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অল্পবয়সেই বাঙালীর 'মানুষ' না-হইবার একটা লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি 'কপালকুণ্ডলা'তে লিখিয়াছিলেন, 'বাঙালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙালীর বশীভূত হয় না।' পরিণত বয়সে তিনি কমলাকান্তের মুখ দিয়া বাঙালীচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য আরও বিশদভাবে উপস্থাপিত করিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর এই প্রবন্ধটির নাম তিনি দিলেন—'বাঙালীর মনুষ্যত্ব'। ইহাতে তিনি কোনও প্রশ্ন না তুলিয়া ধরিয়াই লইলেন যে, বাঙালীর 'মনুষ্যত্ব' নাই, শুধু পরিহাসের ছলে মানুষ হইবার পথ দেখাইয়া দিলেন। আজ পর্যন্ত সেই উপদেশের প্রয়োজন ও যাথার্থ্য আছে।

এই প্রবন্ধ হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমত, মনুষ্যত্বের অভাব কোথায় সে-বিষয়ে। মৌমাছি কমলাকান্তকে বলিল,—

> 'হে বিপ্র! আমার উপর এত চট কেন? আমি কি একাই খ্যান্‌খেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া খ্যান্‌খ্যান্ করিব, না ত কি করিব? বাঙ্গালী হইয়া কে খ্যান্‌খ্যানানি ছাড়া? কোন বাঙ্গালীর খ্যান্‌খানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে?'

এই গঞ্জনা দিয়া মৌমাছি বাঙালীকে মানুষ কি-ভাবে হওয়া যায়, সেই উপদেশ দিল,—

> 'তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত। তোমাদের জাতির খ্যান্‌খ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমি শুধু খ্যান্‌খ্যানানি করি না—মধু সংগ্রহ করি, আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে।...একটা কাজের সঙ্গে যোগ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্র খ্যান্‌খ্যান্। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত।'

নিজের জীবনে মৌমাছির এই উপদেশ মানিয়া আমি চলিয়াছি, এবং আমার ক্ষমতায় যতটুকু সাধ্য ততটুকু সাফল্যও লাভ করিয়াছি বলিতে পারি। অবশ্য দেশবাসীরা বলিবেন যে, আমি মৌমাছির একটি উপদেশই পালন করিয়াছি, অর্থাৎ শুধু হুল ফুটাইয়াছি। বিদেশীরা কিন্তু বলেন, আমি মধুও সঞ্চয় করিয়াছি। এই তর্ক আমি তুলিব না। এইখানে শুধু দেখাইতে চাই কি কি বিষয়ে আমি বিশিষ্ট অর্থে বাঙালী থাকি নাই, বিশিষ্ট অর্থে মানুষ হইবার চেষ্টা করিয়াছি।

বিবাহে মানুষ হওয়া

ইহার পরিচয় দিয়াছিলাম বিবাহের পূর্বে কনে দেখিতে অস্বীকৃত হইয়া। তাহার কথা বলিয়াছি। ইহা ছাড়াও অবাঙালীত্ব দেখাইয়াছিলাম বিবাহের পর পিতার উপর আর্থিক ব্যাপারে নির্ভর না করিয়া।

বিবাহের ব্যাপারে বাঙালী যুবক বাঙালীত্ব সেকালে দেখাইত পিতার উপর নির্ভর করিয়া, বর্তমানকালে দেখাইতে আরম্ভ করিল দুই কুল বজায় রাখিয়া—অর্থাৎ একদিকে পিতামাতার করা সম্বন্ধ মানিয়া লইয়া ও সেই সঙ্গে 'লাভ ম্যারেজের' আদর্শ বজায় রাখিবার জন্য বিবাহের পূর্বে কনে দেখিয়া। আমাদের যুগে বিবাহের ব্যাপারে মনুষ্যত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখাইবার জন্য উপার্জনক্ষম হইবার প্রয়োজন ছিল না। উহার কারণ এই ছিল যে, তখন যুবকদের যে-বয়সে বিবাহ হইত তখন উপার্জনের প্রশ্নই উঠিত না, পিতার উপার্জন থাকিলেই হইত। তবু কোনো কোনো আধুনিক পুত্র পিতামাতা তাহার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলে উপার্জন নাই বলিয়া অনিচ্ছা দেখাইত। পিতা উহার চিরপ্রচলিত বাঙালী উত্তর দিতেন। তিনি পুত্রের বন্ধুকে ডাকিয়া বলিতেন, 'তোমার বন্ধুকে গিয়ে বল—তিনি যদি নিজের টাকায় বউ-এর ভরণপোষণ করবেন এ-কথা মনে করে থাকেন, তাহলে যখন তিনি ভরণপোষণ করতে পারবেন, তখন তাঁকে কেউ মেয়ে দেবে না। আমি থাকতে বউ-এর ভরণপোষণ তিনি করবেন, এ-সব বাঁদুরে বুদ্ধি তিনি ছাড়ুন।' পুত্র তখন বিবেকেরও সম্মান রাখিলাম, পিতারও অবাধ্য হইলাম না, ইহা বুঝিয়া সানন্দে বিবাহ করিতে যাইত।

আমি যে এইভাবে বিবাহ করি নাই তাহার বিবরণ দিয়াছি। আমার ভাবে বিবাহের পর ষাট বৎসরের বেশি কাটিয়া গিয়াছে। তবু যাহা করিয়াছিলাম তাহার হিসাবনিকাশ করিতে কখনও বসি নাই কেন?—জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তাহা হইলে বলি। আমি এখন চূড়ান্ত ভাবে বুঝিয়াছি, অল্পবয়সেও অনুমান করিয়াছিলাম যে, বিবাহের যা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাহা হইবেই; মেয়েকে যাচাই যতই করা হউক না কেন, উহার ব্যতিক্রম কখনও হইবে না। আমার এই ধারণা জন্মিয়াছিল এই সিদ্ধান্তটি হইতে যে, প্রেমের দিক হইতে বিবাহ একটা কঠিন পরীক্ষা।

আমার সিদ্ধান্তটা একটা সূত্রেও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ১৯২৫ সন, আমার বয়স তখন সাতাশ, তাহার উপর অবিবাহিত, এই অবস্থায় প্রেম সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা দাম্পত্যপ্রেমের ফাঁকা জায়গাটা অধিকার করে। তাই নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে একটা বুকনী ইংরেজীতে লিখিয়াছিলাম। তখন প্যাস্কাল, লা-রোশফুকো, লা-ব্রুইএর, ভোভনার্গ প্রভৃতি ফরাসী লেখকদের 'ম্যাকসিম্' বা 'অ্যাফরিজম্' খুবই পড়িতাম। উহার ফলে ঐ ধরনের কিছু লিখিবার আগ্রহ হইয়াছিল, ও নানা বিষয়ে কতকগুলি নিজেও লিখিলাম। যে-বুকনীটির কথা বলিলাম তাহা এগুলির মধ্যে ছিল। সেটি এইরূপ,—আমি প্রথমে প্রশ্ন তুলিলাম,—

'How does it happen that it is far easier to love women in general than to fix our love upon one of them?'

নিজেই উত্তর দিলাম,—

'The charms of women range over so wide a gamut that a choice is repented of as soon as it is made.'

এই কারণে বিবাহের প্রথম আবেশ কাটিয়া গেলেই, স্বামীদের মনে একটা সংশয় জাগিতে আরম্ভ হয় এবং উহার বশে পত্নীর মুখশ্রী ও দেহসৌষ্ঠবের ছোটখাটো খুঁত তাহাদের চোখে বেশি করিয়া পড়ে। সৌভাগ্য এইমাত্র ছিল যে, আমাদের অল্পবয়সে বন্ধু বা সহকর্মীর স্ত্রীকে দেখিবার সুযোগ ঘটিত না, ঘটিলে নিশ্চয়ই সংশয় অনুতাপে পরিণত হইত। তবু যতই বৎসর কাটিতে থাকে ক্ষোভও বাড়িতে থাকে। এ-বিষয়ে প্যাস্কালের একটি উক্তি আমার বুকনীটি লিখিবার কিছুদিন পরেই পড়িলাম। তিনি নিজে বিবাহ করেন নাই, তবু অন্যের বিবাহিত জীবনে অথবা বিবাহের বাহিরে প্রেমের ক্ষণস্থায়িত্ব দেখিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উক্তিটি করিয়াছিলেন। উহা ফরাসীভাষা হইতে বাংলা করিয়া দিতেছি। —

'যে মেয়েটিকে সে দশ বৎসর পূর্বে ভালবাসিত, এখন তাহাকে ভালবাসে না। কেন, আমি ভাল করিয়াই জানি। মেয়েটি এখন আর সেই মেয়েটি নাই, অবশ্য সে নিজেও সেই যুবকটি নাই। তখন তাহার নবীন বয়স ছিল, মেয়েটিরও তাই। কিন্তু এখন মেয়েটি একেবারে অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। তবু, মেয়েটি যদি যেমনটি ছিল তেমনই থাকিত, তাহা হইলে সে হয়ত তাহাকে এখনও ভালবাসিত।'

ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের খোঁচাটা এই যে, পুরুষ নারীর বয়স ক্ষমা করিতে পারে না, কিন্তু নিজের বয়স ভুলিয়া যায়। বাঙালীর বেলাতে এই অবিচার আরও নিষ্করুণ হয় এই জন্য যে, বাঙালী মেয়েরা ষোল হইতে কুড়ি পর্যন্ত যতই তন্বী হউক না কেন, বিবাহের পর পঁচিশ বৎসর হইতেই স্থূলাঙ্গিনী হইতে আরম্ভ করে, ত্রিশের উপরে গেলে তো কথাই নাই।

আজকাল আবার বাঙালীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থায় যে-সব পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহাতে প্রৌঢ় বাঙালী স্বামীদের মনঃপীড়া আরও বাড়িয়াছে। এখন অনেক বাঙালী মেয়ে পঁচিশ-ত্রিশের দিকে গেলেও অবিবাহিতা থাকে। কিন্তু সাধারণত ইহারা তখন পর্যন্তও স্থূলাঙ্গিনী হইয়া যায় না, হয়ত অন্যূঢ়া থাকিবার জন্যই। ইহারা প্রথম দিকে কলেজে পড়ে ও পরের দিকে হয় স্কুল-কলেজে কিংবা আপিসে কাজ করে। এই সব অকাল-তন্বীদের দেখিতে হয় বলিয়া অধ্যাপক ও সেক্রেটারি পদে অধিষ্ঠিত প্রবীণ বাঙালী স্বামীদের মানসিক স্থৈর্যের ব্যাঘাত জন্মিতেছে, কেননা ইহাতে কর্মস্থল ও গৃহের মধ্যে বহুকাল প্রচলিত যে-পার্থক্য ছিল তাহারই বিপর্যয় হইয়া গিয়াছে। আমাদের অল্পবয়স পর্যন্তও কর্মস্থল ছিল জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্র ও গৃহ ছিল শান্তি, স্নেহ ও মাধুর্যের নিলয়। তাই সে-যুগের বাঙালী যুবকেরা কর্মজীবন সম্বন্ধে স্ত্রীদের বলিত,—

'কি হবে শুনিয়া, সখী, বাহিরের কথা—
অপমান অনাদর ক্ষুদ্রতা দীনতা
যত কিছু। লোকাকীর্ণ বৃহৎ সংসার
কোথা আমি যুঝে মরি এক পার্শ্বে তার
এক কণা অন্ন লাগি।'

কিন্তু গৃহ সম্বন্ধে বলিত,—

'সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে এই তুচ্ছ কর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া নাহি জানি
কোন ভাগ্যগুণে। অয়ি মহিয়সী রাণী,
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান। কেন,
সখী, নত কর মুখ ? কেন লজ্জা হেন
অকারণে ? নহে ইহা মিথ্যা চাটু।...'

কিন্তু বর্তমান যুগে কলেজে ও আপিসে তন্বীদের আবির্ভাবের ফলে কর্মক্ষেত্র হইয়াছে মাধুর্যের নিলয়, আর গৃহ হইয়াছে রণক্ষেত্র। প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় 'লেকচার' দিতে দিতে ও প্রবীণ রাজপুরুষ মহাশয় 'ফাইল' উল্টাইতে উল্টাইতে কেবলই ভাবেন—'আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি অপরাধে এই মাধুর্যের এককণা ভাগ হইতেও বঞ্চিত হইতেছি? আমার তো উচ্চ বেতন আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, মর্যাদা আছে, যুবকদের ইষ্ট বা অনিষ্ট করিবারও ক্ষমতা আছে। তবু আমাকেই কেন স্বচক্ষে দেখিতে হইতেছে যে, সবগুলি ডাগর চোখই আমার মুখাপেক্ষী সেই যুবকদের উপরই পড়িয়া আছে, আর আমাকে প্রতি সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া সেই স্থূলাঙ্গিনীকেই দেখিতে হইবে।'

এই সব প্রবীণদের অবস্থা বুঝাইবার জন্য ১৯২৭-২৮ সনে 'শনিবারের চিঠি'তে কি করিয়াছিলাম তাহা বলি। তখন 'কল্লোলযুগ', তরুণদের হৃদয়েও কল্লোল উঠিতেছে। তাই উহাদের একজন লিখিল,—

'ময়ূরপঙ্খী তনু,
ময়ূরের মত পেখম মেলেছে,
দেখিয়া উতলা হনু।'

আমরা এই কবিতাটি একটি ব্যঙ্গচিত্র দিয়া উদ্ধৃত করিলাম। উহাতে একটি তন্বী ময়ূরের মতই পেখম ধরিয়াছিল। তাহার পায়ের কাছে আমরা দেখাইলাম—একটি হনুমান বসিয়া বিহ্বলনয়নে এই রূপরাশি দেখিতেছে। আজিকার দিন হইলে এই ব্যঙ্গচিত্র অর্বাচীন যুবককে হনুমান রূপে না দেখাইয়া প্রাচীন প্রফেসর বা সেক্রেটারিকে দেখাইতাম, কারণ এ-যুগের যুবকেরা যতই 'চুটিয়ে পীরিত' করুক না কেন, পয়সার হিসাবে এমনই সেয়ানা হইয়াছে যে, প্রণয়িনীর কাঁধে টাকার তোড়া না দেখিলে 'লম্বা দিতে' পারে। কেবল প্রবীণ বাঙালীরাই হাবুগাবু হইয়াছেন।

কিন্তু ইঁহারাও যুগধর্মে এমনই আত্মপরায়ণ হইয়াছেন যে, নিজেদের রূপ না দেখিয়া ইঁহারা কেবল পত্নীর রূপাভাবই দেখিয়া থাকেন। সেজন্য ইঁহারা কেহই বজ্রসেনের মত বলিতে পারিবেন না,—

'ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা, পাপীজনশরণ প্রভু!
মরিছে তাপে, মরিছে লাজে প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষম হে মম দীনতা, পাপীজনশরণ প্রভু!'

তবে এই ক্ষমাহীনতার জন্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে ইঁহাদের দায়ী না করিয়া যুগধর্মকেও দায়ী করিতে হয়। ইঁহাদের দীনতা বর্তমান বাঙালী-জীবনে একটা শোচনীয় অভাবের ফল। ইহার ফলে বাঙালী-জীবনের যে একটা পুরাতন পাপ প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া, আপনভোলা হইবার আকুলতার জন্য অনেক পরিমাণে লজ্জিত হইয়া আত্মগোপন করিতে চাহিত; সেই পাপ আজ সদম্ভে নিজ মূর্তি প্রকাশ করিতেছে। এই পাপের কথা রবীন্দ্রনাথ একটি উপেক্ষিতা বাঙালী বধূর মুখে দিয়াছেন। তাহার চরম দুঃখ এই,—

'একদিন একটা রিপুর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয়, তাহারা আর একটা হৃদয়াবেগে আবার উঠিতে পারে, কিন্তু এই যে, দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা—ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোনো রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।'

বর্তমানে বাঙালীর মধ্যে 'এই যে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া', উহা আর ব্যক্তিগত নাই, জাতিগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ হইবার প্রচেষ্টা

প্রথম পাঠ

বিবাহের পরই যে-অক্ষমতা দেখাইলাম তাহা সত্ত্বেও দুই বৎসর ধরিয়া সংসার ভদ্রভাবেই চালাইলাম, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর সহকারী-সম্পাদক হইয়া। কিন্তু আগেই বলিয়াছি মাহিনা ছিল মাত্র একশত টাকা। ইহাতে সংসার চালানো সে-যুগেও সহজ হইতে পারিত না। তাহার উপর 'প্রবাসী' আপিসের অব্যবস্থার জন্য মাহিনা থোকে পাইতাম না, কোনদিন দুইটাকা, কোনদিন দশটাকা পাইতাম। সুতরাং পাওয়ামাত্র সেই টাকা খোরাকের জন্যই খরচ হইয়া যাইত, অন্য পাওনা দিবার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিতে পারিতাম না। ১৯৩৪ সনের এপ্রিল মাস হইতে একেবারে উপার্জনহীন হইলাম, 'প্রবাসী'র চাকুরি ছাড়িয়া ও অন্য চাকুরি না পাইয়া। এই অবস্থা ১৯৩৭ সনের জুলাই মাস পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই সময়েই অবস্থার বশীভূত হইয়া বাঙালী থাকিব, না অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ হইবার চেষ্টা করিব এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইলাম। উহাকে সত্যই struggle for existence বলা চলে। উহার সমস্ত কাহিনী বলিব না, শুধু যাহাতে মানুষ হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সেই কয়েকটি ঘটনার কথাই বলিব।

উনিশ শ' বত্রিশের মে মাস হইতে সংসার চালু হইল। মানুষ হইবার চেষ্টায় বহির্দৃষ্টিতে সংসার শোভন-ভাবেই চলিতে লাগিল। আমার বাড়ির সাজসজ্জার কথা বলিয়াছি, কিন্তু দুইটি অবাঙালী 'সজ্জার' কথা লিখি নাই। উহাদের একটি স্নানের ঘর ইত্যাদির দরজাতে একটি লাল ইলেকট্রিক বাতির ব্যবস্থা, যাহাতে ভিতরে কেউ থাকিলে অন্য কেউ বাহির হইতে ধাক্কাধাক্কি বা চেঁচামেচি না করে ও ভিতর হইতে কাশিতে না হয়; অথবা অনবধানবশত দরজায় খিল না দিয়া থাকিলে উভয়ত অপ্রতিভ হইতে না হয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থা—সদর দরজায় ইলেকট্রিক বেল। উহা তখনকার দিনে সাধারণ বাঙালীর বাড়িতে এতই বিরল ছিল যে, আমার উপরতলার ভাড়াটে একটি প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালী ভদ্রলোক নিজের বাড়িতে উঠিবার সময়ে ঐ বেলটি বাজাইয়া তরতর করিয়া উঠিয়া যাইতেন। আমি বা চাকর পরে গিয়া কাহাকেও দেখিতাম না। একদিন শুধু তিনি ধরা পড়িলেন ও কাষ্ঠহাসি হাসিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও ফাঁকা চালবাজী সম্বন্ধে বাঙালীর শ্যেনদৃষ্টি ও শশককর্ণকে আমি হার মানাইতে পারি নাই। উহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার এক কুটুম্বস্থানীয় যুবক ময়মনসিংহের অজ পাড়াগাঁয়ে সম্পত্তির সামান্য আয়ে থাকিত, ম্যাট্রিক পাশ করিয়া থাকিলেও চাকুরির চেষ্টা করিত না, কারণ সে একেবারে কালা ছিল; কেবল একটি 'ইয়ার ট্রাম্পেট' ব্যবহার করিয়াই কথা শুনিতে পারিত। তাহার উপর সে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইলেও পত্নীর রূপ ও বর্ণ লইয়া সে অভিযোগ করিত। সে ১৯২২ সন হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতা আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিত।

আমার বিবাহের মাস দুই পরে, আমার স্ত্রী দুইদিনের জন্য শ্যামবাজার হইতে ভবানীপুরে তাঁহার দিদির বাড়িতে গিয়াছেন, তখন সে আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমানে বেল বাজিতেছে শুনিয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দরজায় গিয়া দেখিলাম, সে মুখ আকর্ণ ব্যাদান করিয়া হাসিতেছে ও বেলটা বাজাইতেছে। আমাকে দেখিয়াও সে নিবৃত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইল না, আরও বারকয়েক 'বেল' বাজাইয়া বসিবার ঘরে আসিল। চারিদিক দেখিয়া সে বলিল, 'দাদা, আপনি তো poor-salaried man, তবে এইভাবে থাকেন কি কইর‍্যা।' আমি একটু হাসিলাম। সে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া শেষে আমাদের শোবার ঘরে গিয়া ঢুকিল ও থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ওঃ, বুঝছি, বুঝছি, দাদা, বিয়া করছেন!' আমি বলিলাম, 'আর রে, না!' সে খাটের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া আঙুল দিয়া বালিশ দেখাইয়া বলিল, 'Then, why two pillows?' তখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সে-ও একগাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বেল্‌ডাও কি শ্বশুরেই দিছিল্?' ইহার পর বাড়ির কোনো জিনিস আমার নিজের পয়সায় কেনা তাহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি নাই।

এখন পরীক্ষার কথায় আসি। কিন্তু ইহা কি বলিবার আগে, বিবাহিত জীবনে কি ধরনের আচরণ করিব—স্ত্রীর চরিত্রে কি দেখিলে সহ্য করিব না, ও নিজে কি কখনও করিব না—সে-বিষয়ে আরও দুই-একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই কথাগুলি দুইটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জন্য মনে জাগিয়াছিল। তখন মিলিটারি অ্যাকাউন্টসে কাজ করি। একদিন একজন সহকর্মীর বন্ধু আসিয়া বিবাহরাত্রির কথা বলিয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিলেন। ব্যাপারটি এই—দুইজনে নিরালা হইলে বধূ জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি কর?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি ইনকামট্যাক্স অফিসার।' (তখন ২৫/২৬ বৎসর বয়সের বাঙালীর পক্ষে একটা বড় চাকুরি।) বধূ আবার প্রশ্ন করিল, 'সেটা কী?' তিনি বুঝাইয়া বলিলে জানিতে চাহিল উহার বেতন কত। যখন তিনি উত্তর দিলেন, তিনশো টাকা, বধূ তাহাতে মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া তৃতীয় প্রশ্ন করিল, 'কতদিন এ-কাজ করছ?' তিনি বলিলেন বছর দুই—তখন বধূ শেষ প্রশ্ন করিল, 'এতদিনে টাকার কি করেছ?' এই কাহিনী বলিয়া যুবক হতাশের মত মন্তব্য করিল, 'এ-রকম স্ত্রী নিয়ে আমার কি উপায় হবে?' কিন্তু বলিতে পারিতাম যে, এক বৎসরের মধ্যেই এ-বিষয়ে কোনো পীড়া অনুভব না করিয়া তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সুখে বাস করিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রী যদি নীচ হয়, স্বামী তাহার সঙ্গে সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই নীচ হইয়া যায় নাই, এরকম স্বামী আমি কম দেখিয়াছি, আসলে দেখিই নাই বলা উচিত। আমার স্ত্রী যখন এরূপ ছিলেন না, তখন 'আমি নীচ হইতাম না' বলা বড়াই-এর মত হইবে। তবু হয়ত তখনই রাগের বশে ঝোঁকের মাথায় বৌকে বাপের বাড়ি রাখিয়া আসিতাম, মাথা ঠাণ্ডা হইবার অপেক্ষায় থাকিতাম না। ইহার পর স্ত্রী নিজেই আর ফিরিয়া আসিত না।

আর একটা ব্যাপারও মিলিটারি অ্যাকাউন্টস-এ থাকাকালীনই হইয়াছিল। এটা 'বাঙালী' স্বামীর আচরণ সম্বন্ধে। একদিন জরুরী কাজ শেষ করিতে না পারায় সন্ধ্যার পর কাজ করিতেছি। খুব বড় হল; আর এক প্রান্তে আলো জ্বলিতেছিল; দেখিলাম সেখানে দুইটি যুবকও কাজ করিতেছে। আমি খাতাপত্র ফাইল ইত্যাদির আড়ালে পড়িয়া আছি, আমাকে তাহারা দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ শুনিলাম এক যুবক 'ভাইরে!' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। অপরটি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হলো?' প্রথম যুবক উত্তর দিল, 'বৌ বাঁপের বাঁড়ি গেছে।' বন্ধু বলিল, 'তাতে কি হয়েছে। সবার বউ-ই তো বাপের বাড়ি যায়।' আর্ত যুবক বলিল, 'হঁবে নাঁ—I love her, she loves me!' বন্ধু বলিল, 'তবে পাঠালি কেন?' যুবক, 'অসুখ হলো যে!' বন্ধু, 'অসুখ হয়েছে তো বাপের বাড়ি না পাঠিয়ে নিজে তো চিকিৎসা করাতে পারতিস্।' যুবক, 'হ্যাঁ, আমি চিকিৎসা করাতে যাবো? যার মেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে করাবে।' স্বকর্ণে এই আলাপ শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, গ্রাম্য বাঙালী স্ত্রীরা কেন স্বামী আদর দেখাইতে আসিলে বলিত, 'তোমার যেমন ভালবাসা মুসলমানের মুর্গী পোষা।'

আমার পরীক্ষা ঘটিল এই ধরনের ব্যাপারেই—স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনা হওয়াতে। প্রশ্ন তাহাতে উঠিত, তাঁহাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিব, না কলিকাতায় নিজের বাড়িতেই সন্তানজন্মের ব্যবস্থা করিব ? কিন্তু আমি এমনই অবাঙালী হইয়াছিলাম যে, প্রশ্নটা আমার মনে জাগেও নাই। আমি ধরিয়াই লইয়াছিলাম যে, আমার শ্বশুরমহাশয় যখন সন্তানের জন্ম দেন নাই সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করিবার খরচ তাঁহার উপরে চাপানো অন্যায় হইবে। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'— পুরুষ নিজের কর্মের ফলভোগ করে—এই প্রাচীন উক্তি আমি শুনিয়াছিলাম। সেজন্য মনে করিয়াছিলাম, পাপই করিয়া থাকি অথবা পুণ্যই করিয়া থাকি, কর্মফল নিজেই ভোগ করিব।

অথচ স্ত্রীকে প্রথম সন্তান জন্মের জন্য পিত্রালয়ে পাঠানো বাঙালী সমাজের চিরপ্রচলিত ধারা ছিল। ইহার ব্যতিক্রম অন্যত্র দূরে থাকুক, আমাদের পরিবারেও দেখি নাই। সুতরাং ধারা মানিয়া লইলে আমার কোনো নিন্দাই হইত না। তবু আমি উহাতে স্বীকৃত হইলাম না। আমার মন কিছুতেই উহা মানিল না।

কিন্তু আপাতত আমার স্ত্রী শিলং চলিয়া গেলেন। তিনি কলিকাতায় স্কুল-কলেজে পড়িলেও কখনও গ্রীষ্মের সময়ে কলিকাতায় থাকেন নাই। তাই কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন, তাহার উপর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় কষ্ট আরও বাড়িল। সুতরাং শ্বশুরমহাশয় বাবার কাছে প্রস্তাব করিলেন যে, কন্যাকে শিলং লইয়া যাইবেন, বাবাও তখনই সম্মতি দিলেন। স্ত্রী আগস্ট মাসে শিলং গেলেন। কথা রহিল আমিও পূজার সময়ে শিলং যাইব, গেলাম একমাসের জন্য। ঠিক করা হইল শীতের গোড়ার দিকে যখন শ্বশুর-শাশুড়ি কলিকাতা আসিবেন তখন আমার স্ত্রীও আসিবেন। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে যখন তাঁহারা আসিলেন, তখন আমি শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়া স্ত্রীকে বাড়িতে লইয়া আসিলাম। আমি থাকিতাম শ্যামবাজার মোহনলাল মিত্র স্ট্রীটের মোড়ে, তাঁহারা থাকিতেন ভবানীপুর চড়কডাঙ্গার মোড়ের কাছে।

AMARBOI.COM

প্রথম সন্তান

সন্তান হইবার কথা ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের পর। শ্বশুর-শাশুড়ি আবার মেয়েকে নিজেদের বাড়িতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু আমার মত নাই দেখিয়া মোটেই পীড়াপীড়ি করিলেন না। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গেলাম।

তখনকার দিনে কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে সন্তান জন্মের জন্য হাসপাতালে যাইবে—উহা অকল্পনীয় ছিল। সুতরাং সব ব্যবস্থা বাড়িতেই হইতে লাগিল, তাহাও একশো টাকা মাহিনার 'poor-salaried man'-এর মত হইতে দিলাম না। সেকালের পিতারা, আধুনিক পুত্র গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত স্ত্রীর জন্যও ডাক্তার ডাকিতে চাহিলে বলিত, 'যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুমধাম করিয়া মরিবে ?' আমার পিতাও আমার কাণ্ড দেখিয়া সেরকম কিছু বলিতে পারিতেন কিন্তু বলা দূরে থাকুক, পুত্রের দায়িত্ববোধ দেখিয়া খুশিই হইলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার ডাকিবার খরচের জন্য ভাবনা ছিল না ; আমার ছোট ভাই (ক্ষীরোদ চৌধুরী) ভিয়েনা ও ট্যুবিঙ্গেনে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুচিকিৎসক ; সে তাহার এক বন্ধু, মিউনিখে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্ত্রীরোগ ও স্ত্রীলোকঘটিত অন্যান্য ব্যাপারের চিকিৎসককে ঠিক করিয়া রাখিল। তবে ধাত্রী, নার্স ইত্যাদির জন্য খরচ আমাকেই করিতে হইয়াছিল, উহা কম হয় নাই। কিন্তু ঋণ আমিই শোধ করিয়াছিলাম, স্ত্রীর উপর চাপাই নাই।

কিন্তু ডিসেম্বরের শেষের দিকে এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। আমি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। উহা শিলং-এ অতিরিক্ত পরিশ্রম ও পাহাড়ে উঠা-নামা করিবার ফলে। একদিন আপিস হইতে ফিরিবার সময়ে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম, কোনো মতে সামলাইয়া টলিতে টলিতে কাছেই দাদার বাড়িতে গেলাম, ও আর চলিতে না পারিয়া বাড়ির বাহিরেই একটা বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া আমার ডাক্তার ভাইকে খবর দিলেন। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, আপাতত বিপদ নাই। আমার পিতাও তখন দাদার বাড়িতে ছিলেন। তাঁহারা সকলে ভাই-এর গাড়িতে আমাকে শ্যামবাজারে লইয়া গেলেন। আমার স্ত্রী আমাকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া একটু গম্ভীর হইলেন, কিন্তু একটুও অস্থির হইতে দেখিলাম না। চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা হইল, স্যর নীলরতন সরকার ও অন্যান্য বড় ডাক্তার আসিলেন, প্রায় দুই মাস শয্যাগত রহিলাম। আমার স্ত্রী তাঁহার নিজের অবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া আমার সেবা করিতে লাগিলেন এবং বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা ও দিদি কলিকাতাতেই ছিলেন, তাঁহাদেরও আসিতে বলিলেন না।

তখন তাঁহার এই ধরনের আচরণ আমার কাছে অসাধারণ বলিয়া মনে হয় নাই, বরঞ্চ ইহাই মনে হইয়াছিল যে, এইরূপ আচরণই স্বভাবসিদ্ধ—সুতরাং না হইবে কেন? পরজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে, বিশেষ করিয়া প্রায় বিশ বৎসর ইংলন্ডে বাস করিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতে আমার পত্নীর সেই সময়কার ব্যবহার একেবারে অস্বাভাবিক, অন্ততপক্ষে কোনো শিক্ষিতা, উচ্চ-মনোবৃত্তিসম্পন্না, আধুনিকা বাঙালী পত্নীর অযোগ্য আচরণ বলিয়া মনে হইতেছে। কেন বলা প্রয়োজন।

আজকাল বাঙালী যুবকেরা ইংলন্ডে বা আমেরিকায় পড়িবার জন্য আসিলেও যুবতী পত্নীকে লইয়া আসেন, চাকুরি লইয়া আসিলে তো কথাই নাই। পত্নীরাও বিদেশে পৌঁছিবার কিছুদিন পরেই নিজেরাও 'ডক্টরনী' হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান, তাহা না হইলে চাকুরি, একটা না একটা, সব সময়েই লইয়া থাকেন। এই দম্পতিরা ছাত্রছাত্রী হইলেও ব্রহ্মচর্য পালন করেন না, তবে পারতপক্ষে সন্তানজন্মও হইতে দেন না। তবুও কখনও বা স্বেচ্ছায়, কখনও বা দৈবক্রমে সন্তানসম্ভাবনা হইয়া যায়। অল্প কিছুদিন আগে একজন অক্‌স্‌ফোর্ড প্রবাসিনী মাতৃস্থানীয়া বাঙালী মহিলা তিন-চারটি ভাবী 'ডক্টরিনী'কে একদিনে একসঙ্গে সাধভক্ষণ করাইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আমি পাইকারি সাধ খাওয়ানোর কথা শুনি নাই।

কিন্তু ইঁহাদের কেহই সন্তানজন্মের আগে বা পরে মাতৃত্বের দায় ঘাড়ে লইতে চাহেন না, এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য দেশ হইতে মাকে আনান। ইঁহারা বলেন, তাঁহারা জীবনকে এত উচ্চ কাজে উৎসর্গ করিতে চান যে, ছানাপোনার তদারক করিলে সেই জীবনব্রতের বিঘ্ন ঘটিবে, ও তাঁহারা নিজেরাও সেকালের অশিক্ষিত গ্রাম্য স্ত্রীলোক হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাইবেন। এই ব্যাপার যেমন আমেরিকা ও কানাডায় দেখিয়াছি তেমনই বিলাতেও দেখিতেছি।

সেকালের বাঙালী পুরুষ রসিক ছিল, আচরণে গ্রাম্য এবং ভাষায় অমার্জিত হইলেও ; তাহারা সন্তান সম্বন্ধে এইরূপ নির্লিপ্ততা দেখিলে একটা অত্যন্ত বদরকমের রসিকতা করিত, বলিত—'হাঁসের মা বিয়োয়, কিন্তু পালে না।' আমি এই সব প্রবাসিনী বাঙালী পত্নীদের মাতাদের অক্‌স্‌ফোর্ডের রাস্তায় দেখিলে হঠাৎ মনে করি আমি যেন যাদবপুর কিংবা বেহালায় আছি। ইঁহাদের কন্যারা কিন্তু মনে করেন, মাতাকে যখন নিজের খরচে 'বিলাতফেরত' হইবার মর্যাদা দিলাম, তখন তাঁহাকে 'হাউসকীপার' অথবা আয়া বানাইবার মধ্যে কোনো নিন্দা বা লজ্জার কারণ নাই। আমার স্ত্রী নিজের কর্তব্য মাতার উপর চাপানো উচিত মনে করেন নাই, তাই মাকে ভবানীপুর হইতেও শ্যামবাজারে আনেন নাই।

আমরা শেষের দিকে সন্তানজন্ম সম্বন্ধে একটু অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম মানিতেই হইল। অবশেষে যেদিন সন্তান হইবার কথা ডাক্তার বলিয়াছিলেন, তাহার আগের দিন (২০শে ফেব্রুয়ারি) আসিয়া গেল। সেদিন সকাল হইতে পত্নী বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। আমার শাশুড়ি ভবানীপুর হইতে আসিলেন। ডাক্তাররা আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, বিলম্ব আছে ; বিকালে আসিয়া বলিলেন, তখনও দেরি আছে, তবে তাঁহারা দ্বিপ্রহর রাত্রি হইতে উপস্থিত থাকিবেন। ডাক্তার, ডাক্তারভাই, নার্স—সকলেই তখন হইতে শোবার ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, শাশুড়ি-ঠাকুরাণীও রহিলেন। আমি বসিবার ঘরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেও ঘুম আসিল না। আমার সঙ্গে আমার বড় ভগিনীপতিও বসিয়া রহিলেন এবং ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আমার মত 'স্ত্রৈণ' ব্যক্তির কন্যাসন্তান ভিন্ন পুত্রসন্তান হইতে পারে না। তখন তাঁহার নিজের বিবাহ ষোল বৎসর আগে হইয়াছে, কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করে নাই, আমার ভগিনীও তাঁহাকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইত ; এসব কথা তাঁহার মনে ছিল না ; আমিও দুশ্চিন্তায় এত বিক্ষিপ্ত ছিলাম যে, তাঁহাকে সেই ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতে পারি নাই।

রাত্রি ভোর হইয়া আসিতেছে, তখন নার্সটি আসিয়া বলিল যে, আমার স্ত্রী আমাকে ডাকিয়াছেন। আমি শোবার ঘরের দরজাতে যাওয়ামাত্র শাশুড়ি-ঠাকুরাণী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া হাত নাড়িয়া আমাকে ফিরিয়া যাইতে ইশারা করিতে লাগিলেন—কারণ তখনকার দিনে স্ত্রীর সন্তানপ্রসবের সময়ে স্বামীর উপস্থিত থাকা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া মনে হইত। তবু আমি ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীর বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি দুই হাতে আমার একটি হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া দুটি চোখ আমার দিকে তুলিয়া বলিলেন, 'আমার বড় কষ্ট!' দেখিলাম, গাল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমার হাত ধরিয়া থাকাতে যেন শান্ত হইয়া পড়িলেন।

ডাক্তার তখন হঠাৎ চেয়ার হইতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, 'আর দেরি করা উচিত হবে না, চব্বিশ ঘন্টা হয়ে গেছে। যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।' আমার ভাইকে বলিলেন, 'আপনি এনেস্থেটিক দিন।' ভাই নাকের কাছে তাহা ধরিলেন। স্ত্রী জ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন। তখন যন্ত্র দিয়া শিশুটিকে বাহির করিয়া আনা হইল। সে কাঁদিল না, তাই আমি ভাবিলাম শিশুটি হয়ত মৃত জন্মিয়াছে। নার্স তাহাকে একটা এনামেল করা গামলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামাইয়া গরম জল দিয়া ধুইয়া দিতে লাগিল। তখন সে কাঁদিয়া উঠিল, বুঝিলাম মৃত সন্তান হয় নাই, এবং চাহিয়া দেখিলাম যে এটি পুত্র। খুব বড় হইয়াছিল, যদিও আমি অত্যন্ত ক্ষীণকায় ও পত্নী দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন না। ওজন তখনই নেওয়া হইল, দেখা গেল আট পাউন্ডের উপরে, বাঙালী শিশুর পক্ষে বেশ ভারী। তাহার নাড়ি কাটিয়া বাঁধা হইল। এই সূত্রে আমার শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর গৃহকর্ম চালাইবার অসাধারণ দক্ষতার কথা বলিব। যে পেটিটি দিয়া শিশুর নাভি বাঁধা হইল সেটি আমার স্ত্রীর জন্মের পরও ব্যবহৃত হইয়াছিল। শাশুড়ি-ঠাকুরাণী কিছুই নষ্ট হইতে দিতেন না। বস্ত্রাদিও ধুইয়া ইস্ত্রি করিয়া তুলিয়া রাখিতেন। আমার স্ত্রীর শিশুকালের ফ্রকও আমি দেখিয়াছি। শিশুর জন্য আগে হইতেই জামা ইত্যাদি তৈরি করা হইয়াছিল। (মনে রাখিতে হইবে শিশুর জন্মের আগে জামা করানো সংস্কারবিরুদ্ধ ছিল।)

আমি বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভগিনীপতিকে পুত্রজন্মের কথা বলিলাম, তাঁহার পরিহাসের উত্তোর গাহিবার কথা মনেও হইল না। আমি যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম তাহা মানবজীবনের সুখ ও দুঃখের সমান প্রকাশ। দুপুরের পরে জ্ঞান হইলে আমি আবার গিয়া স্ত্রীকে দেখিয়া আসিলাম। তিনি তখনও অত্যন্ত অবসন্ন তবু দেখিলাম স্থিরদৃষ্টিতে শিশুটির দিকে চাহিয়া আছেন।

আমাদের বংশে পুরুষানুক্রমে প্রথম নামের সঙ্গে 'নারায়ণ' যুক্ত থাকিত; ইহা সম্পত্তিশালী বাঙালী বংশের রীতি ছিল তাহা বলিয়া দিতে হইবে না; কিন্তু আমার পিতামাতা ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন হওয়াতে 'পৌত্তলিকতা' সূচক 'নারায়ণ' ছাড়িয়া আমাদের 'চন্দ্র' করিয়াছিলেন। আমি আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, 'নারায়ণ' ফিরাইয়া আনিব, তাই ছেলেটির নাম দিলাম 'ধ্রুবনারায়ণ'। তবে পশ্চিমবঙ্গের রীতি অনুসরণ করিয়া, সে মোটা বলিয়া ডাকনাম রাখিলাম ভোঁদো। বাবা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, তবু এই নামই রহিয়া গেল।

আমাদের পরিবারে আঁতুড় ঘর মানা ছিল না, তাই সকলেই ছেলে দেখিবার জন্য শোবার ঘরে যাইতেছিল। সদর দরজার কাছ হইতে উপরতলার ছয়-সাত বৎসরের একটি মেয়ে এই সব অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিবার পর বলিল, 'আঁতুড়ে অনাছিষ্টি করে দিচ্ছে।' কিন্তু তাহার ঠাকুরমা স্নান করিতে হইলেও মাঝে মাঝে আসিয়া আমার স্ত্রীর তত্ত্ব লইয়া যাইতেন।

আমার স্ত্রীর চলাফেরার ক্ষমতা হইলেই, অর্থাৎ ছয়-সাত দিন পরেই শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর চলিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু স্ত্রীর 'বি-কলাই' যাহাকে বলে তাহার জন্য জ্বর হওয়াতে রহিয়া গেলেন। দিন পনেরো খুবই দুশ্চিন্তায় কাটিল। ইহার পর জ্বর ছাড়িয়া গেল, তখন শাশুড়ি-ঠাকুরাণী বাড়ি গেলেন। গ্রীষ্মের মুখে শ্বশুর-শাশুড়ি শিলং চলিয়া গেলেন, আমার স্ত্রী একাই শিশুপালন, অসুস্থ স্বামীর সেবা, ও সংসার চালানো সবই করিতে লাগিলেন। আমি তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হই নাই, ইহাতে প্রায় ১৯৩৩ সন কাটিয়া গেল।

আর্থিক দুর্দশা

ছেলেটি লইয়া একদিক হইতে আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। আমি অল্পবয়স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতেই ছোট শিশু কোলে করিয়া রাখিতে ভালবাসিতাম। বালক হইয়াও ছোট ভাইদের কোলে-কাঁখে রাখিতাম। পরে ভাগ্নে-ভাগ্নীদেরও রাখিতাম, এমন কি একটি ভাগ্নী বৎসর-খানেকের না হইলেও আমার কোলে থাকিলে তাহার মার কোলেও যাইতে চাহিত না। আমার পত্নী কিন্তু অতিশয় শিশু অবস্থায় ছেলে-কোলে করিতে অস্বস্তি বোধ করিতেন। সুতরাং যতক্ষণ ছেলে না ঘুমাইত, ততক্ষণ বেশিরভাগ আমিই কোলে রাখিতাম। রাত্রিতেও কাঁথা-ন্যাপকিন বদল-করা আমারই কাজ ছিল। তবে এ-কথাও বলা প্রয়োজন, আমরা ডাক্তার-ভাই-এর নির্দেশ অনুযায়ী ছেলেকে প্রায় সব সময়েই বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতাম, কোলে তুলিয়া কোল-ছাড়া শান্ত-না-থাকার কু-অভ্যাস করাই নাই। আমার পত্নী নিজেই সন্তানকে খাওয়াইতেন—এটা তিনি তিন সন্তানের বেলাতেই সাতমাস পর্যন্ত বজায় রাখিয়াছিলেন। তাহাতে আমার খরচ তো বাঁচিয়াছিলই, তাহার উপর তিনটি সন্তানই রোগমুক্ত ও সুস্থ-সবল হইয়াছিল। নিয়ম বাঁধিয়া সন্তান পালন করার জন্য আমাদের বেলাতে এ-বিষয়ে অসুবিধা কোনোদিকেই হয় নাই।

কিন্তু নূতন পিতৃত্বের আনন্দ সত্ত্বেও আর্থিক অভাবে জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িল। একশো টাকার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়া সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব ছিল। ভাড়াও বাকি পড়িতে আরম্ভ করিল। দারোয়ান আসিয়া বিরস মুখ করিয়া তাগাদা করিত। মাঝে মাঝে বাড়িওয়ালার বাড়িতে গিয়া সময় চাহিতাম। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত বড়লোক। তাঁহার কুকুরের সখ ছিল, আপিসের চকমিলানো উঠানে বারান্দায় সাত-আটটি ডালমাসিয়ান কুকুর বাঁধা থাকিত। তাহারা আমাকে দেখিলেই বাড়ি ফাটাইয়া ঘেউ ঘেউ করিত, বোধ হয়, বুঝিয়াছিল আমি ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে অপরাধী ও প্রভুর বিরাগভাজন। আমি বাঙালী-সুলভ কুকুরভীতি না দেখাইয়া শান্তভাবে আপিসে যাইতাম, সেজন্য ম্যানেজারবাবু একদিন একটু বিরক্তির ভাবেই বলিলেন, 'এতগুলো কুকুর বাঁধা, আপনার একটুও ভয় নেই!' জীবন সবদিকেই প্রায় বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরকে ভয় করিবার মত সৌখিনতার অবকাশ ছিল না। এই জন্তুটির চেয়ে মানুষকেই বেশি ভয় করিতে আরম্ভ করিলাম।

সেটা যে স্বাভাবিক বলিয়া দিতে হইবে না। এই সময়েই বা তার কিছুদিন পরে বাগবাজারের প্রথিতনামা বাঘাবাবুর সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি নানারকম ব্যঙ্গাত্মক ছড়া 'অবতারে' ছাপাইতেন। তাহাদের একটি এইরূপ—

'মেজদাদা মুসোলিনী
আমি হিটলার।'

অর্থাৎ শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র।

তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নীরদবাবু, সংসার কাকে বলে?' এ-রকম কোনো প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহার ধারণা করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছি। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'জানেন না? চতুর্দিকে পাওনাদারবেষ্টিত ভূখণ্ডের নাম সংসার।' তখন 'সংসার' সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা আমারও জন্মিল। দরজায় 'বেলে'র ভয়, চিঠির ভয়, চাকর আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবার ভয়। সুতরাং কুকুরের ভয় দূরে থাকুক, ভূতের ভয়কেও শ্রেয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন সময়ে ১৯৩৩ সনের শেষের দিকে একটা নূতন চাকুরির প্রস্তাব আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। বোম্বাই-এর 'ফ্রী-প্রেস অব ইন্ডিয়া'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বত্বাধিকারী সদানন্দ (তিনি তামিল ছিলেন) 'ফ্রী-প্রেস জর্নাল' বলিয়া একটি দৈনিক খবরের কাগজ চালাইতেছিলেন, ও দুই ব্যাপারেই সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি অন্যান্য শহরেও এক-একটি করিয়া কাগজ বাহির করা মনস্থ করিলেন। কলিকাতায় যেটি বাহির করা হইবে তাহার নাম দেওয়া হইল 'ফ্রী-ইন্ডিয়া'। একটি বাল্যবন্ধুর সুপারিশে আমি উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলাম, বেতন 'প্রবাসী'র বেতনের দ্বিগুণ হইল। আমার গুরুজনেরা খুবই আশ্বস্ত ও খুশি হইলেন, আমিও ভাবিলাম এখন হইতে অর্থসঙ্কট ঘুচিবে।

কিন্তু ফল হইল উহার বিপরীত। একমাসের উপর পরিশ্রম করিয়া কাগজটি বাহির করিলাম। তখন অনেক সময়ে সারারাত্রিও আপিসে থাকিতাম। কাগজটি চলিল না, সদানন্দও টাকা-পয়সা সম্বন্ধে শৈথিল্য দেখাইলেন। কর্মচারীরা মাহিনা না পাইয়া ধর্মঘট করিল। কাগজটি বন্ধ হইয়া গেল। তখন ১৯৩৪ সনের মার্চ মাসের শেষের দিক।

আমার পিতা তখন কাশীতে। এইভাবে আমার বেকার হইবার সংবাদ পাইয়া তিনি লিখিলেন যে, কলিকাতা আসিয়া আমার জন্য কি করিতে পারেন দেখিবেন। এই চিঠিটি লিখিবার পর হার্টফেল করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর। মৃত্যুর সংবাদ টেলিগ্রামে পাইবার পর আমি চিঠিটি পাইয়াছিলাম।

আমার মনে হইল যেন অসহায় হইলাম। পিতার অবস্থা তখন ভাল ছিল না। তিনি যে বিশেষ কিছু আমার জন্য করিতে পারিতেন তাহা নয়। তবু যেন একমাত্র ভরসা হারাইলাম এই ধারণা জন্মিল। ভাবিতে লাগিলাম, এখন হইতে সংসার-সংগ্রাম একা চালাইতে হইবে। তখন আমার বয়স সাতাশের উপর। তবু নিজেকে পিতৃহীন বালক বলিয়া মনে হইল।

আপাতত খরচের ভাবনা কোনক্রমে চুকিল। দুইমাস চাকুরির বেতন পাই নাই। তবে আমি পুলিসের সন্দেহভাজন হওয়াতে জামিন হিসাবে কিছু টাকা সরকারে দিতে হইয়াছিল, আমারই নামে। সেটি আদায় করিলাম।

এই টাকাটা পাইয়া দেনা শোধ করিলাম, কিছু টাকা দৈনিক খরচের জন্য রহিল, অল্প কিছু বাঁচিল তাহা হইতে ছেলের জন্য কয়েকটা বিলাতি খেলনা কিনিলাম। উহার মধ্যে একটি 'লট্‌স্ বিল্ডিং ব্লকস্'—ইহাতে নানা আকারের অনেকগুলি কংক্রীটের টুকরা থাকিত, সেগুলি দিয়া ছোট বাড়ি, ফটক ইত্যাদি বানানো যাইত। ছেলে তখন মাত্র দেড় বৎসরের মত হইলেও মানসিক বিকাশ ও হাত ব্যবহারের দক্ষতা যাহাতে হয় ইহার জন্যই এগুলির জন্য ব্যয় করিয়াছিলাম। ইহাতেই হইল মুশকিল। আমার অতি নিকট এক আত্মীয়া আমার শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর কাছে গিয়া নালিশ করিয়া আসিলেন যে, চাকুরি নাই, উপার্জন নাই, তবু শিশুর জন্য শুধু একটা খেলনার জন্যই পাঁচ টাকা খরচ করিয়াছি।

ইহার পর শাশুড়ি-ঠাকুরাণী যখন দেখা করিতে আসিলেন তখন ব্যাপারটা জানিতে পারিলাম। তিনি আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শুনলাম একটা কি খেলনা পাঁচ টাকা দিয়ে কিনেছ, দেখি?' আমি দেখাইলাম, তখন তিনি বলিতেন, 'তা ভালো, কিন্তু এই অভাবের সময়ে কি এর জন্য খরচ করা উচিত হয়েছে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'তবে শুনুন। আমি যদি সিগারেট খেতাম, মদ খেয়ে, এমন কি অস্থানে গিয়েও টাকা উড়াতাম, তা হলেও আপনারা সঙ্কোচে, আমাদের ধারা অনুযায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কথাও বলতেন না। কিন্তু ছেলের জন্য একটা খেলনা কিনে দিয়েছি বলে আমাকে দোষী করছেন। তা হলে কেন কিনেছি বলি।' ইহার পর হাতের কাজ করার সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশের কি সম্পর্ক সে সম্বন্ধে এক লম্বা বক্তৃতা দিলাম। তিনি অত্যন্ত মন দিয়া শুনিয়া বলিলেন, 'এ তো দেখছি শিক্ষার ব্যাপার, অত্যন্ত দরকারি জিনিস। তোমার...এমন করে বললেন যে, আমি বুঝতে পারিনি, ভাবলুম অপব্যয় করেছ। বাবা, আমার দোষ হয়েছে, কিছু মনে করো না।' তখন রূঢ় উত্তর দিবার জন্য আমিই নিজেকে অপরাধী মনে করিলাম। সকল প্রকার শিক্ষার প্রতি আমার শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল।

তাঁহার উদারতার দৃষ্টান্ত হিসাবে আর একটা ঘটনার কথাও বলি। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলেন, অন্যকেও অপরিষ্কার দেখিলে পীড়া অনুভব করিতেন। একদিন আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, আমার প্রথম পুত্র হামা দিয়া বেড়াইতেছে। তিনি তখনই তাহাকে তুলিয়া লইয়া বলিতেন, 'এ কি, দাদা, তোর হাঁটু যে নোংরা হয়ে গিয়েছে। আয়, ধুইয়ে দি।' আমি সম্মুখে ছিলাম, বলিলাম, 'এক্ষুণি ওকে মেঝেয় নামিয়ে দিন। আপনি আমার ছেলেপিলে নিয়ে 'মেড্‌ল্' করেন যদি তা হলে আপনাকে আমার বাড়িতে আসতে দেব না।' শুনিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'বাবা, আমি কি ছেলেপিলে মানুষ করিনি ?' আমি উত্তর দিলাম, 'নিজের মেয়েদের করেছেন নিশ্চয়, কিন্তু ঠাকুরমা দিদিমারা নাতি-নাতনীকে নষ্ট করে।' অন্য শাশুড়ি হইলে আমার প্রথম আপত্তির পরই হনহন করিয়া বাহির হইয়া যাইতেন, আর জামাইয়ের বাড়িতে পদার্পণ করিতেন না। তিনি আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া ছেলের হাঁটু ধুইয়া মুছিয়া দিলেন।

আমার শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর আচরণ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। তিন বৎসর ধরিয়া যে আমাদের অত্যন্ত অর্থাভাব চলিল, সে সম্বন্ধে একদিনও তিনি মেয়ের সঙ্গেও আলোচনা করেন নাই। শাশুড়িদের পক্ষে জামাতার ঘরসংসার সম্বন্ধে কথা বলা অত্যন্ত অন্যায়, কন্যাকে জামাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা আরও অবাঞ্ছনীয় কাজ। ইহাতে কন্যার জীবনে অশান্তি ভিন্ন আর কিছু আসে না। আমার শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর এই প্রবৃত্তি কখনও হয় নাই।

আমার শ্বশুরমহাশয়ও এই তিন বৎসর সংসারযাত্রা সম্বন্ধে আমাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই, আমি চাকুরির সন্ধান করি না কেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করেন নাই। অথচ তাঁহারা কন্যা-জামাতার অর্থাভাব দেখিয়া যে দুঃখ অনুভব করেন নাই তাহা নয়। কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, জামাতার যে-চরিত্র তাহাতে এই বিষয়ে তাহাকে পীড়াপীড়ি করিলে উহার ফল ভাল হইবে না, ইহাতে মেয়ের দুঃখ বাড়িবে বই কমিবে না। আমার সৌভাগ্য যে, আমি এইরূপ শ্বশুর-শাশুড়ি পাইয়াছিলাম।

চরম দুরবস্থা

উনিশ শ' চৌত্রিশের জুন মাস নাগাদ সব টাকাই ফুরাইয়া গেল। তাহার পর আর স্থায়ী কোনো উপার্জন নাই, লিখিয়া মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাই। কিন্তু তাহাতে সংসার চলিবার কথা নয়। শুধু একটা ভরসা ছিল। ইহার কিছুদিন আগে আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাই বিনোদকে 'প্রবাসী' আপিসে পঁচিশ টাকা বেতনে প্রুফ-রীডারের কাজে ঢুকাইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়াছিলাম। সে প্রতিদিন তাহার বৌদিদিকে একটি করিয়া টাকা আনিয়া দিত। ইহাতেই পরের দিনের বাজার হইত। সৌভাগ্যক্রমে সে-সময়ে পৃথিবীব্যাপী 'ডিপ্রেশ্যন', তাই খাইতে পাইতাম, নহিলে তাহাও জুটিত না। ইহাতেও পত্নীকে অনেক সময় সকলকে খাওয়াইয়া শুধু আচারের তেল দিয়া ভাত খাইতে হইত। আমাকে কখনও এ-কথা বলেন নাই। পরজীবনে জানিয়াছিলাম।

ছেলের দুধের সমস্যা গুরুতর হইল। একটি অযোধ্যাবাসী পশ্চিমা ব্রাহ্মণ দুধের ব্যবসা করিত। সেই দুধ দিত। তাহাকে বলিলাম, 'ভাই, আমার কিন্তু চাকুরি নাই, ঠিক সময়ে দুধের পয়সা দিতে পারিব না। তোমার ইচ্ছা হয় দুধ দাও, নইলে দিও না।' সে উত্তর দিল, 'বাচ্চা দুধ পাবে না তা কি হতে পারে? আমি দুধ দিয়ে যাবো। বাবু, তুমি যেমন যেমন টাকা পাবে আমাকে দিও।' তাহার এই দয়াতেই ছেলে খাইতে পাইয়াছিল। এ-কথা বলিব না যে, মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নাই, তবে সে দুধ বন্ধ করে নাই। চাকুরি হইবার পরও তাহার দেনা শোধ করিতে আমার এক বৎসর লাগিয়াছিল।

তখন আর এক দুশ্চিন্তা দেখা দিল স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তান সম্ভাবনায়। বড় ছেলেটির মাথা বড়, সেজন্য তখনও সে হাঁটিতে পারে না, হামা দিয়া বেড়ায়। এ-সময়ে আর একটি সন্তান হইতেছে জানিয়া শাশুড়ি-ঠাকুরাণী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

কোনক্রমে দিন চলিতেছে, এমন সময়ে ৮ই সেপ্টেম্বর খুব ভোরে স্ত্রী বলিলেন যে, তিনি বেদনা অনুভব করিতেছেন। ডাক্তাররা বলিয়াছিলেন যে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইবে। ভয়ে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। আমার হাতে আনা-বারো মাত্র পয়সা আছে, আর ভাই-এর দেওয়া একটি টাকা বাজার-খরচের। ডাক্তারদের জন্য অবশ্য ভাবনা ছিল না, ডাক্তার ভাই-ই লইয়া আসিবে। কিন্তু ঔষধপত্র কিছুই কেনা হয় নাই। সকলকে খবর পাঠানো হইল। আমি ঘরদোর ঠিক করিয়া বলিলাম, 'এটা ফল্‌স্-পেন্ নয় তো?' স্ত্রী মাথা নাড়িয়া জানাইতে লাগিলেন যে, তাহা নয়। আমার সমস্ত ভরসা লোপ পাইল। নয়টার মধ্যে ডাক্তাররা ও শাশুড়ি-ঠাকুরাণী আসিয়া পড়িবেন। তাঁহারা যদি দেখেন ঔষধপত্রও নাই, তাহা হইলে অপমানের সীমা থাকিবে না। অবশ্য তাঁহারা তখনই আনাইবেন, কিন্তু আমার দোষের স্খালন তো হইবে না। কপাল হইতে ঘাম ছুটিতে লাগিল। আমি প্যাসেজ-এ হাঁটিতে হাঁটিতে স্ত্রীর আর্তস্বর শুনিতে লাগিলাম। সাড়ে আটটা হইয়াছে, হঠাৎ দরজার বেল বাজিল। গিয়া দেখি, সজনীবাবু দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন, 'নীরদবাবু, আপিসে যাচ্ছি, ভাবলাম পথে আপনার প্রবন্ধের টাকাটা দিয়ে যাই।' তিনি তখন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক। আমার কি সঙ্কটে তিনি আসিলেন, তাহা অবশ্য তিনি জানিলেন না। আমি তখনই ভাইকে ডাকিয়া ঔষধ ইত্যাদি আনিতে বলিলাম। সেও সব কিনিয়া বাড়ি ঢুকিল, ডাক্তাররা ও আমার শাশুড়ি-ঠাকুরাণী আমার বড় শ্যালিকা সহ বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, আমি নিশ্চল হইয়া বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এগারোটা নাগাদ বড় শ্যালিকা আসিয়া খবর দিলেন যে, একটি পুত্র হইয়াছে, ও তাহার চেহারা অতি সুন্দর। এবারে প্রসবে কোনও বিপর্যয় হয় নাই।

আমি সকাল হইতে কিছুই খাই নাই। তখনও খাওয়ার অপেক্ষা না-করিয়া বাহির হইয়া গেলাম। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়া বিকালে বাড়ি ফিরিলাম, তখনও অভুক্ত, কিন্তু কোনো ক্ষুধা বা ক্লান্তি অনুভব করি নাই। যে-বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যই দেহে বল ও মনে শান্তি পাইয়াছিলাম।

আমার এই দুঃখের দিনের পুত্রটি আজ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত। সে 'ইকনমিক হিস্টোরিয়ান'। তাহার বিষয়ে সে এমনই বই লিখিয়াছে যে, তাহার জন্য 'প্রফেশর-শিপ' প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তাহার গবেষণার জন্য সে বিশ্ববিখ্যাত। কিছুদিন আগে অক্সফোর্ডের রাস্তায় একটি জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। তখন তিনি সবেমাত্র ইংলন্ডে আসিয়াছেন, ও বলিলেন যে তিনি 'ইকনমিক হিস্ট্রি' পড়ান টোকিওতে। আমি যখন বলিলাম যে, আমার পুত্রও তাই করেন, তখন তিনি তাহার নাম জানিতে চাহিলেন, বলিবামাত্র উত্তর দিলেন যে তাহার বই তিনি জাপানে থাকিতেই পড়িয়াছেন। বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ব্রোডেল্ আমার পুত্রের গবেষণার প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিয়াছেন।

আবার নিজের কথায় ফিরিয়া আসি। বেকার অবস্থা আরও তিন বৎসর মত চলিল। দুঃখ ও অপমানের চূড়ান্ত হইল, তেমনই হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনেক সহায়তাও পাইলাম। ইহাদের কথা পরে বলিব। আগে দুই-একটা দুঃখের কথা বলি। নূতন চাকুরি যাইবার পর কেদারবাবুকে (রামানন্দবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র—তিনি 'প্রবাসী'র কার্যাধ্যক্ষ) গিয়া বলিলাম, আমি আবার 'প্রবাসী'তে যাইতে পারি কিনা। তখন তাঁহারা অন্য লোককে স্থায়ীভাবেই নিযুক্ত করিয়াছেন, সেজন্য উহা সম্ভব বিবেচনা করিলেন না, তবু আমার জন্য তাঁহার সহানুভূতি রহিল।

কিছুদিন পরে তিনি আমাকে জানাইলেন যে, কলিকাতার একটি সুপ্রতিষ্ঠ ছাপাখানার স্বত্বাধিকারীরা বোম্বাই-এর 'ইলাস্ট্রেটেড্ উইকলী'র মত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে চাহেন। তাঁহারা আমাকে উহার সম্পাদকত্ব বেশ ভাল বেতনেই দিতে প্রস্তুত। কেদারবাবু আমাকে এই পরিবারের বড় ভাই-এর সঙ্গে গিয়া দেখা করিতে বলিলেন। আমি এক সন্ধ্যায় গিয়া তাহাই করিলাম। তিনি অতি ভদ্র ও সজ্জন দেখিতে পাইলাম। কিন্তু আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া আলাপ করিলাম। কারণটা এখন হাস্যকর মনে হয়, কিন্তু তখন উপেক্ষা করার মত ছিল না। আমার জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, ডান পায়ের বুড়া আঙুল ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। নূতন জুতা কিনিবার পয়সা নাই। ছেঁড়া জুতা পরিয়াই যাইতে হইল। কথা বলিতে বলিতে কেবল মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা পায়ের বুড়া আঙুল দেখিতেছেন, আমি কেবলই কোঁচা নামাইয়া ঢাকা দিতেছি। এইরূপ অবস্থায় পড়িলে সকলেই নিজের দৈন্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ হইয়া পড়ে।

যাহা হউক আপিসে গিয়া কাজ আরম্ভ করিলাম। মেজো ভাই কর্মকর্তা, তাঁহার নির্দেশেই কাজ করিতে হইবে। সুতরাং সব পরামর্শ তাঁহার সঙ্গেই করিতে হইবে। একদিন তিনি একটা নূতন ছাপার কল বসাইতেছেন, তখন গিয়া তাঁহাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে, যখন তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন, আমি যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করি। আমি তখনই চলিয়া আসিলাম, আর কাজে গেলাম না, যতদিন কাজ করিয়াছিলাম, তাহার পারিশ্রমিকও দাবি করিলাম না। কেদারবাবুকে বা বড় ভাইকেও কিছু বলিলাম না। কেদারবাবু নিশ্চয়ই আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি কোন্ মুখে গিয়া তাঁহাকে বলিব যে, এই ব্যক্তিটি আমাকে অপমান করিয়াছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপমানের কথা উঠে যখন দুই পক্ষ সমান। রাস্তার কুকুর যদি হঠাৎ আমার পায়ে কামড় দেয়, হয় আমি তাহাকে লগুড়াঘাত করিব, অথবা কামড় সহ্য করিব, বলিয়া বেড়াইতে পারি না যে, একটি নেড়ী কুকুর আমাকে অপমান করিয়াছে। এই নিয়ম আমি সারাজীবন পালন করিয়াছি।

কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভিজে না, গাঁজাও ভিজে না। আমরা বাল্যকালে একটা গল্প শুনিতাম। শান্তিরাম নামে এক গেঁজেল ভক্ত ছিল। সে পূজার্চনা করিত না, কেবল ঘুরিয়া বেড়াইত। তাই ভয়ে ভয়ে থাকিত, ও একদিন জিজ্ঞাসা করিল,

'সাধন ভজন পূজন বিনা
আমার গাঁজা ভিজবে কি না?'

সকলে তাহার ভক্তির কথা জানিত, তাই উত্তর দিত,

'শান্তিরাম তুই বগল বাজা
গোকুলে তোর ভিজল গাঁজা।'

কিন্তু আমি ছাপাখানার কর্মাধ্যক্ষের অভদ্রতার উত্তরে যতই বগল বাজাইলাম না কেন, আমার চিঁড়ে বা গাঁজা ভিজিল না। দিন যায়, না তো একটা যুগ যায়। আমার অর্থাভাবের অথবা দুশ্চিন্তার সময়ে আমার একটা উপসর্গ দেখা দিত। আমি সর্বদাই রাত নয়টার সময় ঘুমাইতে যাইতাম ও পাঁচটার সময়ে উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিতাম। কিন্তু সঙ্কটের সময়ে আমার ঘুম রাত বারোটা নাগাদ ভাঙিয়া যাইত ও তিনটা পর্যন্ত আর আসিত না। তখন আমি বারান্দায় হাঁটিয়া বেড়াইতাম। খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস আছে যে, পাপীদের প্রেতাত্মা রাত্রিতে কবর হইতে উঠিয়া নিজেদের পাপকর্মের স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমারও ঠিক সেই অবস্থা হইত।

বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতাম পত্নী দুইটি শিশু লইয়া ঘরের ভিতর পালঙ্কে ঘুমাইতেছেন। ইচ্ছা হইত তাঁহার কাছে গিয়া একটু সান্ত্বনা পাই। কিন্তু তখনই মনে হইত, আমার মানসিক যন্ত্রণা আমারই থাকুক, তাঁহাকে কষ্ট দিই কেন? তাই যাইতাম না।

অবস্থা ফিরিবার পর তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি মনে করতে আমি ঘুমুচ্ছি, তুমি যে হাঁটছো দেখছি না। তা নয়, আমিও জেগে থাকতাম। তবে তোমার কাছে যেতাম না এই জন্য যে, যদি যাই তা হলে দুজনেই ভেঙে পড়ব। তাতে কারো কোনো মঙ্গল হবে না।'

অভাবের উপর আবার আরও বিপত্তি উপস্থিত হইল। ১৯৩৫ সনে কলিকাতায় সরিষার তেলে ভেজালের জন্য খুব বেশি বেরী-বেরী বা 'এপিডেমিক ড্রপসি' দেখা দেয়। স্ত্রীর তাহা দেখা দিল। তাহার উপর চক্ষে গ্লকোমাও হইল, প্রায় দেখিতে পান না। ভাই একদিকে চিকিৎসা করিলেন, ডাক্তার নীহার মুন্সী গ্লকোমা আরোগ্য করিলেন। কিন্তু ইহার পরই আর একটা সাংসারিক বিপত্তি ঘটিল।

আমার চতুর্থ ভাই হিরণ্ময় কোচিনে টাটাদের তেল ইত্যাদির কারখানাতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ভাল বেতনে কাজ করিত। কর্মচারী কমাইয়া দেওয়াতে তাহার চাকুরিটি গেল। তখন তাহার একটি পুত্র, বেকার হইবার পর একটি কন্যা হইল। সেও আমার মত অমিতব্যয়ী ছিল, কিছুই জমায় নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া নিজে বাসা করিয়া থাকিবার সঙ্গতি নাই। সুতরাং সে সপরিবারে আমার বাড়িতেই উঠিল। আমি নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসারই চালাইতে পারি না, তাহার উপর আর একটা সংসার আসিয়া পড়াতে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলাম। তবু, না আমি না আমার পত্নী, কেহই বিপদগ্রস্ত ভাইকে রাখিব না বলিবার কল্পনাও করিলাম না। বাঙালী সমাজে একটা প্রচলিত কথা ছিল—'আমার যদি ভাত জোটে, তোমার জন্যও জুটিবে।' এই ধারণার বশেই ভাইকে রাখিলাম। আশ্রয়মাত্র দিয়াছিলাম, বেশি যত্নে রাখিতে পারি নাই। তখনও দুস্থ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে আমার দুই বৎসর বাকী।

সংসার কি করিয়া চলিল

এখন পেটের ভাতের জোগাড় কি করিয়া হইল বলি। জোগাড় হইয়াছিল, কিন্তু কাহারও কাছে চাহি নাই, চাকুরিও দেখি নাই, বন্ধুস্থানীয় অন্যের স্বতঃপ্রবৃত্ত উদারতার জন্য হইয়াছিল। কিছু অবশ্য নিজেই লিখিয়া উপার্জন করিয়াছিলাম—বাংলাতে ও ইংরেজীতে। তবে ইহাতে সংসার চলিবার কথা নয়। এই অবস্থায় সর্বোপরি অমল হোম মাঝে মাঝে আমাকে কলিকাতা কর্পোরেশনে অস্থায়ীভাবে কাজ দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি উচ্চবেতনে কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট'-এর সম্পাদক ছিলেন। ছুটি লইয়া তিনি আমাকে তাঁহার জায়গায় কাজ করাইয়াছিলেন। আমার মনে হয় যে, সময়ে সময়ে আমাকে সহায়তা করিবার জন্যই ছুটি লইয়াছিলেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। ১৯৩৫ সনে যখন সম্রাট পঞ্চম জর্জের জুবিলী হয়, তখন একটি বিশেষ সংখ্যা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহার জন্য তিন বা চার মাসের জন্য আমাকে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কোনো কোনো বন্ধুদেরও আমি লেখার কাজে সহায়তা করিতাম, তাঁহারা কিছু দিতেন। ইহাতে ঋণ শোধ হইত, কিন্তু দৈনন্দিন খরচের জন্য উপযুক্ত কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত না।

ইহার অল্পদিন পরে—১৯৩৫ সনের শেষে ও ১৯৩৬ সনের প্রথম দিকে একটা স্থায়ী কাজের সম্ভাবনা দেখা দিল। সজনীবাবু তাঁহার এক ধনী বন্ধুর সহযোগিতায় একটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র বাহির করা স্থির করিলেন, ও আমাকে উহার সম্পাদনা করিতে বলিলেন। বলাই বাহুল্য আমি সানন্দে ও মহোৎসাহে এই কাজে লাগিয়া গেলাম। জানুয়ারির শেষে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। পত্রিকাটির নাম দেওয়া হইয়াছিল 'নূতন পত্রিকা'। উহা ভালই হইয়াছিল। কয়েকজন সুলেখক পাইয়াছিলাম, ছবিও (ফোটোগ্রাফ হইতে) উচ্চস্তরের হইয়াছিল। ইহাতে খরচ হইবার কথা। যিনি টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন, তিনি এত খরচ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। পাঁচটি সংখ্যা বাহির হইবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া গেল। সম্পাদকের কাজে আবার ব্যর্থ মনোরথ ও অকৃতকার্য হইলাম। তবে যে-কাজের জন্য যে-টাকার প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত হয় নাই।

কিন্তু দোষ পড়িল আমার উপর। পরজীবনে নিজের আত্মজীবনীতে সজনীবাবু আমাকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন, 'নীরদবাবু ছেঁড়া চাটাইয়ে শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিতেন...' ইত্যাদি। ইহাতে তিনি যে নূতন বড়লোক সেই মনোভাব প্রকাশ হইল বটে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে দুইটা বড় ভুল করা হইল।

প্রথমত, শত দুরবস্থাতেও আমি কখনও ছেঁড়া চাটাই-এ শুই নাই, হয়ত বা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোবার ব্যবস্থা বহু বড়লোকের অপেক্ষাও ভালই ছিল। তাহা ছাড়া আমি 'লক্ষ' টাকার স্বপ্ন কখনও দেখি নাই, পরজীবনে লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেও। যে-ব্যাপারে আমি শক্তিমান নই, সে-বিষয়ে বাসনা রাখা আমি ক্লীবের ধর্ম বলিয়া সর্বদাই মনে করিয়াছি। আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল যে, নিজের উদ্যমে টাকা উপার্জন করিবার ক্ষমতা আমার নাই, সুতরাং সভ্য জীবন যাপন করিবার মত টাকা ভিন্ন আমি বেশি টাকার কামনা কখনও করি নাই। কিন্তু যে-বিষয়ে নিজের শক্তি আছে বলিয়া অনুভব করিয়াছি, সে-বিষয়ে সারাজীবনেও আমি কখনও হারি নাই। হার মানা আমার চরিত্রে নাই।

যাহা হউক, 'নূতন পত্রিকা' বন্ধ হইবার পর স্থির করিলাম, আর চাকুরির ভরসাতে থাকিব না, নিজে লিখিয়াই জীবিকানির্বাহ করিব। ইহাতে মনে যেন নূতন বল পাইলাম। ইহাও দেখিলাম যে, মিথ্যা কল্পনা করি নাই। এই সময়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি আমার লেখার অনুরাগী ছিলেন, এবং আমাকে স্নেহ করিতেন। হয়ত তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আমি অর্থকষ্টে আছি। তাই তিনি আমার কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সিতামৌ রাজ্যের মহারাজকুমার রঘুবীর সিংহ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তিনি মালব অঞ্চলে মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উহা কলিকাতায় ছাপাইবার সংকল্প করিয়া যদুবাবুর পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। যদুবাবু এই বইটির সম্পাদনা ও ছাপার কাজের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। ইহার জন্য আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইয়াছিলাম। ইহাও বলিব যে, এই রাঠোর রাজপুত রাজকুমারের সৌজন্য ও শিক্ষা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

লেখার উপর নির্ভর করিয়া জীবিকানির্বাহে আমি অকৃতকার্য হই নাই। এতদিন পর্যন্ত চাকুরিতে থাকিলেও সারা বৎসরে আমার উপার্জন কিছুতেই পনের-শো টাকার উপর যাইত না, কিন্তু ১৯৩৬ সনের জুন হইতে ডিসেম্বর আসিবার আগেই আমি পনের-শো টাকা পাইলাম। ইহার পর আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এখন হইতে আমি প্রতি বৎসরেই আয় এক হাজার টাকা করিয়া বাড়াইব। সৌভাগ্যক্রমে ইহা কার্যতও দেখা গিয়াছিল। ১৯৩৬ সনে বৎসরে ১৫০০ টাকা হইতে দশ বছরে আমার আয় বৎসরে বারো হাজার টাকার উপরে উঠিয়াছিল, অবশ্য চাকুরিও হওয়াতে। কিন্তু চাকুরি খুঁজি নাই, অন্যের উদ্যোগে আসিয়াছিল। তাঁহাদেরকেও আমি অনুরোধ করি নাই। আমার সব চাকুরিই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছে—১৯২১ হইতে ১৯৫৩ সন পর্যন্ত।

স্বামী-স্ত্রীর আর্থিক সম্পর্ক

এই সম্পর্কটা গুরুতর ব্যাপার। ইহাতে চরিত্রবৈষম্য বা মতবৈষম্য থাকিলে বিবাহিত জীবন কখনও সন্তোষজনক হইতে পারে না। বিলাতে এই ব্যাপারে বর্তমানে যাহা দেখিতেছি তাহা দেশে থাকিতে কল্পনাও করিতে পারি নাই। সে-জিনিসটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টাকাপয়সার পৃথক বন্দোবস্ত।

ইহার সম্পর্কে আমি পরিচিত ইংরেজদের বলি, বিবাহের পর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেনা-পাওনা বা হিসাবের কথা উঠে তাহা হইলে বিবাহ করাই উচিত নয়। এখন অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজ পত্নী স্বাবলম্বিতার গৌরব দেখাইয়া বলেন যে, তাঁহারা নিজের খোরাকপোশাকের জন্য অন্যের গলগ্রহ হইতে চান না। আমি এখনও এই শ্রেণীর ইংরেজ মহিলাদের বলিবার অবকাশ পাই নাই যে, তাঁহারা যদি মাতৃত্বের ও আনুষঙ্গিক (না মুখ্য ?) সুখের জন্য স্বামীর গল (বা অন্য স্থান)-গ্রহ হইতে পারেন, তাহা হইলে তুচ্ছ জীবিকার জন্য হইতে আপত্তি কি ? আমি এইটুকু বুঝি যে, বিবাহের সময়ে যখন উভয়েই বলিয়াছিলাম—'যদস্তু হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব', তখন 'যদস্তু অর্থং মম, তদস্তু অর্থং তব' তাহা বলিতেও আপত্তি হইতে পারে না। অর্থ তো হৃদয়ের চেয়ে বড় জিনিস নয়। একটা কড়া কথা বলিতে ভয় পাই না যে, অর্থ সম্বন্ধে স্ত্রীর স্বাবলম্বিতার বড়াই অর্থগৃধ্নুতা ভিন্ন আর কিছুরই লক্ষণ নয়। অবশ্য 'আমি স্বামীর চেয়ে টাকা বেশি ভালবাসি' এ-কথাটা বলা সহজ নয়।

এরপর এই দুঃসময়ে আমরা স্ত্রী-পুরুষে কার্যত কি করিয়াছিলাম তাহা বলি। কোনো পরামর্শ না করিয়াই দুজনেই একভাবে চলিলাম, আমরা টাকাপয়সা সম্বন্ধে বা জীবিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। দুজনেই বুঝিলাম, যে-অভাব অনিবার্য তাহার সম্বন্ধে কথা বলিলে তিক্ততা বাড়িবে মাত্র, কোনো লাভ হইবে না।

প্রথমত, আমি কেন চাকুরির সন্ধান করি না—এই প্রশ্ন এই তিন বৎসরে আমার স্ত্রী আমাকে কখনও করেন নাই, এ-বিষয়ে পীড়াপীড়ি করা দূরে থাকুক। আমি নিজে যে-কারণে চেষ্টা করিতাম না, উহা তাঁহাকে তখন বলি নাই, হয়ত তিনি কারণটা কি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং কৈফিয়ৎ চাহিবার বা দিবার প্রয়োজন হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, টাকাপয়সা সম্বন্ধে পরস্পর কথাবার্তা না বলিয়া অভাব দেখিলে আমি বা তিনি একটা কিছু করিতাম। তবে তিনি শ্বশ্রূমাতা ভবানীপুরে থাকিলেও তাঁহাদের কাছে গিয়া কখনও পাঁচ টাকা চাহেন নাই। পরে তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন, 'বাবা তোমাকে সুপাত্র ভেবে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, আমি কি করে তাঁর কাছে গিয়ে এমন সব ব্যাপার জানাবো যাতে তাঁর মনে হবে যে, তিনি ভুল করেছিলেন ?'

তৃতীয়ত, আমি জীবনে কি করিব, না করিব সে-বিষয়ে কোনো দিন, তিনি প্রশ্ন করেন নাই, দুইটি ব্যতিক্রম ছাড়া। একটা কথা তিনি একদিন বলিলেন, 'তুমি অন্যের জন্য যে বই লিখে দিচ্ছো, তাতে তো তাদের প্রতিষ্ঠা আর নাম হচ্ছে। তুমি নিজের বই লেখ না কেন ?' আমি উত্তর দিয়াছিলাম, 'আমার নিজের বই অন্য রকমের হবে। এ-ধরনের বই আমি প্রতি ছয়মাসে একটা করে লিখতে পারি। আমার বই যা হবে তা লিখতে সময় লাগবে।' সময় অবশ্য দশ বছরের বেশি লাগিয়াছিল। তবে সম্ভবত, আমি আসলে কি লিখিতে পারি তখন দেখাইয়াছিলাম।

ইহার উপর তিনি একটি পরামর্শ দুই বার দিয়াছিলেন। তাহাতে মনে হয় আমার জীবনের গতি ও সার্থকতা সম্বন্ধে আমার অপেক্ষাও তাঁহার মনে ঠিক অনুভূতি জন্মিয়া ছিল। বিবাহের তিন-চার বছর পরেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'চলো, আমরা কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাই। এখানে তোমার কিছুই হবে না, কেউ তোমাকে উঠতে দেবে না।' অন্যকে দায়ী না করিয়াও আমি বুঝিতাম যে, কলিকাতায় থাকিলে আমার জীবন গতানুগতিক বাঙালী ধারাতেই চলিবে এবং সম্ভবত শীঘ্রই অবসানও হইয়া যাইবে। তবু উত্তর দিতাম, 'দেখ, যেখানে উপার্জন সেখানে লোক থাকতে বাধ্য হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার তো কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও জীবিকার সংস্থান করার ক্ষমতা বা উপায় নেই। সুতরাং এখানে থাকতেই হবে।' দৈবক্রমে আমার চেষ্টা ছাড়াও ভারত গভর্নমেন্টের (অবশ্য ইংরেজের) প্রস্তাবেই আমার দিল্লী যাওয়া ঘটিয়াছিল। উহার পর আর কলিকাতায় ফিরি নাই।

এই ধরনের পরামর্শ তিনি ১৯৪৬ সন হইতে দিল্লীতেও দিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, 'এই দেশে থেকেও তোমার কিছু হবে না, চলো আমরা বিলেত চলে যাই। তুমি আগে গিয়ে দেখ কিছু করতে পারো কিনা, আমি ছেলেদের নিয়ে আপাতত দিল্লীতে থাকি। পরে সুবিধে হলেই সবাইকে নিয়ে আমিও চলে যাবো।' আমি তখনও নাচার হইবার ওজরই দিতাম, বলিতাম, 'এখানে ভাল মাইনের চাকুরিতে আছি। ছেলেদের শিক্ষা বলতে গেলে আরম্ভও হয়নি। এই অবস্থায় নিশ্চয়তা ছেড়ে অনিশ্চয়ের পিছনে যাওয়া কি উচিত হবে?' তবে তাঁহার এই যে পরামর্শ উহার অনুযায়ীও আমার জীবন চলিয়াছে; অবশ্য এটাও অন্যের উদ্যোগে। নিজের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, ১৯৪৭ সনে আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়া আমি বিলাত আসার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলাম।

এখন বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার জীবনে প্রকৃত প্রস্তাবেই যে সার্থকতা আসিয়াছে, ও আমি স্থায়ী কাজ যাহা রাখিয়া যাইব, তাহার মূলে আছে তাঁহার দুইটি পরামর্শ অনুযায়ী আমার জীবনের গতি। কলিকাতায় বা দিল্লীতে থাকিলে আমার বড় কাজ সম্পূর্ণ হইত না। আমাদের দুজনের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে শুধু আর একটা ঘটনার কথা বলিব। একবার অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িয়া তিনি আমাকে না-জানাইয়া গহনা বন্ধক রাখিয়া সুপ্রতিষ্ঠ বাঙালী মহাজনের কাছ হইতে কিছু টাকা কর্জ করিয়াছিলেন। ছয়মাস পরে প্রায় দুইশত টাকা সুদ দিয়া আমি সেই গহনা ছাড়াইয়াছিলাম। 'পুঁজিবাদী'র হাতে এইভাবে ও এ-ছাড়াও ক্রমাগত নিষ্পীড়িত হইয়াও আমি বাঙালী কম্যুনিস্ট হই নাই, ইহাই আমার নিজের বড় অহঙ্কার। ইহা 'বাঙালী' না থাকিয়া 'মানুষ' হইবার অহঙ্কার।

শেষ প্রশ্ন ও জবাবদিহি

চাকুরি সম্বন্ধে নিষ্কাম হইবার পর, ১৯৩৭ সনের গোড়ার দিকে এই চাকুরির ব্যাপারেও আমার কপাল ফিরিল। আমার কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া মার্চ মাসে আমার একটি চাকুরি জুটাইয়া দিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী লাহা পরিবারের ডাঃ সত্যচরণ লাহা তখন কলিকাতার শেরিফ হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ইত্যাদি লিখিবার জন্য একজন লেখকের প্রয়োজন হইয়াছিল। ডাঃ লাহার সেক্রেটারি সত্যেনবাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল। তিনি ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু—যাঁহাদের সহিতও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—তাঁহারা আমার অবস্থা জানিয়া কিছুদিন হইতে কি করিতে পারেন তাহার জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। এই সুযোগে তাঁহারা আমার জন্য ডাঃ লাহার কাজটি জোগাড় করিয়া দিলেন। বেতন বেশি না হইলেও একটা নিয়মিত উপার্জনের ব্যবস্থা হইল। ভাবিলাম এখন সব দায় ধীরে ধীরে সামলাইয়া লইব।

কিন্তু ধীরে ধীরে সামলাইবার অবকাশ ঘটিল না। আমার নূতন চাকুরিও হইল, বাড়িওয়ালাও আমার নামে বাকী ভাড়ার জন্য মোকদ্দমা করিয়া বসিল। যতীন্দ্র ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উকিল, 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাতেও লিখিতেন ; তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। তিনিই এই মামলার ভার নিলেন, উহাতে আদালতে গিয়া দাঁড়াইবার লাঞ্ছনা হইতে আমি ত্রাণ পাইলাম। তিনি বাড়িওয়ালার উকিলকে বলিলেন যে, আমার এখন চাকুরি হইয়াছে, সুতরাং ভাড়া দিতে পারিব এবং বাকীও শোধ হইবে। কিন্তু বাড়িওয়ালার ম্যানেজার কিছুতেই মানিলেন না। পরে শুনিয়াছিলাম বাড়িওয়ালার দারোয়ানও আমার হইয়া ওকালতি করিয়াছিল। সে নিজেই আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি বলিতাম, যে-ব্যক্তি 'দো লেড়কা দো নকর' রাখে সে কখনও উপায় থাকিলে ভাড়া ফেলিত না।' যাহা হউক, যতীন্দ্রবাবু বাকী ভাড়া ও মোকদ্দমার খরচের জন্য কিস্তি লইলেন। আমি দুই মাস নিয়মিত দিবার পর বাড়িওয়ালার উকিল যতীনবাবুকে বলিলেন, "আপনার মক্কেল তো দেখছি একেবারে Unintelligently honest। আমরা ধরেই নিয়েছিলুম, এক কিস্তি দিয়েই তিনি ঠিকানা না-দিয়ে ফেরারী হয়ে যাবেন।' তবে তাঁহারা মোকদ্দমা কেন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ আমি আজও বাহির করিতে পারি নাই।

শান্তিতে সংসার চলিতে আরম্ভ করিল। জুলাই মাসে সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আরও বেশি মাহিনায় শরৎচন্দ্র বসুর সেক্রেটারির কাজ জোগাড় করিয়া দিলেন। দুইটি কাজই রহিল। তখন হইতে বেশ সচ্ছল হইলাম, নিজের এবং স্ত্রীর দুঃখমোচন হইল।

তবুও জবাবদিহি করিবার আছে। পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমি নিজে উপার্জন সম্বন্ধে উদাসীনতা ও অবহেলা দেখাইয়া সুবিবেচনার কাজ করিলাম কিনা ; আরও গুরুতর প্রশ্ন—নিজে যতই কষ্ট করি না কেন, স্ত্রীকে এইভাবে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত হইয়াছিল কিনা। দুইটিই সঙ্গত প্রশ্ন। উহাদের উত্তর একে একে দিতেছি।

প্রথমত, আয় ও অর্থ উপার্জন সম্বন্ধে আমার যে ধরনের আলস্য, উদ্যমহীনতা ও অবহেলা ছিল তাহাতে বিপদে না পড়িলে আমি আয় বাড়াইবার চেষ্টা কিছুতেই করিতাম না, যে-স্বল্প-আয়ে জীবিকা চলিতেছিল সেই আয়েই চলিত। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি, ১৯২৬ সনে সরকারি চাকুরি না ছাড়িলে আমি নিশ্চয়ই উচ্চ বেতনে পৌঁছিয়া, উপযুক্ত পেনশন পাইয়া নিউ আলিপুরে না পারিলেও যাদবপুরে বাড়ি করিয়া কেওড়াতলার ঘাটে পৌঁছিতাম। কিন্তু তাহা কি লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অক্সফোর্ড ক্রেমেটোরিয়ামে যাওয়ার তুল্য হইত ? সেদিন 'ডেলী টেলিগ্রাফ' কাগজের প্রতিনিধি আসিয়া প্রায় তিন ঘন্টা কথাবার্তা বলিয়া আমার obituary-র জন্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় থাকিলে 'স্টেট্‌সম্যান' বা 'টুডে'র প্রতিনিধিও আসিতেন না। একটা কথা বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম—'যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে।' আমিও তাই দুঃখের মাটির উপর ভয় করিয়াই ক্রমাগত উপরে উঠিয়াছি—জীবনে স্থায়ী বা ক্রমিক অবনতি আমার কখনও হয় নাই। আর ইহাও দেখিয়াছি যে, যখনই আমি সাবধানতা ও সুবিবেচনা দেখাইয়াছি তখনই আমি ঠকিয়াছি, আর যখনই বেপরোয়া হইয়াছি তখন জিতিয়াছি।

এটা আমার দিক হইতে সাফাই হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীকে এইরূপ অর্থাভাব ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলিবার কোনো অধিকার আমার কি ছিল ? বলিব—নিশ্চয়ই আমার ছিল না, কিন্তু তিনি নিজে গ্রহণ করিলে আমার দোষের অনেকটা স্খালন হইবে। যদি এই দুরবস্থার দিনে একবারও শুনিতাম যে, তিনি পীড়া বোধ করিতেছেন ও অভাব-অনটন তাঁহার সহ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে সেইদিনই তাঁহাকে পিত্রালয়ে গিয়া থাকিতে বলিতাম। তাঁহার পিতা ধনী ব্যক্তি ছিলেন, দুরবস্থাগ্রস্ত কন্যাকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিশ্চয়ই দিতেন। কিন্তু আমার পত্নী এইভাবে কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার কল্পনাও করেন নাই। শুধু এই বলিব, তখন আমার অপরাধ সত্যই হইয়াছে, তবে তিনিই উহার ভার কমাইয়া দিয়াছেন। ফলে তাঁহার দিক হইতেও জীবন সুখেরই হইয়াছে। জীবনের প্রথম দিকে আর্থিক সুখে থাকিয়া জীবনের শেষে ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতার অনুভূতি ভাল, না তাহার বিপরীত হওয়া ভাল? আশা করি আমাদের দুজনেই ইহার উত্তর কি দিব সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ জাগিবে না। আমার কৃতিত্বের চেয়ে আমার দুঃখকে আমি কম গর্বের কথা বলিয়া মনে করি না। এই অনুভূতি আমার অল্পবয়সে হয় নাই, তবে যাহা হইতে উহা আসিয়াছে সেই গানটি আমি বাল্যকালে প্রায়ই গাহিতাম। উহার প্রথম কথাগুলি এই—'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি। তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি॥'

তবে একটা বিষয়ে আমরা দুজনেই বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁহার কথা বলিতে পারি না, জিজ্ঞাসা করি নাই—কিন্তু আমার দিক হইতে বলিব একটা দুঃখ আমার মনে থাকিবে জীবন থাকা পর্যন্ত। আমাদের বিবাহিত জীবনে প্রেমের ফল নিশ্চয়ই ফলিয়াছে। কিন্তু প্রেমের ফুল পূর্ণবিকশিত হইবার অবকাশ কখনও পায় নাই। সকলেই জানে যৌবনসরসী নীরে মিলন-শতদল সর্বদাই টলমল করে, কিন্তু নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে মরিয়া যায় না। দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আঘাতে আমাদের বিবাহিত জীবনের ফুল কখনও পূর্ণবিকশিত হইতে পায় নাই, বিকচোন্মুখ হইয়াই মরিয়া যাইত। কোন্ অপরাধে আমাদের সমাজ আমাদিগকে জীবনের এই সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, তাহার কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

মানুষের জীবন কি-ভাবে দেবোত্তর সম্পত্তি

দেবোত্তর সম্পত্তি কি তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়াছি। এখন আমার শেষ বক্তব্য উপস্থাপিত করিবার আগে দেবোত্তর সম্পত্তির সহিত আমার কি করিয়া ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ পরিচয় হইল তাহা বলি। আমার পিতা একটি দেবোত্তর সম্পত্তির সেবায়েত ছিলেন, সুতরাং আমিও একদিন এইরূপ সেবায়েত হইব এই সম্ভাবনা ছিল। তাই আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তির ইতিহাস জানিতাম।

আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী (অনুমান বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কিংবা তাঁহার জামাতা— যিনি পরে নবাব হন তাঁহার সমকালীন।), তিনিই কিছু ধনসম্পত্তি করিয়া ভাইদের হইতে পৃথগন্ন হইয়া পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া একটা নূতন বাড়ি করেন। আমাদের সময়ে আদি বাড়ির নাম ছিল, 'পুরান-বাড়ি' আমাদের বাড়ির নাম ছিল 'নয়া-বাড়ি' বা সাধু ভাষায় 'নূতন-বাড়ি'।

সম্পত্তিবান হইয়া সেকালের প্রথামত কীর্তিনারায়ণ একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহা কালীর পূজার জন্য, স্থান হইল ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে মঠখলা বলিয়া একটি গ্রামে। এই গ্রাম এগারসিন্দুরের কিছু পুবে। এগারসিন্দুরে মানসিংহের সহিত শেষ পাঠান নেতা ওসমানের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া জানিতাম। এই ওসমানই 'দুর্গেশনন্দিনী'র ওসমান। শুনিয়াছিলাম, ওসমান তাহার অনুচর পাঠানদের লইয়া ঈশ্বরগঞ্জের কাছে 'বোকাইনগরে' বাস করিতে আরম্ভ করে। আমাদের বংশের সঙ্গে মোগলদের পূর্ববর্তী পাঠান সামন্তদের যোগাযোগ ছিল। কীর্তিনারায়ণ, যতদূর শুনিয়াছিলাম, বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া পাঠান ঈষা খাঁর বংশধরদের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

মঠখলার কালীর মন্দিরে কালীর পূজা এবং সেবা অব্যাহত রাখিবার জন্য কীর্তিনারায়ণ তাঁহার সম্পত্তির একভাগ দেবোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন। দেবীর সেবার জন্য যথারীতি ব্যয় করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত তাহা সেবায়েত হিসাবে আমরা পাইতাম। পূজা ইত্যাদি দায়সারা ভাবে করা হইত না। বার্ষিক দুর্গাপূজার সময়ে এত পাঁঠা বলি হইত যে, উহাদের রক্ত স্রোত বাহিয়া কিছুদূরে পুষ্করিণীতে পড়িয়া জলকে রক্তবর্ণ করিত।

আমি সেই দৃশ্য দেখি নাই। পুষ্করিণীটি দেখিয়াছি। কালীর মন্দির ও প্রতিমা তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিতামই। তবে আমি জীবনে চারবার মাত্র মঠখালায় গিয়াছি। দুইবার ১৯১০ সনে, অন্য দুইবার ১৯১৩ সনে। শেষ দেখা ১৯১৩ সনের বর্ষাকালে। কলিকাতা যাইবার পথে সেখানে গিয়াছিলাম, সিঙ্গুয়া নদী ধরিয়া নৌকায়। সেই নৌকাযাত্রা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, এখন পর্যন্ত তাহার স্মৃতি মনে গাঁথিয়া আছে।

সন্ধ্যার আগে মঠখলার মাইলখানেক উত্তরে খামা বিলে ঢুকিলাম। এই বিলটি সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত ছিল। একটি ছোট হ্রদের মত, উহার জল অতি নির্মল ছিল। যখন পৌঁছিলাম তখন হাওয়া ছিল না, হ্রদটাকে একটা বিশাল আয়নার মত দেখা যাইতেছিল। ছই-এর বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি বিল ও চারিদিকের দৃশ্য মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলাম। মাঝামাঝি আসিবার পর সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা ও কাঁসরের ধ্বনি কানে আসিল। মাঝি বলিল, আপনাদের কালীবাড়িতে সন্ধ্যাপূজা আরম্ভ হইয়াছে। উহার দূরাগত ধ্বনি মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ভক্তিতে মাথাকে নত করিয়া দিল।

এর আগে ফরাসী চিত্রকর মিলে-র আঁকা একটি বিখ্যাত চিত্রের প্রতিলিপি দেখিয়াছিলাম। উহাতে একটা চষা ক্ষেতের দৃশ্য ছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এক কৃষকদম্পতি কাজ শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিবে, এমন সময়ে গ্রামের গির্জা হইতে ঘণ্টাধ্বনি আসিল। সেখানে সান্ধ্য-উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। কৃষক ও তাহার পত্নী জোড়হাতে প্রার্থনায় যোগ দিল। আমাদের কালীবাড়ির ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া আমার মনেও সেইরূপ ভাব জাগিয়াছিল।

এখানে অবান্তর প্রসঙ্গ হইলেও একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। পরজীবনে ফ্রান্সে গিয়া আমি মিলে যে-গ্রামে থাকিতেন তাহাতে তাঁহার সামান্য কুটিরটি দেখিয়াছিলাম। উহা ফঁতেনব্লু শহরের উপকণ্ঠে, ফঁতেনব্লুর বিখ্যাত বনের প্রান্তে। মিলে নিজের বিশ্বাসমত চিত্র আঁকিবার জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়া সেই গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। উহাতে গিয়া কর্তব্য-কাজে জীবনকে উৎসর্গ করিবার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। গ্রামটির নাম বারবিজোঁ। এখন সেই গ্রামটি মিলে-র নিজের ও তাঁহার সহকর্মীদের কর্মক্ষেত্র বলিয়াই বিখ্যাত। তাঁহাদের চিত্রাঙ্কনরীতিকে Barbizon School বলা হয়। আর একটা আশ্চর্যের কথা, বারবিজোঁর চারিদিকের দৃশ্য অনেকটা পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য দৃশ্যের মত মনে হইয়াছিল। এই আবেষ্টনে মিলে নিজের জীবনকে দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে আমার মনে জীবিকার্জন বা অর্থোপার্জনের কথা একেবারেই জাগিত না। ভাবিতাম, দেশের সেবাই আমার প্রথম ও সর্বোচ্চ কৃত্য। জীবন যে দেবোত্তর সম্পত্তি তাহা তখন বুঝি নাই, বুঝিবার ক্ষমতাও হয় নাই। তবু অজ্ঞাতসারে এই ধারণাটা জাগিয়াছিল যে, জীবনকে দেবোত্তর সম্পত্তির মত করিতে হইবে। সেই সম্পত্তির দেবতা হইবে দেশ। ইহার পর অন্য আদর্শ এবং লক্ষ্য দেখা দিয়াছে, কিন্তু কৃত্য যাহাই হউক, জীবন যে সেই কৃত্য সাধনের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি এই ধারণা আমার মন হইতে কখনই লোপ পায় নাই। আমি সর্বদাই মনে করিয়াছি আমার জীবনের উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই।

এই কথাটাই আমি কাহাকেও বুঝাইতে পারি না। বুঝিলেও প্রায় কেহই আমার ধারণাটা গ্রাহ্য বলিয়া মনে করে না। দুইটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিতেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দাদা, চারুচন্দ্র চৌধুরীর ১৯৮৭ সনে মৃত্যুর পর আমি অক্সফোর্ডে তাঁহার দৌহিত্রীর সহিত (তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যার কন্যা) তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। মেয়েটি বাল্যবয়স হইতেই আমেরিকার একটি বিখ্যাত মেয়েদের স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছিল। তাহাকে বলিলাম, 'দাদার জন্য আমার বড় দুঃখ। তিনি সব বিষয়ে— বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রের দৃঢ়তায়, মনের স্থৈর্যে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ কিছুই করিলেন না, কিছুই রাখিয়া গেলেন না।' অবশ্য তিনি ওকালতি করিয়াছিলেন ; বড় চাকুরিও করিয়াছিলেন ; পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিদগ্ধ ও বিদ্বান বলিয়া সম্মানিত হইতেন। তবু জীবনের প্রকৃত কৃত্য সম্বন্ধে তাঁহার কোনও উদ্যম দেখি নাই। তাঁহার চরিত্রে একটা রুদ্ধদ্বার ছিল— তিনি অন্তর্মুখীন ছিলেন, কখনই বহির্মুখীন হইতে পারেন নাই। অবসর সময়ে তিনি বসিবার ঘরে ফ্যানের নীচে বসিয়া বই পড়িতেন। বহু বই কিনিয়াছিলেন, বিলাতি সাহিত্যিক পত্রিকাও রাখিতেন।

আমার কথার উত্তরে দৌহিত্রী বলিল, 'তিনি যদি ইহাতেই সুখ পাইয়া থাকেন, ইহাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন, এইভাবেই জীবন যাপন করিয়া সার্থকতার অনুভূতি পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে দোষী করিতেছেন কেন ? প্রত্যেক ব্যক্তিরই তো ইচ্ছামত নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার আছে।'

আমি তাহার এই উত্তরে কিছুমাত্র আশ্চর্য হই নাই। উহা তাহার আমেরিকান শিক্ষা হইতে আসিয়াছিল। মানুষের জীবন সম্বন্ধে আমেরিকান ধারণাই—ধারণাই বলি কেন, ইহা আমেরিকানদের 'জীবনবাদ'—এই ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মপরায়ণ হইতে পারে। পূর্বে এই আত্মপরায়ণতা দেখা গিয়াছিল অর্থপরায়ণতায়, যাহার ফলে রকেফেলার এবং ফোর্ডের মত অর্থস্রষ্টা দেখা দিয়াছিল। বর্তমান আমেরিকান আত্মপরায়ণতা সকল বিষয়ে উপভোগের অসংযমে প্রকাশ পাইতেছে। ইংরেজী ভাষায় যাহাকে Self-indulgence বলে, তাহার চরম রূপ আমেরিকানদের মধ্যে দেখা যায়।

এই 'জীবনবাদ', আমেরিকানদের জাতীয় জীবনের ধারা যাহা হইবে তাহার প্রথম ঘোষণা হইতেই আসিয়াছে। উহা তাহাদের Declaration of Independence-এর মধ্যেই নিবদ্ধ হইয়াছিল। এই ঘোষণার তারিখ, ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬ সন। উহাতে অন্য বহু কথার মধ্যে এই কথাগুলি পাই— 'All men are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, among them are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.' মানুষের জীবন সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা অসত্য ও ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু হইতে পারে না।

ইহাই যদি ভগবানের বিধান হয়, তবে মানুষ মৃত্যুর অধীন কেন ? আজীবন পেটের ভাতের দায়ের দাস কেন ? তাহার জীবনে দুঃখ অনিবার্য কেন ?

আর একটি বাঙালী মেয়ে আমেরিকায় গিয়া শিক্ষা পায় নাই, সেও আমার কথা মানিয়া লইতে পারে নাই। উহার প্রধান কারণ তাহার পিতৃভক্তি। সে বিখ্যাত পণ্ডিত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা। আমি দেবপ্রসাদবাবু সম্বন্ধে দুঃখ করিয়াছিলাম যে, তাঁহার গণিত সম্বন্ধে এরূপ প্রতিভা ছিল যে, তিনি অন্ততপক্ষে রামানুজের মত হইতে পারিতেন, আজিকার দিনে যাঁহারা বিশুদ্ধ গণিতে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের মধ্যেও গণ্য হইতে পারিতেন ; তবে তিনি গণিত ছাড়িয়া রাজনৈতিক দলাদলিতে যোগ দিলেন কেন ? দেবপ্রসাদ-কন্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিলেন,—ইনি বিলাতপ্রবাসিনী, দেশবাসিনী নন— 'তিনি ইহাতেই যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাই প্রীতিকর মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন দিকে তিনি দোষী।'

আমি উত্তর দিলাম, 'এইরূপ কথা বলিবার অধিকারই কোনো মানুষের নাই। ব্যক্তিবিশেষের নিজের তৃপ্তি বা সন্তোষই মানবজীবনের সার্থকতার একমাত্র জবাবদিহি নয়। যে-ব্যক্তি একটা বিশিষ্ট শক্তি লইয়া জন্মিয়াছেন তাঁহার প্রধান কর্তব্য সেই শক্তির চর্চা করিয়া উহাকে পূর্ণ বিকশিত করা। যে-ই বা যাহাই তাঁহাকে এই শক্তি দিয়া থাকুক— তিনি নিজে উহা সৃষ্টি করেন নাই— সেই দাতার কাছে তিনি ঋণী। সেই ঋণ শোধ করা তাঁহার কর্তব্য। উহা শোধ না করিলে তিনি অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক।'

কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরই জীবন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা নাই, এমন কি জীবনের মূল্য বা লক্ষ্য কি তাহা বিচার করিবার মত বুদ্ধিও নাই। শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও নিজের জীবন সম্বন্ধে এই প্রশ্ন জাগে না। 'আত্মানম্ বিদ্ধি' নিজেকে জানিবে— এই যে নির্দেশ হিন্দুদের মধ্যে ছিল, এবং সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির একই প্রতিশব্দে ছিল, এই নির্দেশ সম্বন্ধে উদাসীনতার প্রধান কারণ এই— সভ্য মানুষ মাত্রেই একটা পূর্ণগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের ধারার অধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার কাছে এই ধারাই যথেষ্ট, এই ধারা অনুযায়ী যদি সে জীবন যাপন করে, তাহা হইলে জীবন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন নাই ইহা মনে করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

এইরূপ যতগুলি জীবনের ধারা সভ্য মানুষের মধ্যে দেখা গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে একটা ধারণা অকাট্য সত্য বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, যাহার ফলে সকলেই এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য বা সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবার আবশ্যক নাই, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাইয়া গেলেই জীবন সার্থক হইবে।

এই বিশ্বাস এবং বিশ্বাসপ্রসূত আচরণের মধ্যেও আর একটা দৃঢ়বদ্ধ ও চিরপ্রচলিত ধারণা আছে। তাহা এই— মানুষ বিশ্বে অথবা বিশ্বের যে অংশে, অর্থাৎ পৃথিবীতে যে অস্তিত্বলাভ করিয়াছে উহা তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নয়, উহা তাহার প্রবাস মাত্র। তাহার সত্যকার বাসস্থান অন্যত্র, সে বাহির হইতে পৃথিবীতে আসে, এবং কিছু কাল পৃথিবীতে প্রবাসী থাকিয়া তাহার সত্যকার বাসস্থানে, সত্যকার এবং অনন্ত অস্তিত্ব যেখানে তাহাতে ফিরিয়া যায়। এই ধারণা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও প্রচার করিয়াছেন তাঁহার বিখ্যাত কবিতা ''Ode on Intimations of Immortality''-তে। তিনি লিখিয়াছেন,—

'Our birth is but a sleep and a forgetting;
The Soul that rises with us, our life's Star,
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar;
Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home.'

মানুষের জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথেরও এই ধারণাই ছিল, তিনি বহু কবিতায় উহা বলিয়াছেন। প্রথমে শেষ বয়সের উক্তি উদ্ধৃত করিব—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে,
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"'

তিনি অতি-অল্প বয়সেও, একুশ বৎসর বয়সেও লিখিয়াছিলেন,—

'কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে।
শ্রান্তদেহ আর চলিতে চাহে না
বিঁধিছে কণ্টক চরণে,
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে
এখন ফিরিব কেমনে।'

এই গানটা শিশুকাল হইতেই আমার মাতার মুখে শুনিতাম। বড় হইয়াও নিজেই অনেক দিন গাহিয়াছি। চোখে জল আসিত। আরও বড় হইয়া খোলা উঠানে শুইয়া দূরবীন চোখে দিয়া সারা আকাশ খুঁজিতাম, সেই গৃহের সন্ধানে।

এই শিক্ষা সকল ধর্মই দিয়াছে। ধর্ম শব্দটা এখানে আমি ইংরেজী religion অর্থে ব্যবহার করিতেছি, সংস্কৃত ভাষার অর্থে নহে। সকল ধর্মই বলে, যে-জগতে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জীবনযাপন করি, উহা ইহলোক মাত্র, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কালের জন্য উপস্থিত জগৎ, আসল জগৎ, অনন্ত এবং চিরস্থায়ী জগৎ পরলোক। 'ঐহিক' ও 'পারত্রিক' এই দুটি শব্দ এই বিশ্বাস হইতে আসিয়াছে। কেহই ঐহিক কল্যাণকে পারত্রিক কল্যাণের সমান মনে করে নাই।

এই বিশ্বাসের বলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম ইহজগৎকে পাপপুরী বলিয়া শিক্ষা দিয়াছে। এই ধর্ম বলে, এই জগৎ এমন যে, তাহাকে শুধু ভয় ও ঘৃণা করিতে হইবে। বাইবেলে আছে—এই জগতে যাহা কিছু আছে তাহা ভগবানের নয়, শুধু মানুষের অহং-জ্ঞানের স্পর্ধা। সেজন্য খ্রীষ্টান শিশুদের গড়্-ফাদার ও গড়্-মাদার তাহাদের শিক্ষা দিত যে, তাহারা 'should renounce the devil and all his works, the pomps and vanity of this wicked world.'

এই ধরনের শিক্ষার ফলে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মানুষের জীবনে এক নিরসনীয় ও ভয়াবহ দ্বিত্ব দেখা দিয়াছিল, তাহাকে জগতে বাস করিতেই হইবে, এমন কি বলা হইল যে, আত্মহত্যা মহাপাপ, অথচ সেই সঙ্গে বলা হইল যে, ইহজগৎ পাপপুরী, ইহাতে বাঞ্ছনীয় কিছুই নাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষাও মূলত বিভিন্ন নয়। দুই ধর্মই বলিয়াছে, কর্মমাত্রই মানষকে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া মুক্তি হইতে বঞ্চিত করে।

ইহা ছাড়া, সকল খ্রীষ্টধর্মীয়, যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও ঈশ্বরপ্রাণ, তাঁহারাও বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া বিশ্ব ও মানুষের মধ্যে চিরন্তন বৈর আছে এই কথা প্রচার করিয়াছেন ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক অথচ ঈশ্বরভক্ত প্যাস্কাল সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মানুষকে বধ করিবার জন্য বিশ্বের অস্ত্রধারণ করিবার কোনও আবশ্যক হয় না, এক বিন্দু জলীয় পদার্থ, এক ফুৎকার বায়ুই তাহার প্রাণনাশ করিতে পারে। তবু মানুষ বিশ্বের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ মানুষ জানে যে, বিশ্ব তাহাকে বধ করে, বিশ্বের সেই জ্ঞান বা অনুভূতি নাই।'

ইহার তাৎপর্য এই যে, মনঃসম্পন্ন মানুষ জড় বিশ্বের উপরে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে মানুষকে মন কে দিল? প্যাস্কালের মত বিশ্বাসীর কাছে এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ— মানুষকে মন দিয়াছেন ভগবান, বিশ্বের তাহাতে হাত নাই। মানুষ একদিকে বিশ্বের অধীন, কিন্তু মূলত বিশ্বোত্তর।

মানুষের সঙ্গে বিশ্বের কোনও বিরোধ নাই, বরঞ্চ দুই-এর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, এই কথা দার্শনিকদের মধ্যে একমাত্র প্রাচীন গ্রীক ও রোমান স্টোয়িক দার্শনিক ব্যতীত আর কেহ বলে নাই। এই প্রসঙ্গে এই দার্শনিকবাদের ইতিহাস বা পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। উহা প্রায় পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বিকশিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে স্টোয়িক দর্শনের বিভিন্ন রূপ দেখা গিয়াছিল। তবে এইটুকু বলা চলে যে, প্রথম হইতেই এই দর্শনের শিক্ষায় বিশ্বের সহিত মানুষের যোগের কথা আছে, স্টোয়িক দর্শনের মতে বিশ্বের নিয়ম ও ঈশ্বরের নিয়ম এক, সুতরাং উহাকে দুই দিক হইতেই মানিয়া লইতে হইবে এইরূপ নির্দেশ আছে।

আমি শুধু এই দর্শনের প্রথম দিক হইতে একটি উক্তি ও শেষের দিক হইতে আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব। জেনো এই দর্শনের প্রবর্তক, তাঁহার পরই ক্লেয়ান্থেস্ (খ্রীঃ পূর্ব ৩৩১-২৩১) উহার প্রচার করেন। গ্রীকদের সর্বোচ্চ দেবতা জিউস্-এর উদ্দেশে তাঁহার রচিত একটি স্তব আছে। তাঁহার জিউস গ্রীক পুরাণের জিউস একেবারেই নহেন। ক্লেয়ান্থেস্ তাঁহাকে ঈশ্বর মনে করিয়াই স্তবটি লিখিয়াছিলেন, উহা অবশ্য গ্রীক ভাষায় লিখিত। উহার অংশ বিশেষের ইংরেজী অনুবাদ দিতেছি,—

'Most glorious of immortals, O Zeus of many names, almighty and everlasting, sovereign of nature, directing all in accordance with Law...Thee all this universe, as it rolls round the earth (তখনও কোপারনিকাস ও গ্যালিলিওর মত দেখা দেয় নাই) obeys wheresoever thou dost guide, and gladly owns thy sway.'

অপর উক্তিটি রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের— তাঁহার 'আত্মচিন্তা' হইতে, ইহাও গ্রীক ভাষাতেই লিখিত। মানবজীবন সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শেষে তিনি যাহা বলিয়াছেন উহা তাঁহার চরম উক্তি। উহার ইংরেজী অনুবাদ দিতেছি,—

'Mortal man, you have been a citizen in this great city; what does it matter to you whether for five or fifty years? For what is according to its laws is equal for every man. Why is it hard, then, if Nature who brought you in, and no unjust judge, sends you out of the city—as though the master of the show, who engaged an actor, were to dismiss him from the stage? "But I have not spoken my five acts, only three." "What you say is true, but in life three acts are the whole play." For He determines the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

perfect whole, the cause yesterday of your composition, today of your dissolution; you are the cause of neither. Leave the stage, therefore, and be reconciled, for He also who lets his servant depart is reconciled.'

ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। মানুষ বিশ্ব বা প্রকৃতির হাতে, উহার দ্বারাই সৃষ্ট, উহাই তাহার কৃত্য স্থির করিয়া রাখিয়াছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, মার্কাস অরেলিয়াস বলিলেন, মানুষ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিতে পারে একমাত্র প্রকৃতির নিয়মকে চরম বিধান ও আদেশ বলিয়া মানিয়া। একমাত্র তখনই মানুষ বলিতে পারিবে যে, 'আমার জীবন দীর্ঘ কি অল্পকালস্থায়ী তাহার কোনও অর্থই নাই। শুধু এই কথাটাই বিচার্য, আমার জীবন যতটুকু তাহার মধ্যে যাহা আমার কর্তব্য, যাহা করার যোগ্য তাহা আমি করিয়াছি কিনা।'

এই উপদেশ এমনই মহান যে, খ্রীষ্টধর্মে অবিচল বিশ্বাস রাখিয়াও মিল্টন স্যাম্‌সন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

'His servants He, with new acquist
Of true experience from this great event,
With peace and consolation hath dismissed,
And calm of mind, all passion spent.'
(Samson Agonistes)

আমি ষোল বৎসর বয়সে প্রথম মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা পড়ি। তখন মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিটি চোখে পড়ে নাই, বুঝিবার বয়সও হয় নাই। সেই বয়সে সকলেই বিনা-বিচারে ধরিয়া লয় যে, বিশিষ্ট যে-একটা জীবনের ধারায় সে জন্মিয়াছে তাহাই তাহাকে যাপন করিতে হইবে। আমিও বাঙালী ভদ্রবংশে জন্মিয়া ইহাই মনে করিতাম যে, সকল ভদ্রলোকের ছেলের মত উচ্চশিক্ষা পাইতে হইবে, তাহার পর এই শ্রেণীর যুবকেরা জীবিকার জন্য যে উপায় অবলম্বন করে তাহাই করিব। আপাতত শিক্ষালাভই আমার কাজ, অন্য কথা ভাবিবার প্রয়োজন ছিল না।

তবে সে-বয়স হইতেই আমি মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সেটা তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নয়, শুধু পৃথিবীকে একান্তভাবে ভালবাসিবার ফলে। তাই অনেক সময়েই ঘুমাইতে যাইবার সময়ে মনে হইত, কাল প্রভাতে না উঠিতে পারি, পৃথিবীকে নাও দেখিতে পারি। সুতরাং পৃথিবীর সহিত বিচ্ছেদের কথাই বেশি ভাবিতাম। তখন এই গানটা আমার খুব প্রিয় ছিল— 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' তবে উহার দার্শনিক অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া শুধু কবিত্বটাই উপভোগ করিতাম।

আই-এ পাশ করিবার পর জীবিকার কি উপায় হইবে, এবং কোন কাজকে জীবনের কৃত্য বলিয়া করিব, তাহার কথা মনে জানিতে আরম্ভ করিল। উহা সে-যুগে প্রত্যেক ভদ্রলোকের ছেলের ভাবনার বিষয় হইলেও উহার সম্বন্ধে বেশি ভাবি নাই। তখন যে-সব ছেলেদের পিতা আইনজীবী হইতেন, পুত্রেরা প্রায় সব সময়েই গিয়া পিতার সঙ্গে সেই পেশাতেই ঢুকিত। আমিও তাহাই করিতে পারিতাম, আমার দাদা তাহাই করিয়াছিলেন। আমার কিন্তু আইনজীবী হওয়া সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ছিল। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম বিদ্যাচর্চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়াই জীবন কাটাইব। আই-এ পড়িবার সময়ে সকল বিদ্যার মধ্যে ইতিহাস সম্বন্ধেই আমার বেশি অনুরাগ ও আগ্রহ হয়। তাই তখন হইতেই মনে করিতাম, ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিব, ও জীবিকার জন্য কোথাও ইতিহাসের অধ্যাপকত্ব জোগাড় করিব। আমি পরীক্ষাতে ভাল ফলই করিতাম, সুতরাং অধ্যাপকত্ব পাইতে পারি এই আশা মনে ছিল। অবস্থাচক্রে অধ্যাপক হইতে পারি নাই, তবে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ বর্তমান রহিল, সারাজীবন জুড়িয়া।

জীবিকার কথা ছাড়িয়া জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন আমার মনে উগ্রভাবে দেখা দিল যখন এম-এ পরীক্ষা না-দেওয়ার জন্য অধ্যাপকত্ব করিবার পথ আমার সম্মুখে রুদ্ধ হইয়া গেল, এবং আমাকে সরকারি চাকুরিতে কেরানী হইতে হইল। এই বই-এ আগেই বলিয়াছি, ইহাতে আমার আর্থিক কোনও ক্ষতি হইত না, কিন্তু জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিল। উহার বিস্তারিত কাহিনী অন্য অধ্যায়ে দিয়াছি। তবে কিসের জন্য জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন এত প্রবলভাবে আমার মনে জাগিল তাহার পরিচয় দিব।

সরকারি চাকুরি লইবার পূর্বেই আমার মনে দুই-একটা গুরুতর পরিবর্তন আসিয়াছিল। উহাই জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য চেষ্টার কারণ। প্রথম পরিবর্তন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস হারাইলাম। ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রচলিত ধর্মেও বিশ্বাস হারাইলাম। সুতরাং হিন্দু না থাকিয়া ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান হইব এরূপ সংকল্প আমার মনে কখনও জাগে নাই। আমার মনে প্রশ্ন উঠিল ধর্মের উপর নির্ভর না করিয়া জীবনকে কি-ভাবে পরিচালনা করিব, কিসের শক্তিতে বা কিসের ভরসায় জীবনের অনিবার্য দুঃখকষ্টকে অতিক্রম করিতে পারিব।

আর একটা গুরুতর পরিবর্তনও ধর্মবিশ্বাস হারাইবার ফলেই আসিল। আমি আত্মার অমর অস্তিত্বে ও পরলোকে বিশ্বাস রাখিতে পারিলাম না। মানুষের মনের উপর পরলোকে আস্থা থাকা-না-থাকার একটা প্রচণ্ড অভিঘাত আছে। জীবনে সে কি চাহিবে অথবা চাহিবে না, জীবনকে কি-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবে, জীবনের মূল্য আছে কিনা সবই এই ধারণার উপর নির্ভর করে। যে-ব্যক্তি পরলোকে বিশ্বাস করে সে একভাবে জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, একভাবে আচরণ করে, আর যদি বিশ্বাস করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে চিন্তা করিতে হয় কিসের জোরে সে জীবনযাপন করিবে। ধর্ম হইতে লব্ধ পরলোকে বিশ্বাস হইতে এই ভরসা পায়, এই সান্ত্বনা পায় যে, এই জীবনে, অর্থাৎ ইহলোকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হইলেও পরলোকে সেই ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। আমি বাল্যবয়সে সর্বদাই গাহিয়াছি—

'জীবনে যত পূজা হলো না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা ॥
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা ॥'

ইহা ছাড়া আর একটি কবিতা হইতেও ভরসা পাইয়াছিলাম। আই-এ ক্লাসে পড়িবার সময়ে মিল্টনের সবগুলি সনেটই আমার পাঠ্য ছিল। যে-সনেটের কথা স্মরণ করিতাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উহা তাঁহার অন্ধ হওয়া সম্বন্ধে। যখনই আমার মনে হইত যে, দুর্বলতা বা অক্ষমতার জন্য আমি জীবনে কোনো বড় কাজ করিতে পারিব না, তখন এই সনেটের শেষ কথা আবৃত্তি করিয়া নিজের অধৈর্য সংযত করিবার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি এই—

'They also serve who only stand and wait.'

এই সান্ত্বনা পাইবার উপায় আমার আর রহিল না।

ধর্মবিশ্বাস হারাইবার ফলে আমার মনে আর একটা পরিবর্তন আসিল। তখন মনে করিয়াছিলাম উহাই আমাকে জীবনসংগ্রামে শক্তি দিবে। আমি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির (intellect-এর) উপর অপরিসীম আস্থা স্থাপন করিলাম। মনে করিলাম জীবনের রহস্য বুঝিবার জন্য, জীবনকে সার্থক করিবার জন্য বুদ্ধিই যথেষ্ট, বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। আমি তখন বের্গসঁ-র *Creative Evolution* পড়ি। উহার উপক্রমণিকাতে তিনি বলিলেন যে, বুদ্ধি কখনই জীবনের অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিবে না, কারণ বুদ্ধি জীবনের দ্বারা সৃষ্ট, সৃষ্ট বস্তু কি স্রষ্টার প্রকৃত রূপ কখনও বাহির করিতে পারে? কথাগুলি মনে অত্যন্ত কঠিন আঘাত দিয়াছিল, তবু বিশ্বাস করিতে পারি নাই। বুদ্ধিতে আস্থা রাখিলাম।

কিন্তু অন্য দিক হইতে একটা সংশয় আসিল। পরলোকে বিশ্বাস হারাইবার জন্য অবশ্য মনে হইয়াছিল যে, যাহা কিছু করিবার তাহা পার্থিব অস্তিত্বেই করিতে হইবে, না করিলে করিবার সুযোগ কখনও আসিবে না। কিন্তু পার্থিব কর্মে শ্রদ্ধা রাখিবার জন্য এই বিশ্বাসের প্রয়োজন যে, পার্থিব কর্ম শুভের জন্য, কল্যাণের জন্য, উন্নতির জন্য। এই বিশ্বাস তখন আমার ছিল। কারণ আমি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম সে-যুগে ইউরোপ হইতে লব্ধ উন্নতিবাদ আমাদের মধ্যেও প্রবল ছিল। মানুষের উন্নতি প্রকৃতির নিয়মেই হয়, ইহাই নিশ্চিত, এই ধারণা আমার ছিল।

কিন্তু সে-সময়েই ১৯২২ সনে আমি ডীন ইং-এর Idea of Progress বক্তৃতাটি পড়ি। ইহা হইতে মানুষের অনিবার্য উন্নতি সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিল। একটা দ্বিধায় পড়িলাম। তবু উন্নতিতে বিশ্বাস একেবারে হারাইলাম না। শুধু মনে হইল উহা আয়াসসাধ্য, সুতরাং উন্নতিকে triumphant বলিয়া না মানিয়া উহা militant বলিয়া ধরিতে হইবে, নতুবা উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকিবে না এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

কিসের উপর নির্ভর করিয়া আমি পার্থিব জীবনে ভরসা রাখিলাম এ-কথা পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তখন বলিতে পারিতাম, দুইটি বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া। সেগুলির একটি ফিজিক্স ও গণিতসম্মত ফিজিক্স বিশেষ করিয়া astrophysics; অন্যটি biology. আমি তখন যাহাকে ইংরেজীতে mechanistic biology বলে তাহাতে বিশ্বাসী ছিলাম, Vitalism-এর নাম শুনিলেই, বিরাগ প্রকাশ করিতাম, বের্গসঁ-র *elan vital*-এর কথা শুনিলেই বিরক্তি প্রকাশ করিতাম। জড়পদার্থ যে-বৈজ্ঞানিক নিয়মে আবদ্ধ মানুষের জীবনও সেই নিয়মে আবদ্ধ তাহা বিশ্বাস করিতাম। উহা আজিকার দিনে বিশ্ব সম্বন্ধে Stable State-এ বিশ্বাস করিবার মত ছিল।

কিন্তু আধুনিক astrophysics এবং গণিত ও আধুনিক জীবতত্ত্ব (biology বিশেষ করিয়া evolutionary biology) হইতেই আমার সেই সব ধারণাতে আঘাত লাগিল। এ দুইটি বিষয়ে অধ্যয়নে কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, এই দুইটিই মানবজীবনের অর্থ ও মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়া আশঙ্কার কারণ হইল। এমন কি এই জ্ঞান হইতে বিশ্বেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্থা হারাইতে বসিলাম।

গণিত বলিল, বিশ্বের শক্তি (energy) ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে (Second Law of Thermodynamics অনুযায়ী) ; একদিন উহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, বিশ্ব নিবিয়া যাইবে। এই সিদ্ধান্তে কোনো ভুল আছে তাহা কোনো গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখা যায় না। সুতরাং বিশ্বের অস্তিত্ব, অন্ততপক্ষে জীবনের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী নয়।

জীবতত্ত্বের অথবা evolutionary biology-র গৃহীত ধারণা এই যে, কীটপতঙ্গ হইতে মানুষ পর্যন্ত যে জৈব বিবর্তন বা বিকাশ দেখা যায় তাহারও কোন নিয়ম নাই, লক্ষ্য নাই, অবশ্যম্ভাবিত্ব নাই। এই সবই আকস্মিক, নিয়মবহির্ভূত সংঘাত বা প্রতিঘাত হইতে হইয়াছে। সুতরাং জীবন এবং জীবজগত অর্থহীন, লক্ষ্যহীন।

সুতরাং দেখিলাম, যে-বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জীবনকে অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত মনে করিয়া সংশয়হীন ছিলাম, তাহাও পায়ের নীচে ভূমিকম্পে পৃথিবীর মত টলিতে লাগিল। এই 'ভূমিকম্প' কমিল না। কোথায় দাঁড়াইব স্থির করিতে পারিলাম না। এটাও দেখিলাম, এইরূপ টলায়মান বিশ্বেরও স্থায়িত্ব নাই। সকলই অনিশ্চিত, অস্থির, নশ্বর বলিয়া মানিতে হইল। যে-বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিলাম, দেখিলাম উহা নাস্তিক্যবাদ— nihilism. পূর্বে পরলোকে আস্থা হারাইয়া নশ্বরতার সম্মুখীন হইয়াছিলাম, এখন বিজ্ঞানও আমাকে নশ্বরতা হইতে মুক্তি দিল না।

এই নশ্বরতা ও অর্থহীনতার অনুভূতি হইতে আমি পঁচিশ বৎসর মানসিক কষ্ট পাইলাম। ভয়ও মনে জাগিল যে, বিশ্বের প্রতি মানুষের একটা বিরোধ আছে ; মানুষ আস্তিক, বিশ্ব নাস্তিক ; তাই বিশ্বের কাছে মানুষ বলির পশুর মত। তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাহার জীবন চিরবিদ্রোহীর জীবন। আমার ধারণা প্যাস্কালের ধারণার মত হইল। আমি তাঁহারই কথায় বলিতে লাগিলাম,—

'Man is a reed, the feeblest reed in nature, but he is a thinking reed.'

চিন্তাশীল বিদ্রোহী হইয়াই মানুষকে জীবন ধারণ করিতে হইবে, শুধু মৃত্যু হইলে এই বিদ্রোহীত্ব হইতে সে নিষ্কৃতি পাইবে। কিন্তু সে কি নিষ্কৃতি! প্যাস্কালের কথাতেই বলিব,—

'The last act is tragic, however fine the comedy may be in all the rest. At last they throw earth on our head and there we are for ever.'

কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে তখন, এই মানসিক যন্ত্রণা হইতে আমি মুক্ত হইলাম। ইহার কথা আমি আমার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের শেষে লিখিয়াছি— উহাই এখানে উদ্ধৃত করিব, বাংলা ভাষায় লিখিব না। কথাগুলি এই—

'I have come to see that I and the universe are inseparable, because I am only a particle of the universe and remain so in every manifestation—intellectual, moral, and spiritual, as well as physical...Today, borne on a great flood of faith, hope, and joy in the midst of infinite degradation, I feel that I shall be content to be nothing for ever after death in the ecstasy of having lived and been alive for a

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

moment. I have made the discovery that the last act is glorious however squalid the play may be in all the rest.'

আমি আমার সারাজীবন ধরিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষের দুর্গতি, দুর্মতি, এবং অধোগতি। শুধু আমার দেশেই নয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতে কোনও সুখ পাই নাই, তাহাতে আশার কারণও দেখি নাই। তাহা সত্ত্বেও আমি শুধু শান্তিতে নয়, আনন্দেও আছি। এই অবস্থা আমার নূতন বিশ্বাস হইতে আসিয়াছে। উহার পিছনে বুদ্ধিবৃত্তি নাই, আছে শুধু বিশ্বাস।

সেই বিশ্বাস কি আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। এই ধারণাকে একটা অদ্বৈতবাদ বলা চলে। আমি বলিতে পারি— সোঽহম্ ; আমি আর বিশ্ব এক, শুধু এই একত্বে সাম্য নাই, বিশ্বের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘটপটাদিবৎ। বিশ্ব বৈদ্যুতিক শক্তি, অনন্ত, অফুরন্ত, অসীম, নিরাকার। উহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ শুধু আমাদের অনুভূতিলব্ধ। আমি সেই শক্তির একটি ক্ষুদ্র ভাগ ; বিশ্বের বৈদ্যুতিক শক্তির একটি ক্ষুদ্র ভাগ। একটি ছোট ব্যাটারিতে যেমন বিশ্বের বৈদ্যুতিক শক্তি অল্প পরিমাণে আবদ্ধ থাকে, বিশ্বের শক্তিও তেমনই আমার মধ্যে আবদ্ধ। দুই শক্তির মধ্যে ঐক্য আছে। আমি যেমন জীবন ও সংজ্ঞাযুক্ত, বিশ্বও তেমনই জীবন্ত ও সংজ্ঞাযুক্ত, তবে বিশ্ব অন্তঃসংজ্ঞ। হয়ত বিশ্ব যে কাজ করিতেছে, উহা নিজের অজ্ঞাতসারে। কিন্তু উহা লক্ষ্যহীন নয়, অর্থহীন নয়, যুক্তিহীন নয়।

এই সব কথাকে অনেকেই কথার মারপ্যাঁচ বলিয়া মনে করিবেন জানি। কিন্তু আমি যে নিজের জীবনকে দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করি, উহা এই সব বিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। উহা কেন দেবোত্তর সম্পত্তি তাহা বিশ্ব সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসের কথা না বলিয়া বুঝানো যাইত না। আমি বিশ্বের দাস, বিশ্বের সৃষ্ট, বিশ্বের কাজ করিবার জন্যই জন্মিয়াছি। সুতরাং আমার জীবনকে বিশ্বোত্তর সম্পত্তি বলিতে পারি। এই বিশ্ব আমাদের কি কাজ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছে, উহার পরিচয় দিয়া এই উপসংহার শেষ করিব।

বিশ্ব দাতা, মানুষ গ্রহীতা, কিন্তু এই দান অহৈতুকী নয়, শর্তবিহীনও নয়। এই কারণে এই দান গ্রহণ করিবামাত্র মানুষ ঋণী হয়। প্রাচীন হিন্দুরা বলিত যে, ঋণকারী পিতা পুত্রের শত্রু, কিন্তু পিতা ঋণদাতা হইলে শত্রু নয়। বর্তমান যুগের মানুষ কিন্তু ঋণদাতা বিশ্বকে শত্রু মনে করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। আমি সকলকে না পারি, যাহারা জন্মে আমার স্বজাতি, সেই বাঙালীকে এই স্বেচ্ছাচারিতা যে পাপ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি— বাক্যে ও কর্মে।

বিশ্বের সহিত মানুষের সম্পর্ক মূলত কি তাহা, আমি এ-পর্যন্ত যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতে পাঠক সম্ভবত অনুমান করিতে পারিবেন। তবু আমার বক্তব্য কি তাহা আরও স্পষ্ট করিবার জন্য বিশ্ব কি তাহা সর্বাগ্রে বলি।

বিশ্ব নিষ্ক্রিয় ও অচল নহে, সক্রিয় ও সচল। এখন আমি যাহা বিশ্বাস করি তাহার বশে বলিব, এই সক্রিয়তা ও সচলতার কখনই শেষ দেখা যাইবে না, উহা অনন্ত কাল ধরিয়া চলিবে, ইহাও হয়ত বলিতে পারি, বিশ্ব অবস্থানে সান্ত হইলেও উহার একটি বিশিষ্ট অন্ত সাময়িক, সুতরাং বিশ্বের সীমা ক্রমাগত সরিয়া যাইতেছে ও বিশ্ব আরও বিস্তার পাইতেছে। অর্থাৎ আমি everlasting and expanding universe-এ বিশ্বাস করি, এবং ইহাও বলি যে, বিস্তার এবং বিকাশ শুধু বস্তুগতই নহে গুণগতও বটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বকে যখন নিরন্তর সক্রিয় ও সচল বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহার জন্য আমি ইহাও বিশ্বাস করিতে এবং বলিতে বাধ্য যে, এই দুই অবস্থার ফলও ক্রমাগত দেখা যাইবে, অনেকভাবে এবং নানা রূপে। যাহাকে আমি ফল বলিতেছি, তাহা আসলে বিশ্বের আত্মপ্রকাশ মাত্র। বিশ্ব বলিতেছে— একোঽহম্ বহু স্যাম্। তবে মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ক শুধু কর্তা-কর্মের সম্পর্ক নয়, মানুষ একদিক হইতে বিশ্বের কর্মের লক্ষ্য হইলেও, অন্যদিকে তাহাতে কর্তাও বটে। অর্থাৎ বিশ্বের সহিত মানুষের সম্পর্ক সর্বোচ্চ কর্তার সহিত ক্ষুদ্রতম কর্তার সম্পর্ক। সুতরাং বিশ্বের যাহা ধর্ম মানুষেরও তাহাই ধর্ম।

বিশ্ব যে সক্রিয় ও সচল, শুধু তাই নয়, উহা সজীব। এই ধারণা আমি বাল্যকাল হইতেই অজ্ঞাতসারে অনুভব করিতাম। আমি ঘন জঙ্গলে যাইতে ভয় পাইতাম, মনে হইত গাছ হইতে সজীব কিছু বাহির হইয়া আমার দেহে প্রবেশ করিতেছে। উহা ভূতে বিশ্বাস নয়, আমারই মত জীবন্ত কিছুতে বিশ্বাস, তবে যাহা অশরীরী। আরও বড় হইবার পর যখন কিশোরগঞ্জে বা বনগ্রামে রাত্রিতে ক্ষেতের মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছি, তখন অনুভব করিতাম, আমার চারিদিকে দিনের রৌদ্রে কবোষ্ণীকৃত ক্ষেত হইতে পরীর মত অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার জীব নাচিতে নাচিতে আকাশে উঠিতেছে।

নির্জন জায়গায় গেলেই এই অনুভূতি আসিত। সুতরাং বিদেশেও নির্জন জায়গায় যখনই বেড়াইতে গিয়াছি তখন চারিদিকে অন্য জীবন্ত কিছু আছে তাহা অনুভব করিয়াছি। অক্সফোর্ডের কাছে, হোয়াইট হর্স হিল বলিয়া একটা পাহাড় আছে, উহার উপর দিয়া তীর্থযাত্রীদের জন্য ক্যান্টারবেরী যাইবার পথ গিয়াছে, সেখানে দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছে, নিকটেই যে গুহাতে ওয়েল্যান্ড স্মিথ কামারশালা বসাইয়াছিল, তাহাতে এখনও সে ঠকঠক করিয়া কাজ করিতেছে। এই পাহাড়ের উপর নবপ্রস্তরযুগের মানুষ সাদা পাথরে একটা বিরাট ঘোড়ার relief করিয়াছিল।

এরূপ অলৌকিক অনুভূতি কানাডায় গিয়া অন্যভাবে হইয়াছিল। কানাডা অতিবিস্তীর্ণ অরণ্যানী ও তেমনই বিস্তৃত হ্রদের দেশ, লোকবসতি সে-সব অঞ্চলে নাই বলিলেই চলে। এইরূপ অঞ্চল দেখিয়াছি বিশেষ করিয়া উইনিপেগ অঞ্চলে। লোকের বিশ্বাস এই অঞ্চলের উপর একটা বিশাল-আকৃতি অপদেবতা প্রচণ্ড বেগে উড়িয়া বেড়ায়, তাহার নাম ওয়েনডিগো। সে নীচে কোনো একাকী মানুষ দেখিলেই ছোঁ মারিয়া তাহাকে আকাশে তুলিয়া এত বেগে উড়িতে থাকে যে বাতাসের ঘর্ষণেই লোকটার পা পুড়িয়া যায়।

আমি একদিন উইনিপেগ শহর হইতে 'রেড-রিভার' নদীর ধার দিয়া মোটরকারে উত্তর দিকে যাইতেছিলাম, মনে হইতেছিল যেন হাডসন বে-র কাছে না আসিলেও প্রায় উইনিপেগ হ্রদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। এইখানেই ওয়েনডিগোর উৎপাত বেশি হয় এই ধারণা আছে। আমারও মনে হইল পাছে ওয়েনডিগো আসিয়া আমাকে আকাশে তুলিয়া ফেলে— তবে চারিদিকে বনজঙ্গল ছিল না, ইহা হইতে ভরসা পাইলাম।

আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া যে অলৌকিক, অদৃশ্য অথচ জীবন্ত কোনো শক্তি রহিয়াছে, তাহার সবচেয়ে প্রবল অনুভূতি আমার হইয়াছিল ইংলন্ডের নরফোকের সমুদ্রতীরে নর্থ-সি-র দিকে চাহিয়া।

সেখানে একটা গ্রাম ছিল, কিন্তু সেই গ্রাম ও সমুদ্রের মধ্যে জলা, উহাতে বহু বুনো হাঁস সাঁতার কাটিতেছিল। আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া এই জলাগুলি পার হইয়া সমুদ্রের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম। সেখানে পৌঁছিতে তিনটা নুড়ির সারি বালিয়াড়ির মত উঠিয়াছে, তাহা পার হইতে হয়। পত্নী প্রথম নুড়ির স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি অগ্রসর হইয়া একেবারে সিকতাসজ্জিত বেলাভূমিতে চলিয়া গেলাম। সেখানে উত্তর-সমুদ্র তরঙ্গে-আবর্তে লুণ্ঠিত হইতেছিল। কাছে সমুদ্রের জলে কপোতের গলার রঙ-এর মত নানা রঙ-এর আভা— কিন্তু সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধূসর জলরাশি। উহা তীরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, উহার গতি স্থলের দিকে, কিন্তু আমার মনে হইল উহার টান বাহিরের দিকে, আমাকে টানিয়া লইবার জন্য আসিতেছে। আমি দেহেও একটা আলোড়ন অনুভব করিলাম যেন সম্মুখদিকে ছুটিয়া গিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িব। ভয় পাইলাম উহাকে ঠেকাইতে পারিব না, তাই পত্নীর আকর্ষণ যদি সমুদ্রের আকর্ষণের প্রতিকূলতা করিতে পারে সেই ভরসায় তাঁহার কাছে ফিরিয়া গেলাম। এই ঘটনাটা ঘটিয়াছিল ১৯৬৮ সনে, যখন আমার বয়স একাত্তর।

আমার মনে হয়, আমার মধ্যে আদিম মানবের দৈহিক এবং মানসিক ধর্ম এখনও সক্রিয় আছে। অর্থাৎ আমি এখনও আংশিকভাবে animist। Animism-এর জন্য আদিম মানব মনে করিত যে, তাহার চারিদিকের জড়পদার্থও জীবন্ত। এখন আমি কোনো দৃশ্য অথবা স্পর্শগ্রাহ্য বস্তুকে সম্পূর্ণ জড় মনে করিতে পারি না, সক্রিয় এবং সজীব বলিয়া ভ্রম করি, কিন্তু এটা কি সত্যই ভ্রম মাত্র ?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মতেও কিন্তু বিশ্ব বস্তুগত জড় phenomenon নয়—একটা process। দুইটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম। Process-কে বাংলাতে কার্যক্রম বলিতে পারি। 'ক্রম' শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে একটি অর্থ একটি সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে এইরূপ দেওয়া হইয়াছে— regular course, order, series, succession। দৃষ্টান্ত শকুন্তলা নাটক হইতে দেওয়া হইয়াছে—

উদেতি পূর্ব্বং কুসুমং ততঃ ফলং
ঘনোদয়ঃ প্রাক্তদনন্তরং পয়ঃ
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রমঃ ॥
(৭ম অঙ্ক শ্লোক ৩০)

মনুসংহিতাতেও এইরূপ প্রয়োগ আছে

এই কার্যক্রমে যাহা দেখা যায় তাহা হিন্দুমতে আমাদের তিন প্রধান দেবতার, আমাদের Trinity-র কার্য। ইঁহারা ব্রহ্মা স্রষ্টা, বিষ্ণু স্থিতির রক্ষক, মহেশ্বর প্রলয়ের কর্তা। এই তিন কাজ বৈজ্ঞানিকের মতে বিশ্বেও চলিয়াছে। তবে বিজ্ঞানে প্রলয় নাই, বিনাশ বা লোপ আছে। বিশ্বকে প্রবহমান রাখিতে হইলে এই তিনটি কাজকেই অবিরত চালাইতে হইবে।

আমি সমস্ত বিশ্বের কথা বলিতে চেষ্টা করিব না। উহা করিতে গেলে অত্যন্ত জটিল গাণিতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এ-বিষয়ে গত ত্রিশ বৎসরে যে গবেষণা হইয়াছে তাহাতে আইনস্টাইন, ডাঃ হাবল্ প্রভৃতির মতেও পরিবর্তনের আবশ্যক হইয়াছে। তবে বিশ্ব কত বড়, উহা সীমাহীন, না সীমাযুক্ত এই দুই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নাই। এ পর্যন্ত যতদূর দূরবীনে দেখা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে হিসাব দাঁড়াইয়াছে যে বিশ্বের বয়স পনেরো বিলিয়ন আলোক-বৎসর (light years), উহা পনের শত কোটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৌর বৎসরের সমান। এক বিলিয়ন আলোক-বৎসরই ৫·৭ ট্রিলিয়ন মাইলের সমান। সুতরাং বিশ্বের আয়তন মানুষ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। উহাতে কি আছে, তাহাও নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই। সুতরাং মানবজীবনের কথা বলিতে গিয়া সারা বিশ্বের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা না করিলেও চলিবে। শুধু পৃথিবীর কথা বিবেচনা করাই যথেষ্ট। এই অনুসন্ধানের ফলেও যাহা দেখা যায় তাহাও একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

সেটা এই, পৃথিবীতে সৃষ্টিকার্য নিশ্চয়ই বিশ্বের দ্বারা আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু একবার প্রথম সৃষ্টি করিবার পর, নূতন জীবন বা জীব সৃষ্টি বিশ্ব নিজে করিতে পারে নাই। এই কারণে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ অব্যাহত রাখিবার জন্য বিশ্বকে নিজের সৃষ্ট জীবন্ত জিনিসের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। যেমন এক রকমের উদ্ভিদ হইতেই নানা রকম উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে। এক রকম প্রাণী হইতেই নানা রকমের জীব দেখা দিয়াছে। সুতরাং জীবন্ত জিনিস বিশ্বের অংশ হইলেও, বিশ্বের সৃষ্ট জিনিস হইলেও, বিশ্বের কাজ চালাইবার জন্য বিশ্বের কর্মচারী। বিশ্বের সহিত এই দুই রকমের সম্পর্ক বজায় না রাখিয়া জীবন্ত জিনিসের বা জীবের বিশ্বে থাকিবার অধিকার নাই।

প্রথমে জীবন্ত সত্তার কথাই বলি। উদ্ভিদ তাহা। উহার কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, উদ্ভিদ ভিন্ন নূতন উদ্ভিদ জন্মে না। প্রাণীর বেলাতেও তাহাই। এক প্রাণী ভিন্ন বহু প্রাণী পৃথিবীতে দেখা যাইতে পারে না। সুতরাং জীবনের প্রবাহ বহমান রাখা যতটুকু বিশ্বের কার্য, তাহার ভার বিশ্বের অংশ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপর। এই ভার যদি উদ্ভিদ বা প্রাণী অস্বীকার করে তাহা হইলে বিশ্বে তাহার স্থান নাই। তাহার অস্তিত্ব অর্থহীন।

ইহার পর শুধু মানুষের কথাই বলিব। বিশ্বের কর্মচারী ও প্রাণী বলিয়া মানুষকে মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইতেছে নূতন মানুষের জন্ম দিয়া। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অনিচ্ছাতেই হউক কিংবা অক্ষমতার জন্যই হউক এই কাজ না করিতে পারে। ইহাতে কোনো ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ সৃষ্টির জন্য বিশ্বে সব বিষয়েই একটা safety margin আছে, অর্থাৎ বিশ্বও হাতে রাখিয়া কাজ করে। কিন্তু যাহারা এই কাজে যোগ দেয় না, বা দিতে পারে না তাহারা বিশ্বের rejects—ছাঁট, বরবাদ। ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া বলিব— সক্ষম জীবের, সুতরাং মানুষের অবশ্যকর্তব্য জন্মস্রোত বজায় রাখা।

একমাত্র মানুষের বেলাতেই এই কর্তব্য পালন করা না-করার প্রশ্ন উঠিতে পারে। অন্য জীবের বেলাতে উহা স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হয়। তবে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক আবহমান কাল ধরিয়া মানুষ এই কর্তব্য করিয়াছে। কেবলমাত্র সম্প্রতি মানুষের অস্বাভাবিক দম্ভ ও আত্মপরায়ণতার জন্য ইহা অস্বীকৃত হইতেছে। এখন স্ত্রী-পুরুষ দুইজনই বলিতেছে যে, সৃষ্টির জন্য যাহার প্রয়োজন, অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম, তাহা শুধু উহাদের দৈহিক সুখের জন্য, সুতরাং জন্ম দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই, দায়িত্বও নাই। জন্ম না দিয়া এই সুখ উপভোগ পূর্বে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে নিবারণের নানা উপায় বাহির করিয়া মানুষ এই দায়িত্ব এড়াইতে পারিতেছে। আমার মতে এই সব উপায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপব্যবহার, জন্মনিবারণ বিশ্বের নিয়মের বিরোধী, সুতরাং বিশ্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। উহাকে পাপ ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না।

এ-বিষয়ে একটা যুক্তি অবশ্য দেখানো হইতেছে, বলা হইতেছে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ খাদ্য এত কম হইতেছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ করিয়া লোকসংখ্যা কমানো দরকার। তাই যদি হয়, তবে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ না করিয়াও খাদ্যের অভাব হয় নাই কেন? এখনই হইতেছে কেন? ইহাও মানুষের জৈববৃত্তির অপব্যবহারের জন্য। হিন্দুর শাস্ত্রে আছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'। তবে এই দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া, অর্থাৎ সন্তানের ভার বহন না করিয়া দৈহিক তৃপ্তির জন্য আবহমান কাল ধরিয়া মনুষ্যসমাজে বেশ্যাবৃত্তি ছিল। উহাতে নরনারী সঙ্গম তো অনিয়মিত, তবু উহার জন্য লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া খাদ্যাভাবের ভয় জন্মে নাই কেন? তাহা হইলে কি বেশ্যাবৃত্তির জন্য স্ত্রীলোক অনেকাংশে বন্ধ্যা হইয়া যায়? ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ককে ব্যাপক বেশ্যাবৃত্তি করিয়া ফেলিলেই তো লোকসংখ্যার হ্রাস সহজেই হইয়া যায়—পাশ্চাত্য দেশগুলিকে তথাকথিত 'তৃতীয় জগত'কে এত টাকা দিতে হয় না।

আসলে এই যুক্তি একটা ওকালতি মাত্র, স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক উপভোগ অসংযত রাখার জন্য সাফাই। গর্ভরোধকে একটা সামাজিক কর্তব্য বলিয়া প্রচার করা হইতেছে মূলত অন্য কারণে— পাশ্চাত্য জগতে কামপ্রবৃত্তির উগ্র ও অসংযত প্রকাশের জন্য। ইহার ফলে সেই জগতে বিবাহিত জীবন পর্যন্ত ছদ্মবেশী বেশ্যাবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সন্তানের জন্ম দিয়া পৃথিবীতে মানবজীবন অব্যাহত রাখা জৈবস্তরে বিশ্বের কাছে মানুষের যে ঋণ তাহা পরিশোধ করা।

কিন্তু ইহা ছাড়া, ইহার উপরেও মানুষের আরও ঋণ আছে, আরও কিছু করিবার আছে। ইহা যে স্পষ্ট করিয়া কেন উপলব্ধ হয় না তাহা আমি বুঝিতে পারি না। হয়ত বা ইহা এত বেশি সহজ সত্য যে, উহাকে কেহই লক্ষ্য করে না। সেই সত্যটা এই রূপ— বিশ্ব প্রাথমিক বা মৌলিক জড়পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারিলেও গৌণ ও রূপান্তরিত জড়পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না, পারে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলার কথা বলিতে পারি। ইহা হইতে বিশ্বে নূতন জড়বস্তু ও জড়-সৌন্দর্যের আবির্ভাব ও বিকাশ হয়। ইহার অতিরিক্ত, মানুষের জীবনযাত্রাকে কম আয়াসসাধ্য ও প্রীতিজনক করিবার জন্য যানবাহন যন্ত্রাদি নির্মাণ মানুষেই করিয়াছে। মানুষকে এই সব কাজ করিতে হইয়াছিল এবং হইতেছে এই জন্য যে, বিশ্বের জড়সৃষ্টিও এক জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছিল, অথচ উহাকেও অব্যাহত রাখার প্রয়োজন ছিল। নূতন জড়পদার্থ সৃষ্টির ভার বিশ্ব মানুষের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিজের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছে— ইহা বৃদ্ধ পিতার পুত্রের হাতে সম্পত্তির কাজ চালাইবার আংশিক ভার দেওয়ার মত। বিশ্ব কর্তাবাবু, মানুষ বড়বাবু, মেজোবাবু বা ছোটবাবু।

কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, বিশ্বের সৃষ্টিকার্য শুধু জড়সৃষ্টির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। আরও সৃষ্টি বিশ্বে ও বিশ্বের দ্বারা হইয়াছে, এবং উহাই বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ সৃষ্টি সেটা মনোজগত। উহাকে বিশ্বের স্থূলদেহের সহিত একান্তভাবে সংলগ্ন সূক্ষ্মদেহ বলা চলে। মানুষই এই সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের মন ক্রিয়মান না হইলে এই জগতের অস্তিত্ব দেখা যাইত না। ইহার দ্বারাই বিশ্ব বৃহত্তর ও মহত্তর হইয়াছে। এই সম্ভাবনা বিশ্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল, মানুষের সহায়তায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

মানুষের সৃষ্ট মনোজগত সম্বন্ধে প্রথমেই লক্ষ্য করিবার ব্যাপার এই যে, উহা বিশ্বে একটা নূতন আবির্ভাব— emergence। ইহার দ্বারা বিশ্ব একটা নূতন রূপ, নূতন অর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ করিয়াছে।

মনোজগৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে। উহা এই—মানসিক জীবনই মানুষের সত্যকার জীবন। ইহার জন্যই মানুষ জন্তুমাত্র না থাকিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে এবং মনুষ্যত্ব স্থায়ী করিবার জন্য মানুষকে মনোজগতকে সচল রাখিতে হইবে।

মানুষ মানুষ হিসাবে বহির্জগতে যাহা কিছু করে তাহার প্রেরণা মনোজগৎ হইতেই আসে, শুধু জৈববৃত্তির বশে আসে না। সেজন্য চিন্তা করিতে পারে বলিয়াই মানুষ আছে। এই সত্য ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছিলেন এই কথা বলিয়া— Cogito, ergo sum—I think, therefore I exist; ইহাতে শুধু একটা কথাই যোগ করিবার আছে— শুধু চিন্তা নয়, অনুভব করে বলিয়াও মানুষ মানুষ হইয়া বাঁচিয়া আছে।

তাই দেখা যাইতেছে, বিশ্বের পূর্ণবিকশিত ও পূর্ণপ্রসারিত অস্তিত্ব মানুষের মনোজগতে। এই জগৎকে নূতন সৃষ্টির দ্বারা আরও বিকশিত, আরও প্রসারিত করিবার, অন্ততপক্ষে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার মানুষের উপর।

এই দায়ের জন্যই আমি আমার জীবনকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়াছি, প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা 'বিশ্বোত্তর' সম্পত্তি। আমার কাছে এই দুইটি কথারই অর্থ এক। এইজন্যই আমি মানুষকে দান এবং ঋণ গ্রহণকারী বলিয়া মনে করি। এই ঋণ শোধ করাই মানুষের কৃত্য। ইহা না করিলে সে অকৃতজ্ঞ হইবে, বিশ্বাসঘাতক হইবে। আমাদের প্রাচীন বচন আছে—'ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতি।'

কিন্তু আমি এ-কথা বলিব না যে, বিশ্বের প্রতি কর্তব্য সাধন করিবার জন্য মানুষকে সুখ ও আনন্দ ত্যাগ করিতে হইবে। এই দুইটি চাহিবার ও লাভ করিবার অধিকারও তাহার আছে। বিশ্বের প্রতি কর্তব্যসাধন উপভোগহীন, আনন্দহীন ঋণশোধ মাত্র নয়। বিশ্ব মানুষের উপর শুধু গুরুভারই চাপায় নাই— ইহাও করিয়াছে যে, এই ভার বহন হইতে তাহার আনন্দও আসিবে। বিশ্বের নিয়মে নারী গর্ভযন্ত্রণা, প্রসবযন্ত্রণা অনুভব করে, কিন্তু যন্ত্রণাপ্রসূত শিশুটিকে দেখিলে তাহার মন সুখে ও আনন্দে পরিপূরিত হইয়া যায়।

লিখিতে গিয়া কি যন্ত্রণা তাহা আমি সারা লেখকজীবন জুড়িয়াই অনুভব করিয়াছি। কিন্তু রচনাটি শেষ করিয়া আনন্দই অনুভব করিয়াছি। কর্তব্যপালনেও যে স্বভাবদত্ত আনন্দ আছে তাহার কথা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলিয়াছেন, কর্তব্যকে উদ্দেশ্য করিয়া, তাঁহার Ode to Duty কবিতাটিতে—

'There are who ask not if thine eye
Be on them; who, in love and truth
Where no misgiving is, rely
Upon the genial sense of youth:
Glad hearts! without reproach or blot,
Who do thy work and know it not.

* * *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Serene will be our days and bright
And happy will our nature be
When love is an unerring light;
And joy its own security.'

বিশ্বের প্রতি কর্তব্য সাধন করিতে গিয়া, কেবল ভারই বহন করিতেছি ইহা মনে না করিয়া, দেহে না পারিলেও মনে চিরতারুণ্য রাখিতেছি ইহা মনে করাই মানুষের গৌরব।

মানুষের জীবন দোষাবহ ও অস্বাভাবিক হয় তখনই যখন সে দৈহিক প্রবৃত্তির বশে, যাহাকে হিন্দুর শাস্ত্রে ষড়রিপু বলে তাহাদের বশে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া আত্মপরায়ণ হয়। ইহাও সত্য যে, এই কারণেই মানুষের জীবনে জীবনব্যাপী দ্বিত্ব ও দ্বন্দ্ব আসিয়াছে। উহা বিশ্বের দ্বারা সৃষ্ট নয়, মানুষের নিজের দুর্বলতার জন্য নিজের দ্বারাই সৃষ্ট।

ইহার প্রভাবে মানুষ অনেক সময়েই বিশ্বের প্রতি দায় ভুলিয়া প্রবৃত্তির দাস হয়। তাহা আপাতত প্রীতিজনক হইলেও, উহা হইতে পরিণামে দুঃখ ও ব্যর্থতা ভিন্ন কিছুই আসে না।

আসলে মানুষ প্রবৃত্তির বশে যে-ধরনের সুখের পিছনে ছোটে তাহা, ইংরেজীতে যাহাকে pleasure বলে তাহা, happiness নয়, joy তো নয়ই। এগুলি স্বতন্ত্র জিনিস। তবে happiness ও joy-এর মধ্যে একাত্মতা আছে, joy happiness-এর উচ্ছলিত রূপ। Pleasure এবং happiness অনেক ক্ষেত্রেই জড়িত হইয়া যায় বলিয়া অনেকে উহার বশবর্তী হওয়াকে অন্যায় মনে করে না।

বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতের মানুষ pleasure-কেই চরম কাম্য বলিয়া মনে করিতেছে, সেজন্য পাশ্চাত্য জগতে সুখের অনুভূতি লোপ পাইতেছে। বিশেষ করিয়া আমেরিকানরা ভোগকেই জীবনের চরম ও একমাত্র সুখ বলিয়া মনে করে। কিন্তু সেজন্যই আমেরিকানদের ব্যক্তিগত জীবনে যে শূন্যতা ও দুঃখ দেখা যায়, তাহা ভুলিয়া থাকিবার জন্য আমেরিকানরা নেশাখোর হইয়াছে। আমেরিকানদের মধ্যে যাহারা বেশি ধনবান তাহাদের মধ্যেই আবার নেশা করা বেশি, বিবাহিত জীবনে অশান্তিও বেশি। আমেরিকানদের অনুকরণে শুধু ইউরোপীয় জাতিই নয়, উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়েরাও ভোগকেই চরম কাম্য বলিয়া ধরিতেছে। এই বিপথ হইতে কি তাহারা ফিরিবে? উহা বলিবার উপায় নাই। তবে আমি নিজের জীবনকে দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করিয়া দেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি বলিতে পারি না যে, কৃতকার্য হইয়াছি, হইব তাহাও বলিব না। শুধু আশার বশেই আমার যাহা বলার তাহা বলিতেছি।

তবে আমি এত বুদ্ধিহীন বা সঙ্কীর্ণ নই যে বলিব, জীবনকে সার্থক করিবার জন্য, বিশ্বের ঋণ শোধ করিবার জন্য আমি যে-পথ ধরিয়াছি সকলকেই সেই পথই ধরিতে হইবে। প্রত্যেকটি মানুষকেই সে কোন পথে চলিতে পারে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। বিশ্ব মানুষের কাছে শুধু এই দাবি করে যে, বিশ্ব তাহাকে যে-শক্তি দিয়াছে সেই শক্তি দিয়াই বিশ্বের ঋণ শোধ করিবে। ইহার বেশি কিছু চাহিবার মধ্যে যে-অবিচার আছে তাহা বিশ্বে নাই। বিশ্বের কথা আমাদের ভগবানের মত, তিনি বলিয়াছিলেন,—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং
যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্
অশ্রামি প্রযতাত্মনঃ ॥

শুধু 'সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' তাহা হইলেই 'অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

আমি এই কথা বলিয়াই বইটি শেষ করিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

(যে-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি শেষ জীবনে সুখে ও শান্তিতে আছি, মৃত্যু আসন্ন হইলেও উহার ভয় নাই, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি লন্ডনের 'Independent on Sunday' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে দিয়াছিলাম। উহা এই বই-এ পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। হয়ত ইহাতে আমার বিশ্বাস যে কি তাহা আরও স্পষ্ট হইবে।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The Independent on Sunday, 28 January 1990

What I believe

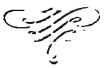

Over the last 40 years I have offered three accounts of what I believe: first, very briefly at the end of my book, *The Autobiography of an Unknown Indian;* second, in a longish article in the most widely read weekly journal in India as part of a series of confessions of faith beginning with one from the first non-European cardinal of the Roman Church; and lastly in the epilogue to the second part of my autobiography, *Thy Hand, Great Anarch!* None was regarded as any kind of confession of faith, although to the last I gave the title *Credo ut intelligam*—I believe in order to understand—a famous Christian formula.

That was because, in conformity with an established tradition, all confessions of faith are affiliated to religion, usually an established one, and I was offering as faith something without connection with religion. Most religions, despite their bewildering variety, are based on three simple but fundamental notions: that human beings do not cease to exist with death, but continue in an incorporeal form; that they pass into an eternal and perfect world imperceptible to the senses; and that, presiding over that world, there is an all-powerful and all-knowing personality who not only gathers those who die in this world, but also cares for the living in the material world. I, on the contrary, was accepting death as the final end of the living individual, denying the existence of the transcendental world, and not recognising a personal God. Therefore my view of life could not be faith in any acceptable meaning of the word.

Certainly, that is a valid religious objection. But what I offer is an non-religious faith, a contradiction in terms to those who take their stand on religion. But I am not being paradoxical, because men stand in need of

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

faith to go through their worldly life, in which inevitably they have to face evil, suffering, and disappointment.

Of course, the great majority of men live without thought, taking life for granted, and also because they are born with love of life. That is to say, they live just as animals do, being three-quarters animals themselves. But the quarter of pure humanity in them suffers, and in order to bear that suffering, man has created a double of his own world in another world.

But supposing the same sort of strength in living could be ensured by conceiving of this world as inherently good, even perfect, and evil as accidental to a general tonality, created by man's hubris, there would be no need for a transcendental world of the imagination. But is this possible?

I think it is, and that is the first article of my faith. I would emphasise that this is not the meliorist's faith, which is only liberal humanism. My faith, in spite of being independent of religion, is in something outside of man, something above man, to whose domination he is not only subject, but should be ready in his own interest to surrender his egoism. That something is the universe thought of as animate.

But this faith did not come to me quickly or easily, it came after decades of suffering, which followed my loss of faith in all established religions before I was even 25. The suffering also came because at first I thought that the intellect would be able to fill up the void created by the loss of religious faith. I became fanatical in my belief that only the intellect could explain life and assign any value to it. For this I depended above all on two sciences, modern physics and modern biology. But in the end both failed me.

The most relevant conclusion of physics for life was that the universe was running down and would one day become extinct. The evolutionary biologists were almost unanimous that the evolution of species was not purposive, but the result of an accidental combination of variations. My mind was repelled by both ideas, but as long as I belived in science, I could not reject them.

So, the suffering which was created by the void left by religion now became positive, because life did not possess any meaning to me. Furthermore, those scientists who offered views on human life in the light of science did not bring comfort to me. As moralists they did not approach even the oldest religious teachers, for example, the authors of the Bible's Book of Proverbs and Book of Ecclesiastes. I give only two examples. Bertrand Russell, whatever his eminence as a mathematician and philosopher showed himself a self-indulgent egotist in his writings on

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

human life. I felt nothing but contempt for his weak self-pity. Even Einstein, a far greater scientist and, equally, a far greater man, uttered only banalities on human affairs. Thus scientists could help me neither in their special role nor in their general role as teachers.

Yet I could not fall back on religion, as many eminent European rationalists had done. That would have been apostasy from reason, my allegiance to which remained unshaken. I had to find a faith consistent with reason. As it happened, I found a way to it from the positive conclusions of physics, only rejecting its nihilistic eschatology. What the physicists have finally established is that what we regard as the material universe is only a subjective illusion of man. I read Sir Arthur Eddington's *Nature of the Physical World* in 1928, and from it learned for the first time that the material universe is only the image which man's sense organs create out of an immaterial energy which is organised in patterns of motion.

Now the invention of television has finally given a practical demonstration of the truth of that scientific hypothesis, and put an end to the credibility of a material universe. On the one hand, there can be no doubt that what we see on the television screen is a pictorial representation of the things we see in real life. On the other, there is equally no doubt that these images are produced by electricity in motion. On this analogy it is permissible to hold that the universe is really a cosmic TV show run by some power who designed it for some end known only to itself.

If this view of the nature of the universe is correct, there can be no room for materialism, for then we have to regard it as a process, as a flow of energy towards a goal. Then the only thing which man, who has been created by the process, can or ought to do is to follow the current of the process. This would render any aberrant desire of an individual a frivolity. So, I would define my faith as a conviction that I am in the hands of a power which determines my life. Dante said of the God of religion: *E'n la Sua volontate— e nostra pace:* in His will is our peace. I have discovered the same God in the universe, and found my peace.

Certainly, it is difficult to accept the universe in this manner if we consider the present state of humanity. To me, it seems that man in his arrogance has set himself against the universe and is determined to play the role of the rebellious angel. In this conflict I shall be, and indeed am, on the side of the universe, one of the loyal angels.

As it happens, only a few days ago I came upon a passage in Ernest Renan's *Recollections of Childhood,* published in 1883, which sums up

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

my attitude to the universe. In the last quarter of the nineteenth century, some of the greatest minds of Europe had been brought to a mood of deep pessimism about the future of man by the radical transformations in human life due to science and democracy. Renan was one of them, but he tried to reassure himself in these words:

"Let us, without worrying about it, allow the destiny of the planet accomplish itself. Our lamentations will not affect it, and our ill-humour will be misplaced. The universe does not know discouragement, it renews every task that has miscarried, every check leaves it young, alert and full of illusions. Courage, courage!"

I also would leave it at that, only adding that, in religious terms, my faith might be called impersonal pantheism.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~